রবীন্দ্রনাথ ও পূর্বাঞ্চলীয় চার ভাষার ছন্দ

রামবহাল তেওয়ারী

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ

রবীন্দ্রনাথ ও পূর্বাঞ্চলীয় চার ভাষার ছন্দ

(আধুনিক বাংলা-অসমীয়া-ওড়িয়া ও হিন্দী ছন্দের তুলনাত্মক আলোচনা)

রামবহাল তেওয়ারী

বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী

শান্তিনিকেতন

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ

RABINDRANATH O PURVANCHALIYA CHAR BHASAR CHHANDA
(A Comparative Study of Modern Bengali, Assamese, Oriya and Hindi Metrics)

Rambahal Tiwari

প্রকাশকাল :
প্রথম মুদ্রণ :— সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩/এ

প্রকাশক :
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ
আর্য ম্যানসন (নবম-তল)
৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার,
কলিকাতা-৭০০০১৩

ISBN—81-247-0012-5

মুদ্রক :
দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ প্রেস অ্যাণ্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
পি-২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম
কলিকাতা-৭০০ ০৫৪

মূল্য : পঁচাশি টাকা

ভারত সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক (শিক্ষা বিভাগ), নূতন দিল্লী, কর্তৃক আঞ্চলিক ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের গ্রন্থ-রচনা প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক ডঃ প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ

অধ্যাপক

অশোকবিজয় রাহার

পুণ্য স্মৃতিতে—

নিবেদন

বৈচিত্র্য ঐক্যেরই অভিব্যক্তি। তাই বৈচিত্র্যের সার্থকতা ঐক্যের প্রতিফলনে। কথাটি অপরাপর বস্তুর মতোই ভাষা, সাহিত্য এমন কি ছন্দের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বর্তমানে আঞ্চলিকতা বা প্রাদেশিকতার বিচারে ভারতীয় ছন্দের অনেক নাম। নামের আড়ালে একটি অপরটি থেকে সম্পর্কহীন বলে মনে হয়। আবার সামগ্রিকভাবে ভারতীয় ছন্দ বললে কোনো সুস্পষ্ট বা সুনির্দিষ্ট ছন্দ-ধারণা জন্মায় না, যেমন বোঝায় অতীতের 'ভারতীয় ছন্দ'-রূপে সংস্কৃত বা প্রাকৃত ছন্দের উল্লেখ করলে। তা হলে কি 'ভারতীয় ছন্দ' কথাটি আধুনিক প্রয়োগে অর্থহীন? না, তা নয়। তার অর্থ-রূপটি বিভিন্ন মধ্যভারতীয় আর্য-ভাষার ছন্দে প্রচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে। তাই নজরে পড়ে না। আর আমরাও সেদিকে নজর দিতে উৎসাহ বোধ করি না। তাই আধুনিক ভারতীয় ছন্দের ধারণাও করতে পারি না। আশার কথা, ভারতীয় ছন্দ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণার গুরুত্ব ক্রমশঃ অনুভূত হচ্ছে। তা নিয়ে ভাবনা চিন্তাও শুরু হয়েছে। প্রচ্ছন্নতার আড়াল থেকে তা প্রকাশ্যে আনা চাই। তার জন্য প্রয়োজন—উদ্যম এবং উদ্‌যোগ। কিন্তু তার সম্যক নিদর্শন এখনো দেখা যায় নি। প্রতিবেশী দুই ভাষার ছন্দ নিয়ে তুলনামূলক আলোচনার কাজ কেউ কেউ করেছেন। ভাষা বিশেষের ছন্দের আলোচনায় কোনো কোনো অন্য ভারতীয় ভাষার ছন্দের প্রসঙ্গ চর্চিত হয়েছে কচিৎ-কদাচিৎ। এ-ক্ষেত্রে বর্তমান গ্রন্থটিই প্রথম পরিকল্পিত সীমিত প্রয়াস-রূপে গণ্য হতে পারে। সীমিত বলার কারণ উত্তর-পূর্ব ভারতের বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া এবং হিন্দী—কেবল এই চারটি ভাষার ছন্দ নিয়ে তুলনামূলক আলোচনার সহায়তায় উদ্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করেছি। তবে বিষয়টির বিশালতা এবং ব্যাপকতার কথা ভেবে সর্বাঙ্গীণ আলোচনায় যাইনি। রবীন্দ্র-প্রভাবিত আধুনিক ছন্দকেই আলোচনার মুখ্য বিষয়রূপে গ্রহণ করেছি। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির নীরব সংশোধক ও সংহতিসাধক। রবীন্দ্র-ছন্দ-শিল্পের মাধ্যমেও এই মহৎ সাধনাটি চরিতার্থ হয়ে উঠেছে। এই চরিতার্থতাই বলে দেয় ভারতীয় ছন্দের যথার্থ স্বরূপ। বলে—'বোঝো জন, যে জানো সন্ধান'। আমরা জানি—আধুনিক যুগে বাংলা, অসমীয়া ওড়িয়া এবং

হিন্দী ছন্দ একে অপরের কাছাকাছি এসেছে এবং পরস্পর পরস্পরকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত, উদ্বুদ্ধ এবং সমৃদ্ধ করেছে। মধ্যযুগে, বাংলা, অসমীয়া এবং ওড়িয়ার মধ্যে যোগাযোগ থাকলেও হিন্দীর সঙ্গে তাদের যোগ ছিল পরোক্ষ এবং বিরল। সেই যোগাযোগের বিষয়ও প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপিত এবং আলোচিত হয়েছে।

পরবর্তী বিষয়সূচীর সাহায্যে এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের প্রকৃতি ও পরিধি সম্বন্ধে একটা চলনসই ধারণা করা যাবে। এস্থলে তার একটু বিশদ বিবরণ দেওয়া গেল। নিবন্ধটি চার অধ্যায়ে বিভক্ত।—

প্রথম অধ্যায়ে আছে—'অবতারণা' অংশে আলোচ্য বিষয়ের উদ্দেশ্য ও পরিধি নির্দেশ, প্রাচীন ভারতীয় ছন্দের প্রসঙ্গ আর তার পরে বাংলা, অসমীয়া ওড়িয়া এবং হিন্দী ভাষার ছন্দোগত বৈশিষ্ট্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়—উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া ও হিন্দী ছন্দের বিকাশের ধারা, তাদের পারস্পরিক যোগাযোগ এবং মধুসূদনের ছন্দ এবং অসমীয়া, ওড়িয়া তথা হিন্দী কবিতায় তার অনুসৃতি।

প্রথম দুইটি অধ্যায়কে মূল গ্রন্থের ভূমিকা রূপে গ্রহণ করা যায়। তার উপর ভিত্তি করেই পরবর্তী অধ্যায়ের বক্তব্য সুস্পষ্ট রূপ লাভ করেছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রযুক্ত বাংলা ছন্দের তিন রীতির বিবর্তন ও বৈশিষ্ট্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। স্বভাবতঃই গদ্যছন্দের কথাও আলোচিত হয়েছে। অসমীয়া, ওড়িয়া এবং হিন্দী সাহিত্যে কোন্ কবির রচনায় বাংলা ছন্দের কোন্ বিশিষ্টতা কতখানি প্রতিফলিত হয়েছে তা দেখাবারও প্রয়াস আছে, এই অধ্যায়ে। তারই সঙ্গে অসমীয়া, ওড়িয়া এবং হিন্দী ছন্দের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের প্রাসঙ্গিক পরিচয় দিতেও সচেষ্ট হয়েছি। রবীন্দ্র-ছন্দের সঞ্চারে পূর্বাঞ্চলীয় ভাষা কয়টির ছন্দে কেমন উৎকর্ষগত সাম্য এসেছে তাও নিরূপণের চেষ্টা করেছি। এ-টিই বর্তমান গ্রন্থের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়ে অতি সংক্ষেপে রবীন্দ্রোত্তর যুগে বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া এবং হিন্দী ছন্দের প্রবণতা ও ভাবী সম্ভাবনার স্বরূপ বোঝাতে চেয়েছি। প্রসঙ্গক্রমে এই চার ভাষার ছন্দের পারস্পরিক নৈকট্য এবং সাধর্ম্য নিরূপণেও প্রয়াসী হয়েছি। ছন্দোবিবর্তনের এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এখনও সমাপ্ত হয় নি, সুতরাং এ-বিষয়ে শেষ কথা বলা সম্ভবও নয়, সমীচীনও নয়। তাই অনাবশ্যকবোধে এ-বিষয়ের বিশদ আলোচনায় যাইনি, ফলে বক্তব্য-বিষয় সংক্ষিপ্ত হয়েছে।

একাধিক ভাষার ছন্দের তুলনামূলক আলোচনায় বিভিন্ন প্রকার পরিভাষা ও বিশ্লেষণ-প্রণালীর দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিবন্ধকতার বিষয় সুবিদিত না হলেও সহজেই তা অনুমেয়। বস্তুত এ-রূপ-কার্যে একপ্রস্থ পরিভাষা এবং একটিই বিশ্লেষণ-প্রণালীর অবলম্বন ও প্রয়োগ প্রায় অপরিহার্য। বর্তমানে ছন্দের আলোচনায় ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেনের সর্বাধুনিক ছন্দ-পরিভাষাই মুখ্যত স্বীকৃতি লাভ করেছে। বাংলাছন্দের আলোচনায় তার উপযোগিতা এবং সার্থকতা সু-প্রমাণিত। এমন কি অন্য ভারতীয় ছন্দের আলোচনাতেও তার ব্যবহারে সুগমতা এসেছে। আমার 'আধুনিক বাংলা ও হিন্দী ছন্দ' (১৯৭৭), 'আধুনিক ওড়িয়া ছন্দ' (১৯৮০) এবং 'রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দী ছন্দ' (১৯৮৬)-গ্রন্থ তিনটিতে আচার্য সেনের ছন্দ পরিভাষাই ব্যবহার করেছি। হিন্দী এবং ওড়িয়া ছন্দের আলোচনাতে তা সহজ এবং অনুকূল প্রমাণিত হয়েছে, তাই বর্তমান গ্রন্থেও সেই পরিভাষা-প্রস্থই সার্থকতার সঙ্গে প্রযুক্ত হয়েছে। তার উপযোগিতা এবং সৌকর্য নিয়ে পাঠকের মনে আর কোনরূপ দ্বিধা জাগবে না—বলেই আমার বিশ্বাস।

বাংলা ও হিন্দী ছন্দের প্রসঙ্গটি 'আধুনিক বাংলা ও হিন্দী ছন্দ' গ্রন্থে কিছুটা বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে, তাই বর্তমান গ্রন্থে সে আলোচনার সংক্ষিপ্ত রূপই পাওয়া যাবে। পাঠকদের সুবিধার্থে যথাস্থানে উল্লেখ-পঞ্জীতে ওই বইটির প্রয়োজনীয় অংশের পৃষ্ঠাংক-আদি সূচিত করা হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়কে প্রাঞ্জল করার জন্য কোনো কোনো বিষয়ের পুনরাবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ—শ্রেয় মনে করেছি।

পুস্তক রচনায় উৎসাহিত এবং বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন অধ্যাপক পবিত্র সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদের প্রাক্তন এবং বর্তমান মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক যথাক্রমে অধ্যাপক শ্রীশিবনাথ চট্টোপাধ্যায় ও ড. প্রশান্তকুমার মহাশয়ের দাশগুপ্ত। এঁদের জানাই সবিনয় কৃতজ্ঞতা। স্মরণ করি শ্রীচন্দ্রকান্ত দাস ও শ্রীইন্দ্রনাথ মজুমদার স্বতঃস্ফূর্ত সহকারিতার কথাও।

এই গবেষণা-কাজে আমি বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও হিন্দীভবন গ্রন্থাগারের গ্রন্থাদি ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছি। তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং কর্মিবৃন্দের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। পত্নী শ্রীমতী ইন্দিরা তেওয়ারী আনুকূল্য ও সহকারিতা করেছেন নানা ক্ষেত্রে। সহযোগিতা পেয়েছি কন্যা সুগীতা এবং পুত্র শ্রীমান্ সুগতের কাছ থেকেও। কাজের বিভিন্ন স্তরে আরও বহু শ্রদ্ধেয় এবং প্রীতিভাজন শুভানুধ্যায়ীর কাছ থেকে পেয়েছি উৎসাহ। তাঁদের

সবাইকে জানাই সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতি। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ এবং আনন্দ প্রেস অ্যাণ্ড পাবলিকেশনস প্রাঃ লিঃ-এর কর্মিবৃন্দের আন্তরিক প্রচেষ্টায় বইটির সুন্দর প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। তাঁদের জানাই প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

ভারতীয় ছন্দের ধারণা স্পষ্টীকরণে এবং পঠন-পাঠনে এ-গ্রন্থে যদি বিন্দুমাত্রও সুগমতা ঘটে তা হলে আমার শ্রম সার্থক মনে করব।

'সাহিত্যসেতু', সীমান্তপল্লী
শান্তিনিকেতন
জন্মাষ্টমী
১০ অগাস্ট ১৯৯৩

রামবহাল তেওয়ারী

বিষয়-ক্রম

প্রথম অধ্যায় : সূচনা

দ্বিতীয় অধ্যায় : রবীন্দ্র-পূর্ব যুগ

তৃতীয় অধ্যায় : রবীন্দ্র-যুগ

চতুর্থ অধ্যায় : রবীন্দ্র-উত্তর যুগ

ছন্দ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি দরকারী কথা

১। ভাষার উচ্চারণ অনুসারে ছন্দ নিয়মিত হইলে তাহাকেই স্বাভাবিক ছন্দ বলা যায়।—ছন্দ (১৯৭৬, সং) পৃ. ৪

২। প্রত্যেক ভাষারই একটা স্বাভাবিক চলিবার ভঙ্গি আছে। সেই ভঙ্গিটারই অনুসরণ করিয়া সেই ভাষায় নৃত্য অর্থাৎ ছন্দ রচনা করিতে হয়।—পূর্ববৎ, পৃ. ৩১

৩। বাংলায় স্বরবর্ণ যদিও সংস্কৃত বানানের হ্রস্বদীর্ঘতা মানে না, তবু এ সম্বন্ধে তার নিজের একটি স্বকীয় নিয়ম আছে। সে হচ্ছে বাংলায় হসন্ত শব্দের পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ হয়। —পূর্ববৎ, পৃ. ৯৪

৪। আক্ষরিক ছন্দ বলে কোনো অদ্ভুত পদার্থ বাংলায় কিংবা অন্য কোনো ভাষাতেই নেই। অক্ষর ধ্বনির চিহ্নমাত্র। —পূর্ববৎ, পৃ. ১০১

৫। বাংলা ভাষায় স্বরবর্ণের ধ্বনিমাত্রা বিকল্পে দীর্ঘ ও হ্রস্ব হয়ে থাকে,…ব্যবহারের প্রয়োজনে একটা সীমার মধ্যে তাদের সংকোচন-প্রসারণ চলে।…এইজন্যেই অক্ষরের সংখ্যা গণনা করে ছন্দের ধ্বনিমাত্রা গণনা বাংলায় চলে না। —পূর্ববৎ, পৃ. ১০২

৬। ইংরেজি ছন্দে অ্যাক্‌সেন্টের প্রভাব; সংস্কৃত ছন্দে দীর্ঘ-হ্রস্বের সুনির্দিষ্ট ভাগ। বাংলায় তা নেই। এইজন্যে লয়ের দাবি রক্ষা ছাড়া বাংলা ছন্দে মাত্রা বাড়িয়ে-কমিয়ে চলার আর কোনো বাধা নেই।—পূর্ববৎ, পৃ. ১৩৩

৭। বিশেষ সংখ্যক মাত্রা ও বিশেষ বেগের গতি, এই দুই নিয়েই ছন্দ; সে ছন্দের মায়ামন্ত্র না পেলে রূপ থাকে অব্যক্ত।

বিশ্ব-সৃষ্টির এই ছন্দোরহস্য মানুষের শিল্প সৃষ্টিতে।
—পূর্ববৎ, পৃ. ১৫১

৮। ধ্বনির দুইমাত্রা এবং তিন মাত্রা বাংলা ছন্দের আদিম এবং রূঢ়িক উপাদান। তারপরে এই দুই এবং তিনের যোগে যৌগিকমাত্রার ছন্দের উৎপত্তি।—পূর্ববৎ, পৃ. ১৬৫

৯। ছন্দের একটা দিক আছে যেটাকে বলা যেতে পারে কৌশল। কিন্তু তার চেয়ে আছে বড়ো জিনিস, যেটাকে বলি সৌষ্ঠব। বাহাদুরি তার মধ্যে নেই, সমগ্র কাব্যসৃষ্টির কাছে ছন্দের আত্মবিস্মৃত আত্মনিবেদনে তার উদ্ভব। কাব্য পড়তে গিয়ে যদি অনুভব করি যে ছন্দ পড়ছি তাহলে সেই প্রগল্ভ ছন্দকে ধিক্কার দেব।—পূর্ববৎ, পৃ. ১৭৫

১০। চলতি ভাষার কবিতা বাংলা শব্দের স্বাভাবিক হসন্তরূপ মেনে নিয়েছে। হসন্ত শব্দ স্বরবর্ণের বাধা না-পাওয়াতে পরস্পর জুড়ে যায়, তাতে যুক্তবর্ণের ধ্বনি কানে লাগে। চলতি ভাষার ছন্দ সেই যুক্তবর্ণের ছন্দ।—পূর্ববৎ, পৃ. ১৮৪

১১। দ্বৈমাত্রিক এবং ত্রৈমাত্রিক ছন্দে বাংলা কাব্যের আরম্ভ। এখনো পর্যন্ত এই দুই জাতের মাত্রাকে নানাপ্রকারে সাজিয়ে বাংলায় ছন্দের লীলা চলছে।...তার রূপের বৈচিত্র্য ঘটে যতি বিভাগের বৈচিত্র্যে এবং নানা ওজনের পঙ্‌ক্তি বিন্যাসে।—পূর্ববৎ, পৃ. ১৮৭

১২। চলতি ভাষার কাব্য, যাকে বলে ছড়া, তাতে বাংলার হসন্ত সংঘাতের স্বাভাবিক ধ্বনিকে স্বীকার করেছে। সেটা পয়ার হলেও অক্ষরগোনা পয়ার হবে না, সে হবে মাত্রাগোনা পয়ার। কিন্তু...সাধুভাষার পদ্য উচ্চারণকালে হসন্তের টানে শব্দগুলি গায়ে গায়ে লেগে যাবে না, অর্থাৎ —বাংলার স্বাভাবিক ধ্বনির নিয়ম এড়িয়ে চলতে হবে।
—পূর্ববৎ, পৃ. ১৮৭

রবীন্দ্রনাথ ও পূর্বাঞ্চলীয় চার ভাষার ছন্দ

অবতারণা

কবিতাকর্মে সুমিত ও সুনিয়মিত ধ্বনি বিন্যাস হল ছন্দ। সব ভাষার ছন্দ সম্পর্কেই এই সংজ্ঞার্থটি সমভাবে প্রযোজ্য। কাব্য ও ছন্দের মধ্যে আত্মিক ও বাহ্যিক সম্পর্ক কোথায়, তা নিয়ে পণ্ডিত সমাজে বহুকাল ধরে অনেক আলোচনা হয়েছে। ছন্দের এই তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া এবং হিন্দী—এই চার ভাষার সাহিত্যের ছন্দই সৌন্দর্যে, ঐশ্বর্যে ও বৈচিত্র্যে অসাধারণ মহিমার অধিকারী। সাহিত্য চারটির ছন্দোধারাগুলির সাদৃশ্য ও পার্থক্য পাঠকচিত্তে গভীর ঔৎসুক্যের সঞ্চার করে। কিন্তু তার যথার্থ নিবৃত্তির কোনো সহজ পথ পাওয়া দুষ্কর। কারণ ছন্দোধারা চারটির ঐশ্বর্য ও বিশেষত্বের পারস্পরিক সাদৃশ্য ও পার্থক্যের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আজ পর্যন্ত হয়নি। বাংলা, হিন্দী ছন্দ, বাংলা ও অসমীয়া ছন্দ এবং বাংলা ও ওড়িয়া ছন্দ নিয়ে যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ আলোচনার প্রয়াস সাম্প্রতিক কালে দেখা যায়। কিছু কিছু আংশিক আলোচনাও চোখে পড়ে বটে, কিন্তু সেগুলি সামগ্রিক দৃষ্টির অভাবে প্রায়শই ত্রুটিপূর্ণ ও পরস্পরবিরোধী। অন্যপক্ষে অসমীয়া ও ওড়িয়া ছন্দ, অসমীয়া ও হিন্দী ছন্দ এবং ওড়িয়া ও হিন্দী ছন্দ নিয়ে আলোচনা হয়নি বললেই হয়। দীর্ঘদিন ধরে বাংলা ও হিন্দী ছন্দের বিপুল ঐশ্বর্য দেখে দেখে মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছিলাম। তাই সামগ্রিক দৃষ্টি নিয়ে এই দুই ছন্দোধারার তুলনামূলক আলোচনা করি 'আধুনিক বাংলা ও হিন্দী ছন্দ' (১৯৭৭) গ্রন্থে। বাংলা ছন্দের সঙ্গে ওড়িয়া ছন্দের সাদৃশ্য ও পার্থক্যে আকৃষ্ট হয়ে রচনা করি 'আধুনিক ওড়িয়া ছন্দ' (১৯৮০)। বাংলা ছন্দের সঙ্গে অসমীয়া ছন্দেরও সাদৃশ্য দেখে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হয়ে পড়ি। তা নিয়েও আলোচনার তাগিদ অনুভব করি। ইতঃমধ্যে হাত দেই 'রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দী ছন্দ' (১৯৮৬) রচনায়। এই আলোচনার সময় নতুন করে বলিষ্ঠভাবে অনুভব করি যে, রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষভাবে আধুনিক বাংলা ছন্দকে এবং পরোক্ষভাবে আধুনিক অসমীয়া, ওড়িয়া এবং হিন্দী ছন্দকে যুগোচিত সৌন্দর্য, সুষমা এবং ভাবপ্রকাশের শক্তি দান করে উৎকর্ষমণ্ডিত করেছেন। পূর্ব ভারতের এই চার ভাষার ছন্দের অভাবনীয় সমৃদ্ধি সাধিত হয়েছে তাঁর ছন্দ-প্রতিভার প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ স্পর্শে। বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া ও হিন্দী এই চার ভাষার সাহিত্যের ছন্দ-

সমৃদ্ধির স্বরূপ কি, তাতে রবীন্দ্রনাথের দানের পরিমাণ কতখানি এবং ছন্দোধারা চারটি স্ব স্ব বিশেষত্ব বা মৌলিকতা অক্ষুন্ন রেখে একে অপরের কতদূর সান্নিধ্যে আসতে সক্ষম হয়েছে এবং তার পরিণতি কী হতে পারে এই চিন্তায় নিবিষ্টমনা হই। তারই ফল বর্তমান নিবন্ধ।

বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া এবং হিন্দী সাহিত্যের ছন্দের উদ্ভব ও বিবর্তনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা প্রস্তুত নিবন্ধের লক্ষ্য নয়। আদি ও মধ্যযুগে চার ভাষার ছন্দই আপন আপন গতানুগতিক ধারায় প্রবাহিত হচ্ছিল। আধুনিক কালে যুগ-প্রভাবে, বিশেষ করে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা-স্পর্শে বাংলা ছন্দের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে বলা যায়। অসমীয়া, ওড়িয়া এবং হিন্দী ছন্দও প্রায় এই সময়েই নূতন প্রবর্তনায় দ্রুতবেগে পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে। তাই প্রধানত আধুনিক যুগে এই চার ভাষার ছন্দের বিকাশ ও গতি-প্রবর্তনার প্রতি লক্ষ রেখে তাদের সাদৃশ্য ও পার্থক্য এবং পারস্পরিক প্রভাবের বিষয় আলোচনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

আধুনিক কালে বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া এবং হিন্দী সাহিত্যের কবিরা ছন্দ নিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। তার ক্রম এখনও চলছে। সঙ্গে সঙ্গে ছান্দসিকরাও এ বিষয়ে উৎসাহী হয়ে নূতন ছন্দশাস্ত্র গড়ে তোলার কাজে প্রবৃত্ত হয়েছেন। একটি লক্ষণীয় বিষয় হল—চার ভাষাতেই স্বয়ং কবিরাই প্রথম ছন্দশাস্ত্র রচনায় অগ্রসর হয়েছেন—কালক্রমে সাহিত্যরসিক ছান্দসিকরা ছন্দশাস্ত্র রচনার গুরুত্বপূর্ণ কাজটি এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। বলাই বাহুল্য কবিছান্দসিকদের ছন্দ-বিশ্লেষণের মূলে থাকে শিল্পদৃষ্টি। আর অন্য ছান্দসিকরা একাজে অগ্রসর হয়েছেন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে। সুতরাং এই দুই শ্রেণীর ছান্দসিকদের ছন্দোবিশ্লেষণে অনিবার্যভাবেই কিছু না কিছু পার্থক্য থাকবেই। তবে একথা স্বীকার করতে হবে যে, কবিছান্দসিকদের ছন্দো-বিশ্লেষণের একটি বিশেষ সার্থকতা আছে। তাঁদের বিশ্লেষণে একদিকে যেমন ছন্দের নান্দনিক দিক্‌টির প্রতি আলোকপাত ঘটে, তেমনি অপর দিকে—ছন্দশিল্প রচনায় তাঁদের অন্তরের প্রেরণা এসেছে কোন্ উৎস থেকে—সে কথাও জানা যায়। ছন্দের বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সে প্রেরণা এবং নন্দনময়তার কথা উপেক্ষণীয় হতে পারে না।

বাংলা-হিন্দী, বাংলা-ওড়িয়া তথা বাংলা-অসমীয়া ছন্দের তুলনামূলক আলোচনায় প্রয়াস পৃথক পৃথক হলেও, বাংলা, অসমীয়া তথা ওড়িয়া এবং হিন্দী

ছন্দের সামগ্রিক তুলনামূলক আলোচনার প্রয়াস আজও হয়নি। এই অভাব পূরণই বর্তমান গ্রন্থের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য।

বাংলার বৈজ্ঞানিক ছন্দ-আলোচনা আজ সুদৃঢ় ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। অসমীয়া এবং হিন্দী ছন্দের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনাও আজ সুবিদিত। কিন্তু ওড়িয়া ছন্দের বৈজ্ঞানিক আলোচনা, বিশেষ করে ওড়িয়া ভাষায়, আজও হয়নি। এই অভাবের আশু পূর্তি আবশ্যক।

বাংলায় অসমীয়া, ওড়িয়া এবং হিন্দী ছন্দশাস্ত্রের আলোচনায় তেমন আগ্রহ দেখা যায় না। সম্প্রতি দুই-একজনের সে প্রয়াস দেখা যায় মাত্র।[১] পক্ষান্তরে হিন্দী, অসমীয়া এবং ওড়িয়া ছান্দসিকগণ বাংলা ছন্দ-শাস্ত্র সম্বন্ধে ততটা উদাসীন নন। হিন্দী সাহিত্যের নিরালা, সুমিত্রানন্দন পন্ত এবং পুত্তূলাল শুক্লের আলোচনায় বাংলা ছন্দ ও ছন্দশাস্ত্র বিষয়ে তাঁদের অল্পাধিক পরিচয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অসমীয়া সাহিত্যের ডিম্বেশ্বর নেওগ, তীর্থনাথ শর্মা, নবকান্ত বড়ুয়া, সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা এবং মহেন্দ্র বরা প্রমুখ বাংলা ছন্দ ও ছন্দশাস্ত্র বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন অসমীয়া ছন্দের আলোচনা প্রসঙ্গে। ওড়িয়া সাহিত্যের নীলকণ্ঠদাস, জানকীবল্লভ মহান্তি, নটবর সামন্তরায় ও খগেশ্বর মহাপাত্র প্রসঙ্গক্রমে বাংলা ও হিন্দী ছন্দ এবং ছন্দশাস্ত্র বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা কেউ ছন্দোবিশ্লেষণ প্রণালীতে বা পরিভাষা ব্যবহারে বাংলা, হিন্দী, অসমীয়া তথা ওড়িয়া ছন্দশাস্ত্রের সমন্বয় সাধনে প্রয়াসী হন নি। এই প্রয়াস প্রথম দেখা গেছে 'আধুনিক বাংলা ও হিন্দী ছন্দ' (১৯৭৭) এবং 'আধুনিক ওড়িয়া ছন্দ' (১৯৮০) গ্রন্থ দুইটিতে। কিন্তু সে প্রয়াস যথাক্রমে বাংলা-হিন্দী এবং বাংলা-ওড়িয়া ছন্দশাস্ত্রের সমন্বয় সাধনেই সীমিত। পূর্বাঞ্চলীয় চার-ভাষার ছন্দশাস্ত্রের সমন্বয় সাধনই বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় মুখ্য উদ্দেশ্য।

অসমীয়া, ওড়িয়া তথা হিন্দী ছন্দের আলোচনাতেও যথাসম্ভব বাংলা পরিভাষাই ব্যবহৃত হয়েছে। ছন্দের বৈজ্ঞানিক আলোচনার ক্ষেত্রে ছন্দ-পরিভাষাও বৈজ্ঞানিক প্রণালী-সম্মত হওয়া চাই। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং পরিবর্জন ও নবীকরণের পর আজ বাংলা ছন্দের নাম ও পরিভাষা বহুলাংশে বিজ্ঞানসম্মত।[২] কিন্তু অসমীয়া, ওড়িয়া ও হিন্দী ছন্দের নাম ও পরিভাষা সম্পর্কে দৃঢ়তার সঙ্গে এ-কথা বলা যায় না। অসমীয়া ছন্দের নাম ও পরিভাষা তেমন অর্থবহ নয় এবং একটু প্রাচীন। ওড়িয়ার ছন্দের নাম ও

পরিভাষা নিয়ে বিশেষ চিন্তা-ভাবনাই দেখা যায় না। আর সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্র অনুসারী হিন্দী ছন্দের স্রোত গতানুগতিক পথেই বহমান—এ-কথা বললে হয়তো সত্যের অপলাপ হবে না। আজ থেকে প্রায় সত্তর পচাত্তর বৎসর পূর্ব পর্যন্ত বাংলা ছন্দের নাম-পরিভাষার অবস্থাও হিন্দীর মতোই ছিল। তাই প্রায় সত্তর বছর আগে বাংলাছন্দের নামকরণ সম্পর্কে ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন যে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন, অসমীয়া, ওড়িয়া ও হিন্দী ছন্দের নামকরণ-সন্দর্ভে তা আজও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য বলে মনে করি। তাঁর অভিমতটি হল—

"বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নামকরণ করতে হলে প্রত্যেকটি নাম অর্থদ্যোতক হওয়া চাই। অর্থাৎ ছন্দের নাম থেকেই ছন্দের অন্তর্গঠন ও বহির্গঠন অনায়াসে বোঝা যাবে এবং নামগুলোর সঙ্গে একবার পরিচয় হয়ে গেলেই কোনো ছন্দের একটি কবিতা পড়লেই তার নাম মনে জেগে উঠবে।"

—'ছন্দের শ্রেণী বিভাগ', প্রবাসী, ১৩২৯, চৈত্র।

এই অভিমতের আলোকে অসমীয়া, ওড়িয়া ও হিন্দী ছন্দের নামগুলিকে অবৈজ্ঞানিক বলা যায়। কারণ ওই প্রচলিত নামের দ্বারা ছন্দের 'অন্তর্গঠন বা বা 'বহির্গঠন' কোনোটিরই পরিচয় মেলেনা, অর্থাৎ নামগুলি ছন্দের স্বরূপ পরিচায়ক নয়। ছন্দের নামকরণ সম্পর্কে প্রাচীনকাল থেকে যে ধারা চলে আসছে তাতে কবি ও স্বচ্ছন্দবিলাসীদের মনোমতো নামকরণের অভিলাষ চরিতার্থ হয় মাত্র, ছন্দ বোঝা বা আলোচনার ক্ষেত্রে কোনো সুবিধা হয় না। এ-প্রসঙ্গে অধ্যাপক সেন বলেছেন—

"কবিরা নিজেদের ইচ্ছামতোই কোথাও কোথাও এক অক্ষর বেশি বা কোথাও এক অক্ষর কম ব্যবহার করেই মনে করেছেন এই একটি নূতন ছন্দ হয়ে গেল এবং নিজ কল্পনা থেকে একটি স্বতন্ত্র নাম দিয়ে ফেলেছেন। এমনি করে…ছন্দের অসংখ্য প্রকারভেদ ও নামের উৎপত্তি হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই এই শ্রেণীবিভাগ ও নামকরণ নিছক খামখেয়ালি বই আর কিছুই নয়।"

—পূর্ববৎ, প্রবাসী, ১৩৩০ বৈশাখ।

সানন্দে স্বীকার্য যে বর্তমানে বাংলা ছন্দ সেই 'খামখেয়ালি'পনা থেকে পুরোপুরি মুক্ত। কিন্তু অপরাপর ভাষার ছন্দ সম্পর্কে এ-কথা জোর করে বলা যায় না। তাই ওই সব ভাষার ছান্দসিক ও কবিদের দৃষ্টি যাতে এই

গুরুত্বপূর্ণ অভিনব পরিবর্তনের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং সংস্কৃত-প্রাকৃত অথবা পূর্বাগত ছন্দশাস্ত্রের অনুসরণস্পৃহা থেকে মুক্ত হয়ে অসমীয়া, ওড়িয়া তথা হিন্দী ছন্দ-চিন্তা ও বিশ্লেষণ স্বাভাবিক এবং বৈজ্ঞানিক পথে অগ্রসর হয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠে—এই সদিচ্ছা এবং উদ্দেশ্যেই বর্তমান সমন্বয়ের পথ অবলম্বন করা হয়েছে। অবশ্য তাতে করে আলোচনার সুবিধাও যে হয়েছে সে-কথা বলাই বাহুল্য।

আধুনিক বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া এবং হিন্দী ছন্দের আলোচনায় অনুপ্রবেশের পূর্বে, আরম্ভ থেকে প্রাক্ আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার কাল পর্যন্ত ভারতীয় ছন্দের বিকাশ-রেখার সঙ্গে পরিচিতি প্রয়োজন। এখন আমরা সেই 'বিকাশ-রেখাটি' তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

প্রাচীন ভারতীয় ছন্দের অবধারণা

বৈদিক ছন্দ : মহর্ষি পাণিনির মতে—'চদি আহ্লাদনৈ দীপ্তৌ চ' (পাণিনীয় ধাতুপাঠ, ভ্বাদিগণ)—'চদি' ধাতুনিষ্পন্ন 'ছন্দ' শব্দটির অর্থ 'আহ্লাদন'।[১] 'উণাদি কোষ'-সূত্রের-'চন্দয়াদেশ্চ ছঃ'—'অনুসারে 'চ', 'ছ', হয়ে যায়। ফলে 'চন্দতি' রূপ নেয় 'ছন্দতি'। সুতরাং যা হর্ষ ও দীপ্তি প্রদান করে—তাই ছন্দ।[৩] যাস্কের নিরুক্ত অনুযায়ী অন্য এক অর্থ হল—'মন্ত্রঃ মননাৎ ছন্দাংসি ছাদনাৎ।' (নিরুক্ত, দৈবতকাণ্ড, ৭।১২)। অর্থাৎ—'ছদি সংবরণে' ধাতুজাত অর্থ হল 'আচ্ছাদন করা।' এই দ্বিতীয় অর্থের সমর্থনে ছান্দোগ্যোপনিষদে[৪] একটি সুন্দর প্রতীকী ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়।—মৃত্যুভয় থেকে পরিত্রাণের জন্য দেবগণ মন্ত্রে আচ্ছাদিত হন। আর অভিহিত হলেন 'ছন্দ'-নামে। এইভাবে ছন্দের আশ্রয়ে দেবগণের অমরত্ব নিশ্চিত হল।

উল্লিখিত প্রথম অর্থটি ছন্দের আত্মার সঙ্গে সম্পৃক্ত, কারণ ছন্দের আহ্লাদক গুণটি রস-সংক্রান্ত। রসই কাব্যের আত্মা। দ্বিতীয় অর্থটি থেকে ছন্দের রূপ বা আকৃতির ধারণা হয়। সুতরাং তা বহিরঙ্গ শিল্পবিষয়ক। দেখা যাচ্ছে —প্রথম অর্থটি ছন্দের অন্তঃ-প্রকৃতি এবং দ্বিতীয়টি তার বহিরাকৃতির পরিচায়ক।

ঋগ্বেদের প্রারম্ভিক যুগে ছন্দ বলতে 'স্তোত্র' বোঝাত—এমন কথাও মনে করা যায়। তাই যাস্কের নিরুক্তে 'ছন্দ' স্তোত্রের পর্যায়বাচী শব্দরূপে গৃহীত।[৫] মন্ত্রের সম্মোহনী, আকর্ষণী এবং হ্লাদিনী শক্তি-লীলার অমোঘ প্রভাবে অভিভূত হত শ্রোতৃমণ্ডলী। পরবর্তীকালে মন্ত্র-ছন্দরাশিই বেদ নামে অভিহিত হল। ছন্দ শব্দটির বহুবচনে রূপ হল—'ছন্দাংসি', অর্থ দাঁড়াল ঋক্ সাম ও যজুঃ—বেদত্রয়ী। বৈদিক ভাষা পরিচিত হল—'ছান্দস্'-নামে। পরবর্তীকালে শংকরাচার্য ও রামানুজাচার্য গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের 'ছন্দাংসি'র সেই অর্থই করেছেন।[৬] এই ভাবে ছন্দ সমার্থক হয়ে উঠেছে বেদের। অথর্ব বেদে 'ছাদ' বা 'আবরণ' অর্থেও ছন্দের প্রয়োগ ঘটেছে। 'বৃহচ্ছন্দস্' বলতে সম্ভবত 'বড়োছাদের বাড়ি' বোঝাত।[৭] তবে আহ্লাদক অর্থেও ছন্দের বার বার প্রয়োগ ঘটেছে অথর্ব বেদে। মহর্ষি শৌনক তাঁর 'ঋক্ প্রাতিশাখ্যে'র (পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ) চার অধ্যায়ে বা পাতালে বৈদিক ছন্দের বিশদ ও পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ এবং শ্রেণীবিভাগ করেছেন। সম্ভবত ছন্দের এ-রূপ বিশদ ও

সূক্ষ্ম আলোচনা এই প্রথম। অবশ্য তার পূর্বেও ছন্দ নিয়ে আলোচনা হয়েছে, তার ইঙ্গিত আছে ঋক্ প্রাতিশাখ্যেই। একদল বা একাক্ষর ' 'ওঁ' থেকে শুরু করে ১০৪ দল বা অক্ষর পর্যন্ত বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের বিচিত্র রচনাকে অন্ততঃ ১৩০টি ছন্দ-নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। গায়ত্রী (২৪ বর্ণ), উষ্ণিক (২৮), অনুষ্টুপ্ (৩২), বৃহতী (৩৬), পঙ্ক্তি (৪০), ত্রিষ্টুপ্ (৪৪), জগতী (৪৮), প্রভৃতি ছন্দ রূপে এবং অতিজগতী (৫২), শক্বরী (৫৬), অতিশক্বরী (৬০), অষ্টি (৬৪), অত্যষ্টি (৬৮), ধৃতি (৭২), অতিধৃতি (৭৬). কৃতি (৮০), প্রকৃতি (৮৪), আকৃতি (৮৮), বিকৃতি (৯২), সংকৃতি (৯৬), অধিকৃতি (১০০) এবং উৎকৃতি (১০৪) প্রভৃতি অতিচ্ছন্দ রূপে বর্ণিত। অবশ্য প্রধান বৈদিক ছন্দ মাত্র সাতটি। যেমন—গায়ত্রী, অনুষ্টুপ, ত্রিষ্টুপ, উষ্ণিক, জগতী, পঙ্ক্তি, এবং বৃহতী। তবে উষ্ণিকের ভেদ—পুরুষ্ণিক ও ককুপ্; বৃহতীর ভেদ সতোবৃহতী এবং পঙ্ক্তির ভেদ প্রস্তার-পঙ্ক্তির সহযোগে বৈদিক ছন্দকে এগারো রকমের বলে মনে করা হয়। কখনো কখনো একপ্রকারের ছন্দ-রূপের সঙ্গে অন্য প্রকারের ছন্দের কয়েকটি চরণ মিশ্রিত করে 'সংকর ছন্দ' রচনার বিধানও ছিল। এই 'ছন্দ-সাংকর্য' প্রগাথ নামে অভিহিত হত। ঋক্ প্রাতিশাখ্যে সংকর ছন্দের বিবরণ আছে।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে আছে 'গায়ত্রী ছন্দসাং মাতা' (১০।২৬), যার অর্থ গায়ত্রী সব ছন্দের জননী অর্থাৎ গায়ত্রীই সর্বপ্রাচীন ছন্দ। অবশ্য ই. ভি. আর্নল্ড (E. V. Arnold) তাঁর 'বৈদিক ছন্দ' (Vedic Metre) গ্রন্থে অনুষ্টুপ্‌কেই প্রাচীনতম ছন্দ বলে উল্লেখ করেছেন। চৌপদী অনুষ্টুপ্ থেকে একপদ কমে গিয়ে ত্রিপদী গায়ত্রীর উদ্ভবের কথা তিনি বলেছেন। তবে তাঁর সিদ্ধান্ত সর্বজনগ্রাহ্য নাও হতে পারে। ব্যবহার আধিক্যের বিচারে গায়ত্রী ও অনুষ্টুপের পরই জগতীর স্থান।

বেদের ছন্দ কেবল অক্ষর গণনা নির্ভর। তাতে 'গণ'-সজ্জা বা গুরু-লঘু-ক্রমে ধ্বনি বিন্যাসের কোনো বিধান নেই। তাই কখনও কখনও অতিরিক্ত ধ্বনির রচনাও পাওয়া যায়। গায়ত্রী ছন্দে সাধারণভাবে ৮ × ৩ = ২৪ বর্ণমাত্রা বিন্যস্ত হয়। যেমন—

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্।
—ঋক্‌বেদ ১।২২।২০

এখানে প্রতি পদে আটটি অক্ষর আছে। এই রূপের পাশা-পাশি ৭, ৬ ও ১১ মাত্রার অসমপদিক গায়ত্রীও রচিত হয়েছে। আর এই অক্ষর সংখ্যাভেদে নামও বদলে যায়। যেমনঃ—৭ × ৩ = ২১ মাত্রার পাদনিচৃৎগায়ত্রী'—

যুবাকু হি শচীনাং যুবাকু সুমতী নাম্
ভূয়াম বাজদাব্নাম্।

—ঋক্ ১।১৭।৪

১১ × ৩ = ৩৩ মাত্রার 'বিরাট গায়ত্রী'—

জুহীরম্নিত্রধিতয়ে যুবাকু রায়ে চনো মিমীতং বাজবত্যৈ
ইষে চনো নিমীতং ধেনুমত্যৈ।

—ঋক্ ১।১২০।৯

আবার অক্ষরাভাবে বিশিষ্ট উচ্চারণের সাহায্যে মাত্রাপূর্তির নিয়মও বিহিত ছিল। যেমন—

তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধী মহী
ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ

—ঋক্ ৩।৬২।১০

চব্বিশ মাত্রার এই সাধারণ গায়ত্রী-ছন্দের প্রথম পদে 'তৎসবিতুর্বরেণ্যম্'— অংশটিতে ৮ মাত্রার স্থলে ৭ মাত্রা আছে। তাই 'বরেণ্যম্' অংশটুকুর উচ্চারণ 'বরেণিয়ম্' করে ধ্বনি সাম্য রক্ষা করতে হবে। সাধারণভাবে 'গায়ত্রী গায়তে স্তুতিকর্মণঃ ত্রিগমনা বা বিপরীতা।' (নিরুক্ত ৭।১২।৫)। অর্থাৎ গায়ত্রী গাওয়া হত এবং তা ত্রিধাবিভক্ত রচনা অর্থাৎ ত্রিপদীবদ্ধ। গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী—এই চারটি ছন্দ বা ছন্দোবদ্ধ বৈদিক সাহিত্যে বহুল প্রচলিত। তাছাড়া প্রতি পদে দ্বাদশাধিক বর্ণমাত্রাযুক্ত ছন্দেরও কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। তবে এ-গুলির প্রয়োগ তুলনামূলকভাবে খুবই কম। এই জাতীয় ছন্দের মধ্যে অতি জগতী (১৩ বর্ণ × ৪), শক্করী (১৪ × ৪), অতি শক্করী (১৫ × ৪), অষ্টি (১৬ × ৪) এবং অত্যষ্টি (১৭ × ৪) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

অনেকের অনুমান—গায়ত্রী জাতীয় প্রাচীন বৈদিক ছন্দের বিকাশ আর্যদের ভারতে আগমনের পূর্বেই ইরান, অথবা মেসোপটেমিয়াতেই ঘটেছিল। গায়ত্রী-অনুষ্টুপ্ জাতীয় শ্লোকবদ্ধ তথা বৃত্তবদ্ধ (Stanzaic) ছন্দের তুলনায় একদিকে আবেস্তা, প্রাচীন নর্স, প্রাচীন আইরীস ও প্রাচীন

লিথুয়ানী কবিতা এবং অন্যদিকে হোমারের ছয় পর্বের (Hexameter / foot) পঙ্‌ক্তি রচনার সঙ্গে করা যায়। তাই কোনো কোনো ছন্দোবিৎ এমন সিদ্ধান্তও করেছেন যে বেদের ছন্দ-প্রণালী ইন্দোয়ুরোপীয় ছন্দোরীতি ও ছন্দোবন্ধের পারম্পর্যেরই বিকশিত রূপ।[৯] বৈদিক যুগের শেষদিকে উচ্চারণগত পরিবর্তনের ফলে পদের দৈর্ঘ্য তার সুনির্দিষ্ট আয়তন-সীমা হারিয়ে বিবিধ ও বিচিত্র রূপ নিতে শুরু করে। ক্রমে ক্রমে চতুষ্পদী রচনা প্রাধান্য লাভ করে। আবার পদগুলি চতুষ্পর্বিক রূপ গ্রহণ করায় এই সময় থেকে ধীরে ধীরে মন্ত্রে বা ছন্দে ক্ষেত্রবিশেষে গুরু বা লঘু ধ্বনির স্থান নির্দিষ্ট হয়ে পড়ে। তাই অনুষ্টুপ্‌ ছন্দে কোনো পদেই পঞ্চম দলটি এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পদে সপ্তম দল গুরু হবে না। কিন্তু প্রতি পদে ষষ্ঠ দলটি গুরু হবে—এমন বিধান গড়ে উঠেছে—দেখা যায়। এই অভিনবত্বকে বৈদিক ছন্দ থেকে পৃথক বিশিষ্টতাযুক্ত ছন্দের সূচনার পরিচায়ক মনে করা যেতে পারে।[১০] কারণ ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' নাটকে দ্বিতীয় অংকের 'বিষ্কম্ভকে' আত্রেয়ীর মুখে বাল্মীকির রামায়ণের প্রথম শ্লোকের কথা শুনে বনদেবতা বলেছেন 'চিত্রম্‌ আম্নায়াদ্‌ অন্যেহয়ং নূতনশ্ছন্দসাম্‌ অবতার:।' অর্থাৎ বেদ থেকে স্বতন্ত্র এই নূতন সুন্দর ছন্দের উৎপত্তি হল। এই নূতন সুন্দর ছন্দ থেকেই সংস্কৃত ছন্দের সূচনা। অবশ্য মনে রাখা দরকার যে বৈদিক ছন্দের পরিবর্তন ও উৎকর্ষলাভের ফলেই সংস্কৃত ছন্দের উদ্‌গম ঘটেছে। এই পরিবর্তন ও উৎকর্ষ লাভ সংঘটিত হয়েছে বহুদিন ধরে লেখ্য ভাষার উপর সম-সাময়িক মানুষের মুখের ভাষার বা লৌকিক ভাষার প্রভাব-প্রক্রিয়ার ফলে।

লক্ষণীয়—ঋগ্বেদের শেষের দিকে 'ছন্দ' সম্ভবত শাস্ত্রীয় বিষয়রূপে স্বীকৃত হয়েছিল। বিশেষ লক্ষণ বা গুণের ভিত্তিতে ছন্দের নামকরণও শুরু হয়েছিল।[১১] ছন্দ নিরূপণের একমাত্র আধার ছিল বর্ণ বা অক্ষর গণনা। তখন ছন্দের ক্ষেত্রে স্বর ও স্বরযুক্তব্যঞ্জনকে বর্ণ ও অক্ষর দুই-ই বলা হত। তাই 'বর্ণবৃত্ত' ও 'অক্ষরবৃত্ত' দুই নামে একটি ছন্দরীতিকেই বোঝানো হত। পাদ ও পর্বের ভূমিকা ছিল গৌণ। মুণ্ডকোপনিষদে বেদশাস্ত্র অধ্যয়নের বিধি-বিধান রূপে বেদের ষড়ঙ্গে 'ছন্দশাস্ত্রও' অন্তর্ভুক্ত। বেদাঙ্গরূপে ছন্দের গুরুত্ব বেশ মর্যাদা লাভ করেছে। অক্ষর-তত্ত্বের রহস্যে অনুপ্রবেশের জন্য মুনি শৌনক ছন্দের অধ্যয়নই বেছে নিয়েছিলেন। পাণিনি-মতে বেদ-জ্ঞান ও 'পূর্ণ পুরুষ' একই। ছন্দ সেই পূর্ণপুরুষের চরণ, কল্প = হস্ত, জ্যোতিষ = নেত্র, নিরুক্ত = কর্ণ,

শিক্ষা—নাসিকা এবং ব্যাকরণ—মুখ। [১২] সুতরাং ছন্দ যে সে যুগে বিশেষ গুরুত্ব ও মর্যাদার অধিকারী হয়ে উঠেছিল তাতে সন্দেহ নেই।

সংস্কৃত ছন্দ : সংস্কৃত ছন্দের বিকাশ মূলত বৈদিক ছন্দের আধারে হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। যদিও উভয়ের প্রকৃতিতে পর্যাপ্ত ভিন্নতা চোখে পড়ে। একদিকে সংস্কৃত-শাস্ত্র ও সাহিত্যের বাহন, অন্যদিকে স্বয়ং একটি শাস্ত্র রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সংস্কৃত ছন্দকে শাস্ত্রীয় ছন্দও বলা চলে।

বৈদিক বর্ণবৃত্তে বর্ণের সংখ্যাই তার বিশিষ্টতার প্রধান দিক। কিন্তু শাস্ত্রীয় সংস্কৃতের বৃত্তছন্দে লঘু ও গুরু ধ্বনির ভিন্নতা স্বীকৃত এবং তার ভিন্ন ভিন্ন বিন্যাসে বহুরকমের ছন্দোবন্ধ গড়ে ওঠে। তার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় 'পিঙ্গল ছন্দঃসূত্র' গ্রন্থে এবং ভরতের নাট্যশাস্ত্রের পঞ্চদশ-ষোড়শ অধ্যায়ে। ভরত একাক্ষর বা একদল ছন্দ 'উক্ত' থেকে শুরু করে ছাব্বিশ দলবিশিষ্ট 'উৎকৃতি' পর্যন্ত বিবিধ প্রস্তারের ইঙ্গিত দিয়েছেন। ছাব্বিশ মাত্রার বড়ো ছন্দকে ভরত 'মালাবৃত্ত' বলেছেন। এই মালাবৃত্তই পরে 'দণ্ডক' নামে পরিচিতি লাভ করে। পরবর্তীকালে সংস্কৃত ছন্দঃশাস্ত্রগ্রন্থগুলি প্রধানত পিঙ্গলের 'ছন্দঃসূত্র' এবং ভরতের নাট্যশাস্ত্রের মূল ভিত্তিতেই রচিত।

সাহিত্যিক সংস্কৃত ছন্দের পূর্বরূপ কঠোপনিষদের যুগে বিভিন্ন রচনায় পাওয়া গেলেও ব্যাবহারিক সংস্কৃত ছন্দ-পরম্পরার আবির্ভাব সর্বপ্রথম বাল্মীকি-রামায়ণেই চোখে পড়ে। অনুষ্টুপ্‌ই বাল্মীকি-রামায়ণের মুখ্য ছন্দ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ইন্দ্রবজ্রা-উপেন্দ্রবজ্রা-বর্গীয় এবং বংশস্থ-বর্গীয় ছন্দের প্রয়োগও যথাক্রমে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের ৩০ এবং অরণ্যকাণ্ডের ১৩-২৫ এবং ৩৭ সংখ্যক তথা অন্যত্রও কোনো কোনো শ্লোকে পাওয়া যায়। রামায়ণ ও মহাভারতে অপরাপর ছন্দও প্রযুক্ত। বিভিন্ন ছন্দের মিশ্রণে উদ্ভূত নতুন নতুন ছন্দের সৃজনও হয়েছে। তের বর্ণমাত্রার (যতি ৪।৯ I) রুচিরা ছন্দও রচিত হয়েছে।—

প্রসাদ যন্নয় বৃষভঃ সমাতরং
পরাক্রমাজ্জিগমিষুরেব দণ্ডেকান্‌
অথাত্ম্যজং ভৃশমনুশাস্ত দর্শনং,
চকার তাং হৃদিজননীং প্রদক্ষিণম্‌।

—অযোধ্যাকাণ্ড—২১-৬৫

জগণ, ভগণ, সগণ, জগণ এবং একটি গুরু ধ্বনির বিন্যাসে এই রুচিরা ছন্দ গঠিত।

অশ্বঘোষ ও কালিদাসের কাব্যে বিবিধ ও বিচিত্র প্রকারের ছন্দ-লালিত্য ও ছন্দ-সুষমার পরিচয় সুপরিস্ফুট। অর্থাৎ তাঁদের রচনায় বহুবিধ ছন্দের প্রয়োগ ঘটেছে। কালিদাসের রচিত ছন্দ-সংখ্যা উনিশ হলেও মুখ্যত সাতটি ছন্দই তাঁর প্রিয় ছিল। ভারবি ও মাঘের রচনাতেও নানাপ্রকার ছন্দের প্রয়োগ আছে। তবে ভারবি বারোটি এবং মাঘ ষোলোটি ছন্দের প্রতিই অধিক আস্থাশীল ছিলেন। মাঝে মাঝে ছন্দোবৈচিত্র্য-সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মাঘের প্রয়াস উল্লেখযোগ্য। পুরাণাদিতেও এই সব প্রচলিত ছন্দেরই অনুসৃতি ঘটেছে। অবশ্য একাধিক ছন্দোবন্ধের মিশ্রণজাত "মিশ্র ছন্দের" (বা সংকর ছন্দ) নিদর্শনও দুর্লভ নয়। তবে এমন ছন্দও পাওয়া যায় যার উল্লেখ 'পিঙ্গল ছন্দঃসূত্রে' অথবা পরবর্তী ছন্দ গ্রন্থে নেই। এই ধরণের অভিনব ছন্দ-রূপে 'মৎস্য-পুরাণে'র দু-একটি ছন্দের উল্লেখ করা যায়। যেমন—⏑⏑। × ৭ + ⏑ [লঘু = ⏑ ; গুরু = ।] = ২২ অক্ষর-মাত্রার ছন্দ, (মৎস্য পু. ১৫৪-৫৫, ৫৫৩, ৫৫৫) ⏑।⏑ × ৮ = ২৪ অক্ষর-মাত্রার ছন্দ, (মৎস্য পু. ১৫৪-৫৫৬-৫৭৫); ।⏑⏑ × ৮ = ২৪ অক্ষর মাত্রার ছন্দ, (মৎস্য পু. ১৫৪- ৫৭৭)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সংস্কৃত কবিরা মাঝে-মাঝে নতুন-নতুন ছন্দোবন্ধ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করেছেন। যদিও তাঁরা প্রাচীন কবিদের প্রযুক্ত ছন্দেই মাত্রাগত তারতম্য ঘটিয়ে ছন্দের ধ্বনি শৃংখলায় অভিনবতা ও বৈচিত্র্য আনতে প্রয়াসী হয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে—'মন্দাক্রান্তায়' কিছু অদল-বদল সাপেক্ষে 'হরিণী' এবং 'ভারাক্রান্তা' ছন্দের উদ্ভব ঘটেছে। মন্দাক্রান্তার প্রারম্ভিক চারটি গুরুধ্বনির পর্বের সঙ্গে পরবর্তী ছটি লঘু ও একটি গুরু ধ্বনি পর্বের স্থান বদল এবং ⏑।⏑⏑ ।⏑⏑ স্থলে ।⏑ ।।⏑।⏑ বসালে 'হরিণী ছন্দোবন্ধ রূপ নেয়। মান্দাক্রান্তার তৃতীয় যতির নির্দিষ্ট অংশে ।⏑।⏑।।⏑ হলে তা 'ভারাক্রান্তা' হয়ে যায়। এই ভাবে স্রগ্-ধরার তৃতীয় যতিবিভাগে একটু হের ফের করে দিলেই 'সুবদনা' ছন্দ মেলে। সংস্কৃত কবিগণ এইভাবে নূতন নূতন ছন্দ রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। 'অশ্বললিত' এমনই একটি ছন্দোবন্ধ যা 'নর্দটক' ও 'জলোদ্ধত গতি' বন্ধদ্বয়ের মিশ্রণে রূপায়িত হয়েছে। ভট্টিকাব্যে তার প্রয়োগ ঘটেছে।[১৩] যেমন—

বিলুলিত পুষ্প রেণুকপিশং প্রশান্তকলিকা পলাশ কুসুমং
কুসুমনিপাত চিত্রবসুধং সশব্দনিপতৎ ক্রমোৎকশকুনম্।
শকুন নিনাদনাদিত কবুর বিলোলবিপলায়মান হরিণং
হরিণ বিলোচনাধি বসতিং বভঞ্জ পবনাত্মজোরিপুবনম্॥
—ভট্টিকাব্য ৮।১৩১

কবি মাঘের শিশুপালবধকাব্যে অনেকগুলি নতুন ছন্দের বা ছন্দোবন্ধের প্রয়োগ চোখে পড়ে। তার মধ্যে 'ধৃতশ্রী', 'মঞ্জরী', 'অতিশায়িনী' ও 'রমণীয়ক' প্রভৃতি অখ্যাত বন্ধকয়টি উল্লেখযোগ্য। এগুলি মাঘের সৃষ্ট বলে মনে হয়। এগুলির মধ্যে মঞ্জরী—'প্রতিমাক্ষরা' 'পৃথ্বী'র সহযোগে, এবং রমণীয়ক 'রথোদ্ধতা 'দ্রুত বিলম্বিত' সহযোগে রচিত। হেমচন্দ্র উল্লিখিত 'প্রভদ্রক' নামে একটি ছন্দোবন্ধ 'নর্দটক' ও 'রথোদ্ধতার' মিশ্রিত রূপ। এই প্রভদ্রকের উল্লেখ হিন্দী ছন্দ শাস্ত্রে, ভিখারীদাসের 'ছন্দার্ণব' গ্রন্থের দ্বাদশ তরঙ্গেও মেলে।

সংস্কৃত ছন্দের উদ্ভব ও রূপ-বৈচিত্র্যের মূলে রয়েছে প্রাকৃতজনের উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য। আবার কবিদের বৈচিত্র্য-পিয়াসী মানসিকতা জনগণের উচ্চারণধ্বনির বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে পড়ে সংস্কৃত ছন্দ ও তার রূপবৈচিত্র্যের প্রয়োগ সৌকর্য ফুটিয়ে তুলেছে। সুতরাং সংস্কৃত ছন্দের বিবিধতা ও বিচিত্রতার মূলে রয়েছে কবিদের জনগণ-নির্ভর সজাগতা ও মানসিক-সক্রিয়তা। সংস্কৃত বার্ণিক ছন্দ প্রধানত তিন ভাগে বিভাজ্য—সমবৃত্ত, অর্ধসমবৃত্ত ও বিষমবৃত্ত।[১৪] যে শ্লোকের চার পদেই সমান মাত্রা থাকে তাকে সমবৃত্ত; যার প্রথম-তৃতীয় এবং দ্বিতীয়-চতুর্থ পদে (পৃথক পৃথক) মাত্রা সাম্য থাকে তাকে অর্ধসমবৃত্ত এবং যার প্রত্যেক পদেই অসমান মাত্রা থাকে তাকে বিষমবৃত্ত বলা হয়। তবে অধিকাংশ ছন্দই সমবৃত্ত জাতীয়। অর্ধসমবৃত্তের বিশেষ ছন্দ হল—হরিণপ্লুতা, অপরবক্ত্র, পুষ্পিতাগ্রা ও বিয়োগিনী। বিষমবৃত্তে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছন্দোবন্ধ হল—উদ্গাতা। তার বহুপ্রকার ভেদও মেলে। বলাই বাহুল্য এই অর্ধসম ও বিষমবৃত্তগুলির উদ্ভব ঘটেছে নানা আকৃতির সমবৃত্তের বিচিত্র মিশ্রণেরই ফলে।

বৃত্তছন্দের বিবর্তনের ধারা অনুসারে সমবৃত্তের উৎপত্তির চারটি ধাপ পাওয়া যায়। প্রথম পর্যায়ে একই-পর্ব আয়তনের বার বার আবৃত্তির ফলে রচনায় একঘেঁয়েমি এসেছে। দ্বিতীয় স্তরে এই অনুবর্তনের যান্ত্রিকতা বর্জিত হয়েছে। তৃতীয় স্তরে অসম-পর্বের সাহায্যে পদ রচনায় বৈচিত্র্য-বিধান প্রয়াস দেখা যায়।

অতঃপর অক্ষর ভিত্তিক স্বরূপের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা। এ-যুগে অক্ষর-মাত্রার বিভিন্ন আয়তনের পর্ব একই পঙ্‌ক্তিতে বিন্যস্ত দেখা যায়। মন্দাক্রান্তা থেকে নিদর্শন দেখা যাক—

গচ্ছন্তীনাং রমণবসতিং যোষিতাং তত্র নক্তম্
রুদ্ধালোকে নরপতিপথে সুচিভেদ্যৈস্তমোভিঃ।
সৌদামন্যা কনক নিকষ স্নিগ্ধয়াদর্শয়োর্বীম্
তোয়োৎসর্গ স্তনিত মুখরোমাস্ম ভূর্বিক্লবাস্তাঃ।

মেঘদূত—৩৭।

শালিনী, মালিনী, শিখরিণী, হরিণী, শার্দূল বিক্রীড়িত ও স্রগ্ধরা প্রভৃতি এই জাতীয় ছন্দ।

চতুর্থ পর্যায়ে ছন্দে পর্বের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে। মধ্যযতির নির্দেশও বর্জিত হয়েছে। ছন্দের পঙ্‌ক্তিও আর তেমন দীর্ঘ নয়। শুদ্ধবিরাট, স্বাগতা, ইন্দ্রবজ্রা, উপেন্দ্রবজ্রা, উপজাতি, ইন্দ্রবংশ ও বংশস্থ প্রভৃতি ছন্দে এইসব লক্ষণ বিদ্যমান। ইন্দ্রবজ্রার একটি উদাহরণ—

দূরাদয়শ্চক্র নিভস্য তন্বী
তমাল তালী বনরাজি নীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে
র্ধারা নিবদ্ধেব কলঙ্ক রেখা॥

—রঘুবংশ—সর্গ-১৩।

সম্ভবত সমবৃত্তের একঘেঁয়েমি দূর করে বৈচিত্র্য আনার উদ্দেশ্যেই সমবৃত্ত থেকে অর্ধসমবৃত্ত ও বিষমবৃত্তের উদ্ভব। অর্ধসমবৃত্তের প্রথম ও তৃতীয় পদ সমরূপায়তনের এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পদ ভিন্নতর সমরূপায়তনের। সুতরাং সমবৃত্তের পদে সামান্য পরিবর্তন সাধিত হলেই অর্ধসমবৃত্ত, হতে পারে। এই ভাবে সমবৃত্ত 'দোধক' ছন্দ থেকে অর্ধসমবৃত্ত 'বেগবতী' ছন্দের উৎপত্তি :—

দোধকঃ— ।⏑⏑×৩+।।—১১ বর্ণ মাত্রা

পর্বত পঙ্‌ক্তি পতাবিহ বল্গৎ
কুঞ্জর কুঞ্জর কুঞ্জস মাঝে।
কাস রসন্তি বাতহু তেহ্ সৌ—
"সজয় সজয় সজ্‌ বলাগ্রৈঃ"

—স্বরথোৎসব—৪।৪০

বেগতী= (তব) মুঞ্জনরাধিপ সেনাং
বেগবতীং সহ তে সমরেষু।
(প্রল) য়োর্মিমিবাভিমুখীং তাং
কঃ সকলক্ষিতি ভৃন্নিবহেষু ।।
—হলায়ুধ—৫।৩৪।

অনুরূপভাবে কালিদাসের রতিবিলাপের অর্ধসমবৃত্ত 'বিয়োগিনী' বা 'সুন্দরী মাত্রিক ছন্দ, ষোলো মাত্রার চরণের—প্রথম ও তৃতীয়টির ২ মাত্রা করে কম হলেই সম, অর্ধসমের রূপ নেয়।—

অহমেত্যপ তঙ্গবর্ত্মনা পুনরঙ্কাশ্রয়ণী ভবামিতে।
চতুরৈঃ সুরকামিনীজনৈঃ প্রিয়যাবন্ন বিলোভ্য সে দিবি।।
—কুমারসম্ভব—৪।২০

অর্থাৎ 'বিয়োগিনী' মূল ছন্দ নয়। সমবৃত্ত থেকে উদ্ভূত অর্ধসমবৃত্ত। চতুষ্পদী বৃত্তের পদ চারটি একে অপরের থেকে স্বতন্ত্র আয়তনের হলে তবে তা বিষমবৃত্ত রূপে পরিগণিত। অনুষ্টুপের মাত্রা বৃদ্ধির ফলে 'পদ-চতুরার্ধ্ব' এবং পরে তার থেকে 'আপীড়' নামক বিষম বৃত্তের উদ্ভব ঘটেছে বলা যায়। এই সমতাহানির মূল যে বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রবণতা তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাতে কানের প্রত্যাশিত প্রসন্নতা আসে না।

একটু মনোযোগ দিলেই বোঝা যায়—সংস্কৃত সাহিত্যের ছন্দের ইতিহাসে সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী 'অনুষ্টুপ্' ছন্দ। যেমন হিন্দী-ক্ষেত্রে 'দোহা' আর বাংলার ক্ষেত্রে 'পয়ার'। এমন কি অসমীয়া এবং ওড়িয়ার কাব্যজগতেও যথাক্রমে 'পদ' ও 'মঙ্গল' অর্থাৎ 'পয়ার'ই সে মর্যাদার অধিকারী। এগুলি সব স্ব স্ব ক্ষেত্রে ছন্দোমালার মধ্যমণির মতো। ধ্বনি-বিন্যাসের সহজতা, ধ্বনিমাধুরী এবং ব্যবহার সৌকর্যে অনুষ্টুপ্ পুরাণ, ইতিহাস, মনুসংহিতা, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রোচিত গ্রন্থে অপরাপর ছন্দকে সরিয়ে প্রায় অদ্বিতীয় বাহন হয়ে উঠেছে। কেবল সংস্কৃতেই নয়, পরবর্তী পালি, জৈন-প্রাকৃত প্রভৃতি গ্রন্থেও অনুষ্টুপ্ প্রাধান্য লাভ করেছে। একটি করে উদাহরণ :—

পালি— অত্তনা চোদয়ত্তানং। পটিমংসেথ অত্তনা।
অত্তাহি অত্তনো নাথো। অত্তাহি অত্তনো গতি।।
—ধম্মপদ-(পালি)।

জৈন-প্রাকৃত — ধম্মং পরক্কমং কিচ্চা। জীবং চ হরিয়ং ময়া
থিইং চ কেয়ণং কিচ্চা। সচ্চেন পলিমন্থ এ॥
—উত্তরজ্ঝয়ণ সুত্ত (জৈন-প্রাকৃত)।

এইভাবে সংস্কৃত বৃত্ত ছন্দ মাত্রাছন্দের আকর্ষণে বিবর্তিত হয়ে সুর-লয়-যুক্ত গীতিময় হয়ে উঠেছে।

প্রাকৃতছন্দঃ পরম্পরা :—আপাতভাবে বৈদিক বর্ণবৃত্তের ধারাই প্রধানত প্রাকৃত সাহিত্যের প্রারম্ভিক যুগ পর্যন্ত চলে এসেছে। পরবর্তীকালে প্রাকৃত ছন্দের নিজস্ব ধারা গড়ে ওঠে।[১৫] আমরা সংস্কৃত ছন্দের পারম্পর্যও দেখেছি বর্ণবৃত্তেই, মাত্রাবৃত্তে নয়। প্রাচীন মাগধীতে বৌদ্ধ-বাণী বার্ণিক ছন্দেই পাওয়া যায়। পালির জাতক-কাহিনীও মূলত বর্ণবৃত্তেই টিকে আছে। এমন কি ধম্মপদেও অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী ছন্দই বেশি মেলে। অবশ্য ধম্মপদে মিশ্র বা সংকর ছন্দোবন্ধের নিদর্শনও রয়েছে। তাতে তিন অক্ষরের পর্বের 'গণাত্মক' বিধান মানা হয়নি। যেমন—

সবথ বে সপ্পুরিসা চজন্তি, ন কাম কামা লপয়ন্তি সন্তো
সুখেন ফুট্ঠো অথবা দুখেন, ন উচ্চাবচং পণ্ডিতা দস্সয়ন্তী॥
—ধম্মপদ,—৬-৮।

এখানে প্রথম তিন পদ ত্রিষ্টুপ্ ও শেষ পদটি জগতীবন্ধে রচিত। ত্রিষ্টুপের কিছুটা পরিবর্তিত রূপভেদের ব্যবহার ধম্মপদে বেশি। কোথাও দশ আবার কোথাও এগারো মাত্রা প্রযুক্ত। এই বন্ধের সারূপ্য লক্ষিত হয় সংস্কৃত 'বিয়োগিনী'র সঙ্গে। বিয়োগিনীর লক্ষণাক্রান্ত ধম্মপদের দুইটি পঙ্ক্তি—

উদকং হি নয়ন্তি নেত্তিকা, উসুকারা দময়ন্তি তেজনম্
দারু দময়ন্তি তচ্ছকা, অত্তানং দময়ন্তি পণ্ডিতা॥
—ধম্মপদ,—৪-৫।

ত্রিষ্টুপ্ বর্গের 'বিরাট ত্রিষ্টুপ্' জাতীয় এই রচনাটি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় প্রাকৃতের প্রারম্ভিক যুগে বৈদিক ছন্দের ধারাই বহমান ছিল। পরবর্তী সংস্কৃত যুগে যেমন বর্ণবৃত্তকে নিশ্চিত অক্ষর সংখ্যা এবং 'গণ' ব্যবস্থায় আশ্রিত দেখা যায়, তখনও তা হয়নি। পালি সাহিত্যে এমন রচনাও আছে যার অসম পদে জগতীর ১২ এবং সমপদে অতিজগতীর ১৩ বর্ণের বিন্যাস ঘটেছে। সুতরাং একথা সহজেই বলা যায় যে তখনও বর্ণসংখ্যা এবং গণ-ব্যবস্থা সুদৃঢ়

রূপ পায়নি।

বিমলদেব সূরী কৃত 'পউম চরিয়' (খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতক) জৈন প্রাকৃত সাহিত্যের প্রাচীনতম কাব্যটি বর্ণবৃত্তেই রচিত। উল্লেখযোগ্য প্রাকৃত কাব্যের মধ্যে রাজশেখরের 'কর্পূরমঞ্জরী' এবং রামপাণিবাদের 'কংসবহো' প্রভৃতিতে বর্ণবৃত্তের শাস্ত্রীয় প্রয়োগ ঘটেছে। যদিও 'পউমচরিয়'তে অক্ষর ও গণশৃঙ্খলা শিথিলই। এ-সব থেকে সিদ্ধান্ত হতে পারে যে—বর্ণবৃত্তে প্রাকৃত ছন্দের নিজস্বতা প্রতিফলিত হয়নি। তা-হয়েছে—অমিল মাত্রাবৃত্তে বা জাতিছন্দে, যার প্রতিনিধিত্ব করে 'গাথা' বা 'গাহা' ছন্দ। এই জাতীয় প্রয়োগ বৌদ্ধযুগে মেলে না, মেলে না ভরতের নাট্যশাস্ত্রেও। সেখানেও 'ধ্রুবা গীতি'—বর্ণবৃত্তেই রচিত। সুতরাং তখনও মাত্রাবৃত্ত তেমন জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি। অবশ্য কালিদাসের কালে 'গাহা' এবং তার ভেদ উপভেদ বেশ প্রচলিত হয়ে উঠেছে দেখা যায়। অভিজ্ঞানশাকুন্তল-এ প্রাকৃত ও সংস্কৃত দুই ভাষাতেই বিশুদ্ধ গাথা এবং অন্য প্রকারের ছন্দের নিদর্শন পাওয়া যায়। কালিদাসের রচনা থেকে একটি করে প্রাকৃত 'উদ্‌গাথা, এবং সংস্কৃত গাথার (আর্যা) উদাহরণঃ—

(১) তু জ্ঝ্ণ জাণে হিঅঅং মম উণ কামো দিবাবি রত্তিম্মি।
নি ঘ্বিণ তবই বলীঅং, তুই বুত্তমণোরহাঁই অঙ্গাই।
—অভিজ্ঞানশাকুন্তল—৩।১৩।

(২) উৎসৃজ্য কুসুম শয়নং নলিনীদলকল্পিতস্তনাবরণম্।
কথমাতপে গমিষ্যসি, পরিবাধাপেলবৈরঙ্গৈঃ॥
—পূর্ববৎ—৩।১৯।

মনে হয়—গাথাজাতীয় ছন্দের উৎসভূমি প্রাকৃত জনের কণ্ঠ ও রচনা। সুমধুর সুরলালিত্যের এই মাত্রাবৃত্ত ছন্দটির পূর্ব রূপ মূলে লোকগীতির বাহন ছিল। তখন তা ছিল অব্যবস্থিত, বিধি-বিধানহীন। রচয়িতা এবং গায়কের প্রয়োজন ও অভিরুচি নির্ভর ছিল তার প্রয়োগ ও রূপাকৃতি। পরে ক্রমে ক্রমে তা বহুল প্রয়োগের ফলে স্থির রূপায়ণের দিকে অগ্রসর হয়। লোকমুখের ভাষা ও গীতি-জাত এই লৌকিক ছন্দটির সুরাশ্রয়ের প্রভাবে আর্যছন্দ পরিবর্তিত ও বিবর্তিত হয়ে মাত্রাবৃত্তের রূপ নেয়। লোকগীতির বাহন এই ধরনের ছন্দ স্পষ্ট হয়ে ওঠে সর্বপ্রথম অন্ধ্র বা মহারাষ্ট্রের লোকসাহিত্যে।[১৬] তাই

অনেকের অনুমান এ-টি আর্য-ছন্দ নয়, দ্রাবিড় ছন্দ। কারণ এই গাথা ছন্দোবন্ধের প্রথম প্রকাশ মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে। আর গাথাই প্রাকৃতের অধিকাংশ মাত্রাবৃত্ত ছন্দের মূল উৎস। গাহা, বিগাহা, উগ্‌গাহা, গাহিনী, সিংহিনী, খংধঅ প্রভৃতি প্রাকৃতের অন্যান্য ছন্দও এই মূল ছন্দের 'গণ'-পর্ব বা পদের ফের-বদলে উদ্ভূত। গাহা গোত্রীয় স্কন্ধক (খংধঅ) প্রবর সেনের 'সেতুবন্ধ' কাব্যের মুখ্যছন্দ। তবে মাঝে-মধ্যে 'গলিতক' ছন্দের প্রয়োগও আছে। অপভ্রংশ যুগে জৈন ধর্ম সাহিত্যে 'গাহা'র বিশেষ মর্যাদা ছিল। যদিও অপভ্রংশ কাব্যে এ-ছন্দের ব্যবহার কমই। হেমচন্দ্রের 'কুমারপালচরিত' গ্রন্থের মুখ্য ছন্দ 'গাহা' ও তার প্রকারভেদই। তাতে প্রাকৃত ছন্দও আছে। মনে হয় অপভ্রংশ কবিরা অপভ্রংশ ভাষায় কাব্য রচনার সময় প্রাকৃত ছন্দের ব্যবহার করতেন না। আবার গাহা প্রভৃতি প্রাকৃত ছন্দ লিখতেন প্রাকৃত ভাষাতেই। লক্ষণীয় প্রাকৃত অমিল মাত্রাবৃত্ত খড়ী হিন্দীর কাব্য বা বাংলা, অসমীয়া এবং ওড়িয়াতে খাপ খায়নি। যদিও প্রাকৃত ছন্দ প্রারম্ভ থেকেই মাত্রাবৃত্ত, যাতে অক্ষর বা বর্ণসংখ্যার তুলনায় মাত্রাসংখ্যার দিকেই আনুগত্য বেশি।

অপভ্রংশ ছন্দ : ভারতীয় ছন্দঃশাস্ত্রে অপভ্রংশ ছন্দের স্বতন্ত্র গৌরব রয়েছে। এই ছন্দ একদিকে যেমন আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার ছন্দকে বহুলাংশে রূপলাভে সাহায্য করেছে তেমনি অপর পক্ষে সমসাময়িক সংস্কৃত ছন্দকেও প্রভাবিত ও সমৃদ্ধ করেছে বলা যায়।[১১] ছন্দটি প্রাকৃতের তুলনায় অধিক সঙ্গীতাত্মক এবং মধুর। কারণ তা লোক-সঙ্গীতের গীতিধর্মিতায় সমৃদ্ধ। সুতরাং তালের নিয়ন্ত্রণ সুস্পষ্ট। এ-ছন্দের রচনা বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গীত হত। অবশ্য বিশুদ্ধ মাত্রাশ্রিত অপভ্রংশ রচনারও অভাব নেই। দেখা যাচ্ছে অপভ্রংশ ছন্দ দুই প্রকারের—তালাশ্রিত এবং মাত্রাশ্রিত। মাত্রা-আশ্রিত অপভ্রংশ ও প্রাকৃত ছন্দ হল প্রায় একই। তবে প্রাকৃত মাত্রাবৃত্ত অমিল আর অপভ্রংশ মাত্রাবৃত্ত সমিল। তালছন্দও ক্রমে ক্রমে তালের আশ্রয় ত্যাগ করে মাত্রা-আশ্রিত হয়ে পড়ে। তাই দোহা, সোরঠা, অরিল্ল, রোলা, হরিগীতিকা প্রভৃতি তাল-আশ্রিত অপভ্রংশ ছন্দোবন্ধ অবশেষে কেবল মাত্রা-গণনার সাহায্যে রচিত ও সুরসংযোগে পঠিত হতে থাকে। অপভ্রংশে দুই থেকে ছ'মাত্রা পর্যন্ত দীর্ঘ পর্ব রচিত হত। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা দরকার যে, সঙ্গীতাত্মক তালছন্দে তালের প্রভাব এবং তাল-অনুসারী পর্ব অর্থাৎ 'তালপর্ব' লোকগীতির প্রত্যক্ষ প্রভাবজাত। এই জাতীয় রচনা পর্বে-পর্বে বাদ্য-তাল বা করতালের সাহায্যে গাওয়া হত। শেষ

পর্যন্ত এই তালপর্ব ৪, ৫, ৬ ও ৭ মাত্রা পর্যন্ত দীর্ঘ রূপ লাভ করতে শুরু করে। এই সব পর্ববিশিষ্ট তালছন্দে দ্বিপদী, চৌপদী ও ষট্‌পদী স্তবক রচিত হত।

অপভ্রংশ ছন্দের স্পষ্ট বিকাশ পরিলক্ষিত হয় বৌদ্ধ-সিদ্ধ-সাধকদের রচনায়। তাতে অপভ্রংশের বিশিষ্ট ছন্দোবন্ধ দোহা ছাড়াও সোরঠা, পাদাকুলক, অরিল্ল, দ্বিপদী, উল্লালা, রোলা প্রভৃতির নিদর্শন রয়েছে। পাশাপাশি লোকগীতের পদ-রচনার ধারাও বহমান। সম্ভবত আধুনিক আর্যভাষার সাহিত্যে গেয় পদের সর্বপ্রথম প্রয়োগ বৌদ্ধ-সিদ্ধ-সাধকরাই করেছেন। তাতে সংস্কৃত ছন্দও প্রভাবিত হয়েছে মনে হয়। জয়দেবের গীতিগোবিন্দে তার পরিচয় দুর্লক্ষ নয়।[১৮] পরবর্তীকালে মাত্রাবৃত্তের এই ধারা একদিকে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, সুরদাস, তুলসীদাস, মীরা প্রমুখ সগুণ সন্তকবিদের, আর অন্যদিকে নাথসিদ্ধা-চার্যদের বাণীর মাধ্যমে কবীরের মতো নির্গুণপন্থী সাধক-কবিদের প্রভাবিত ও উদ্বুদ্ধ করেছে।

অপভ্রংশকালীন জৈন কবিদের রচনায় নানা-প্রকার ছন্দের বৈচিত্র্য চোখে পড়ে। সাধারণভাবে চারটি সমআয়তনের পঙ্‌ক্তির পর দুইটি অপেক্ষাকৃত বড়ো বা ছোটো পঙ্‌ক্তির বিন্যাসে নির্মিত স্তবকের নাম 'কুণ্ডলিয়া'। কুণ্ডলিয়ার প্রথম চার পঙ্‌ক্তিকে 'কড়বক' এবং শেষ দুই পঙ্‌ক্তিকে 'ঘত্তা' বলা হয়। অপভ্রংশের এই জাতীয় ছন্দোবন্ধের ব্যবহার প্রধানত হিন্দী ভক্তি যুগের সুফী প্রবন্ধকাব্যে এবং তুলসীদাসের রামচরিতমানসে চোখে পড়ে। তুলসীদাসের ব্যবহার সার্থকতায় চৌপাঈ বন্ধের 'কড়বক' এবং 'দোহা' বন্ধের 'ঘত্তা'-রচনার প্রথা খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। 'ঢোলামারু' নামক অপভ্রংশের রচনায় দোহাই প্রযুক্ত। তবে অপভ্রংশের আখ্যানকাব্যে দোহার 'ঘত্তা' রচিত হয় নি। তবু সাধারণভাবে কবিতায় দোহার ব্যবহার অধিক হয়েছে।

অপভ্রংশের তালছন্দের ধারা বৌদ্ধসিদ্ধদের রচনা থেকে শুরু করে 'অদ্দহমাণের' 'সন্দেশরাসক' ও তার সমসাময়িক অন্যান্য কাব্যেও বহমান। পরবর্তীকালে এই ধারাটি গুজরাটের 'জুনী গুজরাটী' এবং 'জুনী রাজস্থানী'র রচনাকেও সঞ্জীবিত করেছে। গুজরাটি ছন্দশাস্ত্রে এ-ছন্দের তাল-লয় প্রভৃতির সংকেত আছে। 'প্রাকৃতপৈঙ্গলম্' এবং 'কীর্তিলতা'তেও এই তাল-লয় প্রযুক্ত রচনা আছে, মনে হয়। পরে অবশ্য এইসব ছন্দ তালের আশ্রয় পরিহার করে পুরোপুরি মাত্রিক ধর্মী হয়ে দাঁড়ায়। তা সত্ত্বেও 'চৌপৈয়া', 'লীলাবতী', 'মরহট্টা', 'ত্রিভঙ্গী' প্রভৃতি ছন্দোবন্ধে তালময়তা অক্ষুণ্ণ রয়েছে কতকাংশে।

বর্ণবৃত্ত বৈদিক যুগ থেকে সংস্কৃতের মাধ্যমে প্রাকৃত ও প্রাকৃত থেকে অপভ্রংশের ভিতর দিয়ে নব্য ভারতীয় আর্যভাষার কাব্যে এসে পৌঁছেছে। কিন্তু তার প্রয়োগপরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে। সংস্কৃতের শেষ পর্যায়ে প্রাকৃত ছন্দের উন্মেষের মুহূর্তে লোকভাষা ও লোকছন্দের (অলিখিত) সংস্পর্শে এসে বর্ণবৃত্তের একটি ক্ষীণ পরিবর্তন সূচিত হয়। এই পরিবর্তন ক্রমে ক্রমে আরও সুস্পষ্ট হয়ে সুর-ধ্বনি ও সঙ্গীতময়তায় যে রূপ নেয় তার থেকেই মাত্রাবৃত্তের উদ্ভব হয়েছে—মনে করেন কেউ কেউ। সাহিত্যে বর্ণবৃত্তের হ্রাস ঘটায় এই মাত্রাবৃত্ত তার স্থান পূরণের উদ্‌যোগ নেয়। তাই প্রাকৃতের শেষ পর্যায়ে মাত্রাবৃত্ত বেশ সুস্থির জনপ্রিয় রূপ পরিগ্রহ করেছে। সমসাময়িক এবং পরবর্তী সংস্কৃত কাব্যেও মাত্রাবৃত্ত গৃহীত হচ্ছে দেখা যায়।

অপভ্রংশে সংস্কৃত বর্ণবৃত্তের প্রয়োগ নেই বললেই হয়। যদিও 'স্বয়ংভূছন্দস্' এবং অপরাপর অপভ্রংশ ছন্দ-শাস্ত্রের গ্রন্থে সংস্কৃত বর্ণবৃত্তের লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত দেওয়া আছে। সম্ভবত এই ছন্দ-শাস্ত্রকারগণ অপভ্রংশ ছন্দের শাস্ত্র রচনার সময় পূর্ববর্তী সংস্কৃত-প্রাকৃত ছন্দঃশাস্ত্রগ্রন্থ আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং যুগোচিত প্রবণতার প্রয়োজনে নব-ছন্দঃশাস্ত্র রচনা করেন। তবে অপভ্রংশ কবিরা সেই সব বর্ণবৃত্ত ব্যবহার করেছেন যা তাল শুনে বা 'তালগণে' গাওয়া হত। এই তালগণের বা তাল-পর্বের দৃষ্টান্তস্বরূপ পুষ্পদন্তের 'জসহর চরিউ'তে 'বিতান', 'পঙ্‌ক্তিক', 'ভুজঙ্গপ্রয়াত', 'চিত্রা', স্রগ্বিণী', 'বিভাবরী' প্রভৃতি বর্ণবৃত্তের প্রয়োগ ঘটেছে। এ-গুলি বেশ সহজে তালছন্দে বা তালের সাহায্যে গাওয়া যায়। 'ভুজঙ্গপ্রয়াত' অপভ্রংশ ও অবহট্ট কবিদের প্রিয় ছন্দ। যুদ্ধের বর্ণনায় ছন্দটির শক্তি-সামর্থ্য ও সুষমা ফুটে ওঠে। তাছাড়া অন্যপ্রকার কয়েকটি বর্ণবৃত্তও গেয় ছিল। 'সন্দেশ-রাসক' গ্রন্থে মালিনী, নন্দিনী ও ভ্রমরাবলী প্রভৃতি ছন্দ প্রযুক্ত। মালিনী ৮ মাত্রার তালখণ্ডে গেয়। অপর ছন্দোবদ্ধ দুইটিও চার মাত্রার তালখণ্ডেই গেয়। অর্থাৎ তাদের রচনা চতুর্মাত্রিক পর্বে।

অপভ্রংশ যুগের ছন্দের বৈশিষ্ট্য—তিনটি, যথা—পদ ও পঙ্‌ক্তির আয়তনের নির্দিষ্টতা, পঙ্‌ক্তির পদে, ও পদের চার, পাঁচ, ছয় ও সাত মাত্রার পর্বে বিভাজ্যতা; পঙ্‌ক্তিতে-পঙ্‌ক্তিতে মিল এবং একপদী, দ্বিপদী ও চৌপদীর শ্লোকবন্ধের প্রচলন। এ-সবের সাহায্যেই সে যুগের কবিতাকুঞ্জের ধ্বনিক্রীড়া এবং লালিত্য-প্রবণতা মনোহর রূপ লাভ করত। লক্ষণীয় হল—মাত্রাবৃত্ত রীতিই—এই জাতীয় কাব্যকৃতি এবং ধ্বনি-লালিত্য ও সুষমা-সৌষ্ঠবের পক্ষে

উপযুক্ত বিবেচিত হয়েছিল। এখানে অপভ্রংশের চতুর্মাত্রক বর্ণবৃত্ত 'সুষমা' এবং ষট্‌কলপর্বিক মাত্রাবৃত্ত 'হীর' ছন্দের একটি করে দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।—

(১) ভোহা কবিলা উচ্চা হিঅলা
মজ্‌ঝা পিঅলা ণেত্তা জুঅলা।
রুক্‌খা বঅণা দন্তা বিরলা
কে সে জিবিআ তাকা পিঅলা।
—প্রাকৃত পৈঙ্গলম্‌—১, বর্ণবৃত্ত-৯৭।

দীর্ঘস্বর ও রুদ্ধদল দ্বিমাত্রক।[১৯] তাই প্রতি পর্বে চারকলামাত্রা সুস্পষ্ট।

(২) তিণ্ণি ধরহি বেবি করহি মত্ত পঅহি লেক্‌খ এ।
কোই জণই দপ্পভণই 'হীর' সুকই পেক্‌খ এ।।
—প্রাকৃত পৈঙ্গলম্‌—১, মাত্রাবৃত্ত-১৯৯।

পূর্বের দৃষ্টান্তের মতোই এখানেও পদ-পর্ববিভাগ এবং মিল লক্ষণীয়। আর লক্ষণীয় চৌপদী বন্ধের স্থলে দ্বিপদী বন্ধের প্রয়োগ। এইটিও সে যুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশিষ্টতা। সংস্কৃত-প্রাকৃত যুগের 'দ্রুতবিলম্বিত' ও 'মধুমালতী' প্রভৃতি কোনো কোনো ছন্দে অতিপর্বের প্রয়োগ চোখে পড়ে। অতিপর্বের সাহায্যে রচনার প্রথম পর্বটি ধাক্কা খেয়ে গতিবেগ লাভ করে ও পাঠে বৈচিত্র্য আনে। বলা চলে অপভ্রংশ যুগের কবিরা সচেতনভাবে ব্যাপকতার সঙ্গে অতিপর্ব রচনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন।—

হণু উজ্জর গুজ্জর রাঅদ লং
দল দলিঅচ লিঅমর হট্‌ঠ বলং
বল মোলিঅ মালব রাঅকুলা
ফুল উজ্জল কলচুলি কণ্ণফুলা।।
—প্রাকৃত পৈঙ্গলম্‌-১, মাত্রাবৃত্ত-১৮৫।

এই অপভ্রংশ-অবহট্ট ছন্দই পরবর্তীকালে বিভিন্ন আধুনিক ভারতীয় ভাষার ছন্দের পথ নির্মাণ করে দেয়। বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া ও হিন্দী প্রভৃতি ভাষার ছন্দ স্বকীয়তামণ্ডিত ও বিশিষ্ট হলেও বেশ কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত অবহট্ট ভাষা এবং ছন্দকে মর্যাদার সঙ্গে অভিভাবক হিসাবে স্বীকৃতি জানিয়েছে। আর অগ্রসর হয়েছে আত্মোৎকর্ষের পথে।

সংস্কৃত-প্রাকৃতের দীর্ঘস্বরের উচ্চারণ অপভ্রংশ যুগেই ক্ষেত্রবিশেষে ক্ষীণ

হতে শুরু করেছে। মাঝে মাঝে সুস্পষ্টভাবে তা হ্রস্ব উচ্চারিত হয়েছে এমনও দেখা যায়। প্রাকৃত পৈঙ্গলেই বলা হয়েছে—

'জই দীহো বিঅ বণ্ণো, লহু জীহা পঢ়ই হোই সো বি লহু।'

—প্রাকৃত পৈঙ্গলম্-১, মাত্রাবৃত্ত-৮।

অর্থাৎ 'যদি লঘুভাবে পঠিত হয়, তবে দীর্ঘ বর্ণও লঘু বা হ্রস্ব হয়।'

একটি দৃষ্টান্ত :—

দেশিল বঅনা সবজন মিট্ঠা
তেঁ তৈঁ সপজম্ পওঁ অবহট্ঠা।

—বিদ্যাপতি, কীর্তিলতা,-পৃ. ৬

এখানেও প্রতি পর্বে চারমাত্রা, সুতরাং 'জম্ পওঁ'-তেও চার মাত্রাই পড়তে হবে। ফলে 'ওঁ' দীর্ঘ না হয়ে হ্রস্ব এবং একমাত্রার হবে। এই প্রবণতা চর্যাপদে ও পরবর্তী বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া ও হিন্দী ভাষাতেও সুস্পষ্ট। সুতরাং আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার এ-টি একটি লক্ষণীয় বিশিষ্টতা রূপে এটি গণ্য। এবার আমরা বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া ও হিন্দী ছন্দের সাধারণ পরিচয় লাভে প্রয়াসী হব। অপভ্রংশ ছন্দে যে পরিবর্তনের সূচনা, পরবর্তী সাহিত্যে তার প্রতিষ্ঠা।

একান্তভাবে বাক্‌নির্ভর ধ্বনি-শিল্পই হল ছন্দ। মনে রাখা দরকার—প্রতিদিনের যা Speech, তার সঙ্গে ছন্দের উচ্চারণ আদর্শের পার্থক্য থাকতে পারে। এক ভাষায় যখন অন্য ভাষার ছন্দ ধার করা হয় তখন এই পার্থক্য ঘটে। ধীরে ধীরে তা স্বাভাবিক রূপ নেয় এবং চলতি বাগ্‌ধ্বনির সঙ্গে সাজুয্য পায়। এই ছন্দ আবৃত্তিকার বা শ্রোতৃমনের নির্দিষ্ট সময়ান্তরে ধ্বনির প্রত্যাবর্তন-প্রত্যাশাবোধকে তৃপ্ত ও চরিতার্থ করে। ছন্দের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই নিহিত থাকে সেই ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণ ভঙ্গির মধ্যে। সুনিরূপিত এবং সন্তুলিত গাণিতিক প্রক্রিয়ায় যে ছন্দের যতিবিভাগ ও বিশ্লেষণ সম্ভব তাই সাধারণভাবে কবিতার ছন্দ বা পদ্যছন্দ। গদ্যের ক্ষেত্রে অনুরূপ বিভাজন-বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। তবে সুসাহিত্যিকের গদ্যরচনাতেও একপ্রকার অনুভবগম্য শিল্প-সুষমা এবং ধ্বনি-সাম্য থাকা বিচিত্র নয়। যদিও গদ্যের চেয়ে পদ্যের ছন্দস্পন্দ আরও সুস্পষ্ট, সুমিত ও সুনিয়ন্ত্রিত। যেমন—

মু. দি. ত : আ. লোর্। ক. মল্ : ক. লি. কা। টি. রে ॥
রে. খে. ছে : সন্. ধ্যা। আঁ. ধার্ : পর্. ণ। পু. টে I
উ. ত. রি. বে : য. বে। ন. ব : প্র. ভা. তের্। তী. রে ॥
ত. রুণ্ : ক. মল্। আপ্. নি : উ. ঠি. বে। ফু. টে I

—রবীন্দ্রনাথ, গীতালি—১০৭

এখানে [পূর্ণযতি – I ; অর্ধযতি – ॥ ; লঘুযতি – । ; উপযতি – : এবং অনুযতি – .] নির্দিষ্ট যতিপাতে পঙ্‌ক্তি, পদ, পর্ব, উপপর্ব ও দলের রূপ এবং ধ্বনিসাম্য সুস্পষ্ট। তাতে ছন্দ-স্পন্দের খেলাও সহজে অনুভূত হয়। বলাই বাহুল্য এ-রূপ যতিপাত, ধ্বনিসাম্য ও ছন্দস্পন্দ অসমীয়া, ওড়িয়া এবং হিন্দী ছন্দেরও লক্ষণীয় বিশেষত্ব।

গতি ও যতি হল ছন্দের প্রাণ। কবিতা পাঠের সময় উচ্চারণ বিরতির নাম যতি। ভাব-অনুসারী যতি 'ভাবযতি' এবং ছন্দ-অনুসারী যতি 'ছন্দযতি' নামে পরিচিত। গুরুত্বভেদে ছন্দযতি পাঁচ প্রকারের—পূর্ণযতি (Verse

Pause), অর্ধযতি (Medial Pause), লঘুযতি (Foot Pause), উপযতি (Secondary Pause) এবং অণুযতি (Syllabic Pause)। নামান্তরে যথাক্রমে পঙ্‌ক্তি যতি, পদযতি, পর্বযতি, উপপর্বযতি, এবং দলযতি। এই পূর্ণযতি, অর্ধযতি, লঘুযতি, উপযতি এবং অণুযতি দ্বারা নির্দিষ্ট কবিতাংশকে যথাক্রমে পঙ্‌ক্তি (Metrical •Line), পদ (Verse Clause), পর্ব (Foot), উপপর্ব (Sub-foot) এবং দল (Syllable) বলা হয়।

কবিতা আবৃত্তির সময় ধ্বনিলহরীতে বিশিষ্টতা আনার জন্য কবিরা মাঝে মাঝে পঙ্‌ক্তি, পদ বা পর্বের পূর্বে একটি অতিরিক্ত ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ ব্যবহার করেন। এই অতিরিক্ত ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছকে অতিপর্ব (Anacrusis) বলা হয়।—

যদি নদি ছানার গাঁয়ে
কোথাও অশোক-নীপের ছায়ে
আমি কোনো জন্মে পারি হতে
ব্রজের গোপবালক
তবে চাই না হতে নব বঙ্গে
নব যুগের চালক।
—রবীন্দ্রনাথ, ক্ষণিকাঃ 'জন্মান্তর'

এখানে 'যদি' 'কোথাও', 'আমি', এবং 'তবে'—অতিপর্ব।

ভারতীয় পদ্য-ছন্দের স্বরূপ নির্ণয় করতে হলে তার ধ্বনিমাত্রার বিন্যাস নিরূপণ করা দরকার। কারণ ভারতীয় ছন্দ ধ্বনি-পরিমাণ নির্ভর (Quantitative)। যার সাহায্যে কোনো কিছুর আয়তন বা পরিমাণ মাপা যায়, সেই এককের পারিভাষিক নাম মাত্রা (Unit of measure)। বাংলা ছন্দে ধ্বনি মাপা হয় কলা (Mora) ও দল (Syllable) দিয়ে। হ্রস্বস্বর বা মুক্তদলের উচ্চারণকালকে 'কলা' এবং বাগ্‌যন্ত্রের এক-এক প্রয়াসে উচ্চারিত শব্দাংশকে দল বলা হয়। সুতরাং বাংলায় মাত্রা দুই রকমের 'কলামাত্রা' ও 'দলমাত্রা'। সুপরিমিত পর্বযোগে পদ্যছন্দ (Verse-rythm) উৎপন্ন হয়। পর্ব হল কতগুলি দলের সমষ্টি। দল দুই প্রকারের—মুক্তদল (Open Syllable) ও রুদ্ধদল (Closed Syllable)। সাধারণভাবে সংস্কৃত-প্রাকৃত ও হিন্দীতে হ্রস্ব-স্বরান্ত মুক্তদল লঘু বা একমাত্রক এবং দীর্ঘস্বরান্ত

মুক্তদল ও রুদ্ধদল গুরু বা দ্বিমাত্রক হয়। কিন্তু বাংলা, অসমীয়া এবং ওড়িয়াতে সর্বত্র তা হয় না। এই তিন ভাষায় নিত্যহ্রস্ব ও নিত্যদীর্ঘ স্বরবর্ণ বলে কিছু নেই। শ্রুতির বিচারে 'ছন্দ' শব্দটিতে দুইটি দল—'ছন্' ও 'দ'। প্রথমটি রুদ্ধ এবং দ্বিতীয়টি মুক্ত। রুদ্ধদলে মূল বর্ণের সঙ্গে এক বা একাধিক আশ্রিত বর্ণ থাকে। এই আশ্রিত বর্ণ উচ্চারণের সময় মূল ধ্বনির সহগামী হয়। 'ছন্'-রুদ্ধ-দলটিতে 'ছ' মূল ও 'ন্' আশ্রিত বর্ণ। মূল ও আশ্রিত বর্ণের একটি বা দুইটিই স্বরান্তও (অথবা স্বরবর্ণ) হতে পারে। যেমন—'বই'-তে 'ব' মূল স্বরান্ত এবং 'ই' আশ্রিত স্বরবর্ণ। কিন্তু 'ওই'-তে দুইটিই স্বরবর্ণ।

বাংলা ছন্দে পর্বের আয়তন নিরূপিত হয় দুই প্রকার মাত্রার সাহায্যে—কলামাত্রা ও দলমাত্রা। সংস্কৃত-প্রাকৃত ও হিন্দী ছন্দে একটি হ্রস্বস্বর বা হ্রস্বস্বরান্ত মুক্ত দলের স্বাভাবিক উচ্চারণে যে সময় লাগে অর্থাৎ সেই সময় সীমায় যতটুকু ধ্বনি উচ্চারিত হয় তাকে এক কলা ধরা হয়। দীর্ঘস্বরান্ত মুক্তদলের এবং রুদ্ধদলের উচ্চারণকালে যে পরিমাণ ধ্বনি উচ্চারিত হয় তা মুক্তদলের প্রায় দ্বিগুণ। তাই তা দুই কলা রূপে গণ্য। কিন্তু বাংলা, অসমীয়া এবং ওড়িয়াতে দীর্ঘস্বরান্ত মুক্তদলও একমাত্রক। কারণ, তার উচ্চারণ প্রলম্বিত নয়।

বাংলা কবিতায় দলের, বিশেষ করে রুদ্ধদলের উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বাংলা ছন্দের বিভিন্ন রীতি (Styles) গড়ে উঠেছে। পর্বের মাত্রাবিন্যাস-প্রণালীই ছন্দোরীতি। তাতেই ছন্দের প্রকৃতি উদ্‌ভাসিত। সাধারণভাবে বাংলা ছন্দের দুই রীতি—দলবৃত্ত (Styllabic Style) ও কলাবৃত্ত (Moric Style)। দলবৃত্তে মুক্ত-রুদ্ধ নির্বিশেষে প্রতিটি দলই একমাত্রা রূপে বিচার্য। অর্থাৎ রুদ্ধদলের উচ্চারণ সংকুচিত ও মুক্তদলের সমান। প্রত্যেক পর্বে চার দলমাত্রা দলবৃত্ত ছন্দের স্বাভাবিক মাপ। দল সংখ্যার সমতাতেই এ-রীতির কবিতায় ধ্বনিসাম্য সন্তুলিত থাকে। যেমন—

| ⌣ ⌣ | ⌣ ⌣ ⌣ | ⌣ | ⌣ ⌣ ⌣ ⌣ ⌣ ⌣

আম্. রা : সু. খের্। স্ফী. ত : বু. কের।। ছা. য়ার্ : ত. লে। না. হি : চ. রি I

| ⌣ ⌣ | | ⌣ ⌣ | | ⌣ ⌣ ⌣ | ⌣ ⌣ ⌣

আম্. রা : দু. খের্। বক্. ক্র : মু. খের্।। চক্. ক্র : দে. খে। ভয়্. না : ক. রি I

—রবীন্দ্রনাথ, কল্পনা : 'হতভাগ্যের গান'

[মুক্তদল ='⌣' এবং রুদ্ধদল – '|']

দলমাত্রিক ছন্দের প্রত্যেক পর্বে চারদলমাত্রার বিন্যাস সুস্পষ্ট।

সাধারণভাবে কলাবৃত্ত রীতিতে মুক্তদল এক কলামাত্রা এবং রুদ্ধদল দুই কলামাত্রা রূপে গৃহীত। কিন্তু রুদ্ধদলের উচ্চারণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংকুচিত এবং একমাত্রক হয়ে ওঠে। তাই রুদ্ধদলের উচ্চারণের তারতম্য অনুসারে কলাবৃত্ত রীতি দুইভাগে বিভক্ত—সরল কলাবৃত্ত ও মিশ্র কলাবৃত্ত, সংক্ষেপে কলাবৃত্ত ও মিশ্রবৃত্ত। সরল কলাবৃত্তে প্রতিটি মুক্তদল এককলা এবং প্রতিটি রুদ্ধদল দুইকলা রূপে পরিগণিত।—

দুঃ খের্‌ বর যায়॥ চক্ষের্‌ । জল্‌ যেই । নাম্‌ল I

ব ক্ষের্‌ । দ র জায়॥ ব ন্ধুর । রথ সেই। থাম ল I

—রবীন্দ্রনাথ, গীতালি—১

[দ্বিমাত্রক রুদ্ধদল = '—']

উদ্ধৃতাংশে স্পষ্টতঃ মুক্তদল এক এবং রুদ্ধদল দুইকলা মাত্রার মর্যাদা পেয়েছে। প্রতি পর্বে আছে চারটি করে কলামাত্রা। শেষের অপূর্ণ পর্কে আছে তিনটি কলামাত্রা। এই রীতির অর্থাৎ কলাবৃত্ত ছন্দের পর্বে সাধারণভাবে চার, পাঁচ, ছয় ও সাত মাত্রা থাকতে পারে। কলাবৃত্তের দ্বিতীয় শাখা মিশ্রবৃত্তে মুক্তদল এবং শব্দের প্রারম্ভিক ও মধ্যবর্তী রুদ্ধদল এক কলামাত্রা কিন্তু শব্দান্তিক রুদ্ধদল দুই কলামাত্রা রূপে গণ্য। রুদ্ধ দলের মিশ্র উচ্চারণের জন্যই এই রীতিকে কলাবৃত্ত থেকে পৃথক করে তার নাম দেওয়া হয়েছে মিশ্রবৃত্ত। এই রীতির একটি দৃষ্টান্ত :—

সেই বহ্নি : বাণী আজি ॥ অচল প্র : স্তর শিখা। রূপে I

শৃঙ্গে শৃঙ্গে | কোন্‌ মন্ত্র ॥ উচ্ছ্বাসিছে | মেঘ ধূম্র : স্তূপে I

—রবীন্দ্রনাথ, উৎসর্গ—২৭

এখানে শব্দান্তিক 'চল্‌' ও 'তর্‌'—রুদ্ধদল দুইটি দ্বিমাত্রক, বাকি রুদ্ধদল ও মুক্তদল একমাত্রক। কারণ তাদের উচ্চারণ সংকুচিত। অবশ্য 'সেই', 'কোন্‌' জাতীয় স্বতন্ত্র রুদ্ধদলও দ্বিমাত্রক। কারণ তাদের উচ্চারণ প্রসারিত। 'বহ্নি : 'বাণী', 'প্র : স্তর' 'ধূম্র : স্তূপে'—এই তিন স্থলে লঘুযতি লুপ্ত হয়েছে এবং তা নির্দেশিত হয়েছে তিনটি বিন্দু (:) চিহ্নের সাহায্যে।

বাংলা ছন্দের আলোচিত তিন রীতিতেই পঙ্‌ক্তিতে একটি, দুইটি, তিনটি অথবা চারটি করে পদ থাকতে পারে। পদের সংখ্যা-অনুসারে পঙ্‌ক্তিগুলি যথাক্রমে একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী এবং চৌপদী নামে অভিহিত হয়। এই অভিধা কেবল বাংলারই নয়, অসমীয়া, ওড়িয়া এবং হিন্দী পঙ্‌ক্তি বন্ধের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বাংলা কবিতায় দ্বিপদীবন্ধের এবং ষট্‌কল পর্বের ব্যবহার বেশি। অসমীয়া, ওড়িয়া এবং হিন্দীতেও তাই। বাংলা ছন্দে ৮ ও ৬ মাত্রার পদভাগের দ্বিপদীকে 'পয়ার এবং ৮ ও ১০ মাত্রার দ্বিপদীকে 'মহাপয়ার' বা 'দীর্ঘপয়ার' বলে। তিন রীতিতেই পয়ার এবং মিশ্রবৃত্ত ও দল-বৃত্তরীতিতে মহাপয়ার রচিত হয়। অমিত্রাক্ষর এবং তার পরবর্তী রূপ মুক্তক অভিনবত্ব এনেছে বাংলা ছন্দোবন্ধের রাজ্যে। এক বা একাধিক প্রকারের কয়েকটি পঙ্‌ক্তির সমবায়ে স্তবক বা কুলক গঠিত হয়, পর্ব, পদ, পঙ্‌ক্তি এবং তাদের ক্রমবিন্যাসে কুলক গঠনে বৈচিত্র্য আসে। স্তবক-রচনা ও তাতে বৈচিত্র্য সম্পাদন-প্রবণতা বর্তমান যুগের কাব্য শিল্পের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। কুলক-রচনায় স্বাতন্ত্র্য সমধিক। কুলকের পঙ্‌ক্তি-সংখ্যা, তার আয়তন, মিলের ক্রম—প্রভৃতি নির্ভর করে ভাব প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা ও কবির অভিরুচির উপর।

ছন্দোবন্ধের একটি উল্লেখযোগ্য উপকরণ হল মিল। যদিও মিল কাব্যালংকারের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। তবে ছন্দের সহযোগী রূপেও তার ব্যবহার্যতা ও প্রভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ধ্বনির আবর্তন ও প্রত্যাশাবোধের প্রতিক্রিয়ায় মিল সহায়ক। কবিতা-পাঠের সময় এই মিলই সর্বপ্রথম শ্রোতার শ্রুতি আকর্ষণ করে। পঙ্‌ক্তি, পদ, পর্ব, ও উপপর্বগত মিল বৈচিত্র্যে কবিতার এক-একটি বিশিষ্ট রূপ ফুটে ওঠে, বেড়ে যায় উপভোগ্যতা। আধুনিক বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া ও হিন্দী কবিতার একটি উল্লেখযোগ্য সম্পদ হল এই মিল বৈচিত্র্য। তা সত্ত্বেও বর্তমানে মিলহীন কবিতার পরিমাণ বেশ উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়ে চলেছে—তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

চর্যাপদেই সর্বপ্রথম বাংলা ছন্দের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়। ক্রমে ক্রমে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফুটে ওঠে অভিনবতা। তবে বাংলা ছন্দ অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি লাভ করে রবীন্দ্রনাথের হাতে। কবিজীবনের নানা স্তরে ছন্দ নিয়ে বিভিন্ন ও বিচিত্র রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে জীবনের শেষ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ নূতন ধরনের গদ্য-ধর্মী কবিতা রচনার বিধি প্রবর্তন করলেন। কবিতার পরিচিতি ঘটল 'গদ্যকবিতা' এবং তার 'ছন্দ' অভিহিত হল 'গদ্যছন্দ'

নামে। ফলে বাংলা কবিতা ও ছন্দের ক্ষেত্র হল আরও ব্যাপক আরও প্রশস্ত। গদ্য কবিতার একটি উদাহরণ :—

তোমাকে পাঠালুম আমার লেখা,
এক-বই-ভরা কবিতা।
তারা সবাই ঘেঁষা-ঘেঁষী করে দেখা দিল
একই সঙ্গে এক খাঁচায়।
কাজেই আর সমস্ত পাবে,
কেবল পাবে না তাদের মাঝখানের ফাঁকগুলোকে।
—রবীন্দ্রনাথ, পুনশ্চ : 'পত্র'।

এ-রচনার ভাষা গদ্যসুলভ অথচ এ-টি কবিতা, যা পরিমিত ছন্দে লেখা নয়, তাই এর নাম গদ্যকবিতা। এর ছন্দ গদ্য-ছন্দ।

অষ্টাদশ শতকের কবি ভারতচন্দ্র রায়ের সময় থেকে কোনো কোনো বাঙালি কবি বাংলায় সংস্কৃত ও বিদেশী ছন্দ প্রয়োগের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বাংলার উচ্চারণ স্বকীয়তার জন্য সংস্কৃত বা অন্য ভাষার ছন্দ ঠিকমতো খাপ খায় না বাংলায়। কবিতা-পাঠ বা আবৃত্তির সময় ছন্দের প্রকৃতি বদলে যায়, ফলে রচনা কৃত্রিম এবং ব্যর্থ প্রতিভাত হয়। গঠন বা আকৃতি অনেকটা মূলের মতো দেখালেও ধ্বনিমাধুর্যে স্বাভাবিকতা আসে না। তাই এই জাতীয় প্রয়াস খুব উৎসাহব্যঞ্জক প্রমাণিত হয়নি। কবিতায় ও ছন্দে নবীনতার পূজারীদের কাছে আকর্ষণীয় হলেও বর্তমানে এই ধরনের প্রচেষ্টা বড়ো একটা দেখা যায় না।

অসমীয়া ছন্দ

ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত অসম ও বাংলা পৃথক দুটি ভাষা ছিল না।[২০] সুতরাং পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরে বাংলা ও অসম ভাষা এবং সাহিত্যে সাদৃশ্য থাকাই স্বাভাবিক। এই দুই ভাষার ছন্দের ক্ষেত্রে সেই সাদৃশ্য আজও অক্ষুণ্ণ, নৈকট্য এবং সমধর্মিতা প্রবল।

বাংলার মতোই অসমীয়া পদ্যছন্দের স্বরূপ-নির্ধারণ, তার মাত্রা নিরূপণের উপর নির্ভরশীল। বাংলার মতোই কলা ও দল-মাত্রার সাহায্যে অসমীয়া ছন্দের

প্রকৃতি নির্ণীত হয়। অর্থাৎ অসমীয়াতেও কলা ও দল উভয় মাত্রার প্রচলন আছে।[২১] বাংলার মতোই পাঁচ রকমের যতি—পঙ্‌ক্তি, পদ, পর্ব, উপ-পর্ব ও দল—জ্ঞাপক পূর্ণ, অর্ধ, লঘু, উপ এবং অণুযতি নামে পরিচিত।[২২]—

প. লা. শর : জুই। মু. মাল : এ. তি্‌য়া ॥ শাল : আ. রু : চ. তি : য়ন I
ব্‌নত : মা. নব। দি. নর : অ. তীত ॥ ব. হা. গর : ধুমু : হার I
কি মান স পোন। সবিগলতার ॥ কোনে রাখে খতি : য়ন I
ক লঙ্‌ কপিলী। দি জুর পারত ॥ ক কা দেউ তার। হাড় I

—নবকান্ত বরুয়া।

এখানে প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিতে ২০ মাত্রা। পঙ্‌ক্তি দুইটি ১২ ও ৮ মাত্রার পদে বিভক্ত। পূর্ণ পর্বে আছে ৬ মাত্রা। পঙ্‌ক্তি শেষে অপূর্ণ পর্বে ২ মাত্রা। পাঁচ প্রকার যতির অবস্থান এবং কাজও সুস্পষ্ট। যতির প্রভাবেই ছন্দের ধ্বনি তরঙ্গিত এবং পঙ্‌ক্তি সুগঠিত হয়েছে। অসমীয়াতেও পঙ্‌ক্তি, (চরণ), পর্ব, উপপর্ব ও অণুপর্ব স্বীকৃত। 'পদ' থাকলেও তার স্পষ্ট স্বীকৃতি নেই। একাবলী, দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদী পঙ্‌ক্তির ব্যবহার ও নামকরণও লক্ষ করার মতো। সুতরাং পদভাগও আছে। এই পদ-পর্ব ও উপপর্বও তো অসমীয়া ছন্দকেও তরঙ্গিত করে তোলে। অতিপর্বের প্রয়োগও খুবই স্বাভাবিক। তা 'পর্ব-প্রান্তিক' নামে অভিহিত। অতিপর্বের দৃষ্টান্ত :—

তুমি মিলনর প্রথমতে লাজুকীর কঁপি উঠা বুক।
তুমি সুন্দরিয়ে সুন্দরত মিলনর তৃপ্তিহীন সুখ ॥

—অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরী : 'তুমি'

এখানে দুই পঙ্‌ক্তির প্রারম্ভেই 'তুমি' অতিপর্ব।

প্রকৃতি অনুযায়ী অসমীয়া ছন্দও বাংলার মতোই ত্রি-ধারায় বিভক্ত। এমন কি ধারা তিনটির নামও বাংলারই অনুসারী, যেমন—মাত্রাবৃত্ত, যৌগিক ও স্বরবৃত্ত।[২৩] নাম তিনটি প্রবোধচন্দ্র সেনের দেওয়া।[২৪] অবশ্য পরবর্তীকালে এই নাম তিনটি বর্জন করে তিনি কলাবৃত্ত, মিশ্রবৃত্ত এবং দলবৃত্ত করেছেন। এই নামগুলিই সার্থক, সুন্দর এবং সর্বজন গ্রাহ্য। সুতরাং বর্তমান আলোচনায় আমরাও এই তিনটি নামই ব্যবহার করব। কলাবৃত্ত, মিশ্রবৃত্ত ও দলবৃত্ত রীতির তিনটি অসমীয়া নিদর্শন।—

কলাবৃত্ত :—

যদি জগত। তোমারে মেলা॥
মোর জীবন। তোমারে খেলা॥
তেন্তে কিয়। লটি ঘটি I
রাত্তিয়েদিনে। ছাটি ফুটি I
—রত্নকান্ত বরকাকতী

পঞ্চকল পর্বিক কলাবৃত্তের ত্রিপদী ও একপদী বন্ধের সমাবেশ ঘটেছে। দুই পঙ্‌ক্তিরই শেষ পর্ব অপূর্ণ, চার মাত্রার।

মিশ্রবৃত্ত :—

রহস্যর। সিপারত॥ হাঁহেনে ব : সন্ত নব॥
ইপারত। শুকায় ফু : লনি I
স্নেহ শ্যাম। মরুস্থান॥ দূরৈত শো : ভিছে কেনি।
ওদরত। তুষার বি : ননি I
—দেবকান্ত বরুয়া

প্রতি পঙ্‌ক্তিতে তিনটি পদ (৮॥ ৮॥ ১০ I)। প্রত্যেক পূর্ণ পর্বে চার মাত্রা, পঙ্‌ক্তি শেষ অপূর্ণ পর্বে দুই মাত্রা। রচনাটি মিশ্রবৃত্ত ত্রিপদী।

দলবৃত্ত :—

নতুন ফুলর। নতুন পাতে॥ কত কালর। স্মৃতি মাতে॥
কত আবেগ। অমুরি I
তোমার প্রাণত। নব যৌবন॥ আহি পালে। কঁ পাই পবন॥
দিলে ইমান। জুমুরি I
—ভিম্বেশ্বর নেওগ

এখানে এটি ত্রিপদী বন্ধ। অর্থাৎ প্রতি পঙ্‌ক্তিতে তিনটি পদ, প্রত্যেক পদে দুইটি করে পর্ব, প্রত্যেক পূর্ণ পর্বে চার দলমাত্রা ও পঙ্‌ক্তি শেষে অপূর্ণ পর্বে তিন দল মাত্রা।

কলাবৃত্তে, মিশ্রবৃত্তে ও দলবৃত্তে—তিন রীতিতেই একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী এবং চৌপদী পঙ্‌ক্তি রচিত হয়। ৮ ও ৬ মাত্রার পয়ার একটি বিশিষ্ট ও অতি প্রাচীন অসমীয়ার ছন্দোরূপ।[২৫] মহাপয়ার বা দীর্ঘ পয়ারও লেখা হয়।

লেখা হয় অমিত্রাক্ষর এবং মুক্তকও। স্তবক বা কুলক গঠনে পর্ব, পদ ও পঙ্‌ক্তির বিবিধ বিন্যাসে বৈচিত্র্য আসে। বাংলার মতোই অসমীয়াতেও বিচিত্র স্তবক রচনার প্রবণতা আধুনিক যুগের দান।

বাংলার মতো অসমীয়া ছন্দেও মিলের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।[২৬] অসমীয়া ছন্দেরও সূচনা চর্যাপদে এবং যথার্থ সমৃদ্ধি আধুনিক যুগে। এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২৭] বাংলার মতোই অসমীয়া ছন্দের ক্ষেত্রও উদার তথা প্রশস্ত হয়ে উঠেছে গদ্য কবিতা ও গদ্য ছন্দের প্রবর্তনের ফলে।[২৮] বলাই বাহুল্য গদ্য কবিতার আগে প্রবহমান এবং মুক্তক বন্ধের প্রসঙ্গও স্মরণীয়। অসমীয়া গদ্য-ছন্দের উদাহরণ :—

> অন্ধ বুড়্হা মানুহ জনে আবেলির আকাশ লৈ
> এটা নীলবরণীয়া চরাই উড়াই দি
> ভঙ্গ ভঙ্গা মাতেরে আমাক কৈ ছিল
> মানুহক কবা তেঁও লোকে পৃথিবীত
> কাহানিও চিনি নে পালে।
>
> —নীলমণি ফুকন : 'বিভিন্ন কবিতা'

গদ্য-ছন্দ হওয়ায় এখানে পদ্য ছন্দের মতো বিভাজন সম্ভব নয়।

অসমীয়া কবিতায় সংস্কৃত ছন্দ প্রয়োগের প্রয়াস দেখা যায়নি। তার প্রধান কারণ সম্ভবত অসমীয়া ভাষার উচ্চারণ-প্রকৃতির বৈপরীত্য-প্রবণতা। অসমীয়া-ভাষার উচ্চারণ অ-সংস্কৃত বৈশিষ্ট্যে কখনও কখনও বাংলার মাত্রাকেও অতিক্রম করে যায়। তাই সংস্কৃত প্রয়োগের প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে দেখে অসমীয়া কবিগণ তাতে অগ্রসর হবার তাগিদ অনুভব করেননি। চতুর্দশ শতকে শংকরদেবের যুগে অসমীয়াতে সংস্কৃত ছন্দ প্রচলনের কিছুটা অসফল প্রয়াস দেখা যায়।[২৯]

ওড়িয়া ছন্দ

ভাষাবিদ্‌দের অনুমান—খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে ওড়িয়া ভাষা বাংলা ভাষাগুচ্ছ থেকে পৃথক হয়ে পড়ে। ক্রমে ক্রমে তার স্বকীয়তা পরিস্ফুট হতে থাকে। ভাষা ও সাহিত্যের বিচারে কিছু কিছু পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠলেও সাদৃশ্যের

ধারাটিও বেশ সহজেই চেনা যায়। ছন্দের দিক থেকেও বাংলার সঙ্গে ওড়িয়ার সাধর্ম্য সুস্পষ্ট। চর্যাপদ ও গীতগোবিন্দের প্রভাব সুদীর্ঘকাল ধরে বাংলা, অসমীয়া এবং ওড়িয়া সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রিত করে এসেছে। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এই তিন ভাষার সাহিত্য প্রধানত গেয় ছিল। পাঠ্য কবিতা এবং তার উপযোগী অভিনব ছন্দ পরবর্তীকালের সম্পদ।

ওড়িয়া ছন্দের সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিহিত ওড়িয়া ভাষার উচ্চারণ-প্রবণতার বিশিষ্টতার মধ্যে। ওড়িয়া স্বরান্ত উচ্চারণ যেমন প্রাচীন ধর্মী তেমনি স্বল্প কম্বল বিশিষ্ট। এক্ষেত্রে বাংলা, অসমীয়া এবং হিন্দী থেকে তার ভিন্নতা সুস্পষ্ট। তা হলেও বাংলা এবং অসমীয়া কবিতার ছন্দের মতোই ওড়িয়া কবিতার ছন্দেরও সুনিরূপিত গাণিতিক পদ্ধতিতে যতিবিভাগ সম্ভব। আবার শিল্প-সুষমারঞ্জিত গদ্যও রচিত হয় ওড়িয়াতে। তবে পদ্য রচনার ছন্দ-সম্পদ আরও সুন্দর, সুমিত ও সুনিয়মিত। যেমন—

ছু. আ. র : তো. র। রু. দ্ধ : ক. রি॥ নি. জ র : র. চি। নি. র্বা: স. ন I
অ. দ্ধ :. কা. রে। দে. উ. ল : ত. লে॥ কা. হা. র : তো. লু। সিং. হা. স. ন I
—কবি অনন্ত ; 'দেবতা নাহি ভুবন বনে'

পঞ্চকল পর্বিক পঙ্‌ক্তি দুইটিতে যথাস্থানে যতিপাত, ধ্বনিসাম্য এবং সুনিরূপিত ও সুনিয়ন্ত্রিত ছন্দস্পন্দ অনুধাবনে অসুবিধা হয় না। বাংলা-অসমীয়ার মতোই পাঁচ-প্রকার ছন্দযতি এবং সুস্পষ্ট ভাবযতিও ওড়িয়াতে আছে। গুরুত্ব ভেদে যতি পাঁচ প্রকারের—পূর্ণ, অর্ধ, লঘু, উপ এবং অণুযতি।[৩০] বিরতিকালের তারতম্য অনুসারে যতিগুলি চিহ্নিত। তবে স্বরান্ত উচ্চারণের ফলে বাংলা ও অসমীয়ার তুলনায় ওড়িয়াতে অণুযতির স্বরূপ বেশ সহজে বোঝা যায়। পূর্ণযতি, অর্ধযতি, লঘুযতি, উপযতি এবং অণুযতি-নির্দিষ্ট কবিতাংশকে যথাক্রমে পঙ্‌ক্তি, পদ, পর্ব, উপপর্ব ও দল বলা হয়। আবার অতিপর্বের সাহায্যে কবিতা পাঠে বৈচিত্র্যও সৃষ্টি করে থাকেন কবিরা। যেমন—

উঠ কঙ্কাল। জাগ কঙ্কাল॥ ছিঁড়ু শৃঙ্খল্। আজি।
উঠ্ঠু হৃত গৌরব। মৃত গৌরব॥ গত গৌরব। রাজি।
—গোদাবরীশ মহাপাত্র : 'উঠ কঙ্কাল'।

দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির প্রারম্ভে 'উঠ্ঠু'—দ্বিমাত্রক অতিপর্ব।

ওড়িয়া ছন্দেরও স্বরূপ নির্ণীত হয় মাত্রার সাহায্যে। মাত্রা নির্ভর করে দলের উচ্চারণের উপর। মুক্ত ও রুদ্ধ দলের সহযোগেই পদ্য ছন্দের উৎস পর্ব গঠিত হয়। বাংলা-অসমীয়ার মতোই ওড়িয়াতেও দীর্ঘ ও হ্রস্বস্বরের উচ্চারণে কোনো তারতম্য থাকে না। সবই হ্রস্ব স্বরের মতো উচ্চারিত হয়। পর্বের আয়তন নিরূপিত হয় কলামাত্রা ও দলমাত্রার সাহায্যে। সাধারণভাবে মুক্তদল এক এবং রুদ্ধদল দুই কলামাত্রা রূপে গ্রাহ্য।

ওড়িয়াতেও কলাবৃত্ত এবং দলবৃত্ত—এই দুই প্রধান ছন্দোরীতি। দলবৃত্তে প্রতি পর্বে চার দলমাত্রা হওয়ার কথা। কিন্তু পাঁচ ও ছয় দলমাত্রাও থাকে ওড়িয়া দলবৃত্তে। আসলে অ-স্বরান্ত উচ্চারণ হলে পাঁচ ও ছয় স্বরান্ত দলের পর্ব চারদলের রূপ নিতে পারে। বাংলা এবং অসমীয়াতে তাই হয়। কিন্তু ওড়িয়াতে সে সুযোগ না থাকায় পাঁচটি বা ছয়টি স্বরান্ত (মুক্ত) দলে পাঁচ বা ছয় দলমাত্রাই থেকে যায়। সাধারণভাবে দল সংখ্যার সমতাই এই রীতির ছন্দের ধ্বনিসুষমা ফুটিয়ে তোলে। একটি দৃষ্টান্ত :—

কন্যা হাতরে। কাচ যোড়িকা॥ রুণু ঝুণু। বাজে।
বোউ বেক রে। সুপ পইতা॥ খণ্ডে দূর কু। সাজে।
—নন্দকিশোর গ্রন্থাবলী-পৃ. ৬৫৩।

দুই ছন্দ পঙ্‌ক্তির প্রথম দুই পর্বে আছে পাঁচ দলমাত্রা করে। তৃতীয় পর্বটি চার দলমাত্রার। অবশ্য দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির তৃতীয় পর্বেও আছে পাঁচ দলমাত্রাই। তবে তা উচ্চারণে চার দলমাত্রার সমান সময় নেয়। এই লৌকিক ছন্দে এরূপ মাত্রা বিন্যাস স্বাভাবিক। তাতে পাঠে বৈচিত্র্য আসে। স্মরণীয় বাংলার বহুল প্রচলিত ছড়াটি—

ছেলে ঘুমোলো। পাড়া জুড়োলো॥ বর্গী এলো। দেশে।
বুলবুলিতে। ধান খেয়েছে॥ খাজনা দেবো। কিসে।

প্রথম পঙ্‌ক্তির প্রথম দুই পর্বে আছে পাঁচ দলমাত্রা করে।

বাংলার মতোই ওড়িয়া কলাবৃত্ত রীতির দুইটি শাখা—সরল কলাবৃত্ত এবং মিশ্র কলাবৃত্ত, সংক্ষেপে কলাবৃত্ত ও মিশ্রবৃত্ত। ওড়িয়া কলাবৃত্তের দৃষ্টান্ত :—

স্বভাব সরল। মধুর তরল॥ প্রবন্ধ ফুল। মালে।
মণ্ডি দেইছি। পণ্ডিত বর॥ জননী রম্য। গলে।
—গৌরীকুমার ব্রহ্মা : ‘হে সাধককুলমণি’।

ষট্‌কল পর্বিক রচনাটিতে মুক্তদল এককলা ও রুদ্ধদল দুইকলা মাত্রা রূপে পরিগণিত। এই রীতির পর্বে চার, পাঁচ, ছয় ও সাত মাত্রা হয়। তবে ছয়মাত্রার পর্বের প্রয়োগই সর্বাধিক। মিশ্র কলাবৃত্ত বা মিশ্রবৃত্ত রীতিতে সাধারণভাবে প্রতি পর্বে চার কলামাত্রা হয়। এই রীতিটি মধ্যযুগে 'দাণ্ডিবৃত্ত' নামে পরিচিত ছিল। বাংলা ও অসমীয়ার মধ্যযুগের সাহিত্যের মুখ্য বাহন মিশ্রবৃত্ত পয়ারের মতো দাণ্ডিবৃত্ত পয়ারই মধ্যযুগের ওড়িয়া সাহিত্যের মুখ্য বাহন। হিন্দীতে এই ছন্দই 'ঘনাক্ষরী' বা 'কবিত্ত' নামে পরিচিত। দাণ্ডিবৃত্ত বা মিশ্রবৃত্তের দৃষ্টান্ত :—

ইচ্ছা মো. হ : অন্তা-এহি ॥ নির্মলা র : জনী I
অসরা মুঁ। খো জু আস্তি ॥ সত্য শুভ। তারে I
এ সুন্দর। জ্যোৎস্নাতলে ॥ বাহি এ ত : রণী I
মৃত্যু যাএ। ন ফেরি সে ॥ মহা অন্ধ : কারে I

—মায়াধর মানসিংহ : 'মহানদীরে জ্যোৎস্না বিহার'

প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিতে আছে চোদ্দ মাত্রা। ৮ ও ৬ মাত্রায় পদভাগে এবং ৪ মাত্রার পূর্ণ পর্বে বিভক্ত। শব্দান্তিক রুদ্ধদল না থাকায় সব রুদ্ধদলই একমাত্রার। একটি প্রাচীন দৃষ্টান্ত দেখা যাক্—

দুই হাত। কু লম্বাই ॥ দেই গোড়ি। দুই I
আই ফল। কষিক সে ॥ গোটি এ ভ : রুই I
গচ্ছর ব : কল মান ॥ নখে উকু : টাই I
টি কি টি কি। করি তাকু ॥ দান্তরেফু : টাই I
বুকু আউঁ। সিন যে কা ॥ চিই পুণি। পুণি I
হুঁ-হুঁ-। গরজই ॥ মণ্ড গোটি। ঝুণি I

—বলরাম দাস : রামায়ণ : সুন্দরাকাণ্ড—

ছন্দোবন্ধের বিচারে এ-টিও পূর্বের দৃষ্টান্তের মতোই মিশ্রবৃত্ত পয়ার। শেষ পঙ্‌ক্তির প্রথম পর্বের 'হু-হু-' মুক্তদল দুইটি প্রসারিত উচ্চারণের ফলে দ্বিমাত্রক হয়েছে এবং পর্বটি চতুর্মাত্রক রূপ পেয়েছে। আরও লক্ষণীয়—'দুই', 'বাই', 'দেই', 'রুই', 'টাই', 'জই'—প্রভৃতি শব্দের দুইটি মুক্তদল এক-একটি রুদ্ধদল (দুই্, বাই্, দেই্, রুই্, টাই্ ও জই্) রূপেও উচ্চারিত হতে পারে। উভয় ক্ষেত্রে মাত্রা-মান অক্ষুণ্ণ থাকে। এ-রীতিতে স্বতন্ত্র রুদ্ধদল অথবা

শব্দান্তিক রুদ্ধদল, প্রসারিত উচ্চারণের ফলে দ্বিমাত্রিক রূপে গণ্য। পঞ্চম পঙ্ক্তির পদযতিটিও লুপ্ত (× চিহ্নে সূচিত)। এই সব বিবেচনায় মিশ্রবৃত্ত বা দাণ্ডিবৃত্তের দৃষ্টান্ত রূপে—উদাহরণটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আজকাল মহাপয়ারও লেখা হয় এই রীতিতে। উচ্চারণে পরিবর্তনের ফলে ওড়িয়া মিশ্রবৃত্তের প্রকৃতিও বদলাচ্ছে।—

আগে থিলা। দেশে গোল॥ স্থান্ বোল : স্তান্।
এ তে বেলে। চিহ্ন নাহি॥ আখুন্ জী আস্ : স্থান্।
ইংরেজ ইং : রেজি বিদ্যা॥ রখি যিবে। নাহিঁ।
তে তে বেলে। রহি যিব॥ জল জল। চাহিঁ।

—ফকীরমোহন সেনাপতি : 'উৎকল ভ্রমণ'

এখানে 'গোলস্থান্' 'আস্' 'বোলস্তান্' 'আখুন্ জী আসস্থান্' 'ইংরেজ্'—এই চারটি অংশে ব্যঞ্জনান্ত 'স্থান্' 'স্তান্' 'খুন্' 'আস্' 'ন্' 'স্থান' এবং 'রেজ্' রুদ্ধদলের অবস্থান এবং উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। 'খুন্' রুদ্ধদল টি শব্দমধ্যস্থ তাই একমাত্রার এবং বাকি চারটি শব্দান্তিক, তাই দ্বিমাত্রিক। এইভাবে প্রত্যেক পঙক্তির পয়ার ধর্মিতা অক্ষুণ্ণ আছে।

অনুরূপ আর একটি দৃষ্টান্ত :—

কবিটা সরল লোক এথি নাহিঁ ভুল,
ক্যারাক্‌টর স্টডী করি অছি যে অতুল।
ঠাএ ঠাএ স্থান দেখি দেউ অছি লিছি
দেব লোক হোই কিএ মর্ত্যে ও হলাইছি।
যাহাকু লেখিছি দেই ফিনিশিং টচ্
সাধ্যকার কহিদেব এথি অছি খচ্॥

—ফকীরমোহন সেনাপতি 'উৎকল ভ্রমণ'

এখানেও 'ক্যারকৃটর' ও 'ফিনিশিং টচ্-এর 'টর্' 'শিং' ও 'টচ্' রুদ্ধদল তিনটি দ্বিমাত্রিক, প্রথম দুইটি শব্দান্তিক শেষেরটি স্বতন্ত্র রুদ্ধদল বলে। আর 'ক্যারকটরের' 'রক্' রুদ্ধদলটি শব্দমধ্যস্থিত, তাই একমাত্রার। এই পয়ার জাতীয় বন্ধকে ওড়িয়ায় বলে 'মঙ্গল'।

ওড়িয়াতে স্তবক রচনা এবং মিল বা 'উপধামেল' বেশ গুরুত্ব লাভ

করেছে।[৩০] এসব ক্ষেত্রে বাংলা ও অসমীয়া কবিতা এবং ছন্দের সঙ্গে ওড়িয়ার সাধর্ম্য সুস্পষ্ট।

ওড়িয়া ছন্দে তিন রীতিতেই একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদী পঙ্‌ক্তি-বন্ধ রচিত হয়। মিশ্রবৃত্তে প্রবহমান এবং মুক্তক বন্ধের প্রয়োগ শুরু হয়েছে সাগ্রহে।

ওড়িয়া ছন্দ নিয়ে বেশি চিন্তা-ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রাচীন যুগে ছন্দোরীতি অর্থাৎ কবিতা পঙ্‌ক্তিতে ধ্বনিবিন্যাস এবং তার উচ্চারণ মাহাত্ম্য গুরুত্ব পেত না। গুরুত্ব পেত রাগরাগিণী বা 'বাণী' এবং তদনুযায়ী নাম-করণ করা হত রচনার আর তাই ছন্দের নাম রূপেও গৃহীত হত। এই প্রবণতা চলে এসেছে প্রায় আধুনিক যুগ পর্যন্ত।

বর্তমানে ওড়িয়া ছন্দের তিন ধারায় মিশ্রবৃত্ত ও কলাবৃত্তে প্রবহমান এবং মুক্তক বন্ধ রচিত হয়। অর্থাৎ এই দুই রীতির বহুল ব্যবহার ও সমৃদ্ধি ঘটলেও দলবৃত্ত বা গাউলিগীতির ছন্দ তেমন স্বীকৃতি পায়নি। তার ব্যবহার না হওয়ারই সামিল। তবে আশা করা যায় ক্রমে ক্রমে এই রীতিও সাধুসাহিত্যে জনপ্রিয়তা লাভ করে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত হবে।

ওড়িয়াতেও গদ্য-ছন্দ ও গদ্য-কবিতার প্রাবল্য দেখা দিয়েছে। তবে স্থায়িত্ব পাবার মতো রচনার পরিমাণ কম। গদ্য-কবিতা নামে বহু নিছক-গদ্যে অ-কবিতাই রচিত হচ্ছে। সুতরাং সব কবিতা, কবিতা নয়, আবার সব কবি, কবি নন। গদ্য-কবিতার একটি দৃষ্টান্ত :—

> অধুনা বিস্তীর্ণ এই বালুচরের-খণ্ড খণ্ড শস্তদ্বীপে
> খেলু থিলা দিনে সাগরর অসংখ্য-অসংখ্য সাধা ঢেউ
> হালুকা পাল তোলি ভাসি যাউথিলা লক্ষ লক্ষ বলাকা-পোত
> এই বালুকা জীর্ণ জঙ্গল ধারে ধারে
> অনেক অনেক ধূসর শতাব্দীর যবনিকা ভেদি।
>
> —শচি রাউত রায়, পাণ্ডুলিপি : 'মৃত বন্দর'

বাক্-পর্বাশ্রিত এই কবিতার সুমিত, সুনিরূপিত পদ্য ছন্দের মতো বিভাজন এবং ছন্দস্পন্দ সম্ভব নয়। কারণ এর ছন্দস্পন্দ অনুভূতিগম্য।

ওড়িয়া ছন্দ কতকটা দ্রাবিড়ীয় ছন্দ প্রভাবিত। তার উচ্চারণ বিশিষ্টতার

ফলে যে স্বকীয়তা প্রবল ও প্রকট, আধুনিক যুগে প্রতিবেশী ও বিদেশী ভাষার সংস্পর্শ এবং তাদের শব্দ গ্রহণের ফলে, তা যেন শিথিল ও সহজ হয়ে আসছে। এখন ওড়িয়াতেও অ-স্বরান্ত এবং খণ্ড-স্বরের উচ্চারণ ক্রমে ক্রমে স্বীকৃতি লাভ করছে। তাই কলাবৃত্ত এবং মিশ্রবৃত্তের পাশা-পাশি দলবৃত্তের (রুদ্ধদলের সংকুচিত উচ্চারণ-আধিক্য সম্বলিত) ব্যবহারও প্রত্যাশিত স্বীকৃতি লাভ করবে— আশা করা যায়। মধ্যযুগে ওড়িয়াতে সংস্কৃত ছন্দ ব্যবহারের প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। আধুনিক যুগেও কেউ কেউ তা অনুসরণের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু উচ্চারণ অসঙ্গতির জন্য সে প্রয়াস আজ পুরোপুরি পরিত্যক্ত হয়েছে।[৩১] তাই আজকাল আর সে প্রবণতা বড়ো একটা আর দেখা যায় না।

হিন্দী ছন্দ

অন্যান্য ভারতীয় ছন্দের মতোই হিন্দী পদ্য-ছন্দের স্বরূপ অনুধাবন করতে হলে তার মাত্রা নিরূপণ আবশ্যক। হিন্দীতেও কলা এবং দলের ব্যবহার হয়। যদিও 'দল' সর্বজন স্বীকৃত নয়, কিন্তু কলা সর্বজন স্বীকৃত। সংস্কৃতের মতোই হ্রস্ব-স্বরান্ত মুক্ত-দলের উচ্চারণ-কাল হিন্দীতেও কলামাত্রা (Unit of measure) রূপে গণ্য। দীর্ঘ স্বরান্ত মুক্তদল ও রুদ্ধদলের উচ্চারণ কাল দ্বিকল। সংস্কৃতের মতোই হিন্দীতে একমাত্রার দল লঘু এবং দুই মাত্রার দল গুরু রূপে বিবেচ্য। যেমন—

> দেখি বাগ অনুরাগ উপজ্জিয়। বোলত কলধ্বনি কোকিল সজ্জিয় ॥
> রাজতি রতি কী সখী সুবেবনি। মনহুঁ বহতি মনমথ—সন্দেহনি ॥
> —কেশবদাস : রাম চন্দ্রিকা—১৩০।

ষোলো মাত্রার চৌপাঈ বন্ধের প্রথম দুই পঙ্‌ক্তিতে যথাক্রমে ১২ ও ১৩টি দল আছে। প্রথম পঙ্‌ক্তির 'দে' 'বা' 'রা'—তিনটি দীর্ঘস্বরান্ত মুক্তদল এবং 'পজ্' একটি রুদ্ধদল দ্বিমাত্রক সুতরাং (২×৪) ৮ মাত্রা এবং ৮টি হ্রস্ব-স্বরান্ত মুক্তদলে ৮ মাত্রা হয়েছে। দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির দুইটি দীর্ঘস্বরান্ত মুক্তদল এবং একটি রুদ্ধদলে ৬ এবং ১০টি মুক্তদলে ১০, মোট ১৬ মাত্রা হয়েছে।

বিভিন্ন ছন্দযতির ব্যবহার হয় হিন্দী ছন্দে। তবে প্রধানতঃ পূর্ণ যতি এবং মধ্যযতি বা অর্ধযতির কথাই উল্লিখিত হয়। মধ্যযতিকে 'অন্তর্যতি'ও বলা হয়। দল, উপ-পর্ব, পর্ব, পদ এবং পঙ্‌ক্তি-অনুসারী অণু, উপ, লঘু, অধ এবং পূর্ণযতিপাত ঘটে হিন্দী কবিতাতেও। পর্ব সাধারণত চার, পাঁচ, ছয়, সাত এবং আট মাত্রার হয়। আট মাত্রার পর্বই মাত্রাবৃত্ত বা হিন্দী কলাবৃত্তে বেশি চোখে পড়ে। সপ্তকল পর্বের একটি দৃষ্টান্ত :—

> বীণ : ভী. হুঁ। মৈঁ. তুম্ : হা.রী॥ রা. গি : নী ভী। হুঁ (২৩ মাত্রা)
> নীদ : থী : মে : রী অচল : নিস্ : প. ন্দ : ক. ণ : ক. ণ। মৈঁ।
> প্রথম জাগৃতি থী জগত কে প্রথম স্পন্দন মেঁ
> প্রলয় মে মেরা পতা পদচিহ্ন জীবন মেঁ,
> শাপ হুঁ জো বন গয়া বরদান বন্ধন মেঁ
> কূল ভী হুঁ কূলহীন প্রবাহিনী ভী হুঁ॥
>
> —মহাদেবী বর্মা, নীরজা—পৃ. ২০

হিন্দী কলাবৃত্ত রীতির ২৩ মাত্রার পঙ্‌ক্তি। যতি এবং লুপ্ত যতির অবস্থান সুস্পষ্ট। অতি পর্বের প্রয়োগও হিন্দীতে চোখে পড়ে। তবে তা নিয়ে কবি বা ছান্দসিকদের বিশেষ চিন্তা-ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। হিন্দী অতিপর্বের উদাহরণ—

> মানিনি ! মান তজো লো রহী তুম্‌হারী বান।
> দানিনি ! আয়া স্বয়ং দ্বারপর ওয়হতব তত্রভবান্ !
>
> —মৈথিলীশরণ গুপ্ত ; যশোধরা, পৃ. ১৪৩।

'মানিনি' ও 'দানিনি' চার চার মাত্রার অতিপর্ব।

আধুনিক হিন্দী ছন্দের চারটি শ্রেণী বা রীতি পরিলক্ষিত হয়। যেমন—**বর্ণবৃত্ত**—নির্দিষ্ট লঘু-গুরু ভিত্তিক—গণাশ্রিত এই ছন্দগুলি সংস্কৃত বর্ণবৃত্তেরই উত্তরাধিকারী। ছন্দের নামও সংস্কৃত-প্রাকৃতানুসারী—ইন্দ্রবজ্রা, বসন্ততিলকা, মালিনী, মন্দাক্রান্তা, ভুজঙ্গপ্রয়াত প্রভৃতি।

মাত্রাবৃত্ত :—এই রীতির ছন্দও সংস্কৃত-প্রাকৃত মাত্রাবৃত্তের উত্তরাধিকারী।[৩২] নামকরণও অনুরূপ যেমন—পাদাকুলক, দোধক, দোহা, রোলা, অরিল্ল, সোরঠা, হাকলি, অহীর, প্লবঙ্গম ও মরহট্টা প্রভৃতি।

সাধারণভাবে সংস্কৃত সাহিত্যে লঘু-গুরু ভিত্তিক বর্ণবৃত্তেরই প্রাধান্য।

তবে অর্বাচীন সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে মাত্রাবৃত্তের উত্তরোত্তর প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেখা যায়। মাত্রাবৃত্তের এই ক্রমবর্ধমান গতি হিন্দী সাহিত্যেও অক্ষুন্ন থাকে। নতুন নতুন বন্ধ বা আকৃতি নতুন নতুন নামে দেখা দিতে থাকে। তাই হিন্দীতে এমন কিছু মাত্রাবৃত্ত বা কলাবৃত্তের রূপ পাওয়া যায় প্রাকৃত-অপভ্রংশে যা ছিল না। যেমন—বীর (আল্‌হা), পীযূষবর্ষী, দিক্‌পাল, সরসী প্রভৃতি।

'কবিত্ত', ঘনাক্ষরী বা মিশ্রবৃত্ত :—কবিত্ত শব্দটি প্রত্যাশিত অর্থদ্যোতক নয়। অর্থাৎ এ-নামে ছন্দোরীতির পরিচয় মেলে না। তবে ঘনাক্ষরী অর্থদ্যোতক এবং এইজাতীয় সমস্ত ছন্দের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।[৩৩] সঙ্গতিপূর্ণ মিশ্রবৃত্ত রীতির সঙ্গেও। কারণ অক্ষরের ঘনতা বা সংকোচনের প্রকৃতিই হল এ-রীতির ভিত্তি এবং বিশিষ্টতা হল—লঘু-গুরু বা দীর্ঘ-হ্রস্ব-উচ্চারণ-ভেদ-হীনতা। তবে ঘনাক্ষরী বলা হলেও ছন্দটি কিন্তু অক্ষর সংখ্যাত নয়, মাত্রা-আশ্রিত, যেমন অক্ষর সংখ্যাত নয় বাংলার মিশ্রবৃত্ত।—

এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গল ময়
দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়।
—রবীন্দ্রনাথ : নৈবেদ্য—৪৮

স্বরান্ত ও অ-স্বরান্ত ধ্বনিকে সমান মর্যাদা দিয়ে এক-একটি বর্ণ বা অক্ষর বলে গণ্য করলে প্রতি পঙ্‌ক্তিতে চৌদ্দ অক্ষর পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু স্বরান্ত ও অ-স্বরান্ত ধ্বনিকে সম মর্যাদা দান এক্ষেত্রে সমীচীন নয়। সংস্কৃত-প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রেও তা করা হয় না। উল্লিখিত দৃষ্টান্তের প্রথম পঙ্‌ক্তির শ্‌, ল্‌, য়্‌ এবং দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির র্‌, এবং য়্‌ ধ্বনি কয়েকটির উচ্চারণ অ-স্বরান্ত। সুতরাং প্রতি পঙ্‌ক্তিতে চৌদ্দ অক্ষর গণনা করলে অ-স্বরান্ত ধ্বনি কয়েকটিকেও 'অক্ষর' বলে মানতে হয়। যা অযৌক্তিক। আর সব ধ্বনিকে অক্ষর না ধরেও মাত্রা-সাম্য বিঘ্নিত হয় না। অর্থাৎ চৌদ্দ অক্ষর না থাকলেও চৌদ্দ মাত্রা পেতে অসুবিধা নেই কোনো পঙ্‌ক্তিতেই। তাই অক্ষরবৃত্ত বলার কোনো সার্থকতা নেই। একই কারণে হিন্দীর ঘনাক্ষরী বর্গের ছন্দকেও 'বর্ণবৃত্ত' বা অক্ষরবৃত্ত নামে অভিহিত না করাই বিধেয়। সুরদাসের একটি ঘনাক্ষরী পদের অংশবিশেষ দেখা যাক্।—

মাই কৃষ্ণ-নাম জব, তৈ শ্রবন সু স্যৌ হৈ রী
তব তৈঁ ভূলী রী ভৌন বাওয়রী সী ভঈ রী।

—সূরসাগর, ১০ম স্কন্ধ, পদ—১৮৯৬।

১৬+১৫=৩১ মাত্রার পঙ্‌ক্তিতে অক্ষর গুণে মাত্রা পাওয়া যাবে না। এখানে যে-সব অ-স্বরান্ত ধ্বনি আছে, সেগুলিকে অক্ষর রূপে গণ্য করা যায় না। আসলে এই ঘনাক্ষরী নামান্তরে বাংলার মিশ্রবৃত্ত ছন্দই।

পক্ষান্তরে বাংলা মিশ্রবৃত্তকে ঘনাক্ষরী' বলা যেতে পারে। কারণ এ-রীতির অন্যতম প্রধান বিশেষত্বই হল শব্দের অ-প্রান্তস্থিত রুদ্ধদল-ধ্বনির ঘনীভবন অর্থাৎ সংকুচিত উচ্চারণ ও এককলামাত্রা রূপে গ্রহণ। রীতিটির এই ঘনীভবনকেই রবীন্দ্রনাথ 'ছন্দের শোষণশক্তি' বা 'ভারবহনশক্তি' বলেছেন।[৩৪] এই গাঢ়তা ও গাম্ভীর্য এই ছন্দের একটি বিশেষ গুণ। বাংলায় মধুসূদন দত্ত ও রবীন্দ্রনাথ এই বিশিষ্টতার পূর্ণ সদ্‌ব্যবহার করেছেন বলা যায়। হিন্দীতে মধ্যযুগের কাব্যে সুরদাস ও তুলসীদাস প্রমুখ কবি ঘনাক্ষরীর ব্যবহার করলেও তার বিবিধ ও বিচিত্র ব্যবহার দেখা গেছে আধুনিক যুগে সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী 'নিরালার' রচনায়। স্মরণ করা চলে মধ্যযুগের অসমীয়া কাব্যে মাধবদেব, শংকরদেব এবং ওড়িয়া কাব্যে সারলা দাস ও বলরাম দাস প্রমুখ এই রীতির সার্থক ব্যবহার করেন। কিন্তু ওই দুই ভাষার কাব্যেও ছন্দোরীতিটি নানা রূপে বিচিত্র হয়ে উঠেছে আধুনিক যুগেই। ওড়িয়া ছন্দে রীতিটি 'দাণ্ডিবৃত্ত' নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু নামটির অর্থদ্যোতনা না থাকায় তা অধুনা পরিত্যক্ত বলা যায়। সুতরাং তাকেও 'ঘনাক্ষরী' বা মিশ্রবৃত্ত বলা যেতে পারে।

লৌকিক রীতি—লৌকিক রীতি হিন্দী সাধুসাহিত্যের আসরে স্থান পায়নি। লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখাই তার বিচরণ ক্ষেত্র। তাই তার নাম লৌকিক ছন্দ। হিন্দীতে ছন্দ-শাস্ত্রিগণ তার প্রতি দৃষ্টিপাত করেননি। এ-ছন্দের ভিত্তি হল 'তাল'। এই তাল বিভাগের সূচনা প্রাকৃত-অপভ্রংশ যুগে। হিন্দীতে এসে তা আরও সুপরিস্ফুট। গ্রাম্য ছড়া, মেয়েলি গীত এবং লোকসাহিত্যের অন্যান্য আসরে যে-সব ছন্দ-শাস্ত্রের বিধিবহির্ভূত ছন্দের প্রয়োগ ঘটে থাকে তা-সবই লৌকিক ছন্দের পর্যায়ভুক্ত। লোকসাহিত্যের রচয়িতাগণ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁদের রচনায় যে মাধুরী ও ধ্বনি বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তুলতে লাগলেন—কালক্রমে তাই তাল-পর্বভিত্তিক লৌকিক রীতির রূপ নেয়।

ঘনাক্ষরী এমন কি কলাবৃত্ত রীতির ছন্দেও অল্পাধিক তালপ্রবণতা লক্ষিত হয়। চারমাত্রার পর্বভাগেই তা স্পষ্ট।[৩৫] লৌকিক রীতির প্রভাবের ফল এই তাল-ভিত্তিক পর্বভাগ। এই তালভিত্তিক বিভাগ বাংলার মতোই হিন্দী ছন্দেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। চার দলমাত্রা অথবা ছয় বা আট কলামাত্রার পর্বের প্রারম্ভে প্রস্বর পড়া স্বাভাবিক। যদিও তা সব সময় বোঝা যায় না (দীর্ঘস্বরের দীর্ঘ উচ্চারণে তা ঢাকা পড়ে যায়)। দীর্ঘ স্বরের দীর্ঘতা খর্ব হলে ঝোঁক বা প্রস্বর বোঝা যায়। আরও লক্ষণীয় হল—সাধুসাহিত্যে অস্বীকৃতি এবং অশিক্ষিত জনের রচনা বলে তাতে দলমাত্রা বা কলামাত্রার সুস্থির রূপ পাওয়া যায় না। দলবৃত্তের পর্বে দলের সংখ্যা চারের কম বা বেশিও হতে পারে। কম হলে প্রসারিত উচ্চারণও বেশি বলে সংকুচিত উচ্চারণের সাহায্যে ধ্বনিসাম্য রক্ষিত হয়।[৩৬] হিন্দী লোকসাহিত্যে লৌকিক ছন্দ প্রয়োগের ক্ষেত্র দ্বিবিধ—লোকগীত বা গানধর্মী রচনা এবং ছড়া বা আবৃত্তিধর্মী রচনা। গানধর্মী রচনায় ছন্দোগত মাত্রার অভাবপূর্তি ঘটে সুরের সাহায্যে, আর ছড়া-জাতীয় রচনায় মাত্রাহানি বা মাত্রাবৃদ্ধির অসাম্য দূর হয়—উচ্চারণের প্রসারণ বা সংকোচনের সাহায্যে। হিন্দী লৌকিক ছন্দের 'অকৃত বেশ' 'ভাঙাচোরা' রূপ :—

অনর মনর। পুঅ পাকেলা
চিল্লর খোঁইছা। নাচেলা
চিল্লর গইলেঁ। খেত খরি হান্
লে অইলেঁ তি : নিয়া ধান।
ওহী ধানকে। 'চিউরা কুটোলেঁ
বাভন বিস্নুন্। 'সবকে খি ঔলেঁ।
বভনা বিস্না। দৈলেঁ অসীস
'জীঅ চিল্লর।' লাখ বরীস্।

—সংগৃহীত

পর্বভাগ স্পষ্ট হলেও সবগুলি সমান নয়। তবে আবৃত্তির সময় আর অসাম্য বোঝা যায় না। 'চিউরা কুটোলেঁ' এবং 'সব্‌কে খিওলেঁ'-তে পাঁচটি করে দল আছে। সুতরাং পর্ব দুইটির উচ্চারণ অতি দ্রুত হবে। এর সঙ্গে তুলনীয় পূর্বে উদ্ধৃত-বাংলা ছড়া-'ছেলে ঘুমোলো পাড়া জুড়োলো'-ইত্যাদি। হিন্দী ছড়াটিতে 'নাচেলা' এবং 'লাখবরীস্ পর্বদুইটিতে যথাক্রমে তিনটি মুক্তদল এবং রুদ্ধ-মুক্ত-রুদ্ধ মিলে তিনটি দল আছে। বলাই বাহুল্য 'লা'

'লাখ্' প্রসারিত উচ্চারণ করে মাত্রা সাম্য আনা হয়। আবার 'পা-কে', 'না-চে' ও 'লাখ'-প্রভৃতির দীর্ঘস্বর হ্রস্ব উচ্চারিত। সাধু হিন্দী সাহিত্যে এ-রূপ ঘটে না। হিন্দী লোকসাহিত্যে কলাবৃত্ত রীতিতেই বেশি ছড়া লেখা হয়। সাধুসাহিত্যে না থাকলেও তুলসীদাস, ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র, জয়শংকর প্রসাদ, সূর্যকান্ত ত্রিপাঠি 'নিরালা' এবং মহাদেবী বর্মা প্রমুখ—তাঁদের গানে ও কবিতায় লৌকিক সুর এবং লৌকিক ছন্দ মাঝে মাঝে ব্যবহার করছেন।

আধুনিক হিন্দী কাব্যে প্রবহমান এবং মুক্তক ছন্দেরও সহজ ব্যবহার চোখে পড়ে। তবে মিশ্রবৃত্তের তুলনায় কলাবৃত্তের প্রয়োগই বেশি। ভাবপ্রধান গদ্যের কবিতা অর্থাৎ গদ্য-ছন্দে গদ্যকবিতাও লেখা হচ্ছে। বিংশ শতকের পঞ্চম দশকে হিন্দী গদ্য-কবিতার সূচনা। নিরালার রচনা থেকে হিন্দী গদ্যকবিতার দৃষ্টান্ত :—

পর্বতোঁ কে উঁচে কঈ শৃঙ্গ এক সাথ হৈঁ,
হিমাচ্ছিত ; 'কৈলা' হৈ সবসে বিশাল কায় !
সবসে উঁচা উঠা, অতি শোভন মনোরম।
পর্বতোঁ কী শ্রেণী য়হ ঔরোঁ সে ভিন্ন হৈ।
জিতনে উঁচে হৈঁ য়ে, উতনে মোটে নহী।...

—নয়েপত্তে : 'কৈলাশ মেঁ শরৎ'

হিন্দী বাক্‌পর্ব অনুযায়ী পাঠ করলেই-এই গদ্য কবিতাটির বিশিষ্টতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

হিন্দী কবিগণ বিভিন্ন আয়তন এবং বিচিত্র আকৃতির স্তবক রচনায় বিশিষ্টতা দেখিয়েছেন। ধ্বনিসাম্যে ছন্দের আকর্ষণ বাড়ে। তাই তার রচনাতেও কবিরা, আকর্ষণ বোধ করেছেন। প্রাচীন মধ্যযুগের হিন্দী কবিতায় মিলের বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য ছিল। তবে আজকাল অমিল বা অতুকান্ত রচনার দিকেই প্রবণতা বেশি। তা সত্ত্বেও ছন্দোমাধুরী ও ছন্দ-সংযমের খাতিরে মিলের গুরুত্ব থাকবে চিরকাল। হিন্দী কবিতায় সাধারণভাবে দ্বিদল-ত্রিদল মিল বা 'তুক' রচিত হয়।

আধুনিক যুগে হিন্দী কবিতায় বাংলা, ইংরেজি এবং উর্দু প্রভৃতি ছন্দ ব্যবহারের প্রয়াস লক্ষিত হয়। তবে ওইসব ভাষার উচ্চারণ থেকে হিন্দীর উচ্চারণ অল্পাধিক ভিন্ন হওয়ায়—প্রয়াস পুরোপুরি সার্থক হয়নি। কিছু বৈচিত্র্য

এসেছে—এই যা। মনে হয়—বাংলার ত্রিপদী-পয়ারবন্ধ, ইংরেজী সনেট এবং অষ্টক ও ষট্‌ক-স্তবক, উর্দুর গজল-রুবাঈ প্রভৃতি হিন্দীতে ক্রমে ক্রমে মানিয়ে যাবে। সংস্কৃত-প্রাকৃত-ছন্দ উচ্চারণ, মাত্রা গণনা এবং ছন্দোবন্ধের নামের মাধ্যমে এখনও হিন্দী ছন্দকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। আরবি-ফারসি এবং ইংরেজি ছন্দোবন্ধের আদলে নতুন নতুন বন্ধের প্রয়োগ চলছে হিন্দী কবিতায়। মধ্যযুগের হিন্দী ছন্দ সংস্কৃত-প্রাকৃত ছন্দোরীতি ও ছন্দোবন্ধের প্রয়োগে যেমন সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল, পরবর্তীকালে তেমনটি আর দেখা গেল না।[৩৭] তবে প্রাচীনতার পথ থেকে হিন্দী ছন্দ কিছুটা সরে এসেছে, প্রাদেশিক ও বিদেশী ছন্দের, ব্যবহারে তা বৈচিত্র্যমণ্ডিত ও সম্ভাবনাপূর্ণ হয়ে উঠেছে—তাতে সন্দেহ নেই। বাংলা, অসমীয়া এবং ওড়িয়া ছন্দের মতো হিন্দী ছন্দও অভিনবত্বের পূজারী হয়ে উঠেছে—এটাই আশা ও আনন্দের কথা।

বাংলা-অসমীয়া-ওড়িয়া ও হিন্দী ছন্দের তুলনা

এই অধ্যায়ের কোনো কোনো অংশে বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া এবং হিন্দী ছন্দের মধ্যে পারস্পরিক মিল ও অমিল বিষয়ে ইঙ্গিতবহ মন্তব্য করা হয়েছে। এ-স্থলে সেই বিষয়ে আরও কিছু কথা বলা প্রয়োজন।

পদ্য পাঠের স্বাভাবিক উচ্চারণ অনুযায়ী মাত্রা নিরূপণের উপরেই ছন্দের প্রকৃতি বা স্বরূপ নির্ভর করে।[৩৮] বাংলা, অসমীয়া এবং ওড়িয়া ছন্দের মাত্রা দুই প্রকারের—কলামাত্রা ও দলমাত্রা। হিন্দী ছন্দের মাত্রাও অনুরূপ, তবে বর্ণমাত্রার প্রচলনও আছে হিন্দী ছন্দে। আর দলমাত্রা সূচনা ঘটেছে আধুনিক যুগে। চার ভাষার ছন্দেই কলামাত্রা মূলত একই। পার্থক্যের মধ্যে বাংলা, অসমীয়া এবং ওড়িয়াতে সাধারণভাবে দীর্ঘস্বরের দীর্ঘ বা প্রসারিত উচ্চারণ না-থাকায় তা একমাত্রিক, কিন্তু হিন্দীতে দীর্ঘ-স্বরের উচ্চারণ দীর্ঘ হয়, তাই তা দ্বিমাত্রিক। কৃত্রিম এবং অবৈজ্ঞানিক হলেও বর্ণমাত্রার প্রচলন দীর্ঘদিন ধরে বঙ্গভাষাগোষ্ঠীতেও ছিল, এখন নেই। দলমাত্রা হিন্দীতে না থাকলেও লৌকিক ছন্দের সাধু সাহিত্যে স্বীকৃতি ঘটলে তার সম্ভাবনার কথা অস্বীকার করা যায় না। ওড়িয়া ছন্দের ক্ষেত্রেও সে কথা প্রযোজ্য। মাত্রার বিচারে চার ভাষার ছন্দে বিশেষ প্রভেদ নেই বললেই হয়।

রীতিভেদে বঙ্গভাষাগোষ্ঠীর ছন্দ প্রধানত দুই প্রকারের—কলাবৃত্ত ও দলবৃত্ত। কলাবৃত্ত আবার দুই ভাগে বিভক্ত—সরল কলাবৃত্ত এবং মিশ্র কলাবৃত্ত। সাধারণভাবে বলা যায়—সরল কলাবৃত্ত, মিশ্র কলাবৃত্ত ও দলবৃত্ত অথবা কলাবৃত্ত, মিশ্রবৃত্ত ও দলবৃত্ত—এই তিন রীতিই স্বীকার্য।[৩৯] রীতিভেদে হিন্দী ছন্দ চার প্রকারের—বর্ণবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত (কলাবৃত্ত), ঘনাক্ষরী (মিশ্রবৃত্ত) এবং লৌকিক (দলবৃত্ত)। এ-গুলি নিয়ে আরও একটু আলোচনা করা যেতে পারে। আলোচিত বিষয়ের আলোচনায় কতকটা পুনরাবৃত্তি ঘটলেও তাতে সুস্পষ্ট ধারণা গঠনে সহায়তা হবে।

বর্ণবৃত্ত :—এই সংস্কৃত ছন্দোরীতিটি প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষায় এসেছে। তবে বঙ্গভাষাগোষ্ঠীর কাব্যে বর্ণবৃত্ত প্রয়োগের প্রয়াস সফল হয়নি। প্রাচীন বাংলা, অসমীয়া এবং ওড়িয়াতে বর্ণবৃত্ত সহজস্বীকৃতি পায়নি। এখনও নেই। তবে হিন্দী-সাহিত্যে বর্ণবৃত্ত একটি পুরাগত ছন্দোরীতি। প্রাচীন ও মধ্যযুগে এই রীতিতে প্রচুর কবিতা লেখা হয়েছে। লক্ষণীয় হল ভাষার স্বাভাবিক প্রবণতার ফলে উচ্চারণে যতই বদল ঘটছে বর্ণবৃত্তের আকর্ষণ ততই কমে যাচ্ছে। বর্তমানে তার প্রয়োগ খুবই কম। ভবিষ্যতে ভাষা স্বাভাবিক নয় প্রতিষ্ঠিত হলে বর্ণবৃত্তের বিলুপ্তি ঘটা আশ্চর্য নয়।

কলাবৃত্ত :—বাংলা অসমীয়া এবং ওড়িয়া সাহিত্যের প্রারম্ভিক কাল থেকে প্রত্নকলার ব্যবহার হয়ে আসছে। চর্যাপদই তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আধুনিক কালে নব্যকলাবৃত্তের প্রবর্তন ঘটেছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এবং ব্রজবুলি ভাষার বৈষ্ণবপদাবলীতে, অসমীয়ার শংকরদেবের রচনায় এবং মধ্যযুগের ওড়িয়া কাব্যে মাঝে মাঝে যে কলাবৃত্তের নিদর্শন পাওয়া যায় তাতে সংস্কৃত-প্রাকৃত কলাবৃত্তের (মাত্রাবৃত্তের) প্রভাব সহজেই অনুভবগম্য। দীর্ঘস্বরের দীর্ঘতা রক্ষার প্রয়াস প্রায় অক্ষুণ্ণ বলা চলে। আবার এই বিধান অমান্য করার প্রবণতাও দেখা যায়। এই প্রবণতার সূচনা প্রাচীন যুগেই। আধুনিক যুগে তিন ভাষাতেই দীর্ঘস্বরের দীর্ঘতা অস্বীকৃত হয়েছে। তাই প্রাচীন রূপটিকে প্রত্নকলাবৃত্ত এবং আধুনিক রূপকে নব্য কলাবৃত্ত বা কলাবৃত্ত বলা হয়। প্রত্নকলাবৃত্তের ঐতিহাসিক গুরুত্ব থাকলেও তাতে বাংলা, অসমীয়া এবং ওড়িয়া ছন্দের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ফুটে উঠতে পারে না। তাই ধীরে ধীরে এই রীতির ব্যবহার কমে আসছিল। অবশেষে রবীন্দ্রনাথ মুক্তদলকে এক কলা এবং রুদ্ধদলকে দুই কলামাত্রার মর্যাদা দিয়ে নব্যকলাবৃত্তের ধ্বনিসম্পদের সন্ধান দিলেন। বাংলা ছন্দের এই অভূতপূর্ব

উৎকর্ষের ঢেউ অসমীয়া এবং ওড়িয়া ছন্দ রাজ্যেও স্বাভাবিক তরঙ্গ তুলে তাদের সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যায়।

হিন্দী কলাবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দ প্রাকৃত মাত্রাবৃত্ত সঞ্জাত। ছন্দটি হিন্দীর অনুকূল হওয়ায় হিন্দী কবিতায় এরই প্রাধান্য। প্রাচীন কলাবৃত্তের বিধিসম্মত প্রয়োগ করার সঙ্গে সঙ্গে কবিরা নানাপ্রকার অভিনব প্রয়োগও করেছেন এই রীতির। প্রাচীন ও নবীন প্রয়োগবৈচিত্র্যের ফলে সুসমৃদ্ধ হিন্দী কলাবৃত্ত ছন্দ প্রয়োগ ও সৌন্দর্য মাহাত্ম্যে অপরাপর ভারতীয় ভাষার কলাবৃত্ত ছন্দকে অতিক্রম করে গেছে। তার প্রধান কারণ একমাত্র কলাবৃত্ত ছাড়া প্রয়োগ ও উৎকর্ষ বিধানের যোগ্য হিন্দীর অনুকূল অন্য ছন্দোরীতি নেই।

মিশ্রবৃত্ত :—বাংলায় যা মিশ্রবৃত্ত, অসমীয়ায় যৌগিক এবং ওড়িয়ায় দাণ্ডিবৃত্ত হিন্দীতে তাই ঘনাক্ষরী ছন্দোরীতি নামে পরিচিত। বাংলা, অসমীয়া এবং ওড়িয়ার প্রারম্ভিক যুগে প্রাকৃত সঞ্জাত কলাবৃত্তের প্রচলন ছিল। এই প্রাচীন বা প্রত্নকলাবৃত্ত ও লৌকিক বৃত্তের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে মিশ্রবৃত্ত বর্গীয় ছন্দের উদ্ভব ঘটে। সুতরাং মিশ্রবৃত্ত বঙ্গভাষা গুচ্ছের নিজস্ব ছন্দ; নামে পার্থক্য আছে, এই যা। মধ্যযুগের অসমীয়া এবং ওড়িয়া সাহিত্য প্রায় সামগ্রিকভাবেই এই রীতির পয়ার, ত্রিপদী ও চৌপদী বন্ধে রচিত। বাংলায় মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ, অসমীয়ায় ভোলানাথ দাস ও দেবকান্ত বড়ুয়া, ওড়িয়ায় রাধানাথ রায়, মধুসূদন রাও এবং শচি রাউত রায়ের প্রয়োগে এই ছন্দোরীতির বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি ভাস্বর হয়ে ওঠে। এই তিন ভাষার ছন্দের বৈচিত্র্য এবং ধ্বনিসুষমার উল্লেখযোগ্য অংশ বহুল পরিমাণে এই মিশ্রবৃত্ত রীতির শক্তি-সামর্থ্য ও সৌন্দর্যের উপর নির্ভরশীল।

হিন্দী মিশ্রকলাবৃত্ত বা ঘনাক্ষরীও হিন্দীর নিজস্ব। হিন্দী ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণ-প্রবণতার ফলেই এর সৃষ্টি। ছন্দটির প্রকৃতি স্বাধীন এবং গতি পরিপূর্ণতার দিকে। তবে বাংলা, অসমীয়া এবং ওড়িয়াতে যেমন মিশ্রবৃত্তের ব্যাপক এবং বিচিত্র প্রয়োগ দেখা যায়, হিন্দীতে ঘনাক্ষরীর সেরূপ প্রয়োগ ঘটেনি। ঘনাক্ষরীর শক্তি-সামর্থ্য ও উপযোগিতার ব্যাপারে হিন্দী কবি ও ছান্দোসিকগণ সকলে সমান আস্থাশীল নন। এই ছন্দোরীতি নিয়ে নানাপ্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষার অবকাশ রয়েছে। হিন্দীর এই স্বাভাবিক ছন্দটির সম্পর্কে কবি সূর্যকান্ত ত্রিপাঠীর অভিমত বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।[৪০] তাঁর বিচারে হিন্দী মিশ্রবৃত্ত বা ঘনাক্ষরীর ভবিষ্যৎ খুবই আশাপ্রদ। তবে তার সমুচিত চর্চা এবং প্রয়োগ

চাই।

দলবৃত্তরীতিঃ—কোনো ভাষার প্রাচীন এবং স্বাভাবিক ছন্দের কথা বললেই তার লৌকিক ছন্দের কথা বুঝতে হয়। যদিও তার প্রাচীন লিখিত রূপ পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ তার সৃজন ছিল মানুষের মুখে মুখে। রক্ষা পেয়েছে ওই ভাবেই। কৃত্রিম ও বহিরাগত ছন্দকে প্রভাবিত-পরিবর্তিত এবং অভিনব করেছে তা অলিখিত এবং অলক্ষিত থেকেই। তার ফলে উদ্ভূত হয়েছে নতুন নতুন ছন্দ।

বাংলাভাষার আদিকাল থেকেই লোকসাহিত্যে লৌকিক বা দলবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার ছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে দলবৃত্তের আভাস মেলে। মধ্যযুগের লোচন দাসের ধামালি রচনায় এই ছন্দের প্রয়োগ ঘটেছে। রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীতেও দলবৃত্তের সহজ ও স্বাভাবিক রচনার নিদর্শন মেলে। তবে গুরু-গম্ভীরভাবের বাহন রূপে উচ্চস্তরের কাব্যে এ-ছন্দের প্রথম সার্থক প্রয়োগ করেন রবীন্দ্রনাথ। বর্তমানে এ-টি বাংলাসাহিত্যের একটি শক্তি ও সৌন্দর্যমণ্ডিত বিশিষ্ট ছন্দোরীতি। দলবৃত্ত সুপ্রতিষ্ঠিত অসমীয়া সাহিতেও। প্রাচীনকালের কোনো অসমীয়া রচনায় ছন্দটির লিখিত রূপ পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় বিংশ শতকেই। তবে ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে দলবৃত্তের আভাসযুক্ত কলাবৃত্তের রচনা পাওয়া যায়। যাই হোক সাধু সাহিত্যে দলবৃত্তের প্রয়োগের প্রেরণা আধুনিক অসমীয়া কবিরা রবীন্দ্রনাথের দলবৃত্ত-রচনার বিচিত্র শোভা ও সম্পদ থেকে লাভ করেন। ওড়িয়া কবিতায় লৌকিক ছন্দ ঢগ-ঢমালি বা 'গাঁউলি গীত' ছন্দ নামে পরিচিত। এ ছন্দের রূপ অনেকটা দাণ্ডিবৃত্তের মতো। অসমীয়ার মতো ছয় দলমাত্রার পর্বও পাওয়া যায় ওড়িয়া লোকগীতিতে।[৪১] এ-রীতির রচনা মধ্যযুগের পঞ্চ-সখা সাহিত্য, 'জনান' ও 'ভজন' প্রভৃতিতে পাওয়া যায়।[৪২] তবে সাধারণভাবে চতুর্দল মাত্রিক পর্বের স্থলে পঞ্চদল অথবা ষট্‌দল পর্বিক রচনাই ওড়িয়াতে বেশি। এই লৌকিক বা দলবৃত্ত ছন্দটি বাংলা ও অসমীয়াতে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু ওড়িয়াতে সেরূপ নয়। বলতে কি ওড়িয়া সাধু সাহিত্যে এই লৌকিক ছন্দটির যথার্থ স্বীকৃতি নেই।

ওড়িয়ার মতো হিন্দীতেও সাধু সাহিত্যে লৌকিক ছন্দের স্বীকৃতি নেই বলা চলে। নিরালা প্রমুখ আধুনিক কবিদের রচনায় লৌকিক ছন্দ ও লৌকিক সুরের অল্প-স্বল্প নিদর্শন পাওয়া যায়। বাংলায় মিশ্রবৃত্ত রীতির উদ্ভব ও সমৃদ্ধির প্রধান সহায় বাংলা লৌকিক ছন্দ। অসমীয়াতেও তাই। কিন্তু ওড়িয়া আর

হিন্দীতেও যথাক্রমে দাণ্ডিবৃত্ত ও ঘনাক্ষরীর যে প্রত্যাশিত উৎকর্ষলাভ এবং ব্যাপক প্রয়োগ সম্ভব হয়নি, তার একটি প্রধান কারণ সাহিত্যে লৌকিক ছন্দের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতির অভাব। দলবৃত্তের স্বীকৃতি এবং ব্যবহার ঘটলে দাণ্ডি-বৃত্ত এবং ঘনাক্ষরীরও যথার্থ সমৃদ্ধি ও মর্যাদা লাভ করবে। তাদের শক্তি ও সৌন্দর্য অনুধাবন সম্ভব হবে। ওড়িয়া এবং হিন্দী ছন্দ ও কবিতার ক্ষেত্র আরও প্রসার লাভ করবে। কবিগণ ছন্দের ক্ষেত্রে অবাধ সঞ্চরণের সুযোগ পাবেন এবং বিবিধ ও বিচিত্র সম্পদে ছন্দকে সমৃদ্ধ ও গৌরবান্বিত করে তুলতে পারবেন।

বাংলা, অসমীয়া এবং ওড়িয়াতে বিরামের গুরুত্ব অনুসারে ছন্দযতি পাঁচ প্রকার—পূর্ণযতি, অর্ধযতি, লঘুযতি, উপযতি এবং অণুযতি। এই যতিগুলির সাহায্যেই কবিতার পাঠ, আবৃত্তি তথা অর্থদ্যোতনা সুস্পষ্ট ও শ্রুতিমধুর হয়।

হিন্দী ছন্দে পূর্ণযতির সুস্পষ্ট স্বীকৃতি থাকলেও অন্যান্য যতি বিষয়ে কবি, ছান্দসিক এবং পাঠক মহলে তেমন আগ্রহ দেখা যায় না। অন্তর্যতি নামেই তাঁরা অন্য যতিগুলির উল্লেখ করে ক্ষান্ত থাকেন। তবে কবিতা-পাঠ বা আবৃত্তির সময় যতিগুলির অস্তিত্ব এবং কার্যকারিতা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। প্রাকৃত ছন্দেও তাই। প্রাকৃত ও হিন্দী উভয় ছন্দেই যতিগুলি আছে। কবিতা সুর করে পড়া হয় বলে বিভিন্ন যতির অস্তিত্ব সহজে বোঝা যায় না। সম্প্রতি সহজ-স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কবিতা পাঠের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। তাই ধীরে ধীরে অর্ধযতি, লঘুযতি ও উপযতির গুরুত্ব সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। যতিগুলির সুস্পষ্ট স্বীকৃতি না থাকায় পঙ্‌ক্তি, পদ, পর্ব, উপপর্ব প্রভৃতি বিভাগও হিন্দীতে স্বীকৃত নয়। বাংলা, অসমীয়া এবং ওড়িয়ার সঙ্গে হিন্দী ছন্দের এই পার্থক্যটি ক্রমে ক্রমে কমে যাচ্ছে—স্বাভাবিক কারণেই। বঙ্গ-ভাষাগুচ্ছের মতোই হিন্দীতেও 'ভাবযতি'র ব্যবহার আছে। আছে অতি পর্বের প্রচলনও। তবে বাংলা, অসমীয়া এবং ওড়িয়া ছন্দে এই ভাবযতি এবং অতিপর্ব যেমন সুস্পষ্ট এবং তার উপযোগিতা স্বীকৃত, হিন্দীতে তেমনটি চোখে পড়ে না। প্রাকৃত ও হিন্দীতে অতিপর্বের ব্যবহার খুবই কম। আর ছান্দসিকগণ-এর গুরুত্ব ও নামকরণ সম্পর্কে উদাসীন। অতিপর্বের সাহায্যে হিন্দী ছন্দ হিল্লোলিত এবং ধ্বনিসুষমায় বিচিত্র হয়ে ওঠে। সুতরাং অতিপর্বের সৌকর্য এবং ব্যবহার বিষয়ে কবি ছান্দসিকদের বিশেষভাবে অবহিত এবং উৎসাহী হওয়া দরকার।

পর্ব ও পদের বিচিত্র সমাবেশের সাহায্যে বাংলা, অসমীয়া এবং ওড়িয়াতে

নানা প্রকার স্তবকবন্ধ রচিত হয়। তিন রীতির ছন্দেই একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী এবং চৌপদী পঙ্‌ক্তি লেখা হয়। দ্বিপদীর মধ্যে আবার চোদ্দ মাত্রার পয়ারবন্ধের ব্যবহারই সর্বাধিক। মিশ্রবৃত্ত ও দলবৃত্ত রীতির পর্বে সাধারণভাবে চার কলামাত্রা এবং চার দলমাত্রার পর্বই যথাক্রমে থাকে। কিন্তু কলাবৃত্ত রীতিতে চার, পাঁচ, ছয় ও সাত কলামাত্রার পর্ব লেখা হয়। মিশ্রবৃত্ত কিছুটা গদ্যধর্মী হওয়ায় মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের হাতে প্রবহমান ও মুক্তক বন্ধ রচিত হয়েছে। অসমীয়াতে ভোলানাথ দাস, নলিনীবালা দেবী এবং দেবকান্ত বড়ুয়া প্রবহমানতা এবং মুক্তকের সাহায্যে ছন্দে সমৃদ্ধি এনেছেন। ওড়িয়াতে এই কাজ করেছেন রাধানাথ রায় এবং শচিরাউত রায়। প্রবহমান পয়ার এবং মুক্তক আধুনিক বাংলা ছন্দের বিশেষ সম্পদ। অসমীয়া এবং ওড়িয়া ছন্দের ক্ষেত্রেও কতকাংশে এ-কথা প্রযোজ্য। তবে কলাবৃত্ত ও দলবৃত্ত প্রবহমানতা সৃজনের অনুকূল নয়। তাই এই দুই রীতিতে প্রবহমান ছন্দের নিদর্শন খুবই কম। তবে মুক্তক লেখা হয়েছে এই দুই রীতিতেই।

হিন্দী ছন্দও বঙ্গভাষাগুচ্ছের ছন্দের মতোই বন্ধবৈচিত্র্য সম্পদে উন্নত। তবে বাংলার মতো পয়ার-ত্রিপদী, অসমীয়ার মতো পদ (পয়ার) ও ছবি (ত্রিপদী) এবং ওড়িয়ার মতো মঙ্গল (পয়ার) ও বঙ্গলাশ্রী (ত্রিপদী) প্রভৃতি বন্ধের প্রয়োগ হিন্দীতে হয় না। হিন্দীতে মুখ্যত কলাবৃত্ত রচিত হয়। তাই বন্ধবৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রয়াস কেবল কলাবৃত্তকেই আশ্রয় করেই সম্ভব। ঘনাক্ষরীর তুলনায় কলাবৃত্তের প্রয়োগ বেশি হওয়ায় হিন্দী কবিরা কলাবৃত্তেই প্রবহমানতা আনতে চেষ্টিত হয়েছেন। প্রয়াসটি প্রশংসনীয় হলেও তেমন সাফল্য আসেনি। এক্ষেত্রে সাফল্য আসতে পারে ঘনাক্ষরী বা মিশ্রবৃত্তের মাধ্যমেই। কারণ মিশ্রবৃত্ত রীতির উচ্চারণ প্রকৃতি ভাবের প্রবহমানতার অনুকূল, কিন্তু কলাবৃত্তের তেমন নয়। ভাবের প্রবাহ যেখানে শেষ হয়,—অকস্মাৎ সেখানে থামা কলাবৃত্তের স্বভাববিরুদ্ধ, কিন্তু মিশ্রবৃত্তের প্রকৃতির অনুকূল। এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি অভিমত স্মরণীয়।—

"পয়ার [মিশ্রবৃত্ত] ছন্দের বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে তাকে প্রায় গাঁঠে গাঁঠে ভাগ করা চলে এবং প্রত্যেক ভাগেই মূলছন্দের একটা আংশিক রূপ দেখা যায়। ...কিন্তু তিনের ছন্দ [ছয়মাত্রা পর্বের কলাবৃত্ত]কে তার ভাগে ভাগে পাওয়া যায় না, এইজন্ত তিনের ছন্দে ইচ্ছামতো থামা চলে না।...তিনের ছন্দে গতির প্রাবল্যই বেশি, স্থিতি কম। সুতরাং তিনের ছন্দ চাঞ্চল্য প্রকাশের

পক্ষে ভালো, কিন্তু তাতে গাম্ভীর্য এবং প্রসার অল্প। তিনের মাত্রায় অমিত্রাক্ষর করতে গেলে বিপদে পড়তে হয়।" —ছন্দ (১৯৭৫): 'ছন্দের অর্থ, পৃ. ৬২

রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে বলা যায়—হিন্দীতেও ঘনাক্ষরী বা মিশ্রবৃত্ত রীতিতেও প্রবহমানতা আনা সম্ভব, সহজ এবং স্বাভাবিক। বাংলায় প্রবহমানতা এবং মুক্তকের পরিণতি ঘটেছে গদ্য কবিতায়। অসমীয়া এবং ওড়িয়া ছন্দেও তাই। এই ক্রমপরিণতির মূলে ইংরেজি গদ্য-কবিতার প্রভাব আছে, সে কথা বলাই বাহুল্য।

হিন্দীতেও বাংলা ও ইংরেজি ছন্দের প্রভাবে প্রবহমানতা, মুক্তক (অতুকান্ত, মুক্তছন্দ) এবং গদ্যকবিতার প্রচলন ঘটেছে। তবে গদ্যকবিতা প্রচলনের সম্ভাবনা হিন্দীতে সুপ্তাবস্থায় ছিল পূর্ব থেকেই, হিন্দী ছন্দ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাকৃতের ছন্দ থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করেছে। প্রাকৃতে 'মালা' প্রভৃতি কয়েকটি ছন্দের বন্ধন এমন শিথিল এবং রচনায় স্বাচ্ছন্দ্যের মাত্রা এত বেশি যে, এসব ছন্দের রচনা প্রায় গদ্যধর্মী হয়ে পড়ে। সুতরাং এ-সব ছন্দের গদ্যধর্মী কবিতা যে আধুনিক যুগের গদ্যকবিতার পূর্বাভাস বহন করবে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।[৪৩] এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিমত হল—

"এমন কি সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় আর্যা প্রভৃতি ছন্দে ধ্বনিবিভাগ যতটা স্বাধীনতা পেয়েছে—আধুনিক বাংলার ততটা সাহসও প্রকাশ পায়নি। একটি প্রাকৃত ছন্দের শ্লোক উদ্ধৃত করি।—

বরিস জল ভনই ঘণ গঅণ
সিঅল পবণ মণ-হরণ
কণঅ পিঅরি ণ চই বিজুরি ফুল্লিআ নীবা।
পথর-বিথর-হিঅলা
পিঅলা নিঅ লং ণ আবেই॥

...পাঠকের কান একে রীতিমতো ছন্দ বলে মানতে বাধা পাবে তাতে সন্দেহ নেই, কারণ এর পদবিভাগ প্রায় গদ্যের মতোই অসমান।"

—পূর্ববৎ, 'গদ্যছন্দ', পৃ. ২২০-২১।

কিন্তু হিন্দী কবি বা ছান্দসিকগণ এই দিকটি লক্ষ করেন নি, বা উপেক্ষা করেছেন। তাই বাংলা ও ইংরেজি থেকে আধুনিক যুগে গদ্য কবিতা হিন্দীতে এসেছে।

আজ বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া এবং হিন্দী ছন্দ স্ব স্ব বিশিষ্টতা সত্ত্বেও যে সমধর্মী এবং সম বৈচিত্র্যপ্রবণ হয়ে উঠেছে—বহুলাংশে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

উল্লেখ পঞ্জী—

১। এই প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার এবং সুধাকর চট্টোপাধ্যায়ের যৎসামান্য হিন্দী ছন্দের আলোচনার কথা স্মরণীয়। পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য লেখকের—'আধুনিক বাংলা ও হিন্দী ছন্দ' এবং 'আধুনিক ওড়িয়া ছন্দ' তথা অধ্যাপক বীরেন রক্ষিতের 'বাংলা ও অসমীয়া ছন্দ' অপ্রকাশিত বিষয়ক আলোচনাও উল্লেখযোগ্য।

২। এই প্রসঙ্গটির জন্য দ্রষ্টব্য লেখকের প্রবন্ধ: 'ভারতীয় ভাষায় ছন্দ', মহাদিগন্ত পত্রিকা, শারদীয়া সংখ্যা-১৯৮৭, পৃ. ৫৭-৫৮।

৩। 'চন্দতি হ্লয়তি এন দীপ্যতে বা তচ্ছন্দঃ'—পাণিনি।

৪। 'দেবা বৈ মৃত্যোর্বিভ্যতস্ত্রয়ীং বিদ্যাং প্রাবিশন্। তে ছন্দোভিরচ্ছাদয়ন্। যদেভিরচ্ছাদয়ন্ তচ্ছন্দসাং ছন্দস্ত্বম্।

—ছান্দোগ্য-উপনিষদ্, প্রপাঠক-১, খণ্ড-৪। প্রবাক্-২।

৫। রেমঃ জরিতা কারুঃ নদঃ স্তামুঃ কীরিঃ গৌঃ সুরিঃ নাদঃ ছন্দঃ স্তুপ্ রুদ্রঃ কৃপণ্যুরিতি ত্রয়োদশস্তোত্র নামানি।

—নিঘণ্টু-৩, ১৬

৬। ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥

—গীতা, অধ্যায়-১৫, শ্লোক-১।

শংকর ভাষ্য—ছন্দাংসি ছাদনাৎ ঋগ্যজুঃ সাম লক্ষণানি যস্য সংসার বৃক্ষস্য পর্ণানি ইব পর্ণানি।

রামানুজ ভাষ্য—অশ্বত্থস্য ছন্দাংসি পর্ণানি আহুঃ ছন্দাংসি শ্রুতয়ঃ।

৭। Vedic Index. Vol-1. P. 267 By Macdonal and Keith.

৮। 'একাক্ষরং ছন্দো দৈবীগায়ত্রীতি সজ্ঞায়তে।'—পিঙ্গলছন্দঃ সূত্রম্, ২।৩।

৯। দ্রষ্টব্য—ভোলাশংকর ব্যাস-সম্পাদিত-'প্রাকৃত পৈঙ্গলম্', ২য় খণ্ড, (১৯৬২), পৃ. ৩২৮।

১০। ডঃ তারাপদ ভট্টাচার্য: 'ছন্দতত্ত্ব ও ছন্দোবিবর্তন' (১৯৭১), পৃ. ২৫৫-৫৬।

১১। স্মরণীয়—এবং ক্লৃপ্ত প্রমাণাং ছন্দসামুপদিশ্যতে।—ঋক্ প্রাতিশাখ্য, পাতাল-১৭, ছন্দ-১।

১২। 'তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদ সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষাকল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষামিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।'—মুণ্ডক-১, ১।১।৫।

১৩। মারাঠী ছান্দসিক রামনারায়ণ পাঠক তাঁর 'বৃহৎ পিঙ্গল' গ্রন্থের ২৫২ পৃষ্ঠায় এই প্রসঙ্গটির অবতারণা করেছেন।

১৪। আচার্য কেদার ভট্ট : 'বৃত্তরত্নাকর' —প্রথম অধ্যায়।

১৫। দ্রষ্টব্য—ভোলাশংকর ব্যাস-সম্পাদিত : প্রাকৃত পৈঙ্গলম্—খণ্ড-২, (১৯৬২) পৃ. ৩৩২।

১৬। দ্রষ্টব্য—পূর্ববৎ, পৃ. ৩৩৫।

১৭। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ কাব্য'টি ভাষার লালিত্য ও ছন্দ-সুষমার জন্য অপভ্রংশের কাছে ঋণী বলে মনে করা হয়। প্রাকৃত-অপভ্রংশের বেশ কয়েকটি ছন্দোবন্ধ গীতগোবিন্দে প্রযুক্ত দেখা যায়। এখানে প্রাকৃতানুসারী একটি দোহা উদ্ধৃত করা গেল।—

মামিয়ং চলিতা বিলোক্য বৃতং বধূনিচয়েন। (১৩+১১=২৪ মাত্রা) সাপরাধতয়ামপি ন বারিতাতিভয়েন॥

—গীত ৭।১

এই জাতীয় ছন্দোবন্ধের নিদর্শন সংস্কৃত সাহিত্যে খুবই দুর্লভ। এই প্রসঙ্গে দোহার লক্ষণও স্মরণীয়—

তেরহ মত্তা পঢ়ম পঅ, পুণু এগারহ দেহ।
পুণু তেরহ এগারহহি দোহা লক্খণ এহ॥

—প্রাকৃত পৈঙ্গলম্ -১।৭৮।

১৮। দ্রষ্টব্য—ভোলাশংকর ব্যাস সম্পাদিত 'প্রাকৃত পৈঙ্গলম-২, (১৯৬২) পৃ. ৩৪২।

১৯। সানুস্বারশ্চ দীর্ঘশ্চ বিসর্গী চ গুরু ভবেৎ।
বর্ণঃসংযোগ পূর্বশ্চ তথা পাদান্ত গোঽপি বা॥

গঙ্গাদাস,—ছন্দ-মঞ্জরী-১১।

অনুস্বার বা বিসর্গযুক্ত বর্ণ, দীর্ঘবর্ণ, যুক্তবর্ণের পূর্ববর্ণ এবং পাদান্ত বর্ণও গুরু হয়।

২০। দ্রষ্টব্য—(ক) সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা: অসমীয়া সাহিত্যর সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত (১৯৮১), পৃ. ৫৬-৫৭।

(খ) Banikanta Kakati: The Assamese Language, Aspects of Early Assamese Literature, P. 2.

(গ) সুকুমার সেন: ভাষার ইতিবৃত্ত, (১৯৭৫), 'নব্য ভারতীয় আর্যভাষা' পৃ. ১৬৬

২১। (a) "A unit of the kind is known as Syllabic unit, opposed to a moric unit based on the fixed duration of a short syllable."

—M. Bora: Fundamentals of Assamese Metre (1977), P. 51

(b) The term…dal to mean a syllable is suggested by a great Bengali prosodist, (Probodh Sen: Chando Parikrama, P. 14), we feel if these two terms (mora and dal) are adopted by Assamese Prosody as good as Assamese equivalents, there is nothing to lose but to gain".

—Do, Page 49, F.N. 10.

২২। M. Bora: Fundamentals of Assamese Metre (1977) Ps. 33-34.

২৩। Do. P. 46; মহেশ্বর নেওগ: অসমীয়া কবিতার ছন্দ (১৯৬২) পৃ. ৩৭।

২৪। দ্রষ্টব্য—প্রবোধচন্দ্র সেন কৃত: 'আধুনিক বাংলা ছন্দ সাহিত্য, (১৯৮০) পৃ-৮৯।

২৫। (a) "…it is to…Apabhramsa metre that Assamese metre owes its inspiration for payar, one of its three principal verse-forms, in as much as padakulaka was being already moulded in

the form, providing the model. However, this part of history, is not confined to Assamese metre alone. For, the metres of two other languages of the eastern region of India, Bengali and Oriya, which also have their origin traced back to the Eastern Magadhi dialect, share this common heritage. Of the two, Bengali metre is nearer to Assamese metre ; and unlike Oriya, both of them reflect a well proportioned distribution of vowel-ending and stop-ending Syllables in the speech-texture."

—M. Bora : Fundamentals of Assamese Metre (1977) Ps. 12-13

(b) সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা : অসমীয়া সাহিত্যর সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত (১৯৮১) পৃ. ৫৭।

২৬। দ্রষ্টব্য—মহেন্দ্র বরা কৃত : 'অসমীয়া কবিতার ছন্দ' (১৯৬২)পৃ. ৯৯।

২৭। "Of course, to speak history the immediate inspiration of the new style came from the knowledge of Tagore's successful experiment with it in the realm of Bengali metre. The fact has been acknowledged by more than one Poet in no ambiguous language. One of them makes the frank and bold statement.—"I do not have the audacity of claiming the great success of being able to follow the foot steps of the greatest poet of the world. But I am surely indebted to him for my Metre" (Kamaleshwar Chaliha : Chandita. preface).

—M. Bora : Fundamentals of Assamese Metre (1977) P. 243.

২৮। M. Bora Fundamentals of Assmese Metre (1977) P. 307

২৯। দ্রষ্টব্য—মহেন্দ্র বরা : অসমীয়া কবিতার ছন্দ (১৯৬২), পৃ. ১৪২-৪৬।

৩০। দ্রষ্টব্য—লেখক কৃত : আধুনিক ওড়িয়া ছন্দ (১৯৮০), পৃ. ১৭ এবং 'উপধামেল' : পৃ. ৭৪-৭৬।

৩১। দ্রষ্টব্য—(ক) ডঃ নরেন্দ্রনাথ মিশ্র : আধুনিক ওড়িআ কাব্যধারা, (১৯৮০), 'আদি যুগ' পৃ. ৩০৬।

(খ) লেখক কৃত : আধুনিক ওড়িয়া ছন্দ (১৯৮০), পৃ. ৩৭-৩৮।

৩২। দ্রষ্টব্য—H. T. Colebrook : Miscellaneous Essays, Vol. II (1878) Ps. 62-63.

৩৩। দ্রষ্টব্য—ভোলাশঙ্কর ব্যাস (সঃ) : প্রাকৃত পৈঙ্গলম্—২ (১৯৬২), পৃ. ৫৭৩-৭৪।

৩৪। দ্রষ্টব্য—রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' ৩য় সংস্করণ, (১৯৭৫), 'ছন্দের প্রকৃতি, পৃ. ১৬০।

৩৫। দ্রষ্টব্য—ভোলাশঙ্কর ব্যাস (সং) : প্রাকৃত পৈঙ্গলম্—২ (১৯৬২), পৃ. ৫৭৯।

৩৬। স্মরণীয়—"ইসপ্রকারকে ছন্দ মাত্রা ঔর বর্ণ কী সংখ্যা মেঁ পূরে নহীঁ উতরতে হৈঁ; পরন্তু ভাষা কী প্রকৃতিকে অনুসার উচ্চারণ মেঁ সমান এবং নিশ্চিত স্থান ঘেরতে হৈঁ।"

—ডঃ পুত্তূলাল শুক্ল : আধুনিক হিন্দী কাব্য মেঁ ছন্দ যোজনা (১৯৫৮), পৃ. ১৬, পাদটীকা—৩

৩৭। F. E. Keav : Hindi Literature (1920) Ps. 101-103.

৩৮। "The metrical pattern imitates the structure of sound of the Language ; the line of the poem imitates the metrical pattern ; and, therefore, the line of the poem imitates the structure of sound of the language."

—John Thomson : A linguistic structure and the poetic line—"Poetics".

৩৯। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য :—

(১) প্রবোধচন্দ্র সেন : ছন্দ পরিক্রমা (১৯৭৭), পৃ ১০-১৩।

(২) M. Bora : Fundamentals of Assamese Metre (1977), P. 52.

(৩) রামবহাল তেওয়ারী : আধুনিক ওড়িয়া ছন্দ (১৯৮০), পৃ. ৮১।

(৪) রামবহাল তেওয়ারী : আধুনিক বাংলা ও হিন্দী ছন্দ (১৯৭৭), পৃ. ২৬-২৭।

(৫) রামবহাল তেওয়ারী : রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দী ছন্দ (১৯৮৬), পৃ. ১৪-১৬।

৪০। দ্রষ্টব্য—(ক) সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী 'নিরালা' : পরিমল (১৯৫০), ভূমিকা পৃ. ২২।

(খ) রামবহাল তেওয়ারী : আধুনিক বাংলা ও হিন্দী ছন্দ (১৯৭৭) পৃ. ২০-২১।

৪১। দ্রষ্টব্য—লেখকের আধুনিক ওড়িয়া ছন্দ (১৯৮০), পৃ. ৫৩-৫৪।

৪২। দ্রষ্টব্য—জানকী বল্লভ মহান্তি : 'ওড়িয়া ছন্দর বিকাশ' (১৯৬১), পৃ. ৪৪।

৪৩। উদ্ধৃত দৃষ্টান্তটির পড়ার ভঙ্গিতে পদ্যের, পর্ব বা পদভাগে সমতা নেই। প্রথম দুই চরণে ৪৪টি করে এবং তৃতীয় চরণে ২৭ মাত্রা বিন্যস্ত। ভোলা শঙ্কর ব্যাস সম্পাদিত প্রাকৃত পৈঙ্গলের প্রথম খণ্ডের (১৯৫৯) ১৪৫-৪৬ পৃষ্ঠায় এই অংশটির যে রূপ উদ্ধৃত, তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃত অংশটির সজ্জায় পার্থক্য লক্ষিত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা অসমীয়া ওড়িয়া এবং হিন্দী ছন্দের ক্রমবিকাশ ও যোগাযোগ

যে কোনো ভাষার ছন্দের পর্যালোচনা করলেই দেখা যায়—অন্যান্য কলা-শিল্পের মতোই ছন্দেরও উদ্ভব, ক্রমবিকাশ এবং পরিণতিলাভের ধারা বহমান। বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া তথা হিন্দী ছন্দের ইতিহাসও তার ব্যতিক্রম নয়। এই ভাষা চারটির কবিতার প্রারম্ভিক যুগের ছন্দ কীভাবে ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করেছে, সব ছন্দই সংস্কৃত-প্রাকৃত সঞ্জাত হলেও কীভাবে একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, পরে আবার কীভাবে তাদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে—বর্তমান অধ্যায়ে আমরা তাই আলোচনার চেষ্টা করব।

বাংলা, অসমীয়া এবং ওড়িয়া সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদে (খ্রীস্টীয় দশম—দ্বাদশ শতক) ব্যবহৃত কলাবৃত্ত প্রাকৃত-অপভ্রংশ মাত্রাবৃত্তের অনুবর্তী হলেও নব্য ভারতীয় আর্যভাষার প্রকৃতিজাত বৈশিষ্ট্যও তাতে সুস্পষ্টভাবে লক্ষিত হয়। মিশ্র-কলাবৃত্ত ও দলবৃত্তের প্রয়োগ সে যুগে দেখা যায় না। যদিও প্রাচীন পাদাকুলক থেকে উদ্ভূত সুপ্রসিদ্ধ ছন্দোবদ্ধ পয়ারের আদল আভাসিত চর্যাপদে। প্রাকৃতের ন্যায় দীর্ঘস্বর ও রুদ্ধদল দ্বিমাত্রক এবং হ্রস্ব স্বরও হ্রস্ব-স্বরান্ত মুক্তদল এক-মাত্রক রূপে গণ্য হলেও মাঝে মাঝে তার ব্যতিক্রমও চোখে পড়ে।[১] পাদাকুলকের রূপ পাওয়া গেলেও সংস্কৃত বা প্রাকৃত কোনো ছন্দ বা ছন্দোবন্ধের নামোল্লেখ নেই চর্যাপদে। প্রাকৃত-অপভ্রংশ সঞ্জাত হলেও স্তবক, পঙ্‌ক্তি ও পদের গঠন, মিল-রচনা এবং উচ্চারণের ক্ষেত্রে এযুগের কলাবৃত্ত ছন্দ প্রাকৃতের প্রভাব মুক্ত বলা যায়। দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদী বন্ধের সমিল প্রয়োগ, দ্বিপদীর সঙ্গে ত্রিপদী বা চৌপদী পঙ্‌ক্তির অন্ত্যমিল, আট, দশ, বারো, অথবা চোদ্দ পঙ্‌ক্তির গান; বারো থেকে আটাশ মাত্রা পর্যন্ত দীর্ঘ পঙ্‌ক্তির স্বাতন্ত্র্য এবং বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ চর্যাপদের রচনা। সুস্পষ্ট যতিবিভাগ, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দীর্ঘস্বরের সঙ্কুচিত উচ্চারণ এবং তার একমাত্রক প্রয়োগ চর্যাপদের উল্লেখযোগ্য বিশিষ্টতা। এইসব বিশিষ্টতা পরবর্তী কালে বাংলা, অসমীয়া এবং ওড়িয়া ছন্দের ধারাকে নিয়ন্ত্রিত এবং পুষ্ট করেছে।[২]

চর্যাপদ থেকে দৃষ্টান্তের সাহায্যে সে যুগের বাংলা, অসমীয়া এবং ওড়িয়া ভাষা ও ছন্দের বিশিষ্টতা বোঝা সহজ হতে পারে।—

২ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ২
বা ঢ় ই । সো ত রু ।। সু ভা সু ভ । পা ণী । I

২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ২
ছে ব ই । বি দু জ ন ।। গু রু প রি । মা ণী ।। I

—চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয় : পদ-৪৫

ষোলো মাত্রার এই দ্বিপদী পঙ্‌ক্তির রচনায় একটি মাত্র দীর্ঘস্বর—('ভা') হ্রস্ব-উচ্চারিত। কিন্তু অধিকাংশ দীর্ঘস্বরই হ্রস্ব উচ্চারিত এমন রচনাও বিরল নয়। যেমন—

১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ২ ২ ১ ১
কে হো কে হো । তো হো রে ।। বি রু আ । বো ল ঈ I

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ২ ১ ১
বি দু জ ন । লো অ তো রে ।। ক ণ্ঠ ন । মে ল ঈ I ৪।৪।।৪।৪ I

—চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয় : পদ-১৮

এখানে ১৫টি দীর্ঘস্বরের মধ্যে মাত্র চারটি দীর্ঘ, বাকি এগারটি হ্রস্ব উচ্চারিত।

দেখা যাচ্ছে চর্যাপদেই বঙ্গ ভাষা গুচ্ছের ছন্দ প্রাকৃতের শাসন অগ্রাহ্য করে তার স্বাভাবিক প্রবণতার পরিচয় দিতে শুরু করেছে। বলতে গেলে এখানেই প্রকৃত বাংলা, অসমীয়া তথা ওড়িয়া ছন্দের সূচনা ঘটেছে। প্রাকৃতের অনুবর্তী হিন্দী ছন্দের সঙ্গে বাংলা অসমীয়া এবং ওড়িয়া ছন্দের পার্থক্যের সূচনাও চর্যাপদেই লক্ষিত হয়।

খ্রীস্টীয় একাদশ থেকে চতুর্দশ শতকের মধ্যে ওড়িয়া ও বাংলা পরস্পর পৃথক হয়ে যায়। পঞ্চদশ শতকে ওড়িয়া একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ভাষার রূপ নেয়।[৩] পঞ্চদশ শতকেই অসমীয়াও বাংলা থেকে পৃথক হয়ে যায়।[৪] দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষার প্রভাবে ওড়িয়ার উচ্চারণ কতকটা ভিন্ন রূপ নেয়। বাংলা ও অসমীয়ার স্বরান্ত উচ্চারণপ্রবণতা ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসে, কিন্তু ওড়িয়াতে তা আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে—বলা চলে। তবে বাংলা, অসমীয়া এবং ওড়িয়ার ছন্দের ধারা প্রায় সমানভাবে এবং সমবৈশিষ্ট্যে অগ্রসর হয়ে এসেছে। একে একে এই ভাষাত্রয়ের এবং শেষে হিন্দী ছন্দের ক্রমবিকাশ দেখার চেষ্টা করা যেতে পারে।

বাংলা ছন্দের ক্রমবিকাশ

(মধুসূদন-পর্ব : ১৮৫৮ খ্রী: পর্যন্ত)

কলাবৃত্ত রীতি (Moric Style)।

চর্যাপদে দীর্ঘস্বর ও রুদ্ধদল দ্বিমাত্রক এবং হ্রস্বস্বর ও হ্রস্ব-স্বরান্ত মুক্তদল একমাত্রক রূপে গণ্য। অবশ্য মাঝে মাঝে তার ব্যতিক্রমও দেখা যায়। সংস্কৃত পাদাকুলক, প্রাকৃত দোহা, সোরঠা প্রভৃতি ছন্দোবন্ধের প্রয়োগ চর্যাপদে থাকলেও কোনো ছন্দ বা ছন্দোবন্ধের নামোল্লেখ নেই সেকথা আমরা জানি। প্রাকৃত-সঞ্জাত হলেও স্তবক, পঙ্‌ক্তি ও পদের গঠন, মিল রচনা এবং উচ্চারণের ক্ষেত্রে এ-যুগের বাংলা কলাবৃত্ত প্রাকৃত ছন্দের অনেকটা প্রভাব মুক্ত। দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদী বন্ধের সমিল প্রয়োগ দ্বিপদীর সঙ্গে ত্রিপদী বা চৌপদী এমন কি এক পদীর অন্ত্যমিল, আট, দশ বারো, অথবা চোদ্দ পঙ্‌ক্তির গান ; বারো থেকে আটাশ মাত্রা পর্যন্ত দীর্ঘ পঙ্‌ক্তির স্বতন্ত্র এবং বৈচিত্র্য রয়েছে চর্যাপদে। সুস্পষ্ট যতি বিভাগ, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দীর্ঘস্বরের সঙ্কুচিত উচ্চারণ এবং তার একমাত্রক প্রয়োগ চর্যাপদের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

সুতরাং বাংলা ছন্দ প্রাকৃতের শাসন অগ্রাহ্য করে তার স্বাভাবিক প্রবণতার পরিচয় দিতে শুরু করেছে চর্যাপদেই। এখানেই প্রকৃত বাংলা ছন্দের সূচনা। প্রাকৃতের অনুবর্তী হিন্দী ছন্দ থেকে বাংলা এবং তারই সঙ্গে অসমীয়া ও ওড়িয়া ছন্দের পার্থক্যের সূচনাও চর্যাপদেই ঘটেছে—সেকথা আমরা উল্লেখ করেছি।

চর্যাপদের পর বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে কলাবৃত্তের প্রয়োগ খুবই কম। তবে কলাবৃত্তের উচ্চারণরীতি অনুযায়ী দীর্ঘ ও রুদ্ধদলের দ্বিমাত্রকতার নিদর্শন থেকে গেছে কোথাও কোথাও।

পরবর্তী রচনা বৈষ্ণব পদাবলীতে কলাবৃত্তরীতিব প্রয়োগ বৈচিত্র্য এবং অতুলনীয় ধ্বনিসম্পদ দেখা দিয়েছে। বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষার দুইটি ধারা—বাংলা ও ব্রজবুলি। বাংলা বৈষ্ণব পদে কলাবৃত্তের প্রয়োগ ঘটেনি বলা যায়। সমস্ত পদই মিশ্রকলাবৃত্তের পর্যায়ভুক্ত। জয়দেব ও বিদ্যাপতির অনুসারী বাঙালি কবিরা কৃত্রিমভাষা ব্রজবুলিতে কলাবৃত্ত রচনায় যে দক্ষতা দেখিয়েছেন এবং শিল্প-

সুষমা সৃজন করেছেন তা বৈষ্ণব পদাবলীকে বাংলা ছন্দের ইতিহাসে বিশেষ মর্যাদার আসন দান করেছে। দীর্ঘ ও হ্রস্ব স্বরের উচ্চারণ-পার্থক্য সর্বত্র দৃঢ়ভাবে অনুসৃত না হলেও মাত্রামূল্যের বিচারে প্রাকৃত এবং চর্যাপদের প্রাচীন নীতিই সাধারণভাবে অনুসৃত। উপপর্ব, পর্ব, পদ এবং দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদী পঙ্‌ক্তিবন্ধের রচনা নৈপুণ্যে বৈষ্ণবপদে যেমন রূপগত বৈচিত্র্য এসেছে তেমনি ধ্বনি-সুষমাও ফুটে উঠেছে অনন্ত হয়ে। চার, পাঁচ, ছয় ও সাত মাত্রার পর্ব রচনার অভূতপূর্ব নিদর্শন পাওয়া যায় বৈষ্ণব পদাবলীতে।—

চার মাত্রার পর্ব— ইথে যদি সুন্দরি তেজবি গেহ
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ॥

—গোবিন্দদাস, বৈষ্ণবপদাবলী: মুখোপাধ্যায় (১৯৬১ সং) পৃ. ৬১৩।

এই রচনাটির সঙ্গে জয়দেবের—'মুহুরব লোকিত' (গীত ১২।৫) এবং চর্যাপদের 'কায়াতরুবর' ইত্যাদি পদ তুলনীয়। তিনটিই পাদকুলকের আদর্শে রচিত।

পাঁচমাত্রার পর্ব—

তুঙ্গমণি মন্দিরে ঘনবিজুরি সঞ্চরে
মেঘরুচি বসন পরিধানা।
যত যুবতী মণ্ডলী পন্থমাঝে পেখলি
কোই নহ রাইক সমানা।

—শশিশেখর, পূর্ববৎ, পৃ. ১০২২

এই ত্রিপদীর সঙ্গে জয়দেবের 'স্থলকমলগঞ্জনং' (গীত ১০।৮) পদটি তুলনীয়।

ছয় মাত্রার পর্ব—

কাঞ্চন রুচি রুচির অঙ্গ অঙ্গে অঙ্গে ভরু অনঙ্গ
কিঙ্‌কিণী কর-কঙ্কণ মৃদু ঝংকৃত মনুহারী।
নাচত যুগ ভ্রূভুজঙ্গ কালিদমন দমন রঙ্গ
সঙ্গিনী সব রঙ্গে পহিরে রঙ্গিল নীল শাড়ী॥

—জগদানন্দ, পূর্ববৎ, পৃ. ৮৬৯।

এরূপ চৌপদীবন্ধের নিদর্শন সর্বপ্রথম বিদ্যাপতির রচনায় মেলে। পরে অন্য কবিরাও তাতে নৈপুণ্য দেখান।

সাত মাত্রার পর্ব—

ঝম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরি খন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া॥
—কবিশেখর, পূর্ববৎ, পৃ. ৩২২

এই দ্বিপদী বন্ধটি জয়দেবের গীতগোবিন্দের (গীত ৭।৯) আদর্শে রচিত। বাংলা ব্রজবুলি বৈষ্ণব পদের ছন্দের এই বিশেষত্ব মধ্যযুগের অসমীয়া এবং ওড়িয়া ব্রজবুলি বৈষ্ণব পদ-রচনাতেও বিদ্যমান।

কবি ভারতচন্দ্র রায়ের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে কলাবৃত্ত রীতির নিদর্শন থাকলেও তাতে উল্লেখযোগ্য বিশিষ্টতা চোখে পড়ে নি। সংস্কৃত মাত্রাবৃত্ত ও জয়দেবী ছন্দের সহায়তায় বাংলাতে যে ধ্বনি-গাম্ভীর্য তথা অনুপ্রাস সৃষ্টি সম্ভব তার পরীক্ষা করেছেন ভারতচন্দ্র। তবে সংস্কৃত উচ্চারণ বাংলায় 'বসে' না। তা কৃত্রিম, আড়ষ্ট এবং লঘু করে তোলে ভাষাকে। তার পরিচয়ও রয়েছে ভারতচন্দ্রের রচনায়।

মধ্যযুগের বাঙালি কবির ব্রজবুলি রচনায় প্রত্ন কলাবৃত্ত রীতির প্রভূত প্রয়োগ হয়েছে। কিন্তু খাঁটি বাংলায় কলাবৃত্তের প্রথম প্রয়োগ দেখা যায় অষ্টাদশ শতকের কবি রামপ্রসাদ সেনের রচনায়। প্রথম দিকে তিনিও ব্রজবুলিতে প্রত্ন কলাবৃত্ত রচনায় প্রয়াসী ছিলেন। ক্রমে বাংলায় এই ছন্দ রচনায় ব্রতী হন। ফলে সংস্কৃত উচ্চারণের উদাত্ত ধ্বনি বাংলা উচ্চারণের স্বাভাবিক মাধুরীর সঙ্গে মিশে রামপ্রসাদের পদগুলিকে অপূর্বতা দান করেছে। যে প্রত্নকলাবৃত্ত ও নব্য কলাবৃত্ত রবীন্দ্রনাথের হাতে চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে পরবর্তীকালে বাংলায়, তা প্রথম প্রয়োগের কৃতিত্ব রামপ্রসাদের। এই প্রসঙ্গে রামপ্রসাদের 'ও কে রে মনোমোহিনী' গীতটি স্মরণীয়। এটি এবং আরো একটি—মাত্র দুটি রচনায় বিশুদ্ধ কলাবৃত্তের প্রয়োগ করলেও সে যুগের বিচারে রামপ্রসাদের এই কৃতিত্ব অবিস্মরণীয়।

কবি ঈশ্বর গুপ্তের রচনাতে কলাবৃত্তের নিদর্শন নেই বলা চলে। তবে তাঁর 'বোধেন্দু বিকাশ' নাটকে কলাবৃত্তে লেখা দুটি গান—'কে রে বামা বারিদবরণী', এবং 'কে রে বামা ষোড়শীরূপসী' আছে। দেখা যাচ্ছে এই ছন্দ প্রয়োগে ঈশ্বরগুপ্ত রামপ্রসাদের অনুসারী এবং রবীন্দ্রনাথের পূর্বসূরী ছিলেন। রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরগুপ্ত

উভয়েই কলাবৃত্ত রীতির ষট্‌কল পর্ব রচনা করেছেন। বোধেন্দুবিকাশ নাটকেই ঈশ্বরগুপ্ত হিন্দী ছন্দও রচনা করেছেন।

বাংলা কলাবৃত্ত ছন্দের বহুল প্রয়োগ চর্যাপদ ও বৈষ্ণবপদাবলীতে ঘটলেও তার সুস্পষ্ট আধুনিক রূপের আভাস সূচিত হয়েছে কবি রামপ্রসাদ ও ঈশ্বর গুপ্তের রচনায়। তাঁরা ছন্দসচেতন কানের অধিকারী ছিলেন কিন্তু অনুরূপ মনের অধিকারী ছিলেন না। তাই নব্যকলাবৃত্ত রীতির বহুল প্রয়োগ তাঁরা কেউই করেন নি। পরবর্তীকালে ছন্দ সচেতন কান ও মনের অধিকারী রবীন্দ্রনাথ কলাবৃত্তের ধ্বনির ভিতরের রহস্যটি আবিষ্কার করে তার যথাযথ ব্যবহার করেন। তাঁর হাতেই এই রীতিটির শক্তি ও সৌন্দর্যের পূর্ণ বিকাশ ঘটে।

মিশ্রকলাবৃত্ত রীতি (Mixed moric Style)

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ মিশ্রবৃত্তে নয় কলাবৃত্তে রচিত। প্রাকৃত থেকে এলেও বাংলা উচ্চারণের প্রভাবে এই রীতিতে দীর্ঘস্বর ও রুদ্ধদলের উচ্চারণ মাঝে মাঝে সংকুচিত হয়েছে। ফলে বার বার কলারত্তের ছন্দচ্যুতি ঘটেছে। এই ধরনের বিচ্যুতির আধিক্য ঘটে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের যুগে। প্রচলিত ছন্দোরীতির উপর লৌকিক উচ্চারণ বা অলিখিত লৌকিক ছন্দের যত বেশি প্রভাব পড়েছে ছন্দোরীতি তার পূর্বের রূপ থেকে ততই সরে এসেছে। দীর্ঘস্বর ও রুদ্ধদলের দুইকলার মর্যাদা কমতে শুরু করেছে। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন কাব্যেই একটি অভিনব ছন্দোরীতি আত্মপ্রকাশ করল। যা প্রত্নকলাবৃত্তের উপর অলিখিত লৌকিক বা দলবৃত্তের প্রভাবের ফল। পরবর্তী সাধুছন্দের আদর্শ এই ছন্দটি কলাবৃত্ত ও দলবৃত্ত ছন্দের মধ্যবর্তী। সংস্কৃত বা প্রাকৃত বর্ণবৃত্তের অনুসরণ বা অনুবর্তন বাংলায় প্রথমাবধি হয়নি। হয়নি অসমীয়া এবং ওড়িয়াতেও। কিন্তু হিন্দীর প্রারম্ভিক কাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত তাই হয়ে আসছে। সে যাই হোক, পয়ারের আদলটি আরও সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট হয়ে দেখা দিল শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে। যথা—

পাখি নহোঁ। তার ঠাঁই ॥ উড়ি পড়ি। জাওঁ I
মেদনী বি : দার দেউ ॥ পসিআঁ লু : কাওঁ I

—বংশীখণ্ড, পা. ১৬৩।২

তবে সর্বত্র পয়ারের রূপ এমন নিখুঁত নয়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দ্বিপদী (পয়ার) এবং ত্রিপদীতে মিলের খেলাও সুস্পষ্ট। একপদী ও চৌপদীর রূপ অস্পষ্ট। তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যেই বাংলা ছন্দের দুইটি রূপ সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। কোথাও কোথাও দলবৃত্তের আভাসও ফুটে উঠেছে। কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণও প্রায় একই কালের রচনা বলে—অনেকে মনে করেন। তাতে প্রধানতঃ মিশ্রবৃত্ত রীতিই প্রযুক্ত। তবে লিপিকর প্রমাদের আধিক্যে কৃত্তিবাসের মূল রচনার পরিচয় পাওয়া সহজ নয়। বিংশ শতকে আবিষ্কৃত 'কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ'টির ভাষা ও ছন্দ অবিকৃত অনুমিত হয়। অবশ্য তাতেও মিশ্রবৃত্তের রূপটি সর্বত্র নিখুঁত নয়। বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণ প্রবণতার প্রভাবে মিশ্রকলাবৃত্ত মাঝে মাঝে লৌকিক লক্ষণাক্রান্ত হয়ে পড়েছে দেখা যায়। যেমন—

'রঘুবংশের কীর্তি কেবা বর্ণিবারে পারে
কৃত্তিবাস রচে গীত সরস্বতী বরে।'

—রামায়ণ (সা. সং, ১৯৬৪) পৃ. ১৩

এখানে 'রঘুবংশের' পর্বটির উচ্চারণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পাঠে দলবৃত্তের ভঙ্গিও অনুভবগম্য।

বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল এবং পরবর্তী যুগে চৈতন্যচরিত কাব্যেও মিশ্রবৃত্তের মাঝে মাঝে দলবৃত্তের স্বরূপ ফুটে উঠেছে—দেখা যায়।

মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' কাব্যটিও মিশ্রকলাবৃত্তে রচিত। তবে তাতে উল্লেখযোগ্য কোনো বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে না।

বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীতেও মিশ্রবৃত্ত নিখুঁতভাবে প্রযুক্ত বলা যায়। সপ্তদশ শতকের কবি কাশীরাম দাসের মহাভারতেও মিশ্রবৃত্ত রীতির সুন্দর ও সুস্পষ্ট রূপ মেলে। একটি সার্থক পয়ারের নিদর্শন।—

মকর কুণ্ডল কর্ণে কুণ্ডলি কুণ্ডল
শ্রীবৎস লাঞ্ছন অর্ধশোভিত গরল।

—মহাভারত: আদি পর্ব 'হর ও হরির মিলন'।

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে মিশ্রকলাবৃত্ত রীতির প্রাধান্য ছিল। কিন্তু সংস্কৃত-প্রাকৃত প্রভাবিত বাংলার প্রাচীন উচ্চারণ সংস্কার এবং স্বাভাবিক লৌকিক উচ্চারণ প্রবণতার দো-টানায় পড়ে একটা সুস্থির রূপ নেওয়া তার পক্ষে

সম্ভব ছিল না। এই অস্থিরতা থেকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে ভারতচন্দ্র রায় তাকে অক্ষর সংখ্যার কৃত্রিম নিয়মে বাঁধলেন। উচ্চারিত ধ্বনি অপেক্ষা লিপিরূপ মুখ্য হয়ে উঠল। ছন্দ নিরূপণের এই 'অক্ষর গোনা পদ্ধতি' অপেক্ষাকৃত সরল ও যান্ত্রিক হওয়ায় সহজেই স্বীকৃতি লাভ করল। দীর্ঘদিন ধরে এই পদ্ধতিটি বাঙালি কবি এবং পাঠকদের কানকে আপাতভাবে তৃপ্তি দিয়ে এসেছে। বিংশ শতকে অক্ষরবৃত্তের অন্তর্নিহিত ছন্দোরীতি আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে তার কৃত্রিমতার বন্ধন ছিন্ন হয়েছে। তার রূপবৈচিত্র্য এবং স্বাভাবিক ধ্বনিমাধুরী বাংলা ছন্দকে সমৃদ্ধ করেছে। ভারতচন্দ্রের কান ছিল ছন্দনিপুণ, তাই তাঁর প্রবর্তিত ছন্দের বন্ধন কৃত্রিম হলেও তার প্রয়োগে ছন্দশিল্পের বিশেষ ক্ষতি হয়নি। তাঁর ছন্দোরীতিতে বুদ্ধির ব্যাখ্যা যাই থাকুক কানের সায় ছিল পুরোপুরি। কবি রামপ্রসাদ সেন এবং ঈশ্বরগুপ্ত এই 'অক্ষরগোনা' রীতিই গ্রহণ করেছিলেন। তাই তাঁদের মিশ্রবৃত্ত রচনায় তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো বৈশিষ্ট্য দেখা না দিলেও গুরুগম্ভীর ভাবের বাহনরূপে তার উপযোগিতা স্পষ্টতর হয়ে উঠেছিল।

দলবৃত্ত রীতি (Syllabic Style)

চর্যাপদে কলাবৃত্ত এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে মিশ্রবৃত্তের সাক্ষাৎ পাই সর্বপ্রথম। এই দুই ছন্দোরীতির উদ্ভবের মূল রয়েছে লোকভাষা ও লোক মুখের উচ্চারণের সক্রিয়তা। লোক মুখের ভাষার ব্যবহার ছিল অলিখিত লৌকিক ছড়ায় ও গানে। সুতরাং লৌকিক বা দলবৃত্ত ছন্দের অস্তিত্বও ছিল ওই সব অলিখিত লোকসাহিত্যে। মিশ্রবৃত্তের উদ্ভবের পরও স্বাভাবিক ভাবেই লোকমুখের উচ্চারণ ক্রিয়ার ফল সাহিত্যিক ছন্দের উপর পড়তে থাকে। অর্থাৎ দীর্ঘস্বরের হ্রস্ব এবং রুদ্ধদলের সংকুচিত উচ্চারণের স্বাভাবিক প্রবণতা আরও প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। যার পরিচয় আমরা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে, কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণে ও বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলে পাই। সাধুসাহিত্যে প্রচ্ছন্নভাবে উঁকি মারলেও বাংলার এই স্বাভাবিক ছন্দটি দীর্ঘদিন ধরে মেয়েলি ছড়া ও পল্লীগীতি প্রভৃতির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। সাহিত্যে লিখিতভাবে

এ-ছন্দের দুঃসাহসিক প্রথম প্রয়োগ দেখা দিল ষোড়শ শতকের কবি লোচনদাসের 'ধামালি' রচনায়। এ-গুলি লোকরঞ্জনের জন্য রচিত। সুতরাং লোকসাহিত্যের প্রকারভেদ মাত্র। ভাবে ভাষায় ও ছন্দে ধামালি রচনা পুরোপুরি লৌকিক। লোচনদাসের সাধু রচনা চৈতন্যমঙ্গলে এ-ছন্দের ব্যবহার নেই। ধামালি রচনায় লৌকিক ছন্দ বা দলবৃত্তের আবির্ভাব বিস্ময়করভাবে যেমন সহজ তেমনি স্বাভাবিক। যেমন—

প্রাণ ছন্ ছন্ করে আমার মন ছন্ ছন্ করে।
আধকপালে মাথার বিষে রৈতে নারি ঘরে॥
লোচন বলে কাঁদছিস কেনে ঢোক আপনার ঘর
হিয়ার মাঝে গোরা চাঁদ মন ডুবায়ে ধর॥
—চৈতন্যমঙ্গল (অ. কৃ. গো., ১৩০৮) পরিশিষ্ট, পদ-২৫।

এখানে চারদলমাত্রার পর্ববিভাগ সুস্পষ্ট। তবে 'প্রাণ্ ছন্ ছন্', 'মন্ ছন্ ছন্' ও 'ঢোক্ আপ্নার্'—এই তিন পর্বে তিন রুদ্ধ দলে চার দলের কাজ সামলেছে। লোকসাহিত্যের এই ছন্দে-এরূপ প্রয়োগ অস্বাভাবিক নয়। তাতে ধ্বনিগত বৈচিত্র্য আসে। উদাহরণটিতে দলবৃত্ত পয়ারের রূপও স্পষ্ট।

কবি ভারতচন্দ্র রায়ও তাঁর অন্নদামঙ্গলে মেয়েদের মুখে একটি গানে দলবৃত্ত রীতির প্রয়োগ করেছেন—মাত্র একবার। তবে তাঁর সমসাময়িক কবি রামপ্রসাদ সেন এই লৌকিক ছন্দকে আবার সাহিত্যে স্থান দিলেন। তাঁর শ্যামাসঙ্গীত প্রধানতঃ এই ছন্দেই রচিত। রামপ্রসাদের কল্যাণে এই অবজ্ঞাত ছন্দোরীতিটি ভক্তিপদাবলীর বাহন রূপে ভদ্রসমাজে প্রবেশলাভ করল। সাধুসাহিত্যে তার স্বীকৃতির পথ সুগম হল। উচ্চ-ভাব-প্রকাশের শক্তি ও সৌন্দর্য দলবৃত্তকে অভূতপূর্ব গৌরব দান করল। রামপ্রসাদের এই প্রয়োগ যেমন বিস্ময়কর তেমনি আশাব্যঞ্জক। যেমন—

দূর হয়ে যা যমের ভটা।
ওরে আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা॥
বল্ গে যা তোর যম রাজারে
আমার মতন নিছে কটা।
আমি যমের যম হইতে পারি।
তা বলে ব্রহ্মময়ীর ছটা॥

প্রসাদ বলে কালের ভটা,
মুখ্ সামলায়ে বলিস্ বেটা।
কালীর নামের জোরে বেঁধে তোরে,
সাজা দিলে রাখবে কেটা॥
—রা. সেনের গ্রন্থাবলী (বসুমতী), পৃ. ৮৯।

দুইটি একপদী, দুইটি দ্বিপদী, আবার দুইটি একপদী এবং একটি দ্বিপদীর সমবায়ে এই গানটি রচিত। অতিপর্বের ব্যবহার লক্ষণীয়। দ্বিতীয় দ্বিপদীটির দ্বিতীয় পদের প্রথম পর্বটি 'ভাবলে ব্রহ্ম' পাঁচ মাত্রার হলেও উচ্চারণে বাধা জন্মায় না।

রামপ্রসাদের পর কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত দলবৃত্তের প্রয়োগে বিভিন্ন কলা-কৌশল দেখিয়েছেন। গুপ্ত কবির পূর্ব পর্যন্ত বাংলা কবিতা প্রধানতঃ গেয় ছিল, তাই তাতে ছন্দের নানাপ্রকার শৈথিল্য ও কৃত্রিম উচ্চারণের অবকাশ ছিল। ছাপা যন্ত্রের কল্যাণে কবিতা পুরোপুরি পাঠ্য হয়ে উঠল। তাই সর্বজনগ্রাহ্য ও সর্বজনবোধ্য সুনির্দিষ্ট যতি-বিভাগ এবং স্বাভাবিক উচ্চারণ-মান আবশ্যক হয়ে উঠল। ছন্দের ক্ষেত্রে এই ঘটনাটি বিশেষ তাৎপর্যময় এবং তার ফল সুদূর-প্রসারী। বাক্‌ধর্মী উচ্চারণের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল কবি ঈশ্বরগুপ্ত দলবৃত্তের শক্তি এবং উপযোগিতা বিষয়ে বিশেষ সজাগ এবং উদ্যমী ছিলেন। তবে প্রত্যাশিত আত্মবিশ্বাসের অভাব ছিল তাঁর মধ্যে। তিনি মনে করতেন—এই লৌকিক বা দলবৃত্ত ছন্দটি লোকরঞ্জক গীতিকবিতার পক্ষেই উপযুক্ত। তাই তাঁর রচনায় দলবৃত্তের সহজ ও সাবলীল গতি প্রত্যক্ষ হলেও উচ্চমানের কবিতায় তার প্রয়োগ ঘটেনি। ছন্দপ্রয়োগের ক্ষেত্রে ঈশ্বরগুপ্ত রামপ্রসাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত। উভয়ের রচনাতে বাংলা ছন্দের পরবর্তী রূপ ও বৈভবের পূর্বাভাস সূচিত হয়েছে।

অসমীয়া ছন্দের ক্রমবিকাশ

(হেমচন্দ্র-গুণাভিরাম পূর্ব ১৮৭২ খ্রী: পর্যন্ত)

মূলে অসমীয়া, ওড়িয়া ও বাংলা ছিল একই ভাষা। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে ওড়িয়া বঙ্গ-অসমীয়া থেকে এবং চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে অসমীয়া ও

বাংলা পরম্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র ভাষা রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ঘটনাটি স্বীকার্য অন্তত লিখিত সাহিত্যের বিচারে।[৫] সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচনাকাল পর্যন্ত আমরা বাংলা ছন্দের ক্রমবিকাশের যে পরিচয় পেয়েছি—অসমীয়া এবং ওড়িয়া ছন্দের ক্রমবিকাশের পরিচয়ও মোটামুটি তাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, নারায়ণ দেবের মঙ্গল কাব্য প্রভৃতি প্রাচীন বাংলা রচনা অসমীয়া সাহিত্যের অঙ্গীভূত মনে করা হয়। আনুমানিক ত্রয়োদশ শতকের কবি হেম সরস্বতী রচিত 'প্রহ্লাদ চরিত্র' অসমীয়ার একটি উল্লেখযোগ্য কাব্য।[৬] লক্ষণীয় এই প্রহ্লাদ চরিত্রে মিশ্রবৃত্ত অনেকটা সুষ্ঠু রূপ নিতে পেরেছে।

সরল কলাবৃত্ত রীতি (Simple Moric Style)

চর্যাপদের পর প্রত্নকলাবৃত্ত রীতির প্রয়োগ বাংলার মতোই অসমীয়া বৈষ্ণবপদাবলীতেও ঘটে। যাঁরা এই প্রয়োগ করেন তাঁদের মধ্যে কবি শংকরদেব (১৪৪৯-১৫৬৮) এবং মাধবদেব (১৪৮৯-১৫৯৬) প্রধান। তাঁদের রচনায় চার, পাঁচ, ছয় ও সাত কলামাত্রার পর্বের একপদী, দ্বিপদী এবং ত্রিপদী বন্ধের প্রয়োগ ঘটেছে। যেমন—

(১) চতুষ্কল পর্বিক একপদী :—

৪ ৪ ৪
নখচয় । চান্দক । পাঁতি I
পদতল । আর কত । ভাঁতি I
৪ ৪ ৪
ধ্বজ বজ্র । পঙ্কজ । শোহে I
পেখিয়ে । ত্রিভুবন । মোহে I

—শংকরদেব : 'রুক্মিণী হরণ'।

প্রত্যেক পঙ্‌ক্তির শেষ পর্বের প্রথম স্বর এবং চতুর্থ পঙ্‌ক্তির প্রথম পর্বের প্রথম স্বর কয়টি দীর্ঘ এবং দ্বিমাত্রক। 'ধ্বজ বজ্র'-এর 'বজ্‌' রুদ্ধদলটি একমাত্রক।

(২) চতুষ্কল পর্বিক ত্রিপদী :—

৪ ৪ ৪ ৪
লীলা গজগতি ॥ গমন বিলোচন ॥

২ ২ ২২১
বাণী মেঘ গম্ভীর I ৮ ॥ ৮॥ ১১ I

পাষণ্ড মর্দন ॥ কলিকো কালে
যাক সম । নাহি- । ধীর ॥
সোহি নারায়ণ মায়া বিস্তারি
করু ত্রিজগত নির্মাণ ।
সনক সনাতন যোগী য়ারি
মহিমা । কবহু ন । জান ॥

—মাধবদেব : 'গুরু ভাটিমা'

(৩) পঞ্চ কল পর্বিক একপদী ও দ্বিপদী :—

রময়া করু । মদন খেলা I
খেলে সঙ্গে । রঙ্গে গোপী । রমণী মেলা I

—শংকরদেব : 'কেলি গোপাল নাট'

এখানে একটি দীর্ঘস্বর ও দ্বিমাত্রিক অর্থাৎ দীর্ঘ নয়। এই অংশটুকু নব্যকলা-বৃত্তের লক্ষণাক্রান্ত বলা যায়। কারণ সব রুদ্ধদল দ্বিমাত্রিক, কিন্তু একটিও দীর্ঘস্বর দ্বিমাত্রিক নয়।

(৪) ষট্‌কল পর্বিক দ্বিপদী :—

৬ ৬ ৬ ৪
করকঙ্কণ । কিঙ্কিণী কণক ॥ বানকে চলে গো : পালা ।
পঞ্চম পুরে । লম্বিত উরে ॥ কেলি কদম্ব । মালা ।

—শংকরদেব : 'বরগীত'

'কিঙ্কিণী কণক'—পর্বে সাতমাত্রা আছে মনে হলেও কিঁকিণী কণক উচ্চারণ হলেই মাত্রা সাম্য রক্ষিত হয়। 'পালা' ও 'মালা'তে চার মাত্রা করে ধরতে হবে।

(৫) সপ্তকল পর্বিক দ্বিপদী :—

মোহন বংশিক । শবান শুনি কহ ॥ জীবন ধারণ । যায় I
রাখ রে প্রাণ । বন্ধু মাধব ॥ মধুর অধর সু : হায় I

—শংকরদেব : 'কেলি গোপাল নাট'

সাতমাত্রার পর্বের এমন নিদর্শন সেযুগে খুবই দুর্লভ।

মধ্যযুগের এই দুই সাধক কবির পর অসম কবিতায় প্রত্নকলাবৃত্তের প্রয়োগ

দীর্ঘদিন হয়নি। এই প্রত্নরীতি থেকে পরবর্তীকালে নব্যকলাবৃত্ত রীতির উদ্ভব ঘটে। আধুনিক যুগেও পদ্মধর চলিহা, রত্নকান্ত বরকাকতি প্রমুখ কবি প্রত্নকলাবৃত্তের প্রয়োগে আকৃষ্ট হয়েছেন। অবশ্য এই পদ্মধর চলিহা (১৮৯৫-১৯৬৪), সূর্য কুমার ভূঁইয়া (১৮৯৪-১৯৬৪), অম্বিকা গিরি রায়চৌধুরী (১৮৮৩—১৯৬৭), রত্নকান্ত বরকাকতি (১৮৯৭-১৯৬৩) প্রমুখ কবিদের রচনায় নব্যকলাবৃত্তের সুন্দর এবং সার্থক নিদর্শনও মেলে। অসমীয়ার কলাবৃত্ত রীতিটি এঁদের হাতেই বিবিধ রূপ ও বিচিত্র ধ্বনিসম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

মিশ্রকলাবৃত্ত রীতি (Mixed Moric Style)

প্রহ্লাদ-চরিত্র-কে অসম ভাষার প্রথম কাব্যগ্রন্থ মনে করা হয়। এর রচনাকাল বৈষ্ণব-পূর্ব যুগ বলে মনে করা হয়। তবে অসমীয়া সাহিত্যের স্বর্ণযুগ রূপে নব-বৈষ্ণব যুগের কবিদের মহৎ সাহিত্য সৃজনের কালই চিহ্নিত। সুতরাং অসমীয়া ছন্দের ইতিহাসেও এই যুগটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে হেম সরস্বতী, হরিহর বিপ্র এবং মাধব কন্দলীর ছন্দোরচনার কথা সর্বাগ্রে স্মরণীয়। তাঁরা প্রধানতঃ মিশ্রবৃত্ত রীতির পয়ার এবং একাবলী বন্ধই রচনা করেছেন। অন্যান্য বন্ধ তরল এবং নড়বড়ে অবস্থায় মেলে। এই পর্বের শেষের দিকে ত্রিপদী বন্ধটিও সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে। তখন কবিরা পয়ারের জন্য পদ এবং ছুলারীর (ত্রিপদী) জন্য 'দোলড়ী' ব্যবহার করতেন। রামায়ণে সর্বপ্রথম পয়ারের উল্লেখ মেলে আর 'ছবি'র প্রথম উল্লেখ মেলে গীতি-রামায়ণে।[৮] ষোড়শ শতকের দুর্গাবর কায়স্থের লেখার প্রধান মাধ্যম ঝুমুরা বন্ধেরও প্রথম সার্থক প্রয়োগ এবং উল্লেখ পাওয়া যায় মাধবব কন্দলীর রামায়ণেই। সম্ভবত এই ধরনের প্রয়োগ আধুনিক ভারতীয় ভাষায় এই প্রথম। হেম সরস্বতীর পয়ার ও ত্রিপদীর রূপ দেখা যাক—

পয়ার—মাধব সে পিতামাতা মাধব সে প্রাণ।

মাধবত। পরে কোন্ ॥ বন্ধু আচে। আন ॥ I
জত দেখা। ব্যাঘ্রজল ॥ স্থল গিরি : বন। I
গজভুজ। সবাতে আ ॥ চন্ত নারা : য়ণ ॥ I

—অসমীয়া সাহিত্যর বুরঞ্জী—পৃ. ১৭৪

ত্রিপদী—এভে হেন করা ॥ হরি হু সুমরা ॥
থাকা মোর আজ্ঞা পালি । I
মোর পুত্র তোক ॥ রাজ্য ভার দেওঁ ॥
মাধবক পারা গালি । I

—পূর্ববৎ

ধ্বনিবিন্যাস, পর্ব ও পদের বিচারে পয়ার ও ত্রিপদী কেমন সুদৃঢ় রূপ লাভ করেছে তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মাধব কন্দলীর রচনায় এই পয়ার ও ত্রিপদী আরও পরিণত এবং সুষ্ঠু রূপ লাভ করে। কারো কারো মতে এই ত্রিপদী (৬+৬+৮) বা ঢুলারী সর্বোৎকৃষ্ট গীতিকবিতার বাহন হয়ে উঠে মাধব কন্দলীর হাতেই।* ৮+৮+১০=২৬ মাত্রার ছবি বা দীর্ঘ ত্রিপদী বন্ধও মাধব কন্দলীর হাতেই নিখুঁত রূপ লাভের দিকে অগ্রসর হয়েছে। তবে অপরাপর কবিরা দীর্ঘ ত্রিপদী বন্ধের রচনা করেছেন খুবই কম! তাই নিখুঁত রূপ লাভ করতে তার বেশ সময় লেগেছে। একটি উদাহরণ :—

অতি প্রীতি বন্ধে তাক বিশ্বকর্মে নির্মিলন্ত
সুবর্ণ মাণিকে থানে থানে।
চন্দ্র আদিত্যক ধিক্ আতি বিতোপন জ্বলে
দেখিলন্ত বীর হনুমানে ॥
ও য়ারি মধ্যত চিত্র থানে থানে দেখিলন্ত
আতি বর বিস্তার গহীন।
নির্মল কমল সব পরিমল বৃক্ষচয়
সুগন্ধিত বহয় পবন ॥

—মাধব কন্দলী—সঞ্চয়ন (সা. আ., ৮ম সং) পৃ. ৪

বৈষ্ণব যুগে শংকরদেব এবং মাধবদেবের রচনায় মিশ্রবৃত্ত আরও নতুন নতুন রূপ লাভ করেছে। এই রীতিটি তার সমস্ত শক্তি ও সৌন্দর্য নিয়ে যেন ধরা দিতে চেয়েছে এযুগের কবিদের হাতে। বিশেষ করে শংকরদেব তাঁর প্রতিভার স্পর্শে বিবিধ ও বিচিত্র রূপে ব্যবহারের মাধ্যমে এই ছন্দটিকে পরিণতির দিকে নিয়ে যান এবং মাধবদেব তাকে সম্পূর্ণতা প্রদান করেন। এই প্রসঙ্গে ১০+১০+১৪ =৩৪ মাত্রার ত্রিপদী ছন্দোবন্ধ—লেচারি বা লাচারীর কথা স্মরণীয়। অসমীয়া ছন্দে এইটিই বৃহত্তম ছন্দোপংক্তি। এই ছন্দোবন্ধটির উপযোগিতা আজও অবশ্য স্বীকার্য। তারি সঙ্গে দুর্গাবর কায়স্থ, পিতাম্বর কবি, সুকবি নারায়ণদেব,

অনন্তকন্দলী এবং রাম সরস্বতী প্রমুখ কবিদের হাতেও মিশ্রবৃত্ত রীতির নিপুণ প্রয়োগ ঘটেছে দেখা যায়। বৈষ্ণবসাহিত্য এবং অনুবাদকাব্য সরস এবং উপভোগ্য হয়ে উঠেছে এই মিশ্রবৃত্তের সহজ এবং বিচিত্র ব্যবহারের ফলে।

দলবৃত্ত রীতি (Syllabic Style)

যে কোন ভাষার স্বাভাবিক ছন্দের প্রথম পরিচয় ফুটে ওঠে প্রাচীন যুগের সহজ স্বাভাবিক গানে ও ছড়ায়। তবে তা থাকে অলিখিত। যুগ যুগ ধরে মানুষের মুখ থেকেই তার ঘটে যুগোচিত বিবর্তন। অসমীয়াতেও "পুরাণ··· কিছু মান যোজনা—ফকরা আরু 'পটন্তর', 'ডাকর বচন', 'লরান্দ ও মলা' 'নাম' আদি মৌখিক গীত-সাহিত্যেও অসমীয়া ছন্দর প্রথম আভাস পোওয়া হয়। স্বাভাবিক উচ্চারণ রীতি আরু হেঁচা (এক্সেণ্ট) এয়েই ইহার মূলতত্ত্ব; আখর গণনা বা মাত্রা-পরিমাণ নির্ণয়র কোনো চেষ্টা এই ছন্দর ভিতরত নাই, প্রতি পর্বর অখণ্ড ধ্বনির (ছিলেব্‌ল) লেখ থাকিলেই এই ছন্দ অক্ষুণ্ণ থাকে। এটা যুগ্ম আরু অযুগ্ম স্বরর অস্তিত্বই প্রত্যেক অখণ্ড ধ্বনির যাই কথা, সেইবাবেই এই ছন্দর একোটি পর্বর নাম স্বরপর্ব আরু স্বরপর্বর বিভিন্ন সমাবেশেরে রচিত বুলি ইয়ার নাম স্বরবৃত্ত।[১০] এই উদ্ধৃতিই সাক্ষ্য দেয় যে অসমীয়া ও বাংলা দুই লৌকিক ছন্দই প্রকৃতি, উচ্চারণ, রূপ এবং নামে এক। বর্তমানে বাংলায় 'স্বরবৃত্তের' বদলে 'দলবৃত্ত' ব্যবহার করা হয়। আমরাও তাই করব। বাংলা ছড়ার মতোই অসমীয়া ছড়াও নানা রকমের। এখানে দুইটি অসমীয়া ছড়ার অংশ বিশেষ দেওয়া গেল:—

(১) অ-ফুল, অ-ফুল, মু-ফুল কিয় ?
গরুওয়ে যে আগ খায়, মইনো ফুলিম কিয় ?
অ-গরু অ-গরু আগ খাওর কিয় ?
গরখীয়াই যে গরু নরখে, মইনো নাখাম কিয়। ইত্যাদি—
—অসমীয়া সাহিত্যর বুরুঞ্জী, পৃ. ৮০

(২) কথিলেই কথা মথিলেই ঘিউ
ভাতত দিয়া হাঁহকনীর কেনি যায় জীউ॥
যার হাত জালর তের হাত ফুটা।
ভাল মারিলি বাপর বেটা॥

বউ-বরালি সর কি গল।
পুঠি-খলিহা পাহে পাহে বল ॥

—পূর্ববৎ, পৃ. ৮২

কোনো উদ্ধৃতিই সুস্পষ্টভাবে চতুর্দল পর্বিক নয়। তবে প্রবণতা যে চতুর্দল পর্বের দিকেই এবং পর্ব প্রধানত তাল- আশ্রিত, তাতে সন্দেহ নেই। এই লোকগীতির তাল-আশ্রিত ভঙ্গিই পরবর্তীকালে চতুর্দল-পর্বের আয়তন সুস্পষ্ট এবং বিশিষ্ট করে তুলেছে। ডাকের বচন আদিতেও এই রীতির প্রয়োগ স্বাভাবিক। তবে তা ছন্দের বিচারে ভারসাম্যহীন ও অসংস্কৃতবেশ। ঘুমপাড়ানি গান ইত্যাদিতেও তার অনুরূপ প্রয়োগ মেলে। সেখানেও তার তাল-আশ্রিত-উচ্চারণ বিভাগ স্পষ্ট। সুর করে গাইলে আর ছন্দের ত্রুটি ধরা পড়ে না। একটি উদাহরণ—

রাজাক চিনিবা দানত
ঘোড়াক চিনিবা কানত
খুরক চিনিবা শানত
তিরীক চিনিবা স্নানত।[১১]

দুই-তিন-দুই মাত্রাক্রমের প্রয়োগে—সাত দলমাত্রার একপদীর প্রয়োগ লক্ষণীয়। অসমীয়া দলবৃত্ত রীতির পর্যবেক্ষণ, রূপায়ণ এবং ব্যবহারের বিচারে ষোড়শ শতকের কয়েকজন কবির কথা স্মরণ করতে হয়। তাঁরা হলেন—অনিরুদ্ধদেব (১৫৫৩-১৬২৬), যদুমণি দেব (১৫৬৪-১৬৩১), চান্দসী (ষোড়শ শতক), শাহ মিলন (সপ্তদশ শতক) ও কৈবল্যানন্দদেব (১৭১৫-৪৮)। শেষের দুইজন কবি পরবর্তী দুই শতকের।

এঁদের মধ্যে শাহ মিলনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি দলবৃত্ত পয়ার, ত্রিপদী (ছবি, দুলারী) প্রভৃতি রচনা করেন। যেমন—

পয়ার— দই মিঠা। দুগ্ধ মিঠা ॥ আরু মিঠা। ননী I
সবাৎ করি। অধিক মিঠা ॥ মুর্শিদ মুখর। বাণী। I[১২]

ত্রিপদী— হকরবিনে চককর নাই ॥ আল্লার বিনে গতি নাই ॥
নবীর বিনে নাই নিস্তার I
আওয়াল কলিমার বিনে ॥ আন জিকির আরু নাই ॥
রব বিনে অথলই সংসার I[১৩]

শাহমিলন দল-কলামাত্রিক বা দ্বৈতছন্দের রচনা করলেও সার্থক দলবৃত্ত

রচনার চেষ্টাও করেছেন। যেমন—

চড়াই হৈলে। সজা লাগে॥ সজা হৈলে॥ পাখী I
হস্তী হৈলে। শুরক লাগে॥ কণা হৈলে। লাঠী I
হাট হৈলে। বাজার লাগে॥ দোকানী লাগে। তাত I
নাই হৈলে। নউকা লাগে॥ বৈঠা লাগে। তাত I[১৪]

তৃতীয় ও চতুর্থ পঙ্‌ক্তির প্রথম পর্বে তিন দলমাত্রা এবং তৃতীয় পঙ্‌ক্তির তৃতীয় পর্বে পাঁচ দলমাত্রার বিন্যাস ঘটেছে। তবে ছন্দের ভারসাম্য নষ্ট হয়নি॥ এরূপ প্রয়োগে এ-ছন্দের সৌন্দর্য বাড়ে।

কবি যদুমণিদেব পঞ্চদল পর্বিক পঙ্‌ক্তির সাহায্যে সুন্দর ধ্বনিবদ্ধ রচনা করেছেন। তা নিয়ে নানাপ্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তবে দুর্লভ রূপটি দাঁড় করিয়েছেন। যেমন—

নন্দ দুলনা
জগ ভুলনা
রুচি বুলনা
নাহি তুলনা।[১৫]

অনুরূপ প্রয়োগ চিকুন গোঁসাই বা কৈবল্যনন্দন দেবের রচনাতেও ঘটেছে।—

কৃষ্ণ চরণা
ভব-তরণা
ভক্তি ভাবনা
পদ সেবনা
প্রেম চরণা
কৈবল্য ভজনা।[১৬]

২+৩=৫ দলের চরণের রচনায় অন্তিম চরণটি ৩+৩=৬ দলমাত্রার। এইভাবে ভক্তি গীতির রচনায় অসমীয়া দলবৃত্ত মধ্যযুগেই যেন একটি গৌরবের আসন লাভ করেছিল। তবে সাধু সাহিত্যে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য বাংলা দলবৃত্তের মতোই অসমীয়া দলবৃত্তকেও উনবিংশ শতক পর্যন্ত প্রতীক্ষা করতে হয়।

ওড়িয়া ছন্দের ক্রমবিকাশ

(ফকীরমোহন-পূর্ব ১৮৭২ খ্রীঃ পর্যন্ত)

আমরা জানি প্রাচীন ও মধ্যযুগের ওড়িয়া কবিতা প্রধানত গেয় ছিল। তবে তা সুর-তাল লয়ের সাহায্যে, রাগ-রাগিণীর সাহায্যে নয়। রাগ-রাগিণীর সাহায্যে গেয় রচনা সঙ্গীত,[১৭] সুর-তাল লয়ের সাহায্যে গেয় রচনা গীত এবং সময়ের বিচারে অনিয়মিত ধ্বনিবিন্যাসে রচিত বস্তু, ছন্দোহীন গদ্য।[১৮] সংস্কৃত ও হিন্দীর অনুসারী ওড়িয়াতেও 'ছন্দ' শব্দটি বহুল প্রচলিত। যা বহু অক্ষর ও পদের সমন্বয়ে রচিত, ঘোষা বা ধ্রুবপদহীন, সমানভাবে প্রতিটি চরণই গেয়, তাই 'ছান্দ' নামে পরিচিত।[১৯] রাগ-তাল দিয়ে গেয় নয়। শ্যামসুন্দর ধীরের মতে—"এহি ছান্দ মানংকরে অনেক স্থলরে রাগর নাম লেখা অছি, কিন্তু তালর নাম লেখা থিবা বহুর্তকম্ দেখা যাএ। কেতেক ছান্দরে উৎকল প্রচলিত বৃত্ত বাণীরে গাইবার লেখা অছি ও অনেক ছান্দরে বৃত্ত বা ধ্বনির নাম ও বৃত্ত ও রাগর নাম উভয় লেখা অছি। বৃত্ত যথা—কালি, গড়মালিআ, চক্রকেলী, চোখি, ঢুম্পা, ধীপা, রণবিজে, মুনিবরবাণী পোই, কোইলি, সঙ্গমতিয়ারি, কলসা, সজনী-চৌতিশ, আষাঢ় শুক্ল—এহি পরি আহুরি কেতেক বাণী অছি। এহি বাণী মধ্যরে কেতে বাণী সহিত রাগ নাম লেখা অছি। ছন্দকু রাগ তাল সহিতন গাইলে তাহাকু পদ্যাবৃত্তি কুহা যিব। এহা অধ্রুব পাঞ্চালীর মধ্যরে গণ্য। এহি ছান্দ সংস্কৃত ছন্দরু আসি কেতেক ছন্দের নাম ওড়িআরে নাম করা যাই অছি ও কেতেক ছান্দর ওড়িআ নাম দিআ হোহি নাহিঁ। তাহাকু যেউ রাগরে গাইব, তাহার নাম লেখা অছি। যেউ সংস্কৃত ছন্দর ওড়িআ নাম নাহিঁ তাহার সংস্কৃত বৃত্ত নাম ওড়িআরে কুহাযিব।"

—উৎকল সঙ্গীত পদ্ধতি (১৯৬৪) পৃ. ৩৪৪।

ওড়িয়া ছান্দ-রচনার ছন্দ পরিচয় রাগ-রাগিণীর নামেই গড়ে উঠেছে। ওড়িয়া পুরাণাদির রচনা হয়েছে দাণ্ডিবৃত্তে। তা পাঠের সময় "বক্তা সাধারণতঃ যতিপাত সহিত কথা কহিবা কিম্বা বক্তৃতা দেবা তুল্য বখানি থান্তি।…এ-সবুরে রাগ কি তালকু আদৌ দৃষ্টি দিয়া যাএ নাহিঁ।"[২০] সুতরাং ওড়িয়ার অধিকাংশ রচনাই সঙ্গীত, পদ্যাবৃত্তি-জাতীয় রচনা তুলনায় কম। অবশ্য আধুনিক যুগে তার ব্যতিক্রম দেখা যায়।

সরল কলাবৃত্ত (Simple Moric Style)

ওড়িয়া মাত্রাবৃত্ত বা কলাবৃত্ত ছন্দ সংস্কৃত-প্রাকৃত আগত। কিন্তু স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ ওড়িয়াতে না থাকায় সংস্কৃত ছন্দ ওড়িয়াতে ভালো বসে না। তবু ওড়িয়া কবিগণ চেষ্টার ত্রুটি করেননি। তবে আশানুরূপ ফল লাভ কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি। এই প্রসঙ্গে দেবদুর্লভ দাসের 'রহস্য মঞ্জরী'র কিছু কিছু ছন্দের কথা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার—"সংস্কৃতানুসারী ছন্দ ওড়িআরে যে পরি কৃত্রিম সেহিপরি অনাবশ্যক।"[২১] তবু ওড়িয়া উচ্চারণ যে আকস্মিকভাবে কোনো সময় হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণ পরিত্যাগ করে বসেছে একথা মনে করার কারণ নেই। তা হয়েছে ধীরে ধীরে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। চর্যাপদের মধ্যেই মাঝে মাঝে দীর্ঘ স্বর হ্রস্ব হয়ে এসেছে দেখা যায়। ওড়িয়া সাধু সাহিত্যের মধ্যযুগে দীর্ঘকে হ্রস্ব উচ্চারণ করার প্রবণতা ক্রমে ক্রমে প্রবল হচ্ছিল। তাই বাংলার মতোই ওড়িয়া বৈষ্ণব সাহিত্যে দীর্ঘস্বরের দীর্ঘ ও হ্রস্ব উভয়বিধ উচ্চারণ পাওয়া যায়। তাও তার পরিমাণ খুবই কম। বাংলার মতো ওড়িয়াতেও ব্রজবুলির প্রয়োগ ঘটেছে তবে পরিমাণে কম। পঞ্চসখা সাহিত্যে প্রধানত মিশ্রবৃত্তের প্রয়োগ ঘটেছে। ওড়িয়ার শেষ বৈষ্ণব কবি গোপালকৃষ্ণ রচিত 'লাবণ্যবতী' কাব্যে প্রত্ন কলাবৃত্তের প্রয়োগ চোখে পড়ে। এখানে তার একটি নিদর্শন দেওয়া যাক—

২ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
শ্যাম অ : প বাদ ॥ মতে লাগি। আউ I

১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১
নিতি সেহি। চিন্তারে॥ মো দিন। যাউ I

২ ১ ১ ২ ১ ১ ২ ২ ১ ১
চাহি দে : লে অরে॥ সে শ্রী। মুখ I

২ ১ ২ ২ ১ ২ ১ ১ ১ ১
কোটি এ কোটি॥ জন্মর। দুঃখ

১ ১ ১ ১ ২ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১
লিভি যাউ। ছুরে॥ পরাণ মি : ত্তনি I

২ ১ ১ ২ ১ ১ ২ ২ ১ ১
যে যে তে। বো লি লে বোলু। আ উ I

—লাবণ্যবতী

প্রত্ন কলাবৃত্ত রীতির এই পঙ্‌ক্তি কটি পয়ার বন্ধের। পঙ্‌ক্তি কটিতে (চতুর্থটি বাদে) যথাক্রমে তিনটি (তে, লা, আ), চারটি (সে, তা, রে, যা), দুটি (দে, রে), দুটি (যা, রা) এবং তিনটি (যে, তে, আ) করে দীর্ঘস্বর হ্রস্ব উচ্চারিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ষোড়শ সপ্তদশ শতকের কবি দেবদুর্লভ দাসের নামও উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে মধুসূদন রাও এবং নীলকণ্ঠ দাসও ভগ্নমাত্রাবৃত্তে কবিতা রচনার চেষ্টা করেছেন। কবি পদ্মচরণ পট্টনায়কের কোনো কোনো রচনাতেও ভগ্ন-জয়দেবী বা প্রত্নকলাবৃত্তের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় যেমন—

আজি আসিছি ঘনঘোর বরষা
মুগ্ধ ধরণী আজি, শ্যাম বসনে সাজি
রাজই মধুরিত সুন্দর দরশা।

এখানে প্রথম পঙ্‌ক্তির আ, ষা, দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির শ্যা, এবং তৃতীয় পঙ্‌ক্তির রা ও শা দীর্ঘ বা দ্বিমাত্রক। অন্যত্র দীর্ঘস্বর লঘু বা একমাত্রক। এই রচনাটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষামঙ্গল' কবিতার ছন্দোগত সাধর্ম্য লক্ষিত হয়।

সংস্কৃত মাত্রাবৃত্তে যুক্ত ব্যঞ্জন বা রুদ্ধদলের পূর্ব ধ্বনিকে দীর্ঘ বা দ্বিমাত্রক ধরার নিয়ম। কিন্তু ওড়িয়া দাণ্ডিবৃত্তে তা মানা হয়নি। বৈষ্ণব সাহিত্যেও তা হয়নি। তবে আধুনিক যুগে এসে রুদ্ধদলকে দ্বিমাত্রক রূপে উচ্চারণ করার প্রবণতা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে কোনো কোনো কবির রচনায়। বলাই বাহুল্য এইভাবে ওড়িয়াতেও সরল কলাবৃত্ত রীতির প্রবর্তনা সম্ভব হয়েছে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক গৌরীকুমার ব্রহ্মার একটি অভিমত স্মরণীয়—

"আমে ওড়িআরে কৌতুক, যৌবন গৌরব, ঐরাবত, বৈশাখ দৈব প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ কলা বেলে চেষ্টা কলে মধ্যও 'ঔ' এবং 'ঐ' কু লঘুবর্ণ পরি উচ্চারণ করি পারিবা নাহিঁ।"

—ওড়িআ কবিতার ছন্দ (১৯৬৭), ১০২।

বলাই বাহুল্য 'ঔ' এবং 'ঐ' রুদ্ধস্বর বা রুদ্ধদলই। এইভাবে আধুনিক ওড়িয়া কাব্য-কবিতার ক্ষেত্রে সংস্কৃত মাত্রাবৃত্ত ছন্দ রূপান্তর লাভ করেছে।[২২] বিংশ শতকের প্রথম দুই দশক ওড়িয়া মাত্রাবৃত্ত বা কলাবৃত্ত ছন্দের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাল রূপে বিবেচিত।[২৩] এই সময়ের রচনায় মাত্রাবৃত্তের তরল রূপই চোখে পড়ে। তৃতীয় দশকের প্রারম্ভে কলাবৃত্ত রচয়িতা কবিদের মধ্যে আস্থার ভাব দেখা দিল। গঠিত হল 'সবুজপন্থী গোষ্ঠী। অতঃপর আত্মবিশ্বাসে

ভরপুর ধীর-গম্ভীর পদক্ষেপে যাত্রা শুরু করল ওড়িয়া কলাবৃত্ত ছন্দোরীতি। কিন্তু 'সবুজপন্থী' গোষ্ঠীর পূর্বের একজন কবির নাম এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি হলেন মধুসূদন রাও। জনৈক সমালোচকের মতে :—

"মাত্রিক ছন্দ ওড়িআ সাহিত্যরে নতুন কহিলে চলে। ছান্দসাহিত্যরে এহার কৌণ সি স্থান ন থিলা। অন্য কেতেক স্থলরে এহার পরিসরও প্রচার থিলা অতীব সীমিত। আধুনিক ওড়িআ কবিতার ইতিহাসরে মধুসূদন হেউচ্ছন্তি এক্ষেত্ররে প্রথম কলাকার। তাংকর এই প্রাথমিক উদ্যম হেতু সে ছন্দর নির্ভুল পরীক্ষা সর্বত্র তাংক সাহিত্যরে আশা করা যাই ন পরে।

কিন্তু আধুনিক কবিতারে কানর যে একটি প্রধান ভূমিকা অছি তাহা সে উপলব্ধি করি থিবার স্পষ্টতঃ অনুভূত হুএ।"

—নটবর সামন্ত রায়ের : ওড়িআ সাহিত্যেরে সমীক্ষা ও সংগ্রহ, পৃ. ১১২

মনে রাখা দরকার মধুসূদন রাওয়ের ওড়িয়া মাত্রাবৃত্ত আসলে প্রত্নকলাবৃত্তই।

মিশ্রকলাবৃত্ত রীতি (Composite Moric Style)

রাগ-রাগিণীর প্রভাবমুক্ত সুর সংযোগ পাঠ্য ওড়িয়া রচনার একমাত্র বাহন দাণ্ডিবৃত্ত পঙ্‌ক্তি-পঙ্‌ক্তিতে অক্ষর সংখ্যাগত অসমানতাই এ-ছন্দের প্রধান বিশিষ্টতা বলে মনে করা হয়।[২৪] সারলা দাসের মহাভারত, বলরাম দাসের রামায়ণ অচ্যুতানন্দ ও বিপ্রনারায়ণের 'হরিবংশ' এবং পিতাম্বর দাসের 'নৃসিংহ পুরাণ' প্রধানতঃ দাণ্ডিবৃত্তেই রচিত। অসম কিন্তু সমিল পঙ্‌ক্তিক এই রচনায় ৮, ১১, ১৪ থেকে ২৬ অক্ষর-মাত্রা পর্যন্ত বিন্যস্ত দেখা যায়-এক এক চরণে। গোনা হয় অক্ষর-মাত্রা সুতরাং অক্ষরমাত্রিক ছন্দ হওয়াই সমীচীন। তবে অক্ষর গোনা ছন্দ নামটি গ্রাহ্য নয়। কারণ অক্ষর গুনে এ-ছন্দকে ঠিক চেনা যায় না। যাইহোক চোদ্দ মাত্রার দিকে প্রবণতা থাকায় এ-টিকে পয়ার বন্ধের ছন্দ বা 'পয়ার জাতীয়' ছন্দ বলা চলে। সারলা দাসের মহাভারত থেকে দাণ্ডিবৃত্তের উদাহরণ—

কলিকাল ধ্বংসন ভোগেণ কোটি পূজা।
প্রণমিতে খটই দেবাধিদেব কপিলেশ্বর মহারাজা।

প্রথম পঙ্‌ক্তিতে ১৪ মাত্রা থাকলেও পরেরটিতে আছে ২১ মাত্রা। অক্ষর

গণনাতেও একপ্রকার তাই। আবার পর-পর দুই পঙ্‌ক্তিতেই চোদ্দটি করে মাত্রা আছে এবং তা পুরোপুরি পয়ার নামধেয় এমন রচনাও আছে প্রচুর। যেমন—

প্রথমে বন্দই মাগো কোণারক চণ্ডী
মুখ গোটি শোভা তোর সিন্দূরয়ে মণ্ডি।

—মধ্যপর্ব।

লক্ষণীয়—বন্, দই্, চন্, সিন্, মন্ রুদ্ধদল কটির মধ্যে একমাত্র 'দুই' শব্দান্তিক তাই প্রসারিত ও দ্বিমাত্রক। বাকি কয়টি সেরূপ না হওয়ায় উচ্চারণ সংকুচিত এবং একমাত্রক। সারলাদাসের দাণ্ডি মহাভারতে দাণ্ডিবৃত্ত ছাড়া অন্য কোনো বন্ধের প্রয়োগ চোখে পড়েনা। পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগের (আনু ১৪৬০ খ্রী.) রচনা এই মহাভারত। অতঃপর বৈষ্ণব কবি বলরাম দাসের দাণ্ডি-রামায়ণে এই ছন্দের প্রয়োগ মেলে। তাতে অবশ্য 'নবাক্ষরী' ছন্দও আছে। দাণ্ডিবৃত্তের রূপ কতকটা সুস্পষ্ট এবং সুন্দর হয়ে উঠলেও তরল-নড়বড়ে স্বভাবটি তার থেকেই গেছে। পঞ্চসখা সাহিত্যে যেমন নবাক্ষরী ছন্দ রচিত হয়েছে তেমনি একাবলী, দ্বিপদী (৬+৬ ॥ ৬+২) এবং চৌপদীও ব্যবহৃত হয়েছে। লোকনাথ বিদ্যাধরের 'নীলাদ্রিমহোৎসব' রচনায় কয়েকটি পঙ্‌ক্তি—

তথাপি এমন্ত চিন্তি ॥ কেবল প্রবন্ধ রীতি ॥
পূর্বরু কবি-সংহতি কহি অচ্ছন্তি এ I
যথা কথোচিত হোই ॥ সদৃশ উপমা পাইঁ ॥
সম উপমা যন্তপি নাহিঁ এ I

মিশ্রবৃত্ত ত্রিপদী (৮। ৮ ॥ ১৪ I) রচনায় ধ্বনি বিন্যাসের ক্রম এবং পঙ্‌ক্তি শেষে দীর্ঘস্বরের সংযোজন রচনাটির গেয় ধর্মিতার পরিচায়ক। অষ্টাদশ শতকের রচনায় অসম পঙ্‌ক্তিক দাণ্ডিবৃত্ত সুস্থির পয়ারের রূপ লাভ করেছে।—

অপ্রাকৃত। প্রেম মূর্তি ॥ জয় রাধা। হরি I
অব্যক্ত লী : লাকু ব্যক্ত ॥ কর অব : তরি। I

—অভিমন্যু সামন্ত সিংহ : 'বিদগ্ধচিন্তামণি'

চোদ্দমাত্রার পঙ্‌ক্তি ৮ ও ৬ মাত্রার পদভাগে বিভক্ত। চার মাত্রার পর্বভাগ ও যতিলোপও লক্ষণীয়। পঙ্‌ক্তি শেষে দুই মাত্রার অপূর্ণ পর্ব। 'আট ছয় আট ছয়, পয়ারের ছাঁদ কয়'—সার্থকভাবে অনুসৃত বলা যায়। অবশ্য ওড়িয়াতে এই চোদ্দমাত্রার পঙ্‌ক্তিবন্ধ পয়ার নয়, 'মঙ্গল' 'কলসা', 'ভৈরব', 'মধুসন্ধ্যা', ও 'বাণী মুখারী' প্রভৃতি নামে পরিচিত। তবে 'মঙ্গল' ও 'কলসা'

নামই সমধিক প্রচলিত। সে যুগের অন্যান্য কবিদের মতোই 'রসকল্লোলের' কবি দীনকৃষ্ণ দাসের হাতেও পয়ার সুদৃঢ় ও সার্থক রূপ লাভ করেছে।—

কর্কশী তেজস্বী এ সহজ মহারাজা
কেবল এহাঙ্ক্ তলে হেবি মু' পরজা।
কর দেই নিরন্তরে করি থিবা সেবা
কি ছি মাগু নাহিঁ মোর এতে হিঁ কহিবা।'

—রসকল্লোল-২৩ ছান্দ।

কবি উপেন্দ্র ভঞ্জ এই রীতিকে ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে সুবিধামতো নানাভাবে ব্যবহার করেছেন। তার মধ্যে ষোলো ও কুড়ি মাত্রার দ্বিপদী রূপে প্রয়োগ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। (১২ ॥ ৯ =) ২১ মাত্রার একটি দ্বিপদীর দৃষ্টান্ত—

দেখাইব একা লেখাইব নাহিঁ তা ঠাক বিনয় পত্তর।
লেখাইব যেবে বিনয় পত্রিকা রখাইব একা পাশর॥

—লাবণ্যবতী—১০ম, ছান্দ-২৭।

অষ্টাদশ শতকের শেষ উল্লেখযোগ্য সন্ত কবি হাড়ু দাস (জন্ম ১৭৭২ খৃঃ আ.) ও ছন্দ প্রয়োগ অভিনবতা দেখিয়েছেন। সারলা দাসের মহাভারতের 'দাণ্ডিবৃত্ত' ক্রমে ক্রমে সুস্পষ্টভাবে মিশ্রবৃত্ত (অক্ষরবৃত্ত) পয়ারের এবং অন্যপ্রকার দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদীর রূপ নিয়েছে। তবে দ্বিপদীর রচনাতেই এই ছন্দের বৈচিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—

এ হীন হাড়িআ নোহিব কি ঠিয়া এ হি রূপে যাক্ দিঅ নাশি,
তবে মিনা সত্য সম হোইথিব রত্ন সিংহাসন হৃষিকেশী।

—ভাবনাবর-২৬শ অধ্যায়।

উদ্ধৃত পঙ্ক্তি দুটিতে মিশ্রবৃত্ত রীতির ষট্‌কল পর্বিক প্রয়োগ লক্ষণীয়। মিশ্রবৃত্ত চৌপদী বন্ধের রচনাতেও ওড়িয়া কবিরা আগ্রহ দেখিয়েছেন। একটি দৃষ্টান্ত—

পৃথী আপ তেজ বারি॥ জ্যোতি ব্রাহ্মকলা বেহি॥
চন্দ্র সূর্য উদে হোই॥ ন পাইলে অন্ত আদ্য।
ছপন্ন কোটি জন্তুজীব করি ন পারিলে ঠাব
মুনি তপস্যারে বসি মনরে হেলে তা বাধ্য॥

—ভীম ভোইজ : ভমন মালা।

চতুষ্কল পর্বিক ৩২ মাত্রার এই চৌপদী বন্ধটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য।

লক্ষ করলে দেখা যায় ওড়িয়ার মিশ্রবৃত্ত রীতি একটি প্রাচীন এবং প্রতিষ্ঠিত ছন্দোরীতি। তবে তার প্রয়োগে কবিদের মন নিশ্চিত হতে পারেনি। তাই মাঝে মাঝে চারের স্থলে পাঁচ মাত্রার ('ছপয়কোটি') পর্বের প্রয়োগও মেলে। ঊনবিংশ শতকে মিশ্রবৃত্ত রীতিতে ভাবের প্রবহমানতা প্রবর্তিত হয়। পরবর্তীকালে এ-ছন্দ নিয়ে নানাপ্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে তার শক্তি ও সুষমা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

দলবৃত্ত ছন্দ (Syllabic Style)

ওড়িয়াতে লোকগীতির ছন্দকে সাধারণভাবে 'গাঁউলি গীতির ছন্দ' বা 'ঢগঢমালি ছন্দ' বলা হয়ে থাকে। কিন্তু ভাবে ভাষায় ও ছন্দে লোকগীতির বিশিষ্টতা স্বীকৃত হলেও ওড়িয়ায় ঢগঢমালি আদিক দাণ্ডিবৃত্তের নামান্তর মনে করা হয়। দাণ্ডিবৃত্তে লোকসাহিত্য সৃজন নয়, হয়েও থাকে। কিন্তু তাই বলে তাকে প্রাকৃত বা লোকসাধারণের ছন্দ নামে চিহ্নিত করা সর্বৈব সমীচীন মনে হয় না। লোকসাহিত্যের একপ্রকার বাহন রূপে তার উল্লেখ চলতে পারে। লোকগীতির ছন্দ প্রাকৃত বা দলবৃত্ত ছন্দই। তবে ওড়িয়া সাধু সাহিত্যে এই দলবৃত্তের প্রয়োগ খুবই কম। কারণ সাধারণভাবে ওড়িয়া উচ্চারণে স্বরের সম্পূর্ণ এবং পৃথক অস্তিত্ব স্বীকৃত। তাই ওড়িয়া দলবৃত্তের পাঁচ বা ছয় মাত্রার পর্বের ব্যবহার প্রভূত পরিমাণে হয়। স্বরের বিশেষ করে শব্দান্তিক স্বরের উচ্চারণ দুর্বল এবং লুপ্ত হলে, সন্নিকৃষ্ট স্বরধ্বনির সন্ধি বা একটির লোপ ঘটলেই এই ছয়মাত্রার পর্ব পাঁচ এবং চারমাত্রার রূপ নেয়। তখন তার দলবৃত্ত বা Syllabic রূপটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ-টা পরিলক্ষিত হয় ওড়িয়া উপ-ভাষাগুলিতে। ভাষাতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক ব্রজমোহন মহান্তির মতে—

"ওড়িয়া সাধুভাষার বহু শব্দ স্বরান্ত শব্দ, অর্থাৎ শব্দগুড়িকর অন্ত্যবর্ণরে স্বরর ঝংকার অধিকতর হুয়ে। হেলে আঞ্চলিক ভাষাগুড়িকরে সে পরিস্বরান্ত সমাপ্তি প্রায় হুএ নাহিঁ। এহি বৈশিষ্ট্য বিশেষ পরিমাণরে দক্ষিণাঞ্চল ভাষা দেহরে ও পশ্চিমাঞ্চল ভাষা দেহরে পরিদৃষ্ট হুএ।···পেট-পেট্ ; হাট-হাট্ ; লোক-লোক্ ; (গৌরব-গৌরব্) গোবর-গোবর্, আইল, কাইল্, ওইল্, পাএন্, রাএৎ, এড়

জন্-ইত্যাদি। এঠারে স্পষ্ট যে আঞ্চলিক ভাষাভাষী লোকমানে শেষ স্বর উপরে জোর ন দেই প্রথম স্বর উপরে জোর দেই থাআন্তি, তেণু পেট শব্দরে 'পে' উপরে জোর দিঅন্তি, তথা এহি স্থানরেহিঁ স্বরাঘাত আরম্ভ হুএ। তেণু অন্তবর্ণ উপরে স্বরাঘাত ন হোই লঘু বল প্রয়োগ হেউথিবা হেতু তাহা ব্যঞ্জনান্ত হোই থাএ।"

—ওড়িয়া ভাষার বিজ্ঞান-১ম (১৯৬৮) পৃ. ৩৫০-৩৫২।

শব্দের প্রারম্ভিক দলে জোর বা ঝোক দিলে শব্দান্তিক স্বর ক্ষীণ হয়ে লোপ পায়। ভারতীয় ভাষার আঞ্চলিক রূপের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যই হল তাই। সেইজন্য তার উচ্চারণ ভিত্তিক-লৌকিক বা দলবৃত্ত ছন্দ গড়ে উঠেছে। ওড়িয়া সাধুরচনায় এই ছন্দের ব্যবহার না থাকলেও মাঝে মাঝে তার আভাস যে না পাওয়া যায় এমন নয়। ষোড়শ শতকের 'পঞ্চসখার' অন্যতম কবি অচ্যুতানন্দের রচনায় মাঝে মাঝে দলবৃত্তের আভাস পাওয়া যায়।—যদিও তা শিশুসুলভ প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে উপস্থাপিত :—

প্রঃ জহ্নু মামুঁ। বোলিনন্দ।। কৃষ্ণ কু দে। থাই I
জগতর। মামুঁ জহ্নু।। কেঁউপরি। হোই I
উঃ চন্দ্র ভ্রাত। ভগ্নীলক্ষ্মী।। জগৎমাতা। হেলে I
তেণু মামুঁ। বোলি চন্দ্রে।। জগতে ভা। কিলে I

—অচ্যুতানন্দ দাস।

অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যায়ের কবি বনমালী দাসের কোনো কোনো রচনাতেও লৌকিক ছন্দোরীতির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। সাধারণভাবে চার, পাঁচ ও ছয় দলমাত্রার প্রয়োগ মেলে এইজাতীয় ওড়িয়া রচনায় আমরা জানি। তবে তার প্রবণতা যে চতুর্দল-মাত্রকতার দিকে তা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। মুখ্যত লৌকিক জাতীয় রচনার উচ্চারণ আঞ্চলিক বা উপভাষার লক্ষণ-বিশিষ্ট।—

প্রীতি ছুরি। শান দিআরে।। বাজিবছা : ভিকি কর। লুহারে (ঘোষা)
স্নেহ লুহা। যত্নে ততাই।। অশ্রুজল। তহিঁরে দেই।।
মার-কারিগর। যতনে গড়িছি।। তঁহিঁরে ক। লংক বিষ। পিয়ারে ১।
অতিবড়। তীক্ষ্ণ সে ধার।। নেত্র ন থা। কই তহিঁর।।
নবীন দ। পর্ণ পরি। ঝটকই।। সবুদিনে। দেখ দিশে। নূআ রে। ২।
সে ছুরিকি। যেহু ছুইব।। জাতি কুল। সবু তে। জিব।।

ন পাইলে। ধরী নিশ্চে। নাশয়িব ॥ বিরহী মা। নংক প্রাণ। খি আরে। ৩।
বোলে বন। মালি সে ছুরি ॥ সান বড়। মুহেঁ কাহারি ॥
যাহা সঙ্গে। যেতে পীরতি। করই, তে তি। কি করই। কু অভুআরে ৪ ॥

—বনমালী দাস : প্রীতিছুরি (সঞ্চয়ন, পৃ. ২২০)

একটি দ্বিপদী ও পর পর চারটি চৌপদী নিয়ে এই রচনাটি গঠিত। সাধারণভাবে পর্বে চার দলমাত্রা পাওয়া গেলেও পাঁচ ও ছয় দলমাত্রাও আছে। তবে আঞ্চলিক উচ্চারণ অনুসরণে ছয় দলমাত্রা ও পাঁচ দলমাত্রার চারদল মাত্রায় রূপান্তরিত হওয়া অসম্ভব নয়। যেমন—'যত্নে ও তাই'-পাঁচ দলমাত্রার 'তাই'—'তাই্' উচ্চারিত হয়ে চার দলের রূপ নেয়। অনুরূপভাবে 'মার কারিগর' উচ্চারণে মার্ কারিগর্-চারদল মাত্রা হয়ে যায়। বলাই বাহুল্য এই ধরনের আঞ্চলিক উচ্চারণের বিশিষ্টতা সাধু সাহিত্যে স্বীকৃত নয়। তবে ক্রমে ক্রমে তার পথ প্রশস্ত হয়ে উঠছে। তাই পরবর্তীকালে লৌকিক বা দলবৃত্ত রীতিতে কবিতা রচনার প্রবণতাও স্পষ্ট। কবি সূর্যবলদেবের (১৭৮৯-১৮৪৫) রচনা থেকে কয়েকটি পঙ্ক্তি—

প্রিয় সহি। পরমাদ। বড় তুহি। গো, I
পারু কে তে। ছন্দে মোহি। গো I
পরম পদরে দেই। জাণুতু বসাই I
পুণি তহুঁ। জাণু ভলা। তলকু খসাই I

—সঞ্চয়ন : পৃ. ২৪৬

সাধারণভাবে চতুর্দল পর্বিক একপদীয় শেষে একদলমাত্রার (গো, সাই) অপূর্ণ পর্বের ব্যবহার লক্ষণীয়।

ঢগ ঢমালি নামে পরিচিত লোকগীতির ছন্দও আসলে দলবৃত্তই। যেমন—

কাণ্ডারিআ। নদী জুআ। রিআ পাণি I
গাধোই ষিব। বেল কাল। জানি। I

—কুঞ্জবিহারী দাস : লোকবাণী সঞ্চয়ন (১৯৬৬) পৃ. ১১৮

প্রথম পঙ্ক্তিতে ১২ এবং দ্বিতীয়টিতে ১০ দলমাত্রা থাকায়-এটিকে দাণ্ডিবৃত্তের পর্যায়ে গণনা করা হয়। কিন্তু তা যথার্থ নয়। এ'টির দ্বিতীয় পঙ্ক্তির প্রথম পর্বটি লক্ষণীয়—'গা ধোই ষিব'-আপাতভাবে পঞ্চ মাত্রিক মনে হলেও গা, ধোই, ষি. ব.—তিনটি মুক্ত একটি রুদ্ধ—মোট চারদলে চার মাত্রাই গণনীয়।

এটা খুবই আশা ও আনন্দের কথা যে সম্প্রতি ওড়িয়া সাহিত্যিক ও কবিদের কারও কারও দৃষ্টিও লৌকিক ছন্দের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। ওড়িয়া উচ্চারণে যে বিবর্তন ধারাটি লক্ষিত হচ্ছে তার প্রতিফলনও দেখা যাচ্ছে ওড়িয়া কবিতায়। সুতরাং ভবিষ্যতের ওড়িয়া ছন্দ আরও বলিষ্ঠ এবং ঐশ্বর্যশালী হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে এমন আশা সহজেই করা যায়।

হিন্দী ছন্দের ক্রমবিকাশ

(ভারতেন্দু পূর্ব—১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত)

হিন্দী ছন্দ সাধারণভাবে বর্ণবৃত্ত (অক্ষরবৃত্ত) কলাবৃত্ত (মাত্রা বৃত্ত), মিশ্রকলা বৃত্ত (ঘনাক্ষরী বা কবিত্ত) এবং দলবৃত্ত (লৌকিক)—এই চার প্রকারের। বর্ণবৃত্ত ও কলাবৃত্তের প্রয়োগ হিন্দী সাহিত্যের সূচনা পর্ব থেকেই হয়ে আসছে। মিশ্রবৃত্তের রচনা শুরু হয় সম্ভবত পঞ্চদশ শতকে, কিন্তু দলবৃত্ত সাধু হিন্দী সাহিত্যে আজও পুরোপুরি স্বীকৃত নয়।

হিন্দী ছন্দের প্রাথমিক রূপ দ্বাদশ শতকের কবি চাঁদবরদাঈ-এর 'পৃথ্বীরাজ রাসোতে' পাওয়া গেলেও তার সমৃদ্ধি চোখে পড়ে ষোড়শ শতকে। তখন বর্ণবৃত্ত ও কলাবৃত্তের প্রয়োগ থাকলেও হিন্দী কবিতায় কবিদের অনুরাগ ছিল প্রধানত মিশ্র কলাবৃত্তেই। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে বাংলা অসমীয়া ওড়িয়া ও হিন্দীতে ছন্দের বিশেষ সমৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়।[২৪] তা যেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ তেমনি বিবিধ।

হিন্দী ছন্দ শাস্ত্র রচনাও শুরু হয় ষোড়শ শতকেই। কিন্তু বাংলা ছন্দশাস্ত্র রচনায় সূচনা দেখা দেয়—অষ্টাদশ শতকে, ওড়িয়া ও অসমীয়ায় বিংশ শতকে। অবশ্য কোন ভাষারই প্রথম ছন্দশাস্ত্র বা সে জাতীয় রচনা আজ আর পাওয়া যায় না। হিন্দীতেই ছন্দ-শাস্ত্র গ্রন্থ রচিত হয়েছে সর্বাধিক—ষোড়শ থেকে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত সংখ্যায় প্রায় কুড়িটি।[২৫] বাংলায় প্রথম ছন্দশাস্ত্র নরহরি চক্রবর্তী বা ঘনশ্যাম দাসের 'ছন্দ সমুদ্র' পাওয়া গেছে আংশিকভাবে। অসমীয়া ছন্দ শাস্ত্র বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ (প্রাসঙ্গিকভাবে) ভিত্বেশ্বর নিয়োগের 'সাহিত্যক্তি সূত্রবর্ণন প্রকাশ' (১৯৫২) এবং ওড়িয়া অনুরূপ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ শ্যামসুন্দর রাজগুরুর প্রবন্ধাবলী (১৯১৭)। অবশ্য এই সময়সীমার মধ্যে

হিন্দী ও বাংলার বহু ছন্দ শাস্ত্র গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এগুলি ছন্দ ও ছন্দ ব্যাকরণ বিষয়ক নতুন ও বৈজ্ঞানিক চিন্তন-মননে সমৃদ্ধ। আরও লক্ষণীয় হিন্দী ছন্দ শাস্ত্র প্রধানত সংস্কৃত-প্রাকৃত ছন্দোশাস্ত্রের পথ অনুসরণ করেছে। তাই তাতে অভিনব ও স্বতন্ত্র চিন্তার অবকাশ কম। কিন্তু বাংলার সামনে বিশেষ কোনো ছন্দ-শাস্ত্র মেনে চলার বাধ্য-বাধকতা না থাকায় স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা-চরিত্রের অবকাশ ছিল। তাই বাংলা ছন্দ ও ছন্দ শাস্ত্র স্বকীয়তামণ্ডিত অভিনব পথে অগ্রসর হয়েছে। অসমীয়া ছন্দ পরবর্তীকালে আধুনিক বাংলা ছন্দ ও ছন্দ শাস্ত্রের আদর্শে গড়ে উঠেছে বলা যায়। ওড়িয়া ছন্দেও তাই। তবে তার সুস্পষ্ট স্বীকৃতি কোথাও মেলে না। উপরন্তু বাংলার সঙ্গে সাদৃশ্য-নিরূপণ বা তুলনাও অনেকেই মেনে নিতে চান না। তাই বাংলার পর অসমীয়া ছন্দশাস্ত্র নির্মিত হতে পেরেছে, কিন্তু ওড়িয়া ছন্দশাস্ত্রের বিষয়ে সে কথা বলা যায় না। অর্থাৎ ছন্দ প্রয়োগ ও ব্যাখ্যার সুশৃংখল ধারা গড়ে উঠতে পারেনি হিন্দীর ক্ষেত্রেও তাই।

এখানে হিন্দী ছন্দের রীতি চারটির পরিচয় দেওয়া যাক্।—

বর্ণবৃত্ত রীতি (Classical Syllabic Style)

সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশের ধারা বেয়ে বর্ণবৃত্ত হিন্দীতে এসে ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হয়েছে। পরিমাণ স্বল্পতার জন্য বর্ণবৃত্তকে হিন্দীতে ব্যতিক্রমের পর্যায়ভুক্ত মনে করা যেতে পারে। সংস্কৃতজ্ঞ কবিরা হিন্দীতে অমিল বর্ণবৃত্ত রচনা করেন। প্রায় দু'শো বছর (১৬০০-১৮০০) পর্যন্ত মিশ্রবৃত্তেরই প্রাধান্য ছিল। অবশ্য আধুনিক যুগের কিছুকাল (১৯০০-১৯২৫) মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদীর প্রয়াসে আবার বর্ণবৃত্ত ব্যবহারের প্রবণতা দেখা দেয়। সাম্প্রতিক কালে বর্ণবৃত্তের নিদর্শন মেলে না বললেই হয়। এ-ছন্দের প্রকৃতি হিন্দী ভাষা, এমন কি অধিকাংশ আধুনিক ভারতীয় ভাষার প্রকৃতির প্রতিকূল হওয়ায় তার প্রয়োগ উঠে গেছে বলা চলে।[২৩]

কলাবৃত্ত রীতি (Moric Style)

বাংলা, অসমীয়া ও ওড়িয়া সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন রূপে চর্যাপদ স্বীকৃত। হিন্দীর ক্ষেত্রেও তা করা হয়, কিন্তু ধর্ম-সম্প্রদায় বিশেষের উপদেশ নির্দেশ রূপে চিহ্নিত করে তার সাহিত্য মূল্য হিন্দীতে অস্বীকৃত।[২৭] পরবর্তীকালের হিন্দী সাহিত্যের ভাষা ও ছন্দের বিবর্তন ধারার সঙ্গে চর্যাপদের কোনো সুস্পষ্ট যোগ খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই বলে চর্যাপদের সঙ্গে হিন্দীর কোনো যোগ নেই বলা সমীচীন মনে হয় না। হিন্দী কলাবৃত্তের প্রথম নিদর্শন রূপে চাঁদ বরদাই (১১৬৮-১১৯৩) কৃত 'পৃথ্বীরাজ রাসোর' উল্লেখ করা যায়। এ-কাব্যে নানা ছন্দোবন্ধের নিদর্শন থাকলেও দোহা (৮+৫ ॥ ৮+৩), তোমর (৫+৭) ও গাথা (নামান্তরে আর্যা ১২ ॥ ১৮, ১২ ॥ ১৫) প্রভৃতির ব্যবহারই বেশি। ছন্দশিল্প রচনায় কবি সব সময় ছন্দের (শাস্ত্রের)অনুশাসন মানেননি।

চাঁদ বরদাঈ-এর ছন্দ রচনার একটি নিদর্শন :—

মোর সোর চহুঁত্তর ছটা আষাঢ় বাঁধিনভ।
কচ দাদুর ভিগুঁরন রটত্ত চাতিগ রজত শুভ ॥
নীলাবরণ বসুমতির পহির আত্রণ অলংকিয়।
চন্দবুধ সিব্যদং ধরে বসুমতিসু রাজ্‌জিয় ॥
—পৃথ্বীরাজ রাসোঃ ছন্দ ৬৫।

চব্বিশ মাত্রার রোলা (১১+১৩) বন্ধে রচিত হলেও শেষ তিন পঙ্‌ক্তিতে আছে ২৪-এর বদলে (১৩+১০, ১৪+৯, ১৪+৯) ২৩ মাত্রা। সুতরাং হিন্দী কলাবৃত্তের অস্থির রূপ এখানে লক্ষণীয়।

চতুর্দশ শতকের কবি আমির খুসরোর রচনায় কলাবৃত্ত রীতির নানা বন্ধের প্রয়োগ থাকলেও হরিগীতিকা, সার, তাটংক, দোহা ও চৌপাঈই (৪+৪ ॥ ৪+৪) বেশী চোখে পড়ে। স্বভাবিক উচ্চারণের প্রভাবে দীর্ঘ স্বরের সংকুচিত একমাত্রক উচ্চারণ তাঁর রচনায় পাওয়া যায়।[২৮] চৌপাঈ বন্ধটি বাংলা অসমীয়া এবং ওড়িয়া চৌপদী বন্ধের সঙ্গে তুলনীয়।

পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত হিন্দী কাব্যে সন্তকবিদের যুগ। তাঁদের রচনায় বিভিন্ন ছন্দোরীতির ব্যবহার থাকলেও কলাবৃত্তেরই

প্রাধান্য। এ-প্রসঙ্গে কবীর, জায়সী, সুরদাস, তুলসীদাস ও কেশবদাস প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। সে যুগের প্রচলিত বিভিন্ন ছন্দোবন্ধের মধ্যেই তাঁরা পর্ব, পদ ও পঙ্‌ক্তির সুস্পষ্ট বিভাগ, লুপ্তযতি ও বিভিন্ন যতির ব্যবহার, একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদী পঙ্‌ক্তিবন্ধ এবং চার, পাঁচ, ছয় ও সাত মাত্রার পর্বের রচনায় নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। এই ধরনের প্রয়োগ সে যুগের বাংলা কাব্যেও লক্ষিত হয়। তবে কবিগণ তাঁদের এই রূপ রচনার বিষয়ে অবহিত ছিলেন বলে মনে হয় না। এইরূপ সচেতনতার আভাস পাওয়া যায় অতি সাম্প্রতিক কালে। সে যুগের রচনায় আভাসিত কয়েকটি ছন্দোরূপের নিদর্শন দেওয়া হল।—

চতুষ্কল পর্ব :—হিন্দীতে চতুষ্কল পর্বের ব্যবহারই সর্বাধিক। মধ্যযুগ থেকে শুরু করে আধুনিক যুগ পর্যন্ত কবিরা তার ব্যবহার করেছেন। কখনও কখনও যা অষ্টকল পর্ব রূপে উল্লিখিত, তা আসলে যুগ্ম চতুষ্কল পর্বিকের রূপভেদ মাত্র।—

ধনি ধনি। নন্দ য। শোমতি॥ ধন জগ। পাওয়ন। রে।
ধনি হরি। লিয়ো অব। তার সু॥ ধনি দিন। আওয়ন। রে।
—সুরদাস : সুরসাগর (না. প্র. স.) ১০।১৮।৬৪৬

পর্ব ও পদভাগ সুস্পষ্ট। প্রথম পঙ্‌ক্তিতে একবার ও দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে দুবার যতিলোপ ঘটেছে। দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির দ্বিতীয় পর্বের 'য়ো'-র উচ্চারণ হ্রস্ব সুতরাং একমাত্রক। দেখা যাচ্ছে ২২ মাত্রার দ্বিপদী পঙ্‌ক্তি ('সুখদা')-র দুটি দুটি করে পদ ও প্রত্যেক পদ দুটি করে পর্ব নিয়ে গঠিত। পূর্ণ পর্বে চার মাত্রা। পঙ্‌ক্তিশেষে অপূর্ণ পর্বে দুই বা একমাত্রা।

পঞ্চকল পর্ব :—প্রাকৃতে এবং জয়দেবের রচনায় কিছু কিছু পঞ্চকল পর্বের ব্যবহার পাওয়া গেলেও—সংস্কৃত সাহিত্যে তা ছিল না। মধ্যযুগের হিন্দী সাহিত্যেও বেশী মেলে না। কবি সুরদাস ও তুলসীদাসের রচনাতে পঞ্চকল পর্ব পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে এই পর্বের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। পঞ্চকল পর্বিক একটি একপদী পঙ্‌ক্তির দৃষ্টান্ত :—

একপদী : ইক রাম নাম নিজ সাঁচা। চিত চেতি চতুর ঘট কাঁচা॥
ইস ভরমি নভূলসি ভোলী। বিধনা কীগতি [অতি] ঔলী॥
—কবীর গ্রন্থাবলী মাতাপ্রসাদ, পৃ. ৩২২

কবীরের এই প্রয়োগে অভিনবত্ব লক্ষিত হয়। ৫+৫+৪—১৪ মাত্রার

অর্থাৎ দুটি পাঁচ মাত্রার পর একটি চার মাত্রার পর্বের ব্যবহার প্রাকৃতে নেই, বাংলাতেও নেই, অসমীয়াতেও নেই, তবে ওড়িয়াতে আছে। অবশ্য জয়দেবের গীতগোবিন্দে অনুরূপ পর্ববিন্যাস লক্ষিত হয়।

ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনম্।
ত্বমসি মম ভবজলধি রত্নম্
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী
তত্র মম হৃদয়মতি যত্নম্ ॥
—গীতগোবিন্দ-গীত ১৯।৫

ষট্‌কল পর্ব:—সংস্কৃত-প্রাকৃত সাহিত্যে ষট্‌কল পর্বের সম্ভাবনা থাকলেও তার সুন্দর নিদর্শন দেখা দেয় মধ্যযুগের রচনায়। বাংলা-অসমীয়া ওড়িয়া এবং হিন্দী সাহিত্যের ক্ষেত্রে কথাটি সমানভাবে প্রযোজ্য। হিন্দীর সুরদাস-তুলসীদাস ও কেশবদাসের রচনায় তার প্রয়োগ মেলে—

চিত্রকূট অতি বিচিত্র সুন্দর বন মহি পবিত্র
পাওয়নি পয় সরিত সকল মল-নিকন্দিনী।
সানন্দ জঁহ বসত রাম লোক নয়নাভিরাম
বামঅঙ্গ বামাবর বিশ্ববন্দিনী ॥
—তুলসীদাস: গীতাবলী, অযোধ্যাকাণ্ড-৪৩।

ষট্‌কল পর্বের (১২ ॥ ১২ ॥ ৮) মাত্রার চৌপদীবন্ধ।

সপ্তকল পর্ব:—জয়দেবের রচনায় এবং প্রাকৃত সাহিত্যে সপ্তকল পর্বের প্রয়োগ অল্প-স্বল্প মিললেও মধ্যযুগের সাহিত্যে তার প্রয়োগ বিপুল এবং বিচিত্র; সুরদাস, তুলসীদাস ও কেশবদাসের রচনায় এই জাতীয় পর্ব প্রযুক্ত হয়েছে।—

ব্রহ্মলোক তুরাই আয়ো চরিত দেখন আপ
বচ্ছবালক দেখিকৈ, মন করত পশ্চাতাপ ॥
—সূরদাস: সূরসাগর (না. প্র. স.) ১০।৪৮৫।১১০৩

৭+৭ ॥ ৭+৩=২৪ মাত্রার দ্বিপদী বন্ধের দৃষ্টান্ত এটি।

লক্ষ করলে বোঝা যায় উচ্চারণবিধি, যতিলোপ এবং পর্ব ও পদ বিভাগের বিবেচনায় মধ্যযুগের কলাবৃত্ত রীতি প্রাকৃত মাত্রাবৃত্ত থেকে অনেকটা স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছিল। তবে তা কবি-ছান্দসিকদের অজ্ঞাতসারেই। ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত কলাবৃত্তের এই ধারা বহমান দেখা যায়।

অবশ্য দোহা, চৌপাঈ প্রভৃতি প্রাকৃত-আগত ছন্দোবন্ধের প্রয়োগ এবং বৈচিত্র্য সে যুগের কলাবৃত্তের বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রবৃত্তি। এ-দুটির জনপ্রিয়তা ছিল সর্বাধিক।

দোহা এমন একটি ছন্দোরূপ যাহার সাহায্যে সবরকম বিষয়রই সহজ ও সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ সম্ভব।[২৯] তাই হিন্দী সাহিত্যের উদ্ভবকাল থেকে আজ পর্যন্ত দোহার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ দেখা যায়। অবশ্য মধ্য যুগে তুলসীদাস, বিহারী, ও কেশবদাসের রচনায় দোহার প্রয়োগ-সার্থকতা দেখে অভিভূত হতে হয়। চৌপাঈ রচনায়, সৌন্দর্যে, জনপ্রিয়তা এবং সার্থকতায় দোহারই দোসর। চাঁদবরদাই, কবীর, জায়সী, তুলসীদাস, সুরদাস, কেশবদাস প্রমুখ কবিদের রচনায় দোহা ও চৌপাঈ অনন্ত হয়ে উঠেছে। কয়েকটি উদাহরণ :—

জম্পি সুকী সো পেম করি, আদি অন্ত জো বত্ত।
ইঞ্ছিনি পিন্নহ ব্যাহবিধি, সুব্‌ব সুনন্তে গত্ত॥
—পৃথ্বীরাজ রাসো (দ্বিবেদী সং) পৃ. ১।

১৩।১১—২৪ মাত্রার বদলে কবীরের দোহা বা সাখীতে ১২।১১ এবং অন্য রকম মাত্রাও থাকে। কেশবদাসের দোহা উৎকৃষ্ট কাব্যখণ্ড রূপে গণ্য হয়ে থাকে।—

ওয়াকে থোরা দোষ মৈঁ দীহ্নো দণ্ড অগাধ।
রাম চরাচর ঈশ তুম ছমিয়ো য়া অপরাধ॥
—রামচন্দ্রিকা-৩৪।২৪

দোহার প্রায় তেইশ রকমের আকৃতির প্রয়োগ চোখে পড়ে চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতকের মধ্যে। সব যুগে সব ক্ষেত্রে সাহিত্যের সব শাখায় সব রকমেই দোহার প্রয়োগ হিন্দী সাহিত্যের একটি লক্ষণীয় দিক। তাই দোহা হিন্দী সাহিত্যের সর্বাধিক জনপ্রিয় ও শক্তিশালী ছন্দোবন্ধ।

চৌপাঈ—

জীবরূপ এক অন্তর বাসা। অন্তর জ্যোতি কীহ্ন পরগাসা॥
—কবীর, বীজক, রমৈনী।

মধ্যযুগের বহু কবি নানাভাবে চৌপাঈ রচনা করলেও তাতে সর্বাধিক নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তুলসীদাস তাঁর 'রামচরিতমানস' কাব্যে। তিনি চৌপাঈ বন্ধের শক্তি ও সৌন্দর্যের বিশিষ্টতার পরকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। প্রাসের নিরুন মাধুরী ফুটিয়ে তুলেছেন অবলীলায়—

কঙ্‌কন কিঙ্‌কিনী নূপুর ধুনি ধুনি।
কহত লখন সন রাম হৃদয় গুনি॥
—রামচরিতমানস ১।২৩০

দোহা-চৌপাঈ ছাড়া কলাবৃত্ত রীতির অন্য যে সব বন্ধ মধ্যযুগের হিন্দী কাব্যে রচিত হয় তার মধ্যে আর্যা, সার, উল্লালা, ঘত্তা, পদ্ধরি, রোলা, চউপৈয়া, ত্রিভঙ্গী ও সোরঠা প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লক্ষণীয় মধ্যযুগের বাংলা, অসমীয়া এবং ওড়িয়া সাহিত্যে দোহা-চৌপাঈ প্রভৃতির প্রয়োগ হয়নি।

মিশ্র কলাবৃত্ত রীতি (ঘনাক্ষরী বা কবিত্ত)

প্রাকৃত মাত্রাবৃত্ত ছন্দ হিন্দীর স্বাভাবিক উচ্চারণ প্রবণতার প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে স্বতন্ত্র রূপ নেয়। এই পরিবর্তন প্রধানত চার রকমের—

(১) সংস্কৃত-প্রাকৃতের সুনির্দিষ্ট লঘু-গুরু বিধানের গুরুত্ব হ্রাস পায়।

(২) পর্বভিত্তিক স্বাভাবিক যতি বিন্যাস দেখা দিল।

(৩) কবিতায় 'তুক' বা মিল দেবার রীতি প্রচলিত হল।

(৪) রুদ্ধদল ও দীর্ঘস্বরের লঘু বা হ্রস্ব উচ্চারণ প্রবণতার আভাস স্পষ্ট হয়ে উঠল।

এই চার রকমের পরিবর্তনের ফলে যে নতুন ছন্দোরীতি দেখা দিল তার নাম হিন্দী কলাবৃত্ত। লোকমুখের উচ্চারণের দীর্ঘ দিনের প্রভাবে এই হিন্দী কলাবৃত্ত আরও বিবর্তিত হতে থাকে। দীর্ঘস্বর ও রুদ্ধদলের উচ্চারণ মাঝে মাঝে সংকুচিত হয়ে একমাত্রার রূপ নিতে শুরু করে। ক্রমে ক্রমে এই বিশিষ্টতায় পুষ্ট হয়ে দেখা দেয় যে নতুন ছন্দোরীতি, তাতে দল বা 'অক্ষরের' ঘন সন্নিবেশের ফলে উচ্চারণ বহুলাংশে সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে আসে।[৩০] এই ঘন অক্ষর সন্নিবেশিত রীতিকে 'ঘনাক্ষরী' বলা হয়। এই রীতিটি স্পষ্টভাবে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে 'ভাট' বা 'চারণ' কবিদের স্বাভাবিক কবিতায়। ভাট বা চারণদের কবিত্বশক্তির পরিচায়ক বলে এই রীতিটির আর এক নাম 'কবিত্ব' বা 'কবিত্ত'। এই 'ঘনাক্ষরী' বা 'কবিত্ত' নামের বিচারে 'মিশ্রকলাবৃত্ত' থেকে পৃথক হলেও বৈশিষ্ট্যে বা প্রকৃতিতে এক, তা আমরা লক্ষ করেছি।

হিন্দীর 'ভানুকবি' তাঁর 'ছন্দ-প্রভাকর' গ্রন্থে ঘনাক্ষরীর মাত্রাবিন্যাস করতে গিয়ে বলেছেন—

সম সম সম সম বিষম বিষম সম
সম বিষমহু দোয়, প্রতি আঠ করিকৈ
দোয় বিষমনি বীচ, সম পদ রাখিয়ে না,
রাখে লয় নষ্ট হোত, অতিহি বিগরিকৈ।
—ছন্দপ্রভাকর (১৯৬০), পৃ. ২১৪

আমরা জানি ২+২+২+২ ; ৪+৪ ; ৩+৩+২ ক্রমে মাত্রা বিন্যাসই মিশ্রবৃত্তে চলে, ৩+২+৩ চলে না। এ-কথাই মিশ্রবৃত্তে মাত্রা বিন্যাস পদ্ধতি বিষয়ে ছান্দসিক সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও বলেছেন—

বিজোড়ে বিজোড় গাঁথ, জোড়ে গাঁথ জোড়।
আট-ছয়ে হাঁফ ছেড়ে ঘুরে যাও মোড়॥
—ছন্দসরস্বতী (১৩৭৪), পৃ. ২।

সুতরাং ঘনাক্ষরী ও মিশ্রবৃত্ত একই ছন্দোরীতি। ঘনাক্ষরী অর্থে আমরা মিশ্রবৃত্তই ব্যবহার করছি। লৌকিক ভাষা ও লৌকিক ছন্দের রচনা-সৌকর্যে-আকৃষ্ট হয়ে পঞ্চদশ শতকের কবিরা এই ছন্দটিকে সাধু সাহিত্যে গ্রহণ করেন। সাধু সাহিত্যে গৃহীত ও রচিত হওয়ায় লৌকিক সাহিত্যের সঙ্গে ঘনাক্ষরীর যোগ ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসে। সুতরাং 'ঘনাক্ষরী' হিন্দীর স্বাভাবিক ছন্দ নয় এবং এ-টি সংস্কৃত বা প্রাকৃত 'বর্ণবৃত্ত' থেকে এসেছে বলে মনে করা সমীচীন নয়।[৩১]

লক্ষ করলে বোঝা যায়—মধ্যযুগের বাংলা, হিন্দী, অসমীয়া, ওড়িয়া, গুজরাটি ও মারাঠী কাব্যে সম্ভবতঃ একই কারণে মিশ্রবৃত্ত বা ঘনাক্ষরী, যৌগিক ও দাণ্ডিবৃত্ত জাতীয় ছন্দের উদ্ভব ঘটেছে।

হিন্দীতে ঘনাক্ষরী বা মিশ্রবৃত্তের প্রথম প্রয়োগ করেন সম্ভবতঃ জনৈক সেন কবি (১৫০৩)।[৩২] তাঁর রচনায় মিশ্রবৃত্তের বেশ পরিণত রূপ পাওয়া যায়। তাতে মনে করা যায় সেন কবির পূর্বেই এই রীতিটি সাহিত্যে গৃহীত হয়েছিল। এই শক্তিশালী ছন্দটি সকলপ্রকার ভাব ও রসের সুষ্ঠু প্রকাশের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ষোড়শ শতকের প্রখ্যাত কবি তুলসীদাস এই জনপ্রিয় ছন্দেও রচনা করেন 'কবিতাবলী'। সম্ভবতঃ 'কবিতাবলী' মিশ্র কলাবৃত্তে রচিত হিন্দীর প্রথম কাব্য।[৩৩]

তুলসীদাসের রচনা থেকে মিশ্রবৃত্ত রীতির নিদর্শন :—

বরদন্ত কী পঙ্গতি কুন্দকলী অধরাধর পল্লব খোলন্ কী।
চপলা চমকৈ ঘনবীচ জগৈ ছবি মোতিন মাল অমোলন কী॥
ঘুঁঘুরারী লটৈ লটকৈঁ মুখ উপর কুণ্ডল লোল কপোলন কী।
নিওয়ছাওয়রি প্রাণ করৈঁ তুলসী, বলি জাঁউ ললা ইন বোলন কী॥

—কবিতাবলী : বালকাণ্ড-৫।

মিশ্রবৃত্ত রীতির চতুষ্কল পর্বিক হিন্দী পঙ্‌ক্তির দৃষ্টান্ত এটি। দ্বিপদী রুদ্ধ-মুক্ত সব দলই একমাত্রক। তবে শব্দপ্রান্তিক ধর্, লব্, গন্, তিন্ লন্, পর্, ভল্, লন্, প্রভৃতি দ্বিমাত্রক। কারণ এই কয়টি রুদ্ধ দলের উচ্চারণ প্রলম্বিত। কেশবদাস, পদ্মাকর, বৈতাল, প্রমুখ কবির রচনায় মিশ্রবৃত্ত সুপ্রযুক্ত বলা যায়। মাত্রার হ্রাস বৃদ্ধির কারণে হিন্দীতে ঘনাক্ষরীকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু এরূপ নামকরণ অহেতুক এবং বিভ্রান্তিকর। বাংলায় মিশ্রবৃত্তে পর্ব ও পদগত সৃষ্টির বৈচিত্র্য থাকলেও অযথা নামাবলীর প্রয়াস নেই। সেইটিই স্বাভাবিক।

মধ্যযুগের হিন্দী কবিরা এ-বিষয়ে অবহিত না থাকায় তাঁদের রচনায় পর্ব ও পদগত বৈচিত্র্য ফুটে উঠতে পারেনি। প্রাক্ রবীন্দ্র-যুগ পর্যন্ত বাংলায় পাঁচ, ছয় ও সাত মাত্রার পর্ব রচিত হত। অসমীয়া এবং ওড়িয়া কাব্যেও এইরূপ পর্ব-বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। বাংলা অসমীয়া এবং ওড়িয়াতে আটমাত্রা থেকে শুরু করে বত্রিশ-ছত্রিশ মাত্রার দীর্ঘ আয়তনের ছন্দোপঙ্‌ক্তিও রচিত হয়। ফলে নানা বৈচিত্র্য দেখা যায়। কিন্তু হিন্দীতে ছাব্বিশ ও ততোধিক মাত্রার ঘনাক্ষরী পঙ্‌ক্তি রচনার সংস্কার থাকায় ছোট আয়তনের পঙ্‌ক্তি রচনার প্রয়াস দেখা যায় না। ফলে পঙ্‌ক্তিগত বৈচিত্র্যও তেমন দৃষ্ট হয় না।

বাইশ থেকে ছাব্বিশ বর্ণমাত্রার 'গণাশ্রিত' সবৈয়াও হিন্দীর মধ্যযুগে রচিত হত। কোনো নির্দিষ্ট গণের সাত বা আট বার আবৃত্তির দ্বারা সবৈয়া গঠিত হয়। এ ছন্দকে তেমন জনপ্রিয় বলা যায় না। অনুরূপ প্রয়োগ বাংলা, অসমীয়া এবং ওড়িয়াতে হয়নি। সে যাই হোক, মিশ্রবৃত্ত রীতি তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া ও হিন্দী কাব্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। যদিও তার ব্যবহারে পরিমাণ ও উৎকর্ষগত কিছু কিছু তারতম্য থেকে গেছে বিভিন্ন ভাষায় যা—খুবই স্বাভাবিক।

দলবৃত্ত (লৌকিক) রীতি

কোনো ভাষার লৌকিক ছন্দ, সেই ভাষার সমবয়সী বলা যায়। সব ভাষায় যেমন, তেমনি হিন্দী ছন্দেও বর্তমানে যে সম্পদ-প্রাচুর্য এবং বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে তার মূলে প্রচ্ছন্ন রয়েছে হিন্দী লোকমুখের উচ্চারণ বিশিষ্টতা ও লৌকিক ছন্দের বিবর্তন সাধনের প্রচণ্ড শক্তি। হিন্দী কলাবৃত্ত ও মিশ্রবৃত্তের উদ্ভবে লৌকিক ভাষা ও লোকছন্দের সক্রিয়তার কথা আমরা জানি। পরবর্তীকালে মিশ্রবৃত্তের উপর সক্রিয় লৌকিক উচ্চারণের প্রভাবে রুদ্ধদল ও দীর্ঘস্বরের উচ্চারণ সংকুচিত হয়ে পুরোপুরি একমাত্রক হতে লাগল। তারই ফলে দেখা দিল দলবৃত্ত ছন্দোরীতি। হিন্দী কলাবৃত্ত ও মিশ্রবৃত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সাধু সাহিত্যের ছন্দ। লৌকিক ছন্দ গ্রাম্য ছড়া, মেয়েলি গীত ও ভাটের কবিতাতেই সীমিত থেকে গেল। পেশা ও সম্প্রদায়ভেদে হিন্দী লোক-গীতির নানা প্রকার ভেদ দেখা যায়। যেমন কহঁরউ, ধোবিউ, আহিরউ, চমরউ, প্রভৃতি।

এই লোকগীতিতে ব্যবহৃত ছন্দই লৌকিক ছন্দ। অলিখিত লোকগীতির ছন্দের দুই ধারা—কলাবৃত্ত ও দলবৃত্ত। অবশ্য ওড়িয়াতে ধারা দুইটি মিশ্রবৃত্ত ও দলবৃত্ত। সাধু সাহিত্যের বহুল প্রচলিত কলাবৃত্তে প্রয়োজন মতো মাত্রাবৃদ্ধি ঘটিয়ে গাইবারও সুযোগ থাকায় মধ্যযুগ থেকেই হিন্দী লোক সাহিত্যে কলাবৃত্তের ব্যবহার লক্ষিত হয়। কবীর, দাদূ, জায়সী, এমন কি তুলসীদাস, সুরদাস ও কেশবদাসের রচনাতেও লোকমুখের ভাষা ও কলাবৃত্ত ছন্দের প্রয়োগ দেখা যায়। অবশ্য মাঝে মাঝে কলাবৃত্তের ফাঁকে ফাঁকে দলবৃত্তকেও উঁকি মারতে দেখা যায়। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ, বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল কৃষ্ণদাস মাধবরাজ চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতিতে যেমন মিশ্রবৃত্তের মাঝে মাঝে দলবৃত্ত দেখা যায়।[৩৪] আবার সরলা দাস, বলরাম দাস, অচ্যুতানন্দ প্রমুখের রচনায় দাণ্ডিবৃত্তের মাঝে মাঝে যেমন দলবৃত্ত ঢগঢমালি যেমন দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে তুলসীদাসের রচনায় রামললানহছূ অংশটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রচনাটি 'সোহরছন্দ' নামে চিহ্নিত। বলাই বাহুল্য এটি 'শাস্ত্রীয় ছন্দ' নয়। লোকগীতির ছন্দ। আপাতভাবে এটি বাইশ কলামাত্রার দ্বিপদী

ছন্দে রচিত হলেও দলবৃত্তের বৈশিষ্ট্যও তাতে সুস্পষ্ট। যেমন—

কোটিহু বাজন বাজহি দসরথকে গৃহ হো।
'দেবলোক সব' দেখহিঁ আনন্দ অতি হিয় হো॥
নগর সোহাও'য়ন লাগত বরনি ন জাতৈ হো॥
কৌসল্যা কে হর্ষ ন হৃদয় সমাতৈ হো॥

—তুলসী গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড (না. প্র. স.), পৃ. ৩

এই অংশটি কলাবৃত্ত ও দলবৃত্ত—দুই রীতিতেই বিশ্লেষণ করা যায়। তবে কলাবৃত্তের পাল্লাই ভারী। হিন্দীতে দলবৃত্ত পয়ার বন্ধের আভাসও পাওয়া যায় এটিতে। সুতরাং বলা যায় তুলসীদাস প্রযুক্ত ষট্‌কল পর্বিক কলাবৃত্ত রীতি চতুর্দল পর্বিক দলবৃত্ত-প্রভাবিত। দলবৃত্ত-প্রভাবিত মিশ্র কলাবৃত্ত রীতির অনুরূপ পরিচয় পাওয়া যায় মধ্যযুগের বাংলা, অসমীয়া এবং ওড়িয়া সাহিত্যেও।[৩৫]

সুতরাং মধ্যযুগের বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া ও হিন্দী সাহিত্যে দলবৃত্ত স্বীকৃতি না পেলেও কোনো কোনো কবির রচনায় মাঝে মাঝে তার স্বরূপ আভাসিত হয়ে উঠেছে। আধুনিক যুগে বাংলা ও অসমীয়াতে দলবৃত্ত সাধু সাহিত্যেও স্বীকৃতি লাভ করেছে। কিন্তু ওড়িয়া ও হিন্দীতে এই রীতিটি যথাযোগ্য মর্যাদা লাভ করতে পারেনি। ফলে এই দুই ভাষার কবিতা তার স্বাভাবিক অভিব্যক্তির ক্ষেত্রেও মর্যাদা থেকে বঞ্চিতই থেকে গেছে। যতদিন না এই প্রাকৃত বা স্বাভাবিক ছন্দোরীতিটি সম্যকভাবে গৃহীত ও প্রতিষ্ঠিত হবে। স্বাভাবিক মাধুরী ও অন্তরের শক্তি থেকে ওড়িয়া ও হিন্দী কবিতা বঞ্চিতই থেকে যাবে। যা কোনো ক্রমেই বাঞ্ছিত এবং মর্যাদাকর নয়। আমাদের ভুললে চলবে না যে—

(১) প্রত্যেক ভাষারই একটা স্বাভাবিক চলিবার ভঙ্গি আছে সেই ভঙ্গিটারই অনুসরণ করিয়া সেই ভাষার নৃত্য অর্থাৎ তাহার ছন্দ রচনা করিতে হয়।—

—রবীন্দ্রনাথ, ছন্দ (১৯৭৬) পৃ. ৩১

(২) প্রত্যেক ভাষার একটা স্বকীয় ধ্বনি উদ্ভাবনা আছে। তার থেকে তার স্বরূপ চেনা যায়।—

—পূর্ববৎ, পৃ. ১৬৭।

(৩) ভাষার উচ্চারণ অনুসারে ছন্দ নিয়মিত হইলে তাহাকেই স্বাভাবিক ছন্দ বলা যায়।

—পূর্ববৎ, পৃ. ৪১

(৪) Study carefully the phonetic system of a language above all its dynamic features, and you can tell what kind of a verse it has developed or, if history has played pranks with its psychology what kind of verse it should have developed and some day will.

—Edward Sapir : Language (1921) P. 246.

ভাষার স্বাভাবিক গতি ও বিশিষ্টতা নিরপেক্ষ কোনো ভাষার ছন্দ বেশিদিন টিকতে পারে না। ভাষার স্বাভাবিক বিশিষ্টতাই তার ছন্দকে সহজ শক্ত এবং প্রত্যাশিত পরিণতি দান করে।

বাংলা ও অসমীয়া সাহিত্যে লৌকিক ছন্দ গৃহীত হয়ে কবিতায় যে শিল্প সমৃদ্ধি এনেছে, সম্ভবত তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সাম্প্রতিক কালে কোনো কোনো কবি ও ছান্দসিকের দৃষ্টি ওড়িয়া ও হিন্দীর লৌকিক ছন্দের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। কাজেই ভবিষ্যতের ওড়িয়া ও হিন্দী কবিরা এইদিকে অধিকতর দৃষ্টি নিবদ্ধপূর্বক ওড়িয়া ও হিন্দী ছন্দকে স্বাভাবিক ও সুদৃঢ় ভূমির উপরে স্থাপন করে, তাকে আরও বিচিত্র, সম্পদশালী ও শক্তিশালী করে তুলবেন—এমন আশা অনুচিত হবে না।

বাংলা অসমীয়া ওড়িয়া এবং হিন্দী কবিতার যোগাযোগ

ভাষার ইতিবৃত্তকারদের মতে অপভ্রংশের অর্বাচীন রূপ অবহট্ট নবম থেকে প্রায় পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারতের লোকসাহিত্যের অন্যতম বাহন রূপে স্বীকৃত ছিল।[৩৬] অবহট্ট লোকসাহিত্যে প্রযুক্ত ছন্দও সমগ্র উত্তর ভারতে প্রসার লাভ করে।[৩৭] চতুর্দশ শতকে বারাণসীতে সংকলিত অপভ্রংশ অবহট্ট

ভাষার ছন্দবিষয়ক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'প্রাকৃত পৈঙ্গলম্'-এ উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের কবিদের রচনা স্থান পেয়েছে। চর্যাপদের ভাষার সঙ্গে বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া ও হিন্দীর অবহট্ট-স্তরের ভাষার সাদৃশ্য থাকায় এই চার ভাষারই পূর্বরূপ বলে চর্যাপদের ভাষার উল্লেখ করা হয়ে থাকে। অপভ্রংশ-অবহট্ট ছন্দ ধারার রূপও চর্যাপদে পাওয়া যায়। এগুলিতে বাংলা—পয়ার ও ত্রিপদী প্রভৃতি, অসমীয়া তুলারি ও ছবি প্রভৃতি, ওড়িয়ায় ছন্দ-নাম রূপে গৃহীত কামোদী (কামোদ), বঙ্গলাশ্রী (বঙ্গাল), রামকেরী (রামক্রী), গুর্জরী, ভৈরবী প্রভৃতি এবং হিন্দী দোহা, সোরঠা পাদাকুলক প্রভৃতির প্রচ্ছন্ন রূপ বিদ্যমান।

জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যে অপভ্রংশ ছন্দের প্রয়োগ দেখা যায়। সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিসম্পদ ও জয়দেবের প্রয়োগ কৌশলের সহায়তায় অপভ্রংশ ছন্দ কোমলকান্ত পদাবলীর যোগ্য বাহন হয়ে উঠেছে। গীতগোবিন্দের ২৭ মাত্রার (গীত-১৫), ২৮ মাত্রার (গীত-১১) এবং ২৯ মাত্রার (গীত-২৪) দীর্ঘ পঙ্‌ক্তিতে বাংলা ত্রিপদী, অসমীয়া ছবি, ওড়িয়ার বঙ্গলাশ্রী, ভীষ্ম বাণী, মুনিবর বাণী এবং হিন্দী ত্রিভঙ্গী আদি বন্ধের রূপ ফুটে উঠেছে বলা যায়। সুপরিচিত অপভ্রংশ ছন্দের অভিনব মনোহারী প্রয়োগ গীতগোবিন্দের পাঠক ও শ্রোতৃবর্গকে অভিভূত করে। সমগ্র উত্তর ভারতে এমন কি দক্ষিণ ভারতেও কাব্যটি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। পরবর্তীকালে বিদ্যাপতির রচনায় এই ছন্দের প্রয়োগ ঘটে। অপভ্রংশ ছন্দ ব্রজবুলি সাহিত্যেও ব্যবহৃত হয়। এই বিচিত্র প্রয়োগ দেখা যায় মধ্যযুগের বাংলা, অসমীয়া এবং ওড়িয়া পদাবলী সাহিত্যে।[৩৮] হিন্দী সাহিত্যে কবীর, সুরদাস, তুলসীদাস ও কেশবদাস প্রমুখ মধ্যযুগের কবিদের রচনাতেও সাতাশ, আটাশ, উনত্রিশ ও ত্রিশ মাত্রার দীর্ঘ পঙ্‌ক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। এগুলিতে ত্রিপদী ও চৌপদী বন্ধের পূর্বাভাস রয়েছে। এই কবিরা অপভ্রংশ ছন্দ প্রয়োগের প্রেরণা হয়তো জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্য থেকে পেয়েছিলেন।[৩৯] ব্রজবুলি কাব্য ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি বিদ্যাপতির (পঞ্চদশ শতক) রচনায় জয়দেবের প্রভাব দুর্লভ নয়। বিদ্যাপতির বৈষ্ণব পদগুলি বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রাচীন এবং প্রধান উৎস। গোবিন্দ দাস প্রমুখ বহু কবি বিদ্যাপতির অনুকরণে ও অনুসরণে বৈষ্ণব পদ রচনা করেছেন। বাংলার উচ্চারণ প্রভাব এবং লিপিকর প্রমাদের ফলে বিদ্যাপতির পদগুলি পরিবর্তিত হয়ে বাংলা রূপ লাভ করেছে। বিদ্যাপতি ছাড়াও কবীর সুরদাস, তুলসীদাস, মাধো প্রমুখ হিন্দী কবিদের কিছু কিছু জনপ্রিয় পদ

বাংলার উচ্চারণ প্রভাবে বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়ে বাংলা পদরূপে গৃহীত হয়েছে।[৪০] বৈষ্ণবতীর্থ বৃন্দাবনধামবাসী কোনো কোনো বাঙালি বৈষ্ণব কবিও ব্রজভাষাতে পদ রচনা করেছেন। 'পদকল্পতরু' এবং 'বৈষ্ণবপদাবলী' গ্রন্থে এরূপ পদ বিরল নয়। এই প্রসঙ্গে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের অসমীয়ার অংকীয়া নাটক' ও 'বরগীতের' কথা স্মরণীয়।[৪১] ওড়িয়াতে 'রাধাকৃষ্ণ তামসা' জাতীয় রচনাও এই শ্রেণীতে পড়ে।[৪২]

ষোড়শ শতকের প্রারম্ভে 'নাভাজি' 'ব্রজভাষায় 'ভক্তমাল' রচনা করেন। হিন্দী ভক্তি সাহিত্যের এই মূল্যবান গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেন 'কৃষ্ণদাস বাবাজী' বা লাল দাস।[৪৩] সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে সাতাশ খণ্ডে গ্রন্থটি অনূদিত হয়। বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যের উপর এই গ্রন্থখানির গভীর প্রভাব পড়েছে।

রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ', বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য ও নারায়ণ দেবের 'মনসাপুরাণ' 'অসমীয়া-বাংলা ভাষার' মধ্যযুগীয় নিদর্শন রূপে পরিগণিত। বাংলা মহাভারতকার সঞ্জয় ও পিতাম্বরও অসমীয়া সাহিত্যের কবি রূপে পরিগণিত।[৪৪]

মধ্যযুগের হিন্দী বাংলা ও অসমীয়া সাহিত্যের রোমান্টিক কাহিনী-কাব্য রচনায় মুসলমান কবিরাই অগ্রণী। সমগ্র নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি হল মালিক মোহম্মদ জায়সীর (ষোড়শ শতক) পদুমাওয়ৎ বা 'পদ্মাবতী' কাব্য। এই কাব্যটি বাংলায় অনুবাদ করেন কবি আলাওলা।[৪৫]

ষোড়শ শতকের হিন্দী কবি কুতুবনের 'মৃগাবতী' এবং মঝনের 'মধুমালতী'র অনুসরণে অসমীয়া কবি রাম দ্বিজ 'মৃগাবতী চরিত' ও জনৈক অজ্ঞাত কবি 'মধুমালতী' রচনা করেন। তদুপরি পশুপতি দ্বিজ রচিত 'চন্দ্রাবলী' কাব্যও পাওয়া যায়, যা সম্ভবতঃ বাংলা থেকে অসমীয়ায় অনূদিত।[৪৬]

দেখা যাচ্ছে মধ্যযুগের বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া ও হিন্দী সাহিত্যের মধ্যে বেশ সুন্দর যোগসূত্র গড়ে উঠেছিল। বাংলা, আসাম এবং ওড়িষ্যাবাসীরা হিন্দী সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। অসমীয়া এবং ওড়িয়াগণ বাংলা সাহিত্যের প্রতিও অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু হিন্দীভাষীরা, বাংলা, অসমীয়া এবং ওড়িয়া সাহিত্যের প্রতি তেমন আকর্ষণ অনুভব করেননি। বাঙালিরাও অসমীয়া তথা ওড়িয়া সাহিত্যের প্রতি অনাকৃষ্টই ছিলেন। তার কারণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়—তীর্থ দর্শন এবং রাজকার্যের উদ্দেশ্যে বাঙালী, অসমীয়া ও ওড়িয়াদের বার বার হিন্দীভাষী অঞ্চলে যাতায়াত এবং মাঝে মধ্যে বসবাসও করতে

হত। ফলে হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিতি ও আকর্ষণের ফলস্বরূপ হিন্দী সাহিত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া স্বাভাবিক ছিল। অসমীয়া এবং ওড়িয়া ভাষীদেরও বাংলায় বিশেষ করে কলকাতায় আসতে ও থাকতে হত নানা কারণে। কিন্তু হিন্দীভাষীরা বাংলা, আসাম ও ওড়িষ্যা যাবার কোনো আকর্ষণ অনুভব করতেন না। বাঙালীদেরও আসামে এবং ওড়িশায় যাওয়া-আসার সঠিক কারণ ছিল না। তবে যাঁরা এইসব অঞ্চলে কোনো কারণে যেতেন তাঁরা প্রায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। বাঙালীরা আসামে এবং ওড়িষ্যায় গিয়ে সেখানকার বাসিন্দা হয়ে পড়েছেন। ফলে তাঁদের উত্তর পুরুষগণ বাংলা অসমীয়া ও ওড়িয়ার সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক তথা স্রষ্টা রূপে দেখা দিলেও তাঁদের সেই সব অঞ্চলের ভাষাভাষী রূপেই গণ্য করতে হয়। এইসব কারণে মধ্যযুগের হিন্দী সাহিত্যে বাংলা, অসমীয়া এবং ওড়িয়া সাহিত্যের কোন প্রভাব পড়তে পারেনি। বাংলা সাহিত্যে প্রভাব পড়েনি অসমীয়া এবং ওড়িয়া সাহিত্যের। আধুনিক যুগের হিন্দী, অসমীয়া এবং ওড়িয়া সাহিত্যে বাংলার যে প্রভাব দেখা যায় তার মূলে রয়েছে মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র প্রমুখ প্রতিভাশালী সাহিত্যিকদের কল্যাণে বাংলা সাহিত্যের অচিন্তিত-পূর্ব সমৃদ্ধি। সে স্তরের সমৃদ্ধ রচনার প্রয়াস মধ্যযুগে কোনো কবি করেননি। হিন্দী ছন্দে হিন্দী কবিতা রচনার প্রথম প্রয়াস লক্ষিত হয় ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যে। এ কাব্যে বহুভাষাবিদ ভারতচন্দ্র (১৭১২-১৭৬০) সংস্কৃত, হিন্দী, ফরাসি প্রভৃতি ভাষা ও ছন্দের প্রয়োগে যে নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন তা দুর্লভ। ভারতচন্দ্র অনায়াসে হিন্দীতে কবিতা রচনা করতে পারতেন এবং অনায়াসে বাংলার পাশেই তাকে স্থান দিতেন।[৪৭] তাঁর রচনায় মিশ্র ভাষা, ব্রজবুলি এবং ব্রজভাষার প্রয়োগও সুলভ। তাঁর মঙ্গলকাব্য ও অন্যান্য রচনায় হিন্দী কবিতা বা কবিতাংশের অন্তত বারোটি দৃষ্টান্ত রয়েছে।—'শিবের ভিক্ষা যাত্রা' (৮+৮+১২=২৮ মাত্রার 'সার') 'শিবের বিবাহ (১২+১২+১২+১১=৪৭ মাত্রার ব্রজবুলি চৌপদী), 'ভাটের প্রতি রাজার উক্তি' (১৪+৮+১০=৩২ মাত্রার নবকদলী পত্র' অথবা সাতটি 'ভ' গণ ও ২টি গুরুবর্ণ=২৩ বর্ণের 'মত্ত গজেন্দ্র গতি'[৪৮] বর্ণবৃত্ত), ভাটের উত্তর (সংস্কৃত চামর বা তূণক=পনর বর্ণের), 'মানসিংহের যশোর যাত্রা' কলাবৃত্ত রীতির দ্বিপদী ও চৌপদী), 'প্রজার প্রতি মহিষাসুরের উক্তি' (১২+১২+১২+১১=৪৭ মাত্রার চৌপদী), হিন্দী ভাষার কবিতা (হিন্দী কলাবৃত্ত চতুষ্কল পর্বিক দ্বিপদী ও ষট্‌কল পর্বিক

দ্বিপদী), নটির উক্তি (৮+৮+১১=২৭ মাত্রার সরসী), মহিষাসুরের উক্তি (অতি বিকৃত, সম্ভবত ১২+৮+১২=৩২ মাত্রার ত্রিপদী), প্রভৃতি প্রয়োগ ভারতচন্দ্রের ছন্দ-শিল্প চেতনায় বিশেষত্বের পরিচায়ক।

বহুভাষাবিদ্ ভারতচন্দ্র কবিতা রচনার ক্ষেত্রে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়ে সংস্কৃত, বাংলা, পারসি এবং হিন্দী ভাষার মিশ্রছন্দের কবিতাও রচনা করেছেন। এই ধরনের 'একপ্রকার চৌপদী ছন্দ' শীর্ষক রচনার কয়েকটি পঙ্ক্তি উদ্ধৃত করা যায়।—

শ্যামহিত প্রাণেশ্বর রায়দকে গোয়াদরুবর
কাতর দেখে আদর কর কহে মর রো রোয়কে।
বক্তুং বেদং চন্দ্রমা ছুঁলালা চে রেমা
ক্রোধিত পর দেও ক্ষমা মেট্টমে কাহে শোয়কে।

—ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী (র. সা. প.), বিবিধ, পৃ. ৪৫১।

বিভিন্ন ভাষার পদগুলির ছন্দোগত সঙ্গতি নিখুঁত না হলেও প্রাস্বরিক উচ্চারণের প্রবণতা লৌকিক ছন্দের আভাস দেয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ভারতচন্দ্র রায় কেবলমাত্র বাংলা কবিতায় সংস্কৃতাদি ছন্দ প্রয়োগ-করেই ক্ষান্ত হননি, হিন্দী কবিতাতে হিন্দী সংস্কৃত প্রভৃতি ছন্দের প্রয়োগ পরীক্ষাও করেছেন। লঘু ভাব ও ধ্বনির খেলা আশ্রিত হলে ও তাঁর এই প্রয়াস হিন্দী ছন্দের ইতিহাসে অতি গুরুত্বপূর্ণ। প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সহ স্বাধীন চিন্তার সঙ্গে হিন্দী ছন্দের প্রয়োগ যে সম্ভব ভারতচন্দ্র তা প্রমাণিত করেছেন।[৪৯] ভবিষ্যতে সহজ স্বাভাবিক পথে হিন্দী ছন্দের গতি হবে এমন সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা যায় না। ভারতচন্দ্র সেই সব কবিশিল্পীদের অন্যতম যাঁরা অহিন্দী ভাষী হয়েও সার্থকতার সঙ্গে হিন্দী কবিতায় হিন্দী ছন্দের প্রয়োগ করেছেন।

ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক কবি রামপ্রসাদ সেনও (১৭১৮-১৭৮১) তাঁর বিদ্যাসুন্দর কাব্যে কয়েকটি হিন্দী কবিতায় হিন্দী ছন্দ প্রয়োগের প্রয়াসী হয়েছেন। তবে তিনি হিন্দী কবিতায় বাংলা ছন্দ প্রয়োগের অনুরাগী ছিলেন। তাঁর 'কোটালের চোর অন্বেষণে সজ্জা' (মিশ্রবৃত্ত রীতির পর পর ছটি ষণ্মাত্রক পর্বের পর একটি পঞ্চকল পর্ব), 'কোটালের প্রতি মাধব ভট্টের উক্তি' (ভট্ট ভাষা বা ব্রজভাষায় রচিত পঁচিশ বর্ণের 'ক্রৌঞ্চপদা ছন্দ') ও মাধবের প্রতি কোটালের কটুবাক্য' (মিশ্রবৃত্ত পয়ারে হিন্দী দলবৃত্তের আস্বাদ) এই তিনটি

স্বতন্ত্র কবিতারূপে পরিগণিত। 'মাধব ভট্টের কাঞ্চিপুরগমন' (৮+৮+১০=২৬ মাত্রার মিশ্রবৃত্ত বা ঘনাক্ষরী ত্রিপদী), 'সিন্দুর চিহ্ন দৃষ্টে রজক ও হীরার শাস্তি' (হিন্দী ঘনাক্ষরীর পয়ার বন্ধের বিকৃত রূপ) প্রভৃতিতে বাংলা রচনার মধ্যেই হিন্দীর অনুপ্রবেশ লক্ষিত হয়। 'রাজধানী ও গড় বর্ণন' অংশে একাধিক হিন্দী ত্রিপদী পঙ্‌ক্তির বিন্যাস লক্ষিত হয়। কোনো কোনো হিন্দী কবি ও ছান্দসিকের মতে বাংলা ছন্দের পয়ার ও ত্রিপদী বন্ধ হিন্দী কবিতার অনুকূল নয়।—এই ধারণাটি ঠিক বলে মনে হয় না। মধ্যযুগের হিন্দী কবিতায় আংশিকভাবে ত্রিপদীর ব্যবহার চোখে পড়ে। রামপ্রসাদের হিন্দী রচনাতেও পয়ার ও ত্রিপদীর সুন্দর প্রয়োগ ঘটেছে। তাঁর এই প্রচেষ্টার সার্থকতার মূলে রয়েছে হিন্দী উচ্চারণে দীর্ঘ-হ্রস্ব স্বরধ্বনির যথাসম্ভব পার্থক্য হ্রাস।

তবে রামপ্রসাদ তাঁর রচনায় হিন্দী কবিতা বা কবিতাংশ সন্নিবেশিত করে, বিশেষ করে বাংলা ছন্দের বৈশিষ্ট্যকে হিন্দী কবিতায় প্রকাশ করতে গিয়ে যে সফলতা দেখিয়েছেন তা যেমন বিস্ময়কর তেমনি গুরুত্বপূর্ণ।[৫০] উপযুক্ত প্রতিভার স্পর্শ পেলে হিন্দী ছন্দও যে একদিন বাংলা ছন্দের মতো স্বাভাবিক উচ্চারণের দিকে অগ্রসর হবে, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

আধুনিক বাংলা কাব্যের অগ্রদূত কবি ঈশ্বর গুপ্ত হিন্দী ভাষা ও ছন্দ বিষয়ে অবহিত ও আগ্রহী ছিলেন। তুলসীদাসের সাহিত্যকৃতি এবং রামচরিত মানসে প্রযুক্ত ছন্দ বিষয়ে বিশেষভাবে অনুরক্ত ছিলেন। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ নভেম্বর সংবাদ প্রভাকরে তুলসীদাসের সাহিত্যকৃতি পর্যালোচনাকালে তিনি যা বলেছিলেন তার প্রাসঙ্গিক অংশ হল —

"হিন্দী ভাষায় বহুবিধ ছন্দ চলিত আছে, কিন্তু তুলসীদাস রামায়ণে কেবল চারি প্রকার ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। যথা—দোহা, চৌপাঈ, সোরঠা এবং ছন্দ। দোহার অর্থ যাহাতে দুই পদ আছে। সংস্কৃত ভাষার অনুষ্টুপ্ এবং বাংলা ভাষার পয়ার যেরূপ প্রসিদ্ধ ছন্দঃ হিন্দী ভাষাতে দোহা সেই প্রকার, কিন্তু রামায়ণে দোহা অপেক্ষা চৌপাঈ অধিক দেখিতে পাই, সোরঠা দ্বিবিধ এবং ছন্দঃ নামক ছন্দঃ দুই তিন প্রকার হইবে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ছন্দঃ সংস্কৃত ও বাংলা উভয় ভাষাতেই ব্যবহৃত হইয়াছে।[৫১]

এই মূল্যবান অভিমতের পর গুপ্তকবি 'রামচরিত মানসের'-বালকাণ্ড থেকে ৮+৮+১২=২৮ মাত্রার চউপৈয়া, যা আসলে ২ মাত্রার অতিপর্ব সহ হরিগীতিকার প্রকারভেদ মাত্র, উদ্ধৃত করেছেন। সে অংশটি হল—

ভয়ে প্রকট কৃপালা দীন দয়ালা
কৌসল্যা হিতকারী।
হরষিত মহতারী মুনি মনহারী
অদ্ভুত রূপ বিচারী।।
লোচন অভিরামা তনু ঘন শ্যামা
নিজ আয়ুধ ভুজ চারী।
ভূষণ বনমালা নয়ন বিসালা
সোভাসিন্ধু খরারী।
—রামচরিত মানস : বালাকাণ্ড ১৯১।৪

তুলসীদাসের রামচরিত মানসে-চওপৈয়া, হরিগীতিকা, তোমর এবং তোটক-এই চার প্রকারের ছন্দোবদ্ধ 'ছন্দ' নামে চিহ্নিত।

হিন্দীর সর্বাধিক জনপ্রিয় ছন্দোবদ্ধ কলাবৃত্ত দোহা বা দ্বিপদী বাংলাতেও রচনার চেষ্টা করেছেন ঈশ্বর গুপ্ত। তাঁর 'বোধেন্দু বিকাশ' নাটকে দ্বিপদীকে দোহা নামে চিহ্নিত করেছেন। আসলে রচনাটি দলবৃত্ত পয়ার জাতীয়।[৫২] ঈশ্বর গুপ্ত লৌকিক ছন্দে বা 'অকৃতবেশ' দলবৃত্তে সাত স্তবকের দীর্ঘ হিন্দী ভজনও রচনা করেছেন। এই রচনাটি তাঁর 'গীতাবলী' গ্রন্থে স্থাপিত। বাঙালীর মুখে হিন্দী দলবৃত্ত কেমন রূপ পেতে পারে তার সুন্দর নিদর্শন এই ভজনটি।[৫৩]

কবি রাজকৃষ্ণ রায়ও (১৮৪৯-১৮৯৪) ব্রজবুলি ভাষায় জয়দেবী ছন্দে কবিতা রচনা করেছিলেন। তাঁর 'ভারতগান' গ্রন্থে ৭১-সংখ্যক রচনাটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তার থেকে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি—

নিশিদিন ভারত রোয়সি কিস লিয়ে
ভূ-পর শোয়সি কাহে,
গভীর দীঘল শ্বাস মুহু মুহু ভেজসি
নিয়ত দহসি দুখ-দাহে ?
—সা. সা. চ.-৫০, পৃ. ৯২।

৮+৮+১২=২৮ মাত্রার ত্রিপদী পঙ্‌ক্তির চারটি দীর্ঘস্বর (যে, ভী, দী, শ্বা) হ্রস্ব উচ্চারিত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) প্রথম বয়সে বৈষ্ণব কবিদের অনুসরণে

বিশটি বৈষ্ণব কবিতা রচনা করেন ব্রজবুলিতে। সেগুলি 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' নামে পরিচিত। এই পদাবলী রচনার মাধ্যমে হিন্দীকাব্য সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরোক্ষ যোগ স্থাপিত হয়। এই সময় কিছুদিন রবীন্দ্রনাথকে আমেদাবাদে থাকতে হয়েছিন। সেখান থেকে তিনি হিন্দী-বাংলা ও ইংরেজির মিশ্র ভাষায় কবিতা আকারে একটি পত্র লেখেন। আপাতভাবে মনে হয় এই দীর্ঘ কবিতা-পত্রটি বাংলা দলবৃত্তে রচিত তবে তাতে হিন্দীর সার (১৬+৮--) বন্ধের আভাস মেলে। কবিতাটির প্রথম চার লাইন—

কলকত্তা মে চল গয়া রে স্থরেন বাবু মেরা
স্থরেনবাবু, আসলবাবু, সকল বাবু কা সেরা।
খুড়া সাব কো কায় কো নহি পতিয়া ভেজো বাচ্ছা
মহিনাভর কুছ্ খবর মিলে না ইয়ে তো নহি আচ্ছা।
—প্রহাসিনী : নাসিক হইতে খুড়ার পত্র।

ভাষাগত কিছু বিকৃতি থাকলেও এই কবিতাটিই সম্ভবত উনবিংশ শতকের বাঙালী কবির হিন্দী রচনা প্রয়াসের শেষ নিদর্শন। এটি প্রকাশিত হয় ১৮৮৬।১২৯৩ বঙ্গাব্দের ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যা ভারতীতে। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে কবি কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদও (১৮৮১-১৯০৭) হিন্দীতে কবিতা এবং গান লিখতেন। তাঁর একটি স্বদেশমূলক কবিতার (১৯০৬) কিছু অংশ হল—

পুণ্যস্থান ইহ আরিয়াবর্তমে নাহি মিলে কোই চিহ্ন,
আদমি বৌয়া মূরখ হোকর ছোড় দিয়া তজবীজ॥…
দীন বিশারদ গণই বিপদ শুনো দুঃখ কি গীত
হো মতিমান্ দেশ কে সন্তান করো স্বদেশ কি হীত॥
—সা. সা. চ.-৬৮, পৃ. ৮৮।

আপাতভাবে দলবৃত্তের প্রভাব অনুভূত হলেও বাক্‌ভঙ্গির প্রাধান্য এবং ভাষার ত্রুটি-বিচ্যুতির আড়ালে এটিতে ২৬ মাত্রার সরসী (৮+৮+৮-) ছন্দোবন্ধ পাওয়া যেতে পারে।

অসমীয়ার সাহিত্যে গত পাঁচশ বছর ধরেও যাঁর সাহিত্যিক মান ও স্থান সন্দেহাতীতভাবে শ্রেষ্ঠ সেই শংকরদেবের রচনায় বিশেষভাবে 'রুক্মিণীহরণ' গ্রন্থে ভাটের মুখে রুক্মিণী ও কৃষ্ণের অনুপম বর্ণনা 'ব্রজবুলি মিহলি অসমীয়া'তে

বিধৃত। 'সৌন্দর্য-গাম্ভীর্য কোনো গুণতে এনে বর্ণনা নিশ্চয় সংস্কৃত তকৈ হীন ন হয়।'[৫৪] উদাহরণস্বরূপ বরগীতের কয়েকটি পঙ্‌ক্তি—

তুহুঁ নব তরুণী প্রধান। সো হরি নবীন যুবান॥
দুহুঁ এক বয়স সমান। কয়লি বিধি নিরমাণ॥
ভুবন নিরুপেম রূপ। গুন ধনি বচন স্বরূপ॥
যবতব পনি সোহি হুই। সফল জনম তেবে তুই॥

—অসমীয়া সাহিত্যের বুরঞ্জি (১৯৫৭), পৃ. ৩৭১।

প্রত্নকলাবৃত্ত রীতির দশমাত্রক একপদী ছন্দোবন্ধের রচনাটির বিষয়, ভাব, ভাষা ও ছন্দের গুরুত্ব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পরবর্তীকালে গোপাল আতার 'জন্মযাত্রা' এবং রামচরণ ঠাকুরের 'কংসবধ' গ্রন্থেও ব্রজবুলির চতুষ্কল পর্বিক প্রত্নকলাবৃত্তের প্রয়োগ বেশ সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।[৫৫] শংকরদেবের শিষ্য মাধবদেবও ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনায় নৈপুণ্য দেখিয়েছেন।—

তেজরে কমলাপতি পরভাতে নিন্দ
তেরি চান্দ মুখ পেখোঁ উঠরে গোবিন্দ।

—অসমীয়া সাহিত্যের বুরঞ্জী (১৯৫৭), পৃ. ৪৩৮।

কবি রত্নাকরের 'সহস্রনাম বৃত্তান্ত' এবং শ্রীধর কন্দলীর 'ঘুনুচা-যাত্রা' জাতীয় রচনাতেও ব্রজবুলির প্রয়োগ দেখা যায়। দৈত্যারি ঠাকুর প্রমুখ সংকলিত 'গুরুচরিত' পুঁথিতে শংকরদেবের শিষ্যদের, এমন কি মুসলমান শিষ্যেরও বিরচিত কয়েকটি পদ সংকলিত।[৫৬] তাতে শংকর-কবীর প্রসঙ্গের সমর্থনে 'কবীরা'র একটি হিন্দী গীত স্থান পেয়েছে। সেই গীতের কয়েকটি পঙ্‌ক্তি—

ব্রহ্মা শংকর যাক ধিয়াই। জ্ঞানী মুনি যোগী তত্ত্ব ন পাই॥
চৈতন্য রামানন্দ হরিব্যাস। জ্ঞান-কর্ম যোগ করি প্রকাশ॥
রূপ সনাতন পাংস্তা দো ভায়া। তেহোঁ উপদেশ ভক্তিক পায়া॥
হামু কবীর অশুচ্য জাতি। কেবল ভক্তিক করিলোঁ খ্যাতি॥
হামাকু আগে না পাইলা লাগ। কি মোর দুঃসহ পরম ভাগ॥

—অসমীয়া সাহিত্যের বুরঞ্জী (১৯৫৭), পৃ. ৫৫১।

এই রচনাটি চৌপদীর আদলে রচিত। তবে অসমীয়া বাক্‌বিধি ও উচ্চারণবিধির প্রভাবে মাত্রা কোথাও কোথাও চোদ্দ বা পনের মাত্রা হয়ে

বাংলা দাঁড়ায়। মৈথিলী ও ওড়িয়া ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম সংস্কৃতি আদির সঙ্গে অসমীয়ার নানা কারণে বার বার যোগাযোগ ঘটেছে। তার প্রভাবে অসমীয়া ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি ভালোভাবেই প্রভাবিত এবং অনুপ্রাণিত হয়েছে।[৫৭] তার ফলে অসমীয়া কাব্যজগতে যেমন নতুন স্বাদ এসেছে তেমনি ছন্দের প্রয়োগকৌশল ও অভিনবতা মণ্ডিত হয়েছে। বাংলা, হিন্দী ও ওড়িয়া ভাষা ও ছন্দের সঙ্গে অসমীয়া ভাষা ও ছন্দের এই যোগসূত্র উভয় ক্ষেত্রেই ফলপ্রসূ হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বাংলার। এই অনুপ্রেরণা থেকেই সে যুগের মিশনারীদের সহযোগিতায় 'অরুণোদয়' পত্রিকা (১৮৪৬-১৮৮২) আত্মপ্রকাশ করে। তারই ফলে অসমীয়া সাহিত্যের প্রথম আলোচনা, আধুনিকতার প্রতিষ্ঠা, প্রচলিত বাংলা ভাষার বিরোধিতা ও অসমীয়া ভাষার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস, নতুন সাহিত্যিক ও সাহিত্যের আবির্ভাব এবং সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার সূচনা ঘটে। পরবর্তীকালে ১৮৮৯ সালে 'অসমীয়া ভাষার উন্নতি সাধন' সভার (কলকাতা) মুখপত্র রূপে 'জোনাকী' পত্রিকার প্রকাশ ঘটে। জোনাকী যেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার মধ্যে যোগসেতু রূপে দেখা দিল। তখন বাংলা বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, হেমচন্দ্র, মধুসূদন, নবীনচন্দ্র, বিহারীলাল, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখের সাহিত্য সৃজনে পরিপ্লাবিত। তারই আদর্শে অসমীয়া সাহিত্যকে গড়ে তুলতে চাইলেন যাঁরা তাদের মধ্যে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া, চন্দ্রকুমার আগরওয়াল, হেমচন্দ্র গোস্বামী, রঘুনাথ চৌধুরী, হিতেশ্বর বরবরুআ, লম্বোদর, সত্যনাথ আদি জোনাকী যুগের লেখকরা কলকাতায় বাংলা ভাষায় শিক্ষা লাভ করেন। বাংলা সাহিত্যের ঐশ্বর্যের পরিচয় পেয়ে তাঁরা অসমীয়া সাহিত্যের উন্নতির বিষয়ে ব্রতী হন। বঙ্গদর্শন (১৮৭২) পত্রিকাও এ-ব্যাপারে তাঁদের উৎসাহিত করে। এইভাবে বাংলা ও অসমীয়ার পারস্পরিক নৈকট্য ঘটে সাহিত্যের ক্ষেত্রে।

লক্ষ্মীনাথ, হেমচন্দ্র, পদ্মনাথ গোহাঞি বরুআ প্রমুখের অজস্র রচনায় অসমীয়া সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি ঘটে। বাংলার আদর্শে তাঁরা অসমীয়া সাহিত্যে ভাবগঙ্গা প্রবাহিত করে আসামের সঙ্গে বাংলার সম্পর্ককে সুদৃঢ় সুমধুর ও স্থায়ী করে তুললেন। পরবর্তীকালে এই রাখীবন্ধনের সুফল ফলতে দেরি হয়নি।

অসমীয়ার মতোই ওড়িয়া ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে বাংলার একটি অপরিহার্য ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে প্রাচীনকাল থেকেই। চৈতন্য মহাপ্রভু এবং

তাঁর বৈষ্ণব ধর্মকে কেন্দ্র করে বাংলা, হিন্দী, অসমীয়া ও ওড়িয়া ভাষার নতুন করে যোগসূত্র গড়ে ওঠে। ব্রজবুলি ভাষায় পদ-রচনা, বৈষ্ণব চরিত সাহিত্যের বাংলা থেকে ওড়িয়ায় এবং ওড়িয়া থেকে বাংলায় অনুবাদ প্রভৃতি সাহিত্যিক কর্মে তার পরিচয় নিহিত।

ওড়িয়ার 'পঞ্চসখা' সাহিত্যও নানা কারণে এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বলতে কি বৃন্দাবন, মিথিলা, নবদ্বীপ, আসাম প্রভৃতি অঞ্চলের ভাষা ও বৈষ্ণব সাহিত্যের অপূর্ব সংমিশ্রণ এবং সমন্বয়ের ফল পঞ্চসখা সাহিত্য। এই সমন্বয়ের কথা স্বীকৃত পঞ্চসখাদের অন্যতম অচ্যুতানন্দ দাসের 'গুরুভক্তি গীতা'র নিম্নের কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে—

চারি বেদ অষ্টাদশ পুরাণহিঁ পটে
গীতা ভাগবত ষড়্ শাহাস্ত্ররে বড়ে।
সাক্ষী যে শবদ চউতিশ পদ গায়ে
বিবিধ যে যন্ত্রমান তানভেদ বায়ে॥ ৮০

—গীতা ১৫, অ. ৩৭।[৫৮]

লক্ষণীয় চতুর্দশাক্ষরা বা মিশ্রবৃত্ত পয়ার বন্ধে রচিত এই অংশের তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে সাখী, শবদ, চউতিশ ও পদ'-এর উল্লেখ রয়েছে। 'সাখী' ও 'শবদ' কবীর ও নানকের রচনায় বিশেষ ধরনের কবিতা, চউতিশ ওড়িয়া, কিন্তু 'পদ' বা পয়ার অসমীয়া ও বাংলা। ভাষা প্রাকৃত বলে উল্লিখিত অর্থাৎ ওড়িয়ার সে যুগের বহু প্রচলিত ভাষা। অচ্যুতানন্দের ভাষা এত বেশি বাংলার সঙ্গে মেলে যে, তাকে মাঝে মাঝে বাংলা বলে ভুল হয়—

প্রভু বিনয় একাম্বর। কহিলা অচ্যুত পামর।
মুহিঁ পামর হীনমতি। অভয় পদ্মপাদ চিন্তি।
ভাবই হৃদপদ্মো মোর। গুরু যে মহিমা সাগর।

—পরম সংহিতা—অধ্যায়-২৪।[৫৯]

এ-ভাষা ষোড়শ শতকের বাংলা ভাষা থেকে খুব পৃথক নয়। সেই কারণে জগন্নাথ দাসের কয়েকটি গ্রন্থ মধ্যযুগের বাংলার সাহিত্যের নিদর্শন রূপে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে গৃহীত। আবার ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাসকারকদের মতে তা মূল ওড়িয়া থেকে বাংলায় অনূদিত। যদিও অনুবাদক ও অনুবাদ-কাল সম্পর্কে সবাই নীরব। সম্ভবত নীরবতাই শ্রেয়। জগন্নাথ দাসের নামে

গৃহীত বাংলা রচনার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি—

শুন বিনোদিনী ধনী আমার কাণ্ডারী তুমি।
তোমার কাণ্ডারী কহ কারে।
তুয়া অনুরাগে প্রেমী সমুদ্রে ডুব্যাছি আমি
আমারে তুলিয়া কর পারে।
—জগন্নাথ দাস—'রসোজ্জ্বল'।

জগন্নাথ দাসের বহু রচনা ওড়িয়া ব্রজবুলির নিদর্শনরূপে গণ্য—

দাস জগন্নাথ ছান্দ দোহনি নাই
যাও সব অনুসঙ্গ।

পদকল্পতরুতে অনুরূপ বেশ কয়েকটি পদ সংকলিত, যা ওড়িয়া কবিদের রচনা।[৩০]

'আরতি' বা 'মঙ্গল গীতি'—যা ওড়িষ্যায় বহুল প্রচলিত। ব্রজবুলিতে সেই আরতির নিদর্শনও মেলে। অজ্ঞাতনামা ওড়িয়া ভক্ত কবির একটি অনুরূপ রচনা :—

আরতি শ্রীজগন্নাথ মঙ্গল করি। পরশ চরণারবিন্দ আপদহরি।
ঘরণ ঘরণ ঘণ্টা বাজে বেণু বাঁশরী। বাজত মৃদঙ্গ তাননাদ খঞ্জরী।
অগ্রদান দীপদান জ্যোতি জগমগ। অগ্রতুল্য দীপদান পাওক জোরি।
ইন্দ্রদ্যুমন গঙ্গা আদি রোহিনী ঠাঢ়ী। মারকণ্ড শ্বেতগঙ্গা আনন্দ ভারী।
সুরনর দ্বারে ঠাঢ় ব্রহ্ম বেদ উচারি। ধন্য ধন্য রাজেশ্বর আজ কো পারি।

হিন্দী কলাবৃত্ত রীতির ১৮ মাত্রার পঙ্‌ক্তির এই রচনাটি হিন্দীর সঙ্গে ওড়িয়ার সুমধুর সম্পর্কের সার্থক দৃষ্টান্ত।

শ্রীক্ষেত্র জগন্নাথধামে উত্তর ভারতের নানা স্থান থেকে সাধুসন্তের দল ও বৈষ্ণব কবিসম্প্রদায় এসেছেন। তাঁরা নিজেদের ভাষায় আত্মভাব নিবেদনের চেষ্টা করেছেন। কালক্রমে সেসব ভজনগীত ওড়িশায় রয়ে থেকে গেছে। এইভাবে কবীর, সুরদাস, তুলসীদাস, দাদূদয়াল প্রভৃতির রচনাও অল্প-স্বল্প বিকৃতিসহ থেকে গেছে। এই সর্বভারতীয় ধর্মপীঠস্থানের মাহাত্ম্যের এই দিকটিও উপেক্ষণীয় নয়। এই ধরনের সুরদাসের নামে প্রচলিত একটি পদ—

নাথ জী নাথ জী নাথ জী। জয় জগবন্ধু জগন্নাথজী।

তুলসী কো থান মু আজ বিরাজো জী।
জহাঁ হনুমান চৌকী বৈঠেঁ জী। ১।
রত্ন সিংহাসনে পদ্ম আসন জী
জহাঁ ভক্ত জন বৈঠেঁ গুণ গাওয়েঁ জী॥ ২॥
বাওয়ন কোটি ভোগ লগায়েঁ জী
যহাঁ লক্ষ্মী পাওঝী লিয়েঁ ঠাঢ়ি জী। ৩॥
সুরদাস প্রভু তুহুঁারে দরশন কো চরণকওঁল চিত্ত ধায়ে জী॥"[১]

এই পদটির ভণিতায় সুরদাসের নামোল্লেখ থাকলেও এটি যে সুরদাসের রচিত নয়, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। সুরদাসের কোনো পদে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের উল্লেখ পাওয়া যায় না, অন্তত কাশীর নাগরী-প্রচারিণী সভার সুরসাগরে নেই। সুতরাং এটি কোনো ওড়িশাবাসী ভক্তসন্তের রচনা বলে স্বীকার্য।

প্রাক্ আধুনিক যুগে ইংরেজি শিক্ষা-সভ্যতা এবং সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে বাংলা সাহিত্য যখন অপেক্ষাকৃত উন্নত হয়ে উঠল, তখন খুব স্বাভাবিক কারণে অসমীয়ার মতো ওড়িয়াতেও বাংলার আদর্শে নিজেকে গড়ে তোলার প্রবণতা দেখা দেয়। মধুসূদন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র কেবল বাংলারই নয় সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যেরই গৌরব ও আদর্শ হয়ে উঠলেন। বহু ওড়িয়াভাষী কলকাতায় এসে-পড়া-শোনা করেন। বাংলা শিখে প্রথমে বাংলায় এবং পরে ওড়িয়াতে কবিতা লিখতে শুরু করেন। অনেকে বাংলায় না লিখে সরাসরি মাতৃভাষা ওড়িয়াতেই লিখতে শুরু করেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাংলা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত রচনা একটু অদল-বদল করে ভাষান্তরিত করে মৌলিক রচনা বলে প্রকাশিত হতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত ওড়িয়া সাহিত্যিক কবিবর রাধানাথ রায় একটি পত্রে সে কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে লিখেছেন—

"পুরাতন বাংলা পুস্তক কিম্বা মাসিক পত্রিকারু প্রবন্ধ নেই তাহাকু অনুবাদ ও ঈষৎ রূপান্তরিত করি উৎকলীয় সাধারণ সমক্ষরে মৌলিক প্রবন্ধ বোলি উপস্থাপিত করিবার সুকৌশলরে অনেক তথাকথিত ওড়িয়া লেখক সিদ্ধ হস্ত দেখা যাস্তি"। (রাধানাথ গ্রন্থাবলী)।

অষ্টাদশ শতকের ওড়িয়া কবি বংশীবল্লভ গোস্বামীও একাধিক ভাষায় জ্ঞাতা ছিলেন। তাঁর রচিত 'রাধাকৃষ্ণ তামাসা'র ভাষা ব্রজবুলির ন্যায়।—অবশ্য তাতে ওড়িয়া, বাংলা, হিন্দী, আরবি, ফারসি ও উর্দুর সংমিশ্রণ ঘটেছে বলা

যায়। তাই ভাষাটিকে ব্রজবুলির সমগোত্রীয় বলাই সঙ্গত। সব মিলিয়ে এই ভাষাকে হিন্দী ভাষা রূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। হিন্দীর দোহা ('দুহা') কবিত্ত ('কবিত্তি') প্রভৃতি ছন্দেই পুরো 'তামাশা'টি রচিত। দু-একটি অন্য ছন্দেরও প্রয়োগ চোখে পড়ে। অবশ্য কোনো ছন্দ-বন্ধই নিখুঁত নয়। যেমন—

কবিত্তি : ছাহি-এ ছাহি-এ-ছাহি-এ ছবনা
মেয়ো পসারো উত্তীরে কাহাই।
বল্লভ যাকু ছাহি দিএ
কাহা করে ছাহি কংস রাজাই।

—এষণা পত্রিকা, সপ্তম খণ্ড, ১৯৮৩ পৃ. ৩৭।

কবিত্ত নয়, এটি আসলে দোহার আকৃতির রচনা। এবার তার দৃষ্টান্ত—

দোহা— বনওয়ারি তুম লিখে কহো,
শুন্ বাত জাত জ্ঞান।
দিন কারনকু ফিরে চলো
এই করোরে সমান।

—পূর্ববৎ, পৃ. ৩৭

১৩+১১=২৪ মাত্রার দোহা রূপটি তেমন বিকৃত নয়।
কবিত্তির অপেক্ষাকৃত সুন্দর রূপের নিদর্শন রয়েছে এই অংশে—

শীতল সুগন্ধ মন্দ মধুর মধুবন হে, ১৬
ষড়্ ঋতু কে রিত বিত যাত এক ছন মো, ১৫
ভাউ ভাউ লটপটাত লহ লহ হাত লতাবাল ১৬
পুরন্ ফুল ফুল হাত পল্লব তরু অনমু॥ ১৫

—পূর্ববৎ, পৃ. ২৬।

মিশ্রবৃত্ত বা হিন্দী ঘনাক্ষরী (কবিত্ত) রীতি অনুযায়ী প্রথম ছন্দ পঙ্‌ক্তিতে ১৬+১৫=৩১ এবং দ্বিতীয় ছন্দ পঙ্‌ক্তিতেও ১৬+১৫=৩১ মাত্রা পাওয়া অসম্ভব নয়।

অষ্টাদশ শতকের (আনুমানিক ১৭২৫-১৮১০) কবি ব্রজনাথ বড়জেনা তাঁর কাব্যে ওড়িয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা এবং হিন্দী ভাষা এবং ছন্দের ব্যবহার করেছেন। বিনা দ্বিধায় তৎসম শব্দের সঙ্গে আরবি-পার্শি এবং দেশজ শব্দও

ব্যবহার করেছেন। হিন্দী ও বাংলা কবিতার মান ও পরিমাণ বিচারে সহজেই বলা যায় তিনি বাংলা ও হিন্দী রচনায় বেশ দক্ষ ছিলেন। তাঁর 'অম্বিকা বিলাস', 'সমরতরঙ্গ' (১৭৮১) এবং 'শ্যামরাসোৎসার' প্রভৃতি কাব্যে তার পরিচয় রয়েছে। অম্বিকা বিলাস কাব্যে সংস্কৃত পৃথ্বী, রথোদ্ধতা, শার্দূল বিক্রীড়িত, ভুজঙ্গপ্রয়াত, দোধক (প্রাকৃত) প্রভৃতি ছন্দের প্রয়োগ করেছেন। তাঁর বহু ভাষার জ্ঞান এবং কবিতা রচনায় বিভিন্ন ভাষা ও ছন্দের প্রয়োগ প্রবণতা বাংলার ভারতচন্দ্র রায়ের অনুরূপ দক্ষতা ও প্রবণতার সঙ্গে তুলনীয়। এ-ক্ষেত্রে বড়জেনার ভারতচন্দ্রের রচনা পাঠে অনুপ্রাণিত হওয়া বিচিত্র নয়। অন্নদামঙ্গলে যে যুদ্ধের কাহিনী যেরূপ ভাষা ও ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে 'বড়জেনার' 'সমরতরঙ্গ' রচনায় দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। অম্বিকা বিলাসের 'ব্রহ্মস্তুতি' 'ইন্দ্রস্তুতি' প্রভৃতি বারোটি স্তুতি কবিতা সংস্কৃত ভাষায় রচিত। অবশ্য 'পিঙ্গল ভাষার' নামস্তুতি এবং বঙ্গদেশে স্তুতি বাংলায় অসুর স্তুতি হিন্দী বা 'খোরঠা' ভাষায় রচিত। হিন্দী 'মত্ত গয়ংদ সবৈয়া' (ভগণ × ৭ + গ. গ. = ২৩) বর্ণমাত্রা) এবং বাংলা মিশ্রবৃত্ত রীতির ত্রিপদী (৮ ॥ ৮ ॥ ১০ = ২৬ মাত্রা) ব্যবহার করেছেন। চৌপদী প্রভৃতি বন্ধও রচনা করেছেন। প্রথমে বাংলা কবিতা—

অপর্ণাদেবীর স্বামী তোমার চরণে আমি
ভূত ভূত সবে কবে হৈব।
অপার এই ভবনদী তরিতে না দিশে বুদ্ধি
যন্তপি না দিবে দয়া নাব ॥ ১ ॥
অধর্ম্মের পথ মাড়ি ধর্ম মার্গ দিলা ছাড়ি
বঞ্চনাতে জীবন বঞ্চলে।
অন্তকের দূত যবে জঞ্জাল করিবে তবে
উদ্ধারিবে তুমি দিগ চলে ॥ ২ ॥
অনিল সংসার যত চরাচর আছে মাত্র
সকল কারণ হও তুমি।
অস্তস্থিতি উৎপত্তি আজ্ঞাতে আছি প্রবর্তি
ভববন্ধে মগ্ন হয়ে আমি ॥ ৩ ॥
অজ অরন্ধ আশ্রয় দিগম্বর গৌর কায়
জয় জয় ভূত কুলেশ্বর।

অয়ে বিভু বিশ্বনাথ ভাবে দাস ব্রজনাথ

ভববন্ধ কন্দহু উদ্ধার ॥ ৪ ॥

—'বঙ্গদেশ স্তুতি' : ব্রজনাথ গ্রন্থাবলী (১৯৬৫) পৃ. ৪৫১

—মিশ্রবৃত্ত ত্রিপদীর (বঙ্গলাশ্রী) প্রয়োগ নিখুঁত বলা যায়। এবার হিন্দী কবিতা ও ছন্দ :—

অম্বকে নাথ ত্রিলোচন শংকর শম্ভু দিগম্বর অম্বকে প্যারে,
অম্বর ছোড়িউ ভূতি চঢ়ায়কে ডম্বরু শূল কপাল কী ত্যারে,
অন্তরয়ামি সদাশিব হো তুম, দিলকে বাত ছিপে নহিঁ তোরে,
অম্বুজ নাথ্ চঢ়াউ করো বখ সিস্ মুনাসিব্ বাগ্ হামারে ॥

—'অম্বুর স্তুতি' : ব্রজনাথ গ্রন্থাবলী (১৯৬৫) পৃ. ৪৫১।

এটি ২৩ বর্ণ মাত্রায় মত্ত গয়ংদ সবৈয়ার নিদর্শন। 'সমরতরঙ্গ' থেকে হিন্দী কবিতার অংশ :—

অবসর সরদার বিচারো।
একঠো ভী গড় হাত ন আয়া ভলে ভলে তুম মারো ॥ 0 ॥
ঢাল ঢাল ভর পইসা লেকে কোই অব মার্ দো কিল্লা।
থোড়া গঢ় টুক লড়নে হা হিঁ ক্যা করু যাকে বঙ্গলা ॥ ১ ॥
রাজা মুঝে ক্যা কহেকো কাম নহিঁ বড়ি থোড়া।
লাখ ফউজ অব সাথ হৈ মেরা কেতা হাথিনী ঘোড়া ॥ ২ ॥
যাতে যাতে কিত্তা কিল্লা লিআ তোপকে মারে।
বিশ্ বিশ্ রোজ সড়্গই সড়কে ক্যা-কহুঁ ভাই তুমারে ॥ ৩ ॥
নিকলে সব তুম পাওঁ উঠাকে মারনেকু কলকত্তা।
জোর ন পায়ে উঠাও ন ঢিলা পাহাড় তোড় মমতা ॥ ৫ ॥
মুছ দাড়ি পর হাথ্ রখো মত্ কুছু কাম নহী কিয়া।
(যুহ) বাত শুনি ব্রজনাথ কহে-সরদার লোক জল গিয়া ॥ ৫ ॥

—খোরঠা ভাষা, পূর্ববৎ, পৃ. ৫১৫।

এখানে কবি বড়জেনা ১৬॥ ১২ = ২৮ মাত্রার দ্বিপদী বন্ধের পঙ্‌ক্তি লিখেছেন। ভাষা বাক্‌ধর্মী হিন্দী, যদিও তা নির্ভুল নয়। এবার 'শ্যামরাসোৎসার' কাব্য থেকে দুইটি দৃষ্টান্ত :—

সারথি ভণ্ডমেঁ গালি দিএ যব খুস চলে তব্ রাম কী ভাই
হাঁ হাঁ হাঁ হাঁ করে গহলমে ঠেলে দেঁ কোই যাএ।
কোই ভিড়মে রুচির রমণী কুচকু আঞ্চলিয়ে ॥
নেলা নেলা কহ কহ কোই কামকুঁ মুদি ধাএঁ।
মাল মালে চেড়ি পো কিকল বোলকে সোর কিয়ে ॥
—সূর্যনারায়ণ দাস : ও. সা. ইতিহাস, খণ্ড-২, পৃ. ১০৫।

এখানে হিন্দী ও মারাঠীর মিশ্র ভাষা ব্যবহৃত। আরও একটি নিদর্শন :—

কাহাঁ বিরাজত রাজ কী দৌলত, কৌনজগে দ্বিজমণ্ডলী তোরা।
কাহাঁ পড়ে গিরিপুরী দিগম্বর কৌন জগে পড়ে সঞ্চন ডেরা
কহাঁ নবাব কী তম্বু পড়ে ভই কহাঁ মহাজন রাউটী ঘেরা
কৌন জগে রহে দণ্ডী সুপণ্ডিত কাহাঁ পড়িগই গরিব বিচারা ॥
—পূর্ববৎ, পৃ. ১০৫।

উচ্চারণ যথাসম্ভব চলিত হিন্দীর এবং ছন্দ চতুষ্কল পর্বিক হিন্দী কলাবৃত্তের। ২৮ মাত্রার দ্বিপদী। হিন্দী মাত্রাবৃত্ত চৌপাঈ বন্ধের নিদর্শন :—

চউদিগ পূরত হরি হরি বাণী। চালত আসন চামর শ্রেণী ॥

বিভিন্ন ভাষার জ্ঞাতা ব্রজনাথ বড়জেনার শেষ কাব্য 'গুণ্ডিকা বিজে'— আকারে ছোট হলেও তা পুরোপুরি হিন্দীতে লেখা। সে যুগে অ-হিন্দী ভাষী কবির সম্পূর্ণ হিন্দী কাব্য রচনার নিদর্শন আর চোখে পড়েনি। 'গুণ্ডিকা বিজে' কাব্যটির বহু লিপিকর প্রমাদের ফলে মূল ভাষা পুরোপুরি হয় তো নেই। কাব্য গ্রন্থাবলীর সম্পাদক সুধাকর পট্টনায়ক ভূমিকায় লিখেছেন—

"দুঃখর বিষয়, কবিংক সময় ঠারু এ-হিন্দী দীর্ঘকাল মধ্যরে বিভিন্ন নকল-নবিস মানংক হস্তরে পড়ি এবে আম হাতকু আসি থিবা গুণ্ডিকা বিজের হিন্দী ভাষারে কিছি কিছি অশুদ্ধতা রহি যাইথিবা স্বাভাবিক। এথিপাই আম্ভেমানে দুঃখিত।"

—ব্রজনাথ গ্রন্থাবলী (১৯৬৫) 'মুখবন্ধ, পৃ. ২৭।

ছন্দের বিচারে বলতে হয় দোহা, চৌপাঈ, প্রভৃতি মাত্রাবৃত্ত বন্ধ সহ তোটক সবৈয়া প্রভৃতি বন্ধের প্রয়োগ ঘটেছে এই ২৫ পৃষ্ঠার হিন্দী কাব্যটিতে।

একটি প্রারম্ভিক দোহা—

শ্রীরাধা পতি পদ চিন্তকে, সকল বিঘ্ন কর নাশ
করতহিঁ নরহরি গুণ্ডিকা যাত্ত বিধি পরকাস।
—গুণ্ডিকা বিজে : প্রথম দোহা।

অ-হিন্দী ভাষী হয়েও হিন্দী কাব্য কবিতা রচনায় যে আগ্রহ, অধিকার এবং ভাষাপ্রীতি দেখা যায় ওড়িয়া কবি ব্রজনাথ বড়জেনার ব্যক্তিত্বে, তাতে তিনি বাঙালি কবি ভারতচন্দ্র রায়কেও অতিক্রম করে গেছেন বললে অন্যায় হবে না।

কাশীরাম দাসের মহাভারতের অনুসরণে সারলা দাসের ওড়িয়া মহাভারতের কিছু কিছু অংশের পরিবর্তিত রূপ পাওয়া যায়। বাংলার সঙ্গে ওড়িয়ার এইজাতীয় যোগাযোগ কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এখানে দুইটি মাত্র পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করা যাচ্ছে।—

বাংলা মহাভারত : মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্‌॥

এর আদর্শে পরিবর্তিত সারলা দাসের মহাভারতের দুই পঙ্‌ক্তি।[৬৩]

পুণ্যকথাভারতর শুণে পুণ্যবান।
পৃথিবীরে সুখ নাহিঁ এহার সমান॥
—সারলাদাস মহাভারত : বনপর্ব, পৃ. ২৬৯

মিশ্রবৃত্ত পয়ারের রূপটি উভয়ত্রই সার্থক।

ঊনবিংশ শতকের সর্বজন শ্রদ্ধেয় তিনজন ওড়িয়া সাহিত্যকার—ফকিরমোহন সেনাপতি, রাধানাথ রায় ও মধুসূদন রাও বেশ ভালো বাংলা জানতেন। তাঁরা বাংলা লিখতেও পারতেন। রাধানাথ রায় প্রথম জীবনে বাংলাতেই কবিতা লেখা শুরু করেন—তাঁর কবিতাবলী প্রথম ও দ্বিতীয় এবং লেখাবলী কলকাতার নবভারতে এবং এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত কবিতার সংকলন। তিনি বাংলার আদর্শে ওড়িয়া কাব্যজগতে যুগান্তর আনতে প্রয়াসী এবং সফলকাম হন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং কবি নবীনচন্দ্র সেন উভয়ে রাধানাথকে 'ওড়িশার গৌরবকেতন' অধ্যায় ভূষিত করেছিলেন।[৬৪]

মধুসূদন রাও যথার্থতই রাধানাথের শিষ্য। তিনিও বাংলায় কবিতা লিখতেন। তাঁর ২০৪ পঙক্তির দীর্ঘ একটি কবিতা ১২৯৮, অগ্রহায়ণ সংখ্যার

নব্যভারতে (পৃ. ৪০৫-০৯) প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসক ছিলেন এই কবিতা ও কবির। ১২৯৮, পৌষ সংখ্যায় সাধনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

"ঋষিচিত্র একটি কবিতা। লেখক শ্রীযুক্ত মধুসূদন রাও। নাম শুনিয়া কবিকে মহারাষ্ট্রীয় বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু বঙ্গভাষার এরূপ কবিত্ব প্রয়াস আর কোনো অ-বাঙ্গালী দ্বারায় সাধিত হয় নাই। কবির রচনার মধ্যে প্রাচীন ভারতের একটি শিশিরস্নাত পবিত্র উষালোক অতি নির্মল উজ্জ্বল এবং মহৎভাবে দীপ্তি পাইয়াছে। এই কবিতার মধ্যে আমরা একটি নূতন রসাস্বাদন করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি। প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে বাংলায় অধিকাংশ লেখক যাহা লেখেন, তাহার মধ্যে প্রাচীনত্বের প্রকৃত রসাস্বাদন পাওয়া যায় না। কিন্তু ঋষিচিত্র কবিতার মধ্যে একটি প্রাচীন ধ্রুপদের সুর বাজিতেছে।"

—অবন্তী দেবী : ভক্তকবি মধুসূদন রাও ও উৎকলে নবযুগ (১৩৭০) পৃ. ১২২

ঋষিচিত্র কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি—

সহসা সহস্র বিদ্যুন্মহ : পরাভবি
স্ফুরিল ঋষির হৃদে মহামৃত ছবি।
অমূর্ত মূরতি আহা রূপ নিরূপম।
অনন্ত অনল ব্যাপি স্থাবরজঙ্গম।
দেশ কালাতীত দৃশ্য কল্পনা অতীত
অথচ জ্যোতির জ্যোতি নয়নাগ্রস্থিত।

—নব্যভারত, অগ্রহায়ণ, ১২৯৮, পৃ. ৪০৭।

বাংলা মিশ্র কলাবৃত্ত রীতির পয়ার বা ওড়িয়া 'চতুর্দশাক্ষর' বন্ধের নিখুঁত প্রয়োগ লক্ষিত হয় এই সার্থক কবিতাটিতে।

কবি ফকিরমোহন সেনাপতির বাংলা কবিতাও কলকাতার পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হত। কিন্তু তার কোনো বিবরণ বা নিদর্শন পাওয়া যায় না।

বিংশ শতকের ওড়িয়া বাঙালি কবি ও সাহিত্যিকদের মধ্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ অন্নদাশংকর রায়—প্রথমে ওড়িয়াতে কবিতা রচনা শুরু করেছিলেন। রাধানাথ রায় বাংলা থেকে ওড়িয়ায় এবং অন্নদাশংকর ওড়িয়া থেকে বাংলায় আসেন। অন্নদাশংকর রবীন্দ্রাদর্শে ওড়িয়া সাহিত্যে সবুজগোষ্ঠীর স্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁর কবিতার ভাবে ভাষায় ও ছন্দে রবীন্দ্রনাথের আদর্শানুসৃতি

লক্ষিত হয়। সবুজগোষ্ঠীর কবিদের রচনায় তা সুলভ। অন্নদাশংকর অন্তত বারোটি কবিতা রচনা করেছেন ওড়িয়া ভাষায়। রূপে ও রীতিতে সেগুলি বিভিন্ন। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—

"তরুণ অন্নদাশংকর বঙ্গলার আশ্রয় নেবা পূর্বরু ওড়িআরে যেতিকি লেখি থিলে স্বল্পতা সত্ত্বে এহি…তাহারি হিঁ শৈল্পিক মূল্য সর্বোচ্চ কহিবাকু হুএ।"[৬৫]

কয়েকটি উদাহরণ:—

(১) যেতে পাপ, যেতে মিথ্যা, যেতে মোহ, যেতে প্রবঞ্চনা
ধর্মনামে, নীতিনামে, জাতিনামে যেতে আবর্জনা।
বৈষম্যের ভেদ রেখা ভণ্ডতার যেতে আচ্ছাদন
দুর্বলর হাহাকার পীড়িতর মরমবেদন
বিধি পদে ধরিত্রীর দুঃখ শোকে ভরা অর্ঘ্যথালি—
নিষ্ঠুর নির্মম মুহিঁ নির্বিকারে সবু দেবি জালি।

—সবুজ কবিতা: 'প্রলয়-প্রেরণা'।

ভাব-ভাষা ও ছন্দে এই রচনাটি রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষ শেষ' কবিতাটির স্মরণ করায়। আঠারো মাত্রার মিশ্রকলাবৃত্ত দ্বিপদী (৮ ।। ১০) মহাপয়ার।

(২) কহুছি সত শুন গো মিত
ধ্বংসে মোর মন নাহিঁ
সে হুহেঁ মোর ব্যসন,
প্রলয় ধূমকেতু মুঁ নুহেঁ
মুহই ভূমিকম্প মুঁ হে
সৃষ্টি স্থিতি নাশন।

—সবুজ কবিতা, 'সৃজন স্বপ্ন'।

রচনাটি পঞ্চকল পর্বিক কলাবৃত্ত ত্রিপদী (১০ ।। ১০ ।। ৮)।

(৩) নিষ্ঠুর বাস্তব বণে আসিছি আহ্বান
থাস মুগ্ধা প্রণয়িনী স্বপ্নানসা বাণী
কমল বিলাসী কবি মাগই মেলাণি
আজি মুঁ তুলিবি তোতে, কালিদেবি প্রাণ।

—সবুজ কবিতা: 'কমল বিলাসীর বিদায়'।

একটি সনেটের অংশ বিশেষ। সেযুগের বিচারে এই সনেটটি অনবদ্য এবং

অদ্বিতীয় ওড়িয়া সাহিত্যে।

(৪) বসন্তের চম্পাসম তরুণী যেবে ফুটিলা
সৌরভর সুরা তাহার দিগ্ বিদিগে ছুটিল।
জগতে হজেনা কিছি হজে জীবনে
বাহারে বেদনা নাহিঁ বেদনা মনে।
আহা যউবন থরে গেলে আউ আসে না
বৃথা বিধুর পরাণপুরে ঝুরে বাসনা।
—পূর্ববৎ : যউবন থরে গেলে আউ আসে না।

চতুষ্কল পর্বিক কলাবৃত্তের ১৩ মাত্রার দ্বিপদী (৮+৫) পঙ্ক্তি। শেষ দুই পঙ্ক্তি প্রথমে দুই মাত্রার অতি পর্ব বিন্যাসের ফলে পাঠে বৈচিত্র্য এসেছে। রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী কবিতাটির (৮+৫+ = ১৩ মাত্রা) ছন্দ-বিন্যাস স্মরণীয়। অন্নদাশংকর তাঁর 'পরীমহল : উত্তরা' কবিতায় চতুষ্কল পর্বিক ১৫ মাত্রার দ্বিপদী (৮ ॥ ৭) এবং ১১ মাত্রার একপদীর সার্থক ব্যবহার করেছেন।

এ পর্যন্ত আলোচনা থেকে দেখা গেল যে—বাঙালি, অসমীয়া এবং ওড়িয়া কবিরা হিন্দী ভাষা ও ছন্দ অধিগত করে হিন্দীতে কবিতা লেখার চেষ্টা করেছেন। বেশ কয়েকজন সফলও হয়েছেন। কিন্তু উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত কোনো হিন্দী কবি বাংলা, অসমীয়া বা ওড়িয়া ভাষা ও ছন্দ চর্চা করেননি। অসমীয়া এবং ওড়িয়া চর্চার ব্যাপারে উৎসাহী হিন্দী কবির কথা জানা যায় না। তবে বাংলা ভাষা ও ছন্দ চর্চায় প্রথম আগ্রহ দেখান আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের অগ্রদূত কবি ও নাট্যকার ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র (১৮৫০-৮৫)। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গুণগ্রাহী হরিশ্চন্দ্র প্রথম কবি যিনি ঘনাক্ষরী (মিশ্রকলাবৃত্ত) রীতির পয়ার বন্ধে হিন্দী কবিতা রচনা করেন। বাংলা ছন্দে বাংলা কবিতাও তিনি রচনা করেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'প্রাতসমীরণ' নামে ৮৬ পঙ্ক্তির দীর্ঘ কবিতাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৩৩] কবিতাটির প্রথম ও শেষ দুইটি করে পঙ্ক্তি হল :—

মন্দ মন্দ আওয়ৈ দেখো প্রাত সমীরণ
করত সুগন্ধ চারো ওর বিকীরণ ॥…
প্রাত পৌন লাগে জাগ্যো কবি হরীচন্দ
তাকী স্তুতি করি কহ্যো য়হ বঙ্গছন্দ।
—ভা. গ্রন্থাবলী (না. প্র. স.) খণ্ড-২, পৃ. ৬৮৬-৮৯।

বলাই বাহুল্য ৪+৪ ।। ৪+২=১৪ মাত্রার পয়ার বন্ধই এখানে 'বন্ধছন্দ'। রীতি মিশ্রবৃত্ত। প্রয়োজনবোধে কবি তিন মাত্রার শব্দকে দুই মাত্রার রূপ দিয়েছেন, ছন্দের খাতিরে। এই জাতীয় প্রয়োগ কবির ছন্দ জ্ঞান ও পাকা কানের পরিচায়ক। কবিতাটি লেখা হয় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে।

পূর্বেই বলেছি ভারতেন্দু হিন্দী পয়ার রচনা ছাড়াও বাংলা কবিতাও লিখেছেন। বাংলা ছন্দের কলাবৃত্ত, মিশ্রবৃত্ত ও দলবৃত্ত রীতিতে লেখা প্রায় ৪৭টি বাংলা পদ বা গান হরিশ্চন্দ্রের নামে প্রচলিত। এগুলি সংকলিত তাঁর 'প্রেমতরঙ্গ' কাব্যে (১৮৭৭) 'অথ বঙ্গলা গান' শিরোনামে। অ-বাঙালি কবির বাংলা কবিতায় ভাব-ভাষা ও ছন্দের ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা স্বাভাবিক। তবে বাংলা ও হিন্দী কবিতার যোগসূত্র হিসাবে এগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এইসব রচনায় বিভিন্ন রীতির একপদী, দ্বিপদী (পয়ার), ত্রিপদী ও চৌপদী বন্ধের ব্যবহার ঘটেছে। 'অতিপর্ব' ও নানা রকমের মিলের সাহায্যে ধ্বনিবৈচিত্র্য সৃষ্টির সপ্রশংস চেষ্টা লক্ষ করার যোগ্য। কারো কারো মতে এই পদগুলির মধ্যে কোনো এক কাশীবাসিনী বাঙালি মহিলার রচনাও আছে। সে যাই হোক —আমরা এখানে ভারতেন্দুর রচনা থেকে তিন রীতির একটি করে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি।

১। কলাবৃত্ত :—

প্রাণনাথ নিদয় হয়ে বিদায় চেওনা।
তোমা বিন প্রাণ, নাহি রবে প্রাণ
কিসে পাব ত্রাণ—আমায় বল না।
আমি হে অবলা তাহাতে সরলা
বিরহ জ্বালা, প্রাণে সহে না।

—প্রেমতরঙ্গ : অথ বঙ্গলা গান, পদ—২।

প্রথম পংক্তির প্রারম্ভে চারমাত্রার অতিপর্ব সহ পাঁচ ও ছয় মাত্রার পর্বের একপদী ও দুইটি লঘু চৌপদী রচিত। নিধুবাবুর 'টপ্পা'র ছাঁচে পদটি গঠিত।

২। মিশ্র কলাবৃত্ত :—

নিভৃত নিশীথে লই ও-বাঁশি বাজিল।
পূরিত করিয়া বন ভেদিয়া গগন ঘন
কাঁপাইয়া সমীরণ মধু রবে গাজিল ॥

স্তম্ভিত প্রবাহ নীর তাড়িত ময়ূর কীর
ঝংকারিয়া তরুগণ একতান বাজিল ॥
হরিশ্চন্দ্র শ্যাম বাঁশী সুর কামদেব ফাঁসী
কুলবধূ শুনিয়াই আর্যপথ ত্যজিল ॥

—পূর্ববৎ, পদ-৪১।

৮+৭=১৫ মাত্রার প্রথম পংক্তিটির 'ও' দীর্ঘ ও দ্বিমাত্রক। বাকি তিনটি পংক্তি চৌপদী (৮ ॥ ৮ ॥ ৮ ॥ ৭।)। লুপ্ত যতিরও প্রয়োগ সুস্পষ্ট। চতুষ্কল পর্বিক রচনাটির পদে পদে মিলের বৈচিত্র্যও লক্ষণীয়। প্রাচীন নীতি মেনে ভারতেন্দু মিশ্র কলাবৃত্তে ষট্‌কল পর্বেরও ব্যবহার করেছেন।

৩। দলবৃত্ত :—

মন কেন রে ভাব এত
দিবানিশি ভাবছ বসি
জেন বুঝি হয়েছে হত
এতেক ভাবনা কিসের কারণ
হবে বুঝি পাগলের মতো।

—পূর্ববৎ, পদ-১৩

চতুর্দল পর্বিক একপদী ওই যে, ও দুইটি দ্বিপদী পংক্তিতে এই গানটি রচিত। দ্বিতীয় পংক্তির প্রথমে দুই মাত্রার অতিপর্ব আছে। রচনাটিতে রামপ্রসাদী—'মন কেন রে ভাবিস এত' ইত্যাদির ভাব-ভাষা ও ছন্দের ছাপ সুস্পষ্ট। 'অথ বঙ্গলা গান'-এর কোনো কোনো পদে মিশ্র কলাবৃত্ত ও দলবৃত্তের মিশ্র প্রয়োগ ঘটেছে—এমনও দেখা যায়। বাংলা ছন্দ রচনায় ভারতেন্দুর অসামান্য নৈপুণ্য ছিল। বাংলা কাব্যজগতে বিশেষ করে বাংলা ছন্দের ক্ষেত্রে তাঁর ঐতিহাসিক কীর্তি স্মরণীয় হয়ে থাকবে।[১১]

বাংলা কাব্য ও বাংলা ছন্দের প্রতি ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের বিশেষ আকর্ষণের মূলে আছে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'বিদ্যাসুন্দর' নাটক এবং ভারতচন্দ্র রায়ের 'বিদ্যাসুন্দর কাব্য'। এ-দুইটি গ্রন্থ পড়ে তিনি 'বিদ্যাসুন্দর' নাটক অনুবাদে আগ্রহী হন।[১২] আসলে এটিকে অনুবাদ না বলে অনুসৃতিই বলা ভালো। ভারতচন্দ্র রায়ের রচনার সঙ্গে ভারতেন্দুর এই যোগাযোগ বাংলা ও হিন্দী সাহিত্যকে ঘনিষ্ঠ হতে সহায়তা করেছে।

সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী 'নিরালা' আর একজন কবি (১৮৯৬-১৯৬১) যিনি বিংশ শতকে হিন্দী সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠা অর্জন করলেও তাঁর জন্ম ও শিক্ষা-দীক্ষা সব বাংলায়। পরবর্তী জীবনেও তিনি বাংলায় কবিতা লিখতেন। এ-পর্যন্ত তাঁর দুইটি বাংলা কবিতা পাওয়া গেছে—একটি মিশ্রবৃত্তে এবং অন্যটি দলবৃত্তে।

মিশ্রবৃত্তের কবিতাটি ১৯৩১ জানুআরি ৬, তারিখে আলমোড়া থেকে কবি সুমিত্রানন্দন পন্তের উদ্দেশ্যে অভিনন্দন বার্তা রূপে লেখা। প্রতিষ্ঠিত হিন্দী কবি বাংলায় এই কবিতাটি লেখার কৈফিয়ৎ স্বরূপ লিখেছিলেন—

"বন্ধু, আমি এই ভাষায় [বাংলায়] প্রথম কবিতা লিখিয়াছিলাম, তাই ইহাতেই তোমার অভিনন্দন।"[৪০]

এই অভিমত থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে, বাংলা ভাষার প্রতি নিরালা গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন এবং বাংলা ভাষায় তাঁর যথেষ্ট অধিকারও ছিল। তিনি স্বতঃস্ফূর্ত কণ্ঠে স্বীকার করতেন "বঙ্গলা মেরী ওয়ৈসী হী—মাতৃভাষা হৈ জৈসী হিন্দী" (প্রবন্ধ প্রতিমা) অর্থাৎ বাংলা আমার তেমনই মাতৃভাষা যেমন হিন্দী। আরো। বলেছেন—"মৈঁ য় হাঁ অবশ্য বঙ্গলাকা বিরোধ নহী কর রহা, উসকে আধুনিক অমর সাহিত্য কা মুঝ পর কাফী প্রভাব হৈ।" (পরিমল, ভূমিকা, পৃ. ১৩) সে যাই হোক—আলোচ্য কবিতাটি থেকে শেষের কয়েক ছত্র :—

পথ যাহা জানি আমি বলি
　　আগুন দ্বিগুণ মনে জ্বালো।
যতই জ্বলিবে দেহমন
　　ততই পাইবে তুমি আলো॥
গাহিয়া উঠিবে তব প্রাণ
　　প্রভাতের আলোকের গান।
সকলের জীবনের ধারা
　　তোমাতে লভিবে অবসান॥

—গীতগুঞ্জ (১৯৫৯), ৬৭-৬৮।

মূল কবিতাটি ছত্রিশ ছত্র অর্থাৎ ১৮ ছন্দ-পংক্তির। (৪+৪+২ ॥ ৪+৪+২) ২০ মাত্রার দ্বিপদী। বলাই বাহুল্য ভাবে-ভাষায় ও ছন্দে কবিতাটি অনবদ্য।

দলবৃত্ত রীতির কবিতাটি একটি সনেট বিশেষ। সনেটটি বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতকে উদ্দেশ্য করে লেখা। সেটি হল—

মাননীয়া শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতকে প্রতি—

সেদিন তুমি আমায় ডেকে ছিলে
আমার সঙ্গে কথা বলবে বলে।
ভেবেছিলাম কোনো অছিলায়
এড়িয়ে যাব এমন দায়।
নানারকম ভেবে গেলেম শেষে,
এলে তোমার রূপের স্রোতে ভেসে,
চাহনিতে কিন্তু বিষম লাগে,
প্রাণে আমার দুরু দুরু জাগে।
চরিত একটি ধরে বললে, "কোব্‌লার,
জুতো পালিশ করতে পার?" "পারি।"
যেই বললেম, বললে, মানিয়ে হার,
"তখন তোমার কলম আমি বাড়ি।"
কলম বাড়ার ভাবে গন্ধ ছোটে,
তোমার চোখে মুখে গোলাপ ফোটে।

—অণিমা (১৯৪৩), পৃ. ৫১।

সাধারণভাবে দশ দলমাত্রার পংক্তির কবিতা হলেও আট এবং নয় দলমাত্রা আছে কোনো কোনো পংক্তিতে। এটি বাংলা 'চতুর্দশ পদী' অর্থাৎ বাংলা সনেট রূপে চিহ্নিত। এইজাতীয় বাংলা সনেট এটিই প্রথম। পরবর্তীকালে বাঙালি কবিরাও লিখেছেন। ভাষা ও দল সমতার বিচারে কিছু ত্রুটি থাকলেও বাংলা দলবৃত্ত ব্যবহারে নিরালা যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন রচনাটির ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়।

নিরালার মাধ্যমে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যে অবলীলায় হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে এবং তার ফল সুদূর প্রসারী হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

দেখা যাচ্ছে বিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া এবং হিন্দী কবিতা ও ছন্দের যোগাযোগ আপাতভাবে অদৃশ্য থাকলেও মাঝে মাঝে

তার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি ঘটেছে। বাংলা, অসমীয়া এবং ওড়িয়া একই পরিবারের ও প্রতিবেশী হবার ফলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক ভাষা, কবিতা ও ছন্দের মেলামেশা ও রচনা সহজ। বাঙালির পক্ষে অসমীয়া, ওড়িয়া; অসমীয়ার পক্ষে বাংলা, ওড়িয়া এবং ওড়িয়ার পক্ষে বাংলা-অসমীয়ায় কবিতা রচনা অস্বাভাবিক ছিলনা তার নিদর্শন দুর্লভ হলেও অ-প্রাপ্য নয়। এই তিন ভাষার সঙ্গে মৈথিলীর যোগ ও উল্লেখযোগ্যতার প্রমাণ রয়েছে তিন ভাষাতেই—ব্রজবুলি ভাষায় বৈষ্ণবপদ রচনার প্রাচুর্য ও সফলতায়। হিন্দী ভাষা অপেক্ষাকৃত দূরের হলেও এই তিন ভাষার সঙ্গে তার যোগাযোগ বেশ নিবিড় ও গভীর বলা যায়। তাই দেখা যায় বাঙালি, অসমীয়া ও ওড়িয়া কবি হিন্দী ভাষা ও হিন্দী ছন্দে বেশ সহজে কবিতা রচনা করেছেন। হিন্দী সন্ত কবিদের পদ দীর্ঘদিন ধরে বহুল প্রচলনের ফলে বাংলা অসমীয়া এবং ওড়িয়ার প্রভাবে বিকৃত ও পরিবর্তিত হতে হতে অনেকটা বাংলা, অসমীয়া ও ওড়িয়া রূপ লাভ করেছে এমনও দেখা যায়। আধুনিক হিন্দী কবিদের মধ্যেও বাংলা অসমীয়া এবং ওড়িয়া কবিতা রচনার ইচ্ছা ও প্রয়াস যে দেখা দেয়নি এমন নয়, তবে তার নিদর্শন বেশি চোখে পড়েনা। এর থেকে এটাই অনুমিত হয় যে, বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া ও হিন্দী ভাষায় ও সাহিত্যের পারস্পরিক আদান-প্রদানের সাহায্যে আত্মোৎকর্ষ সাধনের পথ কোনোদিন সংকীর্ণ ও রুদ্ধ ছিল না এবং ভবিষ্যতে অনুকূল বাতাবরণ পেলে তা আরও প্রশস্ত তথা উপযোগী এবং সংহতির প্রতীকরূপে প্রমাণিত হবে।

মধুসূদনের যুগ (১৮৫৮-১৮৭৩)

বাংলা সাহিত্যের মতোই বাংলা ছন্দকেও মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) যুগোচিত সংযোজনের ফলে যুগাতিচারী করে তোলেন। বাংলা ছন্দের ক্ষেত্রে তিনি একটি যুগ-বিশেষ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, প্রাচীন এবং আধুনিক সাহিত্য পাঠে সমৃদ্ধ মনের অধিকারী মধুসূদন যুগধর্মী কাব্য-সুষমা বিধান, সুদৃঢ় ভাবব্যঞ্জক শব্দ নির্বাচন এবং ওজস্বী ছন্দ ঝংকারের প্রবর্তন করে বাংলা ছন্দকে নতুন গতিশক্তি, নতুন রূপ এবং অভিনব সম্পদ দান করেছেন। তাঁর অলৌকিক প্রতিভা বাংলা ছন্দকে অভূতপূর্বভাবে সমৃদ্ধ করেছে। সে যুগের অপরাপর

কবিরা প্রচলিত মিশ্রবৃত্ত রীতির পয়ার ও ত্রিপদী বন্ধ নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। মধুসূদনের প্রারম্ভিক সমর্থনও ছিল সেই দিকেই। কিন্তু যথাসময়ে মধুসূদন তাঁর ছন্দ প্রতিভার প্রকৃত পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে নতুন ছন্দ 'অমিত্রাক্ষরের' প্রবর্তনের মধ্যে।

পাশ্চাত্য ভাষা ও সাহিত্যে, বিশেষ করে ইংরেজিতে মধুসূদনের বিস্ময়কর দখল ছিল। ইংরেজি কবিতায় Blank Verse-এর ভাব প্রকাশের শক্তি গাম্ভীর্য এবং ওজস্বিতা তাঁকে বিশেষভাবে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করে। তাই বাংলায় অনুরূপ ছন্দ প্রবর্তনে প্রয়াসী হন। বাংলা কাব্যে দীর্ঘদিন ধরে বহুল পরীক্ষিত এবং সুপ্রচলিত মিশ্রবৃত্ত ছন্দের প্রকৃতি ও শক্তিতে আস্থাশীল মধুসূদন পয়ার নামক দ্বিপদী পঙ্‌ক্তিকেই গ্রহণ করলেন পাশ্চাত্য-আদর্শী নবছন্দের বাহনরূপে। আর মিশ্র কলাবৃত্তই Blank Verse-এর পক্ষে উপযুক্ত প্রমাণিত হল।

পয়ার বন্ধের পঙ্‌ক্তি প্রান্তিক যতি ও মিল ভাবের স্বচ্ছন্দ প্রবাহের প্রতিবন্ধক হয়ে ধরা দিল মধুসূদনের কাছে। এই প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য তিনি যতি-বিন্যাসে আনলেন স্বাধীনতা এবং পঙ্‌ক্তি-প্রান্তিক মিল তুলে দিলেন। প্রয়োজনবোধে ভাব চোদ্দ মাত্রার পঙ্‌ক্তির বেড়া ভেঙে পরবর্তী পঙ্‌ক্তিতে প্রবাহিত হল। ভাব-প্রবাহের শেষে পড়ল ভাবযতি। এইভাবে যতি ও মিলের প্রচলিত শাসন অস্বীকার করে চোদ্দ মাত্রার পঙ্‌ক্তি সীমার মধ্যেই ভাব-স্বচ্ছন্দ গতিলাভে বাংলা কাব্যকে নতুন স্বাদে সমৃদ্ধ করল। এতদিন ভাব ছিল যতির অনুসারী এবার যতি হল ভাবের অনুগামী। মধুসূদন এই নতুন ছন্দের নাম দিলেন 'অমিত্রাক্ষর' যা 'Run on Blank Verse'-এর প্রকৃতিদ্যোতক। তবে ছন্দটির অর্থদ্যোতক নাম—'অমিল প্রবহমান পয়ার'। বাংলা ছন্দে এই অভিনব সংযোজন মধুসূদনের বিস্ময়কর প্রতিভার অতুলনীয় কীর্তি। মধুসূদন মিশ্র কলাবৃত্ত রীতির অমিল প্রবহমান পয়ারের প্রথম প্রয়োগ-পরীক্ষা করেন তাঁর 'পদ্মাবতী' নাটকে (১৮৬০)-র দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে কঞ্চুকির স্বগত উক্তিতে। ছন্দটির ক্রম পরিণতি চোখে পড়ে তিলোত্তমা সম্ভব কাব্যে (১৮৬০), মেঘনাদবধকাব্যে (১৮৬১) এবং বীরাঙ্গনা কাব্যে (১৮৬২)। 'তিলোত্তমা সম্ভবে' যতি স্থাপনের কৌশল তেমন সুস্পষ্ট নয়, তবে সুন্দর শব্দবিন্যাসে মিলের অভাববোধ পূর্ণ করার প্রয়াস লক্ষিত হয়। তিলোত্তমা সম্ভব কাব্যেই গীতিধর্মী অমিল প্রবহমান পয়ারের প্রথম সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এপ্রসঙ্গে কবি সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের একটি

মূল্যবান উক্তি এই—

"ইহাই বাংলা কবিতার প্রথম Lyrical Blank Verse…ইহাই প্রথম খাঁটি মিলহীন বাংলা কাব্যছন্দ, ইহাতেই কবি মধুসূদনের জন্ম হইল।"

—বাংলা কবিতার ছন্দ (১৩৫৫), পৃ. ১১১।

তিলোত্তমা সম্ভব কাব্যের অমিত্রাক্ষরের দুর্বলতা মধুসূদনের কান মনকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। সে প্রয়াস তিনি করেছেন পরবর্তী কাব্যে। তাই মেঘনাদবধ কাব্যের ছন্দ দৃঢ় এবং ত্রুটিমুক্ত হতে পেরেছে। এখানে অমিত্রাক্ষর জ্যোতিদৃপ্ত, মহিমামণ্ডিত, বলিষ্ঠ ও পরিণত রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। মহাকাব্যের গুণোপেত এই ছন্দটি মেঘনাদবধ কাব্যকে মহাকাব্যের মর্যাদা দান করেছে বলা যায়। মেঘনাদবধ থেকে সুমধুর, বলিষ্ঠ এবং পরিণত অমিত্রাক্ষরের একটি দৃষ্টান্ত।—

কতক্ষণে উতরিয়া উদ্যানে দুয়ারে
ভীমবাহু, সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে
ভীষণ-দর্শন মূর্তি। দীপিছে ললাটে
শশিকলা, মহোরগ-ললাটে যেমতি
মণি, জটাজূট শিরে, তাহার মাঝারে
মহাবীর ফেন-লেখা, শারদ-নিশাতে
কৌমুদীর রজোরেখা মেঘমুখে যেন।
বিভূতি ভূষিত অঙ্গ, শালবৃক্ষ সম
ত্রিশূল দক্ষিণ করে! চিনিলা সৌমিত্রি
ভূতনাথে।

—মেঘনাদবধ কাব্য—পঞ্চমসর্গ, পঙ্‌ক্তি ২০৩-১২।

এখানে সুনির্বাচিত শব্দচয়ের বিন্যাস এবং যথাস্থানে ভাবযতি স্থাপনের ফলে গীতের আবেগ ও সৌন্দর্য, ওজস্বিতা ও গাম্ভীর্য সহজ অভিব্যক্তি পেয়েছে। ছন্দ যেন কবির উদ্দেশ্য সাধনের সহজ সাধন হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

ইংরেজিতে প্রস্বরিত (accented) ও অ-প্রস্বরিত (un-accented) ধ্বনি এবং সংস্কৃতে দীর্ঘ-হ্রস্ব ও রুদ্ধদলের ধ্বনির সাহায্যে ছন্দ-তরঙ্গিত হয়ে ওঠে। কিন্তু বাংলায় প্রস্বরিত-অ-প্রস্বরিত অথবা দীর্ঘ-হ্রস্ব ধ্বনির অভাবে শব্দগুলি বড়ো শান্তশিষ্ট। তাই দলের সংকুচিত এবং প্রসারিত উচ্চারণের

সাহায্যেই বাংলা ছন্দকে তরঙ্গায়িত করা সম্ভব—মধুসূদনই সর্বপ্রথম এ-টি আমাদের দেখালেন।[৭১]

মিলটনের The Paradise Lost-এর অনুসরণে মধুসূদন বাংলায় পঙ্‌ক্তি অনুচ্ছেদ বা Verse Paragraph রচনা করেন। কেবল তাই নয়, বাংলায় কবিতায় স্তবক গঠনের কোনো সুস্থির প্রক্রিয়া ছিল না। মধুসূদনই সর্বপ্রথম তাঁর সূক্ষ্ম শ্রুতিশক্তির সাহায্যে বিচিত্র ভাববাহী ছোট-বড়ো পঙ্‌ক্তি বা পদের সুন্দর সমবায়ে পঙ্‌ক্তি অনুচ্ছেদ এবং বিভিন্ন আকৃতির স্তবক গঠনের প্রথা প্রবর্তন করেন।

মেঘনাদবধ কাব্যের অমিত্রাক্ষর শক্তি-সুষমা ও মনোগ্রাহিতায় অপূর্ব হলেও তা সর্বত্র নিখুঁত নয়। সেদিকেও মধুসূদনের সজাগ দৃষ্টি ছিল। তাই তার শান্ত-সমাহিত নিখুঁত গীতিকবিতার যোগ্য রূপটি ফুটে উঠেছে 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে। এই অমিল প্রবহমান পয়ার অমিত্রাক্ষরের সর্বাঙ্গ সুন্দর আদর্শ রূপের একটি নিদর্শন :—

হে সুন্দর, শীঘ্র আসি কহ মোরে শুনি,
কোন দুঃখে তব সুখে বিমুখ হইলা
এ নব যৌবনে তুমি? কোন্ অভিমানে
রাজবেশ ত্যজিলা হে উদাসীর বেশে?
হেমাঙ্গ-মৈনাক সম, হে তেজস্বি কহ,
কার ভয়ে ভ্রম তুমি এ বন-সাগরে
একাকী আবরি তেজঃ, ক্ষীণ, ক্ষুণ্ন খেদে?
তোমার মনের কথা, কহ আসি মোরে।

—বীরাঙ্গনা, পঞ্চম সর্গ, পঙ্‌ক্তি ১৪-২১।

সংলাপোচিত নিখুঁত বাক্‌ভঙ্গি, সুন্দর শব্দবিন্যাস, উপযোগী যতিস্থাপন এবং গীতিভাবধর্মী সুরের অপরূপ সমন্বয়ে বীরাঙ্গনার অমিত্রাক্ষর উৎকর্ষে অদ্বিতীয় বলা যায়।

মধুসূদন প্রবর্তিত 'অমিত্রাক্ষর' বা অমিল প্রবহমান পয়ার যথাসময় প্রতিবেশী অসমীয়া, ওড়িয়া এবং হিন্দী কবিশিল্পী এবং ছন্দানুরাগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফলে অসমীয়া এবং ওড়িয়ায় 'অমিত্রাক্ষর' তথা হিন্দীতে 'অতুকান্ত' নামে এই ছন্দের প্রয়োগ ঘটে। যথাস্থানে সে কথা বিশদভাবে আলোচিত হবে।

বাংলা কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে আধুনিক মহাকাব্যের মতোই মধুসূদনের অপর একটি অতি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হল পাশ্চাত্য সনেটের (Sonnet) আদর্শে বাংলা চতুর্দশপদী কবিতা রচনার প্রথা প্রবর্তন। অমিত্রাক্ষর প্রবর্তনের ন্যায় সনেট রচনার ক্ষেত্রেও মধুসূদনই প্রথম বাঙালি তথা ভারতীয় কবি। তিনি সর্বপ্রথম বাংলা সনেট লেখেন ১৮৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'মাতৃভাষা' নামে। বলাই বাহুল্য ইংরেজি ও ইতালীয় সনেট পড়েই মধুসূদন বাংলায় সনেট রচনায় উৎসাহিত হন। তবে ইংরেজি বা ইতালীয় কোনো সনেটই তাঁর স্বকীয়তাকে চাপা দিতে পারেনি। মিল-দেওয়া অষ্টক (Octave) ও ষট্‌ক (Sestet) স্তবক গঠনে তিনি যথাসম্ভব স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন। সনেট আকৃতিতে কঠিন এবং এবং প্রকৃতিতে কঠিনতর রচনা। মিশ্র কলাবৃত্ত রীতির প্রবহমান পয়ার বন্ধকেই তিনি বেছে নিয়েছিলেন একাজের জন্য। সুতরাং বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ছন্দ স্তবক গঠন ও মিল-রচনার বিবেচনায় এই চতুর্দশপদী কবিতা মৌলিকতার ছাপ বহন করে। মধুসূদনের ১০৯টি সনেটের মধ্যে বেশ কয়েকটি রচনা খুবই উৎকৃষ্ট।

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, মোহিতলাল, মধুসূদন প্রমুখ কবি বাংলা সনেটের রূপবৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি আনতে চেষ্টিত হয়েছেন মধুসূদনের সনেটের আদর্শে। ফলে বাংলা কবিতার একটি অপরিহার্য অঙ্গ রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা। বাংলার অনুসরণেই অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় বিশেষ করে হিন্দী, ওড়িয়া, অসমীয়া, গুজরাটি ও মারাঠী ভাষায় সনেট রচনার সূচনা ঘটে।

মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা কাব্যটি ছন্দ প্রয়োগের বিচারে না হলেও স্তবক নির্মাণর বিবেচনায় উল্লেখযোগ্য। প্রায় প্রতিটি কবিতাতেই কবি পঙ্‌ক্তি পদ ও পর্বে নানাপ্রকারের মিল স্থাপন ও বিচিত্র আকৃতির স্তবক গঠন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তাঁর এই অভিনব প্রয়াস পরবর্তী বাঙালি কবিদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁর রচনায় বিভিন্ন আয়তনের পঙ্‌ক্তির প্রয়োগও চোখে পড়ে। তাঁর কোনো কোনো শিথিল রচনায় পরবর্তীকালের মুক্তকের আভাস পাওয়া যায়।[৭২] রাজকৃষ্ণ রায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনায় এই মুক্তক ক্রমে ক্রমে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বাংলা ছন্দের ক্ষেত্রে নানাপ্রকারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে মধুসূদন অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছেন। তাঁর ছন্দশিল্প-প্রতিভা বাংলা ছন্দে এক চির উজ্জ্বল অধ্যায় সংযোজন করেছে। তাঁর প্রবর্তিত অভিনব মহাকাব্যের

যোগ্য অনুসারীর অভাব ঘটলেও তাঁর অভিনব ছন্দ-প্রয়োগ পরবর্তীদের কাছে যথোচিত মর্যাদায় স্বীকৃতি ও অনুসৃতি লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথের মতো কবির হাতে তার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ঘটেছে। বাংলা সাহিত্যে মেঘনাদবধ কাব্যের তুলনায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের গুরুত্ব ও মহত্ত্ব বেশি বই কম নয়।

পরবর্তীকালে বাংলায় এবং অন্যান্য ভারতীয় সাহিত্যে প্রবহমান এবং মুক্তকে বিচিত্র রূপ দেখা দিয়েছে এবং কবিতার বাক্‌মুখী প্রবণতা যে গদ্য-কবিতায় পর্যবসিত হয়েছে সে সবের সূচনা মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর প্রবর্তনের মাধ্যমেই ঘটেছে বললে অত্যুক্তি হবে না।

মধুসূদনের যুগ : অসমীয়া, ওড়িয়া ও হিন্দী ছন্দ

মধুসূদনের যুগান্তকারী প্রতিভার স্পর্শে বাংলা সাহিত্যের অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি সাধিত হয়েছিল। কিন্তু তাঁর অতুলনীয় সাহিত্যকৃতি দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর বাংলায় স্বীকৃতি পায়। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখ কবি মধুসূদনের আদর্শে কাব্য রচনায় ব্রতী হন মধুসূদনের তিরোধানের (১৮৭৩ খ্রীঃ) পরে। সুতরাং ভারতের অপরাপর ভাষার সাহিত্যে তাঁর সাহিত্য প্রতিভার পরিচিতি এবং স্বীকৃতি লাভে আরও বিলম্ব ঘটবে—তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। মধুসূদনের অভিনব কাব্যসামগ্রী এবং ছন্দের সঙ্গে প্রতিবেশী সাহিত্যের কাব্য ও ছন্দজগতের যোগাযোগ ঘটে মধুসূদনের পরবর্তী যুগে। অর্থাৎ রবীন্দ্র-পর্বের উন্মেষ ও বিকাশকালে। তার পূর্বে অসমীয়া, ওড়িয়া এবং হিন্দী কবিতার ছন্দে তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। তখনও অসমীয়াতে শংকরদেব, মাধবকন্দলীর অনন্তকন্দলী, পীতাম্বর এবং রামসরস্বতী, ওড়িয়াতে সারলা দাস, বলরাম দাস, জগন্নাথ দাস ও উপেন্দ্র ভঞ্জ তথা হিন্দীতে সূর, তুলসী কেশবদাস প্রমুখ পূর্বতন কবিদের ব্যবহৃত ছন্দই, হয়তো বা অল্পাধিক পরিবর্তিত রূপে প্রযুক্ত হয়ে এসেছে। তবে সব ভাষার ছন্দেরই প্রবণতা ছিল প্রাচীনতা থেকে মুক্তি এবং আধুনিকতার সান্নিধ্য ও অনুরক্তির দিকে তাতে সন্দেহ নেই।

মধুসূদনের যুগ : অসমীয়া ছন্দে

মধুসূদনের আধুনিক মহাকাব্য, অমিত্রাক্ষর ছন্দ এবং সনেট, স্তবক-রচনা অতি সহজে অসমীয়া সাহিত্যে সঞ্চারিত হয়। কারণ আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের প্রথম যুগের কাব্য-আন্দোলনের সঙ্গে যে সব তরুণ কবি বিশেষভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন কলকাতাবাসী শিক্ষার্থী। তাঁদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অর্থাৎ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ভাষা একপ্রকার বাংলাই ছিল। তাছাড়া তাঁরা শিক্ষিত হতেন বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের বাতাবরণে। তাই উনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যের নবজাগরণের সুর তাঁদের হৃদয়ে নানা ধরনের বিচিত্র আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন জাগিয়ে তোলে। বাংলা কাব্যে মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্র দত্ত, নাটকে গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখের আবির্ভাব ভারতের সর্বত্র সাড়া জাগায়। এই সব সাহিত্যিকদের সাহিত্যকৃতিতে বিমুগ্ধ ছাত্র-সম্প্রদায় অসমীয়াতেও নবীন সাহিত্যের বৈচিত্র্যময় সুর অনুরণিত করতে অভিলাষী হলেন। বাংলায় যখন মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ও সনেট রাজকীয় সমারোহে অভিনন্দিত হতে লেগেছে, অসমীয়াতে তার অনুরূপ সৃজন-কর্মের প্রয়াস দুর্বার হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক।

সম্ভবত রমাকান্ত চৌধুরী (১৮৪৬-৮৯) সর্বপ্রথম অসমীয়া ভাষায় অমিত্রাক্ষর প্রবর্তনে প্রয়াসী হন। এই প্রসঙ্গে তাঁর অমিত্রাক্ষর বন্ধে লেখা 'অভিমন্যুবধ' (১৮৭৫) কাব্যটি উল্লেখযোগ্য।[৭৩] সুতরাং অসমীয়া সাহিত্যে ছন্দের নবদিগন্ত উন্মোচনের কৃতিত্ব রমাকান্ত চৌধুরীরই পাপ্য। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় হল—বাংলার মতোই অসমীয়াতেও মিশ্র বৃত্ত রীতির পয়ার বন্ধেই অমিত্রাক্ষর রচিত। তাই অসমীয়া অমিত্রাক্ষরকেও অনায়াসে 'অমিল প্রবহমান পয়ার' বলা যেতে পারে। অসমীয়া অমিত্রাক্ষরের নিদর্শন :—

> দশ দিন যুদ্ধ করি ভীষ্ম মহাবলী
> যেতিয়া শুইলা বীরে শর-আসনত,
> মহারথী পাণ্ডবেও আনন্দ-মনেরে
> বজাইলা ঢাক-ঢোল-শিঙ্গা করতরে

জগঝম্প, ভেরি, দবা। আপুনি শ্রীহরি
নিজবাদ্য শঙ্খ লই ফুবায় বিজয়,
ঘোরনাদে বুড়ুওয়াই সকল শবদ
হরষিলা পাণ্ডবক।

—রমাকান্ত চৌধুরী : 'অভিমন্যুবধ'।

ভাবের প্রবাহ, পংক্তি-অনুচ্ছেদ ঠিক রেখে ছন্দটির শক্তি ফুটিয়ে তুলেছেন কবি। কেবল ছন্দই নয়, কাব্যের বিষয় নির্বাচন, নামকরণ এবং ভাষাসজ্জাতেও মধুসূদনের অনুপ্রেরণা ধ্বনিত। কবির প্রয়াস যে সার্থক তাতে সন্দেহ নেই।

মধুসূদনের আদর্শে অসমীয়াতে অন্য যাঁরা এই 'নূতন ছন্দয়' প্রবর্তন ও প্রয়োগে সাফল্য লাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে ভোলানাথ দাস (১৮৫৮-১৯২৯), পদ্মনাথ গোহেন বরুয়া (১৮৭১-১৯৪৬), হিতেশ্বর বরবরুয়া (১৮৭৩-১৯৩৯) এবং দণ্ডিনাথ কলিতা (১৮৯০-১৯৫৩) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে সর্বাধিক সফলকাম কবি হলেন ভোলানাথ দাস। তিনি ছাত্রাবস্থাতেই (১৮৭১-৮৩) মধুসূদনের অনুসরণে 'সীতাহরণ' কাব্য রচনা করেন। কাব্যটি ধারাবাহিক রূপে 'আসাম বিলাসিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রথম দিকে বিরূপতা এবং প্রতিকূলতার সম্মুখীন হলেও কবির প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতি লাভে খুব বিলম্ব হয়নি। 'সীতাহরণ' কাব্য গ্রন্থাকারে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কিন্তু প্রাক জোনাকী যুগের এই কবি তাঁর 'কবিতামালা'র দ্বিতীয় খণ্ডে এবং চিন্তা-তরঙ্গিণী কাব্যগ্রন্থে অমিত্রাক্ষর নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। ছন্দোবৈচিত্র্য ও শব্দচর্চাতেও ভোলানাথ বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তাতে মধুসূদনের প্রভাব লক্ষিত হয় স্পষ্টভাবে। যেমন :—

"ভাঙ্গিলেক উরু তার ভীম ভীমাঘাতে।"

—হিংসা, পৃ. ৯।

সীতাহরণ কাব্যের প্রথম সর্গে ভোলানাথ দাস বিনীতচিত্তে মধুসূদনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন এইভাবে—

সেহি রামায়ণ গীত
গাইবে বাঞ্ছিছোঁ আমি মূঢ় অকিঞ্চন
অমিত্র-অক্ষর ছন্দে, হে মাতঃ বাগ্দেবী,

যি ছন্দে গাইলা বহু মধুময় গীত
তব অনুগ্রহে অতি প্রিয় পুত্র তব
শ্রীমধুসূদন বঙ্গ-কবিকুল মণি।

—সীতাহরণ কাব্য ১ম সর্গ।

তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছিল। 'আসলে তাঁর মধুসূদন দত্তর অনুকরণএত নিখুঁত ছিল যে, তাঁর রচনায় মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের দোষ ত্রুটিও সুস্পষ্টভাবে লক্ষিত হয়'।[৭৪] মধুসূদনের মতোই বিজোড় মাত্রার পর যতি এবং পঙ্ক্তি শেষের যতিকে পুরোপুরি অস্বীকারের প্রবণতাও তাঁর রচনায় খুবই সুলভ। পঙ্ক্তি প্রান্তিক মিলের অভাব পূর্তির জন্য তিনি মধুসূদনের মতোই অন্তঃমিলের সুযোগ সৃষ্টি করে গীতিময়তা সুরক্ষার চেষ্টা করেছেন।

পদ্মনাভ গোহাঁই বরুআ তাঁর আত্মজীবনীমূলক 'লীলা কাব্যে' (১৮৯৯) অমিত্রাক্ষর রচনায় কিছুটা স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন বলা যায়। পঙ্ক্তি প্রান্তিক ক্ষীণ যতির অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন আর বিজোড়মাত্রার পর যতিপাত ঘটতে দেননি। তাঁর এই প্রয়াস বাংলায় কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত নিখুঁত অমিত্রাক্ষরের কথা স্মরণ করায়। হিতেশ্বর বর বরুআর 'যুদ্ধক্ষেত্রত অহোম রমণী' কাব্য (১৯১৫) অসমীয়া অমিত্রাক্ষরকে পূর্ণতা ও পরিণতি দান করেছে বলা যায়। ভাবে-ভাষায় ও অমিত্রাক্ষরে এমন সার্থক সমন্বয় কমই দেখা যায় অসম সাহিত্যে যেমন—

স্বদেশর স্বাধীনতা, তার অর্থ রিটে
জীবন উৎসর্গ করি মরে এমরত,—
মৃত্যু তার হয় শান্তি ; মহানিদ্রা তার
অনন্ত বিশ্রাম মা থো; বিশ্ব জননীর
কোলাৎ (শান্তিরে ভরা), অগ্নি তার কাযে
সুধাংশুর রশ্মি যেন, ভূমি শয্যা তার
কুসুম কোমল শয্যা, শেল-শূল গাত
মাথো পুষ্প বরিষণ, কিয়া করা শোক
তোমার স্বামীর অর্থে?

—যুদ্ধক্ষেত্রত অহোম রমণী, চতুর্থ সর্গ।

মধুসূদনের বীরাঙ্গনা কাব্যে যেমন অমিত্রাক্ষর চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে

এখানে অসমীয়া অমিত্রাক্ষরের স্তরও অনুরূপ। সংলাপোচিত বিশিষ্টতাও লক্ষিত হয় কাব্যটিতে। তাঁর অমিত্রাক্ষরে ভোলানাথ দাস এবং পদ্মনাথ গোহাঁই বরুআর বিশিষ্টতা লক্ষিত হয়। কবি দণ্ডিনাথ তাঁর 'অসম-সন্ধ্যা' কাব্যটি অমিত্রাক্ষরে রচনা করেন। তাঁর প্রয়োগ বেশ পরিণত এবং স্বচ্ছন্দ। অমিত্রাক্ষর যেন একটি বিশেষ মর্যাদায় অধিকারী হয়েছে তাঁর সৃজনীশক্তির গুণে।

দেখা যাচ্ছে মধুসূদনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অসমীয়া কবিরা অমিত্রাক্ষরের সুন্দর এবং সার্থক ব্যবহার করেছেন। সনেট রচনাও করেছেন তাঁরা। হেমচন্দ্র গোস্বামী (১৮৭২-১৯২৮) প্রথম অসমীয়া সনেটকার। তাঁর প্রথম সনেট হল 'প্রিয়তমার চিঠি', অপরাপর কবিরাও যেমন—পদ্মনাথ গোহাঁই বরুআ, হিতেশ্বর বরবরুআ (১৯১৮ তে প্রকাশিত ১২টি সনেটের সংগ্রহ 'মালচ') সনেট রচনা করেন। তাঁদের রচনায় ইটালীয় সনেটের আকৃতি ও বিশিষ্টতার অনুসৃতি ঘটেছে। মধুসূদনের অনুসরণে মিশ্র কলাবৃত্ত পয়ার বন্ধে প্রবহমানতা ও বৈকল্পিক মিল বিন্যাসের প্রবণতা লক্ষিত হয়।

মধুসূদনের অনুসরণেই অসমীয়াতেও একপদী দ্বিপদী (পয়ার) ত্রিপদী ও চৌপদীর বিচিত্র সমাবেশে স্তবক রচনার প্রবণতাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অপর ভারতীয় ভাষার মতো অসমীয়া ভাষা ও তার ছন্দর ও মধুসূদনের নতুন ছন্দ, সনেট-রচনা এবং স্তবক-নির্মাণ পদ্ধতি দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। বাংলার মতোই অসমীয়া সনেটও কেবলমাত্র মিশ্রবৃত্ত রীতিতেই রচিত। অর্থাৎ পয়ার বন্ধের প্রাচীনতা, শক্তি ও সৌন্দর্য অসমীয়া ছন্দেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এইসব দিকের বিচারে অসমীয়া ছন্দ বাংলার অনুসারী বললে অন্যায় হবে না। এই অনুসৃতি পরবর্তীকালে আরো ব্যাপক এবং সুফলপ্রসূ হয়েছে।

মধুসূদনের যুগ : ওড়িয়া ছন্দ

ওড়িয়া কাব্য সাহিত্যে আধুনিকতার অগ্রদূত কবি রাধানাথ রায় (১৮৪৮-১৯০৮)। রাধানাথ রায়, মধুসূদন রাও (১৮৫৩-১৯১৩) এবং ফকিরমোহন সেনাপতির (১৮৪৩-১৯১৮) চিন্তন-মনন ও সৃজনে ওড়িয়া সাহিত্যে আধুনিকতার লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাই বলে এঁরা প্রাচীন বিশিষ্টতার বিরোধী ছিলেন না। প্রতিবেশী সাহিত্য, বিশেষ করে বাংলার আধুনিক

প্রবণতার আকর্ষণ এবং পাশ্চাত্য সাহিত্য বিশেষ করে ইংরেজি সাহিত্য থেকে যার সমর্থন ও পুষ্টিলাভে ওড়িয়া সাহিত্যে আধুনিকতা দেখা দিল। বাংলায় মধুসূদন দত্ত নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মহাকাব্য, তাতে অমিত্রাক্ষর ছন্দের এবং সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা রচনার অভিনব রীতি প্রবর্তন করলেন। তার আকর্ষণ ও প্রচার ভারতের বিভিন্ন প্রতিবেশী সাহিত্যে অনুভূত হয় স্বাভাবিক কারণেই। যার পরিচয় আমরা অসমীয়া সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে এই অধ্যায়েই পেয়েছি। ওড়িয়া সাহিত্যেও তার ঢেউ এসে লাগে। অমিত্রাক্ষর রচনার প্রয়াস দেখা দেয় উনবিংশ শতকের শেষ পাদে। এই প্রসঙ্গে রুদ্রনারায়ণ পট্টনায়ক, রামশংকর রায়, কহ্নৈয়ালাল বসু এবং রাধানাথ রায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে রাধানাথ রায়ের 'মহাযাত্রা' কাব্যেই অমিত্রাক্ষরের যথার্থ প্রতিষ্ঠা বলা চলে।[৭৫] রামশংকর রায় (১৮৫২-১৯৩১) প্রথমে তাঁর নাটকের সংলাপে এবং পরে 'প্রেমতরী' কাব্যে অমিত্রাক্ষর প্রয়োগের পরীক্ষা করেন। তাঁর এই প্রয়াস প্রশংসনীয় হলেও তা দুর্বল। কহ্নৈলাল বসুর 'বৈদেহীবিলাপ' (১৮৯১) কাব্যে ওড়িয়া অমিত্রাক্ষরে একটি সুষ্ঠু রূপ ফুটে ওঠে। কাব্যটির প্রারম্ভিক অংশের কয়েকটি পঙ্‌ক্তি দেখলেই তা বোঝা যাবে।—

> পতি নির্বাসন বার্তা শুনি দাশরথি—
> হৃদয় চন্দ্রিকা, চারু-কুসুম-কোমলা,
> হেমাঙ্গী স্তম্ভিত-গাত্রা-চকিত-নয়না,
> (সম্মুখে অশনি যথা ভীমরবে পড়ি,
> স্তম্ভিত করাএ, পথে পথিক নিকরে,
> ঝলসি নয়ন যুগ, সংজ্ঞা উপঘাতি)
> ম্লানমুখী, কি কহিলা ভাসি আখি নীরে!
> কহ মাতঃ, কুন্দ-ইন্দু-তুষার ধবলে।
> কহ, কহ, যেউ রূপে কবি বাল্মীকির
> মানস সরসি সরোরুহ পরে বসি—
> বিপঞ্চী নিক্বণে, শত শত মধু শ্রাবী—
> অমিয় মিশ্রিত যেউ কর্ণ-মন-প্রিয়—
> বাণি গুঞ্জে কহিথিলু সদয় হৃদয়ে।
>
> —বৈদেহী বিলাপ।

মধুসূদনের 'অমিত্রাক্ষর' বা অমিল প্রবহমান পয়ারের আদর্শই এখানে অনুসৃত। মিশ্রবৃত্ত রীতির পয়ার বন্ধে (চতুর্দশাক্ষরা ছন্দ!) ভাষা ও ছন্দ অনেকটা মুখের কাছাকাছি এসে গেছে। গাম্ভীর্য, নমনীয়তা ও নাটকীয়তা এবং আভিধানিক শব্দের উপর অধিক নির্ভরতা—মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের অনুসৃতিরই পরিচায়ক। সর্বোপরি 'অমিত্রাক্ষর' নামকরণটি-ত্রুটিমুক্ত না হলেও তা মধুসূদনেরই দেওয়া এবং ওড়িয়ায় তা অচিরে গৃহীত হয়। হিন্দী সাহিত্যে যেমন ওড়িয়া সাহিত্যেও তেমনি 'অমিত্রাক্ষর' ছন্দের মূল ধর্মটি অনুধাবন করতে না পারায় অমিল অর্থে 'অতুকান্ত' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। ওড়িয়াতে 'অমিতাক্ষর' শব্দটির প্রতিও কেউ কেউ আকর্ষণবোধ করেছেন।[৭৬] আবার শচিরাউত রায়ের মতো বিদগ্ধ ব্যক্তিও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করে বলে বসেন—"প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যমান অমিত্রাক্ষর ছন্দরেই রচিত হেউথিলা।[৭৭] বলাই বাহুল্য অমিত্রাক্ষর বা Run On Lines Verse-এর ধারণাটিই আধুনিক। সুতরাং প্রাচীন রচনায় মধ্যে তা খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। তবু এ-রূপ মন্তব্য করার পিছনে রয়েছে প্রকৃত বস্তুটির বিষয়ে অজ্ঞতা। যাই হোক ছন্দটিকে সঠিকভাবে অনুধাবন ও আয়ত্ত করে ওড়িয়া কাব্যজগতে তাকে প্রতিষ্ঠিত করেন কবি রাধানাথ রায়। তার সুষ্ঠু ও পরিণত রূপ মেলে তাঁর 'মহাযাত্রা' কাব্যে। অমিত্রাক্ষরের মূলকথা ভাবানুসারী যতিপাত। ভাবপূর্ণ হলেই এর যতি পড়ে। তাই এর নাম 'ভাবযতি'। পঙ্‌ক্তি প্রান্তিক মিল বা 'উপধা মেল' থাকবে না। কিন্তু সেটিই এ-ছন্দের বড়ো পরিচয় নয়। একথা উপলব্ধি করে রাধানাথ এক পত্রে লিখেছিলেন—"ওড়িআরে অনেক লোক অমিত্রাক্ষররে লেখিচ্ছন্তি, মধ্য লেখুচ্ছন্তি। এহি সাহসরে মুঁ সেথিরে প্রবৃত্ত হোইথিলি। অন্যথা এপরি দুরূহ বিষয়রে মু কদাচ হস্তার্পণ করিবাকু সাহসী হোই ন থান্তি।...মিত্রাক্ষর অপেক্ষা অমিত্রাক্ষর সহজ এমত কেতে দূর ঠিক মুঁ কহি ন পারে। নিজ অনুভবরু মুঁ জানে অমিত্রাক্ষর রচনা অধিকতর কঠিন"।[৭৮] আসলে বিষয়ের প্রতি গভীর রুচি ও শ্রদ্ধা থাকলেই এরূপ অভিমত প্রকাশ সম্ভব। তাঁর অমিত্রাক্ষরের কয়েকটি পঙ্‌ক্তি :—

> হা ধিক্ এরংক প্রাণ আতংকে বঞ্চাই
> আশু মৃত্যুপদ রণুঁ, অরপি যবনে
> নিজর এ স্বর্ণ-প্রসূ-ভূমি সনাতনী,
> যাপিব কি দিন চির অনশন ব্রতে?
>
> —রাধানাথ রায় : মহাযাত্রা।

বলাই বাহুল্য এ-ছন্দ ওড়িয়া ভাষার সঙ্গে বেশ সঙ্গতিপন্ন। কিন্তু সে যুগে বহু বিরূপ-সমালোচনা এবং প্রতিকূলতার ঝড় ওঠে। তবে শেষ পর্যন্ত বড়কুমার বলভদ্র, কবিবর চিন্তামণি (১৮৬৭-১৯৪৩) এবং পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাসের (১৮৮৪-১৯৬৩) মতো ব্যক্তির প্রয়োগ ও সমর্থন আনুকূল্যে ওড়িয়া-অমিত্রাক্ষরের প্রতিষ্ঠা লাভ সম্ভব হয়।

মধুসূদন দত্তের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ওড়িয়ার কবিগণ ওড়িয়াতে 'চতুর্দশপদী' বা সনেট' রচনার সূত্রপাত করেন। বাংলার মতোই চতুর্দশ পঙ্‌ক্তির আয়তনের এই কবিতা মিশ্রবৃত্ত রীতি এবং চতুর্দশ মাত্রার পঙ্‌ক্তি বন্ধে (যা ৮ ও ৬ মাত্রা ভাগে বিভাজ্য) রচিত।

রুদ্রনারায়ণ পট্টনায়কই সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম ওড়িয়া সনেট রচনা করেন। 'রাম'-নামের সেই সনেটটি 'সংবাদ বাহিক' পত্রিকার ১৬ ডিসেম্বর ১৮১৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরে গোপাল বল্লভ দাস (১৮৬০-১৯১৪)—'উপেন্দ্র 'ভঞ্জ', 'বনমল্লবী', 'গোলাপ' ও 'মধুকর' প্রভৃতি সনেট রচনা করেন। এই হিসাবে তিনি মধুসূদন রাওয়ের পূর্বসূরী। আলোচক ক্ষেত্রবাসী নায়কের মতে—"ভক্ত কবি মধুসূদন রাও (১৮৫৩-১৯১৩) হেউছন্তি ওড়িশারে সনেট কাব্যরূপের বিকাশ কর্তা। তাংক প্রদত্ত নাম ঘেনি সনেট অদ্যাবধি 'চতুর্দশপদী' কবিতা রূপে পরিচিত।"[১৯]

বলা যায় সনেট যে অর্থে 'বাংলা সনেট', ওড়িয়া কবিদের সনেটও সেই অর্থে 'ওড়িয়া সনেট'। সুতরাং চতুর্দশপদী নামটি কবি মধুসূদন রাও যে মধুসূদন দত্তের অনুসরণে গ্রহণ ও ব্যবহার করেছেন সেকথা না বললেও চলে। মধুসূদন দত্তের মতোই রাও কবির সনেটে ইংরাজি ইটালিয়ান ও বঙ্গীয় রূপ অনুসৃত হয়েছে। তবে সনেটের জটিলতা এমন কি প্রবহমানতা পরিহারের পক্ষপাতী ছিলেন ভক্ত কবি মধুসূদন রাও। তাঁর 'বসন্তগাথা' কাব্যের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন—"চতুর্দশপদী কবিতা গুড়িকর অধিকাংশ বসন্ত কালরে রচিত হোইথিবারু তাহা 'বসন্তগাথা' নামরে আখ্যাত হেলা।" মধুসূদনের বসন্তগাথা (১৯০১) কাব্যে উৎসর্গ কবিতাটি সহ মোট ৪১টি সনেট সংকলিত। কয়েকটি যুগ্ম সনেটও তিনি লিখেছেন। সনেটগুলির মধ্যে ১৬টি মিত্রাক্ষর, একটি দুর্বল এবং ক'টি বাকি বিশুদ্ধ রচনা। মধুসূদন রাওয়ের একটি সনেট—

হজিনাহিঁ যার কেভে কি ছিহিঁ রতন
এ মর্ত্য সংসারে সেহি দীন অকিঞ্চন।

সে পুনি দরিদ্রতর	হরাই রতন
এ ভব ভবনে তাহা	পাসোরে যে জন।
সে পুনি দরিদ্রতম	কৃপা পাত্র অতি
হরাই পাশোরিবাকু	বলে যার মতি।
শোকর অসীম	মসীময় অন্ধকারে
প্রেমর প্রদীপ জ্বালি	মর্ম বেদনারে
যে জন জপই শিব	রাত্রি জাগরণে,
অশ্রু পূত প্রেম মন্ত্রে	হৃদয় রতনে,
সেহি একা এ জগতে	মহা ধনে ধনী
অক্ষয় ভাণ্ডার তার	দিবস রজনী।
প্রভুহে শাশ্বত তব	শ্রী কোঠ ভণ্ডারে
রথ বন্ধু হৃদ-নিধি	লক্ষ্মী প্রতিমারে।

—বসন্তগাথা : বিচ্ছেদ

মধুসূদন রাওয়ের সমসাময়িক এবং পরবর্তী অন্যান্য ওড়িয়া কবিরাও চতুর্দশপদী রচনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে কবি ফকীরমোহন সেনাপতি (১৮৪৩-১৯১৮), গঙ্গাধর মেহের (১৮৬১-১৯২০), নন্দকিশোর বল (১৮৭৫-১৯২৮), ব্রজমোহন মহান্তি, গোপবন্ধু দাশ (১৮৭৭-১৯২৮), গোদাবরীশ মিশ্র (১৮৬১-১৯৫৬), পদ্মচরণ পট্টনায়ক (১৮৮১-১৯৫৬) এবং বালকৃষ্ণ ও নারায়ণমোহন দে প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। কারও কারও রচনায় অল্প-স্বল্প নতুনত্ব পাওয়া গেলেও তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নেই।

এই সময় থেকেই ওড়িয়া সাহিত্যে নানা রকমের স্তবক সম্ভারে কবিতা সুসজ্জিত হয়ে আত্ম প্রকাশ করতে শুরু করে। বিশেষ করে চার ও ছয় চরণে ব্যালাড রচনায় কবিদের বিশেষ প্রবণতা লক্ষিত হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে মধুসূদন দত্ত ইংরেজি কবিতার Blank Verse ও Sonnet দ্বারা প্রভাবিত হয়ে—বাংলা কবিতায়—বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতি আশ্রিত তার যে অভিনব প্রয়োগ করে কাব্যরচনায় নবদিগন্ত উন্মোচন করলেন তার ঢেউ প্রতিবেশী সাহিত্যেও লাগে। তারই ফলে অসমীয়া ওড়িয়া এবং হিন্দী, কাব্যে যথারীতি অমিত্রাক্ষর ও চতুর্দশপদী গৃহীত ও বহুলভাবে রচিত হতে থাকে। চিরাচরিত সংকীর্ণ পরিধির সীমা পার হয়ে কবিতা যেমন

বিচিত্র তেমনি অভিনব ও মহনীয় হয়ে উঠল। মধুসূদন তাঁর প্রতিভা বলে বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া এবং হিন্দী সাহিত্যকে ছন্দ ও বিষয়বস্তুর সূত্রে গ্রথিত করে অসাধ্য সাধন করলেন। পরবর্তীকালে অবশ্য প্রত্যেক ভাষার সাহিত্য আপন আপন শক্তি সামর্থ্য অভিরুচি ও মানসিক প্রবণতাসুলভ পরিবর্তন সাধিত করে নিয়েছে—যা স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিত।

মধুসূদনের যুগ : হিন্দী ছন্দ

হিন্দী সাহিত্যে আধুনিকতার অগ্রদূত ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে হিন্দী সাহিত্যের মিলনের সেতুপথ নির্মাণ করেছিলেন পূর্বেই। এবার তার সুফল দেখা দিতে লাগল। বাংলা নাটক ও উপন্যাসের হিন্দী অনুবাদ শুরু হয় এ-যুগেই। বাংলা কাব্যের তেমন হিন্দী অনুবাদ না হলেও হিন্দীতে বাংলা কবিতা ও বাংলা ছন্দের অনুসৃতি লক্ষিত হয়।

ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্যিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল তা নানা দিক দিয়ে বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিল। তাই কবি অম্বিকা দত্ত ব্যাস ও শ্রীধর পাঠক প্রমুখের রচনায় সমকালীন বাংলা কবিতা ও অমিল প্রবহমান পয়ার, সনেট প্রভৃতির অনুসৃতি লক্ষিত হয়। হিন্দীতে অমিত্রাক্ষর বা অমিল প্রবহমান অর্থাৎ অতুকান্ত ছন্দ সর্বপ্রথম রচনা করেন অম্বিকা দত্ত ব্যাসই।

আধুনিক অসমীয়া, ওড়িয়া ও হিন্দী কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দোবন্ধের প্রয়োগ, সনেট রচনা এবং স্তবক নির্মাণ—এই তিন ক্ষেত্রে মধুসূদনের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

হিন্দী কাব্যে অমিত্রাক্ষর রচনা করে যাঁরা যশস্বী হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অম্বিকা দত্ত ব্যাস (১৮৫৮-১৯০০), শ্রীধর পাঠক (১৮৫৯-১৯২৮), অযোধ্যা সিংহ উপাধ্যায় 'হরিঔধ' (১৮৬৫-১৯৪১), মৈথিলীশরণ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৬৪) এবং জয়শংকর প্রসাদ (১৮৮৯-১৯৩৭) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৮০]

কবি অম্বিকা দত্ত হিন্দীতে অমিত্রাক্ষর প্রথম রচনা করলেও তাতে সফলতা আনতে পারেননি। তিনি 'বেতুকে' বা মিলহীন (আপাত ভাবে অমিত্রাক্ষরের

পর্যায়বাচী শব্দ) প্রবহমান কবিতা এবং 'কংসবধ' কাব্য রচনা করেন। সম্ভবত প্রথম প্রয়াসের জন্য প্রত্যাশিত খ্যাতি অর্জন করতে পারেননি।[৮১]

কবি শ্রীধর পাঠক বাংলা অমিল প্রবহমান ছন্দের অনুসরণে অতুকান্ত, অসম পঙ্‌ক্তিক গদ্যের মতো দীর্ঘ বাক্যের প্রয়োগ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন।[৮২] তবে বাংলায় অমিত্রাক্ষর মিশ্রবৃত্ত রীতির চতুষ্কল পর্বে রচিত, কিন্তু হিন্দী কবিরা হিন্দী কলাবৃত্তে তার প্রয়োগ-পরীক্ষা করে মৌলিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। যেমন—

প্রসবকে কালকী লালিমা মেঁ লসা
বাল-শশি ব্যোম কীওর থা আ রহা।
সদ্য-উৎফুল্ল-অরবিন্দ-নিভ নীল সুবি—
শাল নভবক্ষ পর জা রহা থা চঢ়া ॥
—হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস (১৯৫২) পৃ. ৬৭৫।

কলাবৃত্ত রীতির পঞ্চকল পর্বের দ্বিপদী (১০+১০) (অরিল্ল) বন্ধে কবিতাটি রচিত। অমিল ও প্রবহমানতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। চতুর্থ পঙ্‌ক্তির শেষে পঙ্‌ক্তি যতিটিও ('সুবি। শাল') অস্বীকৃত। মধুসূদনও এরকম যতি অস্বীকৃতির কৌশলে ছন্দে বৈচিত্র্য এনেছেন।—

কহরে সন্দেশ—
—বহ, কহ শুনি আমি, কেমনে বধিলা
দশাননাত্মজ-শূরে দশরথাত্মজ ?
—মেঘনাদবধ কাব্য, প্রথম সর্গ।

এই 'সুবি-শাল' শব্দটি 'সন্দেশ-বহ'-এর মতোই খণ্ডিত হয়ে দুই পঙ্‌ক্তিতে বিন্যস্ত। সে যাই হোক, মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর এবং শ্রীধর পাঠকের অতুকান্তের মধ্যে ব্যবধান সুস্পষ্ট। তবে বাংলার বহুল প্রচলিত মিশ্রবৃত্ত যেমন মধুসূদন ব্যবহার করেছেন। হিন্দীতেও তেমনি অমিত্রাক্ষরের জন্য দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত কলাবৃত্ত রীতির নির্বাচন যুক্তিযুক্তই মনে হয়। তাই অমিত্রাক্ষরের প্রথম প্রকাশ বাংলায় মিশ্র কলাবৃত্ত রীতিতে হলেও হিন্দীতে হয়েছে সরল কলাবৃত্তে।

ব্রজভাষার বদলে খড়ী হিন্দীতে কবিতা রচনার প্রথম উদ্যোগ দেখা দেয় ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র ও শ্রীধর পাঠক প্রমুখের রচনায়। বহু কবির নানা প্রকার বিচিত্র প্রয়োগের প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে সরস্বতী পত্রিকার পৃষ্ঠায়। বাংলা সাহিত্যের

সমৃদ্ধি সাধনে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনের' (১৮৭২) যে ভূমিকা হিন্দী সাহিত্যের ক্ষেত্রে মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদী (১৮৭০-১৯৩৮) সম্পাদিত সরস্বতী (১৯০০) পত্রিকার ভূমিকাও সেইরূপ গুরুত্বপূর্ণ। মহাবীরপ্রসাদ সংস্কৃত ছন্দের অনুরাগী হলেও হিন্দী কবিতায় ছন্দ প্রয়োগে উদার ছিলেন। বাংলার অমিত্রাক্ষর হিন্দীতে প্রয়োগেরও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন।[৮৩] বলেছিলেন—

"সংস্কৃতে ইংরেজি তথা বাংলায় যদি এরূপ [অমিত্রাক্ষর] ছন্দের প্রয়োগ সম্ভব হয়, তবে আমাদের ভাষায় [হিন্দীতে] তার প্রয়োগ না করার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে না।"

—ডঃ সুধীন্দ্র : হিন্দী কবিতা মেঁ যুগান্তর (১৯৫০) পৃ. ৭০।

লক্ষণীয়—সংস্কৃতে অতুকান্ত (অমিল) প্রয়োগ প্রচুর থাকলেও অমিত্রাক্ষরের (অমিল ও প্রবহমান রচনার) প্রয়োগ ছিল না। সে যাই হোক মহাবীরপ্রসাদের প্রোৎসাহনে হিন্দীতে অমিত্রাক্ষর লেখা হতে লাগল প্রচুর। কবি অযোধ্যাসিংহ উপধ্যায় 'হরিঔধ' প্রিয়প্রবাস রচনা করেন (১৯৮৩) বর্ণবৃত্তে। রচনা অমিল হলেও ভাবপ্রবাহ তেমন সুস্পষ্ট নয়। তাঁর এই প্রয়াস যে যুক্তিযুক্ত হয়নি প্রিয়প্রবাসের ভূমিকাতে তিনি নিজেই সে কথা স্বীকার করেন।[৮৪] মধুসূদনের বিস্ময়কর প্রতিভার দান অমিত্রাক্ষর হিন্দী কবিদের মধ্যে সর্বাধিক অনুপ্রাণিত করেছিল—কবি মৈথিলীশরণ গুপ্তকে। তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন অনুরাগী পাঠক ও বোদ্ধা ছিলেন। 'মধুপ' ছদ্মনামের আড়ালে তিনি ব্রজাঙ্গনা, মেঘনাদবধ এবং বীরাঙ্গনা কাব্যের হিন্দী অনুবাদ করেন। 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যটি হিন্দী কলাবৃত্তে অনূদিত তবে মেঘনাদবধ ও বীরাঙ্গনার ছন্দ মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরেরই হিন্দী রূপ। অর্থাৎ হিন্দী মিশ্রবৃত্ত বা ঘনাক্ষরী রীতির অমিল প্রবহমান পনের মাত্রার (৮+৭) পয়ার। বাংলা চোদ্দ মাত্রার বদলে কেন পনের মাত্রা রাখতে হল তার কারণ দেখিয়েছেন মেঘনাদবধ কাব্যটির হিন্দী সংস্করণের (১৯২৭) ভূমিকায়। তা থেকে জানা যায়, বাংলায় অধিকাংশ বিভক্তি শব্দের সঙ্গে জুড়ে যায় তাই তাতে শব্দ ও বিভক্তি মাত্রা বাড়ে না। কিন্তু হিন্দীতে শব্দ ও বিভক্তি পৃথক থাকে তাই মাত্রা বৃদ্ধি ঘটে পদে পদে।[৮৫] এইরূপ প্রয়োগের প্রেরণা পান মৈথিলীশরণ গুজরাটি কবি কেশবলাল হর্ষদ রায় 'ধ্রুব' রচিত ১৫ মাত্রার অমিত্রাক্ষর থেকে।[৮৬] তবে অসমীয়া ও ওড়িয়াতে বাংলার মতোই চোদ্দ মাত্রারই পঙ্ক্তি প্রযুক্ত। যথাস্থানে তা আলোচিত হয়েছে। অন্যান্য হিন্দী কবিরা হিন্দী কলাবৃত্তে অমিত্রাক্ষর লিখেছেন, কিন্তু মৈথিলীশরণ লিখেছেন মিশ্রকলাবৃত্ত বা

ঘনাক্ষরীতেই। সুতরাং ছন্দোরীতি, মিলহীনতা ও প্রবাহ সৃষ্টির বিচারে তিনি মধুসূদনের সমীপবর্তী এবং পূর্বসূরী হিন্দী কবিদের অতিক্রম করে গেছেন। তবু উত্তরসূরীর হাতে ছন্দটি আরও সার্থক হয়ে উঠবে—এমন প্রত্যাশাও তিনি পোষণ করতেন। বলেছেন—

"আশা করি ভবিষ্যতের শক্তিশালী কবিদের হাতে পরিমার্জিত হয়ে এই ছন্দটি ধারাবাহিক বর্ণনার ক্ষেত্রে সংস্কৃতের অনুষ্টুপ এবং বাংলার পয়ারের মতোই উপযোগী হয়ে উঠবে।

—বীরাঙ্গনা (হিন্দী) ১৯২৭, নিবেদন, পৃ. ৩।

অমিত্রাক্ষর মৈথিলীশরণ গুপ্তের হাতে কতটা, সরল ও সুষ্ঠ হতে পেরেছিল তা বোঝা যাবে নিম্নের উদ্ধৃতাংশ থেকে—

পুষ্পক মেঁ বৈঠা হুআ রক্ষোনাথ নিকলা
ঘূমে রথচক্র ঘোর-ঘর্ঘর-নিদাদ সে,
উগল কৃশানু-কণ, হাঁ—সে হয় হর্ষ সে
চৌঁধা কর আগে চলী রত্নসম্ভবা বিভা,
উষা চলতী হৈ যথা আগে, উষ্ণ রশ্মি কে
জব উদয়াদ্রি পর একচক্র রথ মেঁ
হোতা হৈ উদিত ওয়হ দেখ রক্ষোরাজ কো
রক্ষোগণ গরজা গভীর ধীর নাদ সে।

—মেঘনাদবধ (হিন্দী) ১৯২৭, সপ্তম সর্গ।

লক্ষ করলে দেখা যায় মূলের সাত পঙ্‌ক্তি অনুবাদে আট পঙ্‌ক্তি হয়েছে। তবে মূলের ভাব প্রবাহ, ধ্বনিবিন্যাস ও কাব্যগরিমা বহুলাংশে পাওয়া গেলেও পনের মাত্রার পঙ্‌ক্তি এবং পঙ্‌ক্তি শেষে দীর্ঘস্বরের কবির প্রয়াসকে অনিবার্যতা পুরোপুরি সফল হতে দেয়নি। কবি মৈথিলীশরণ তাঁর 'নহুষ' ও 'সিদ্ধরাজ' কাব্য দুটিতেও ১৫ মাত্রার যথাক্রমে সমিল ও অমিল প্রবহমান ব্যবহার করেছেন। অনুরূপ ছন্দেই তিনি মধুসূদনের 'মিত্রাক্ষর' সনেটটি হিন্দীতে অনুবাদ করেন এবং একটি মৌলিক সনেটও রচনা করেন। অনুবাদের চেয়ে মূলটি সহজগতি সম্পন্ন। হিন্দী সাহিত্যে ঘনাক্ষরী রীতিতে রচিত প্রথম এবং একমাত্র সনেট রূপে এ-টি বিবেচ্য।[৮৭]

কবি জয়শংকর প্রসাদ মৈথিলীশরণ গুপ্তের পূর্বেই হিন্দীতে অমিত্রাক্ষর

রচনায় মনোযোগী হন। অপরাপর কবিদের মতো তিনিও কলাবৃত্তেই অমিত্রাক্ষর রচনা করেন। 'ভারত' নামত কাব্য রচনাতে তিনি কলাবৃত্ত অমিত্রাক্ষরের প্রথম প্রয়োগ করেন। তাঁর 'করুণালয়' (১৯২২) ও 'মহারাণাকে মহত্ত্ব' প্রভৃতি গ্রন্থও এই ছন্দে লেখা। করুণালয় থেকে অমিত্রাক্ষরের নিদর্শন—

অপনী আবশ্যকতা কা অনুচর বন গয়া
রে মনুষ্য! তূ কিতনে নীচে গির গয়া।
আজ প্রলোভন-ভয় সে তুঝসে করওয়া রহে
কৈসে আসুর কর্ম। অরে তূ ক্ষুদ্র হৈ—
ক্যা ইতনা?

—করুণালয়: পঞ্চম দৃশ্য।

একুশ মাত্রার পঙ্‌ক্তিতে অমিল ও প্রবহমানতা আনা হয়েছে। তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে মাত্রাধিক্য ঘটেছে, তবু তা হিন্দী কলাবৃত্তের অমিত্রাক্ষর রূপে গণ্য হতে পারে। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের সঙ্গে জয়শংকর প্রসাদের অমিত্রাক্ষরের বড় পার্থক্য—মিশ্রকলাবৃত্ত পয়ার বন্ধের বদলে কলাবৃত্ত রীতির প্রবঙ্গম (ল গ. ৭+৬-র) প্রভৃতি বন্ধের প্রয়োগ। কলাবৃত্ত অমিত্রাক্ষর রচনায় জয়শংকর প্রসাদ পূর্ববর্তী কবিদের অতিক্রম করলেও মধুসূদনের ধারা পুরোপুরি আয়ত্ত করতে পারেননি। তিনি হিন্দী সনেটও লিখেছেন, কিন্তু কলাবৃত্ত রীতিতে। লক্ষ করার বিষয়—হিন্দী কলাবৃত্ত রীতিতে অমিত্রাক্ষরের প্রচুর প্রয়োগ ঘটলেও বাংলায় এরূপ প্রয়োগের নিদর্শদ মেলে না। অসমীয়া এবং ওড়িয়া সাহিত্যেও সেরূপ প্রয়োগ ঘটেনি। সম্প্রতি কোনো কোনো আধুনিক কবির রচনায় অনুরূপ প্রয়াস লক্ষিত হয়।

বাংলা সাহিত্যে, সম্ভবত সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যেই মধুসূদন দত্ত সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য কাব্যশিল্পের অনুসরণে কবিতায় Verse paragraph বা পঙ্‌ক্তি অনুচ্ছেদ এবং বিভিন্ন আকৃতির স্তবক রচনার রীতি প্রবর্তিত করেন। তাঁর ব্রজাঙ্গনা কাব্যে বিচিত্র স্তবক নির্মাণ-শিল্পের নিদর্শন বিদ্যমান। মধুসূদনের পূর্বে ভারতীয় সাহিত্যে সাধারণভাবে চৌপাঈর পর দোহা ব্যবহার করে অথবা বিভিন্ন বন্ধের পঙ্‌ক্তির সমাবেশ ঘটিয়ে কবিতার আকৃতিতে বৈচিত্র্য আনার প্রয়াস দেখা যেত। মাঝে-মধ্যে ত্রিপদী চৌপদীর ব্যবহারও দেখা যেত। মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন আকৃতি, আয়তন ও ওজনের যে

স্তবক নির্মাণ পদ্ধতি প্রবর্তন করলেন তা ক্রমে ক্রমে অন্যান্য ভারতীয় সাহিত্যেও স্বীকৃতি লাভ করে। হিন্দী সাহিত্যেও তার সুফল দেখা দিল। আলোচ্য যুগের মুখ্যত দুইজন কবি মৈথিলীশরণ গুপ্ত এবং জয়শংকর প্রসাদের রচনাতেই বিচিত্র স্তবক গঠন পদ্ধতির নিদর্শন পাওয়া যায়। মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা'র অনুবাদ 'বিরহিণী ব্রজাঙ্গনা' (১৯১৫) কাব্যে মৈথিলীশরণ মধুসূদনের স্তবকসজ্জা অনুসরণ করেননি। তবে পরবর্তী কাব্য রচনায় তিনি যেন বিচিত্র স্তবকসম্ভার তুলে ধরেছেন সেই অভাব পূর্তির জন্য। কবি জয়শংকর প্রসাদ একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদী পঙ্ক্তির সমাবেশে নানা রকমের স্তবক রচনা করেছেন। তাঁর 'শের সিংহকা শস্ত্র সমর্পণ'—কবিতায় একটি মাত্র একপদী দিয়ে স্তবক রচনার বিরল নিদর্শন পাওয়া যায়—

হুআ সুনা হৈ পঞ্চনদ।
—লহর (১৯৫২), পৃ. ৫৪।

কবি প্রসাদ পঞ্চপদী ও ষট্পদী পঙ্ক্তি দিয়েও স্তবক রচনা করেছেন তাঁর 'লহর' কাব্যটির 'অশোক কী চিন্তা' কবিতাটিতে।

কেবল হিন্দীই নয় অসমীয়া এবং ওড়িয়া কবিতাতেও স্তবক নির্মাণের বিচিত্র পদ্ধতির পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে—মধুসূদনের শিল্প-রূপের অনুপ্রেরণায়। যথাস্থানে বিষয়টি স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে। এইভাবে মধুসূদন তাঁর প্রতিভার সাহায্যে ছন্দের মালায় বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া এবং হিন্দীকে সুশোভিত এবং সংযুক্ত করেছেন। ভাব-ভাষা ও ছন্দে অভিনবতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং আকর্ষণ জাগ্রত হয়েছে, দীর্ঘদিনের সুপ্তি কেটেছে-আলোচিত ভাষা চতুষ্টয়ের গতানুগতিক সাহিত্য মনস্কতার। এ-টাই মধুসূদনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দান। পরবর্তী স্তরে আমরা মধুসূদনের উত্তরযুগে পূর্বাঞ্চলীয় এই চার ভাষায় কবিতায় ছন্দের স্বরূপ ও বিশিষ্টতার কথা আলোচনা করব।

মধুসূদনের উত্তর যুগ (১৮৭৩-১৮৯০)

বাংলা কাব্যে ভাব-ভাষা ও ছন্দের ক্ষেত্রে অভিনবত্ব এনে মধুসূদন কাব্য রচনায় যে নব পথ নির্মাণ করেন, পরবর্তীকালের কবিরা সে পথে বেশিদূর

অগ্রসর হতে পারেননি। মধুসূদনের সাহিত্য-শিল্প ও মানসিকতার স্বাঙ্গীকরণ ও অনুসরণ অন্যদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখ শক্তিধর কবির প্রয়াসও মধুসূদনের অক্ষম অনুসৃতির মধ্যেই সীমিত থেকে যায়।

মধুসূদনের উত্তর যুগে একদিকে বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ প্রয়োগের প্রয়াস লক্ষিত হয়, অপর দিকে তেমনি মিশ্র কলাবৃত্তের সমিল, অমিল, প্রবহমান ও অপ্রবহমান পয়ার দীর্ঘ পয়ার, ত্রিপদী ও চৌপদী প্রভৃতির বিচিত্র প্রয়োগও মেলে। প্রত্নকলাবৃত্ত ও নব্যকলাবৃত্তের প্রয়োগও মাঝে মাঝে দেখা যায়, তবে তা খুবই কম। কোনো কোনো কবি লঘু ভাবের কবিতায় দলবৃত্তের প্রয়োগও করেছেন। আবার মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরও বিবর্তনের পথে মাঝে-মধ্যে মুক্তকের কাছা-কাছি এসে গেছে।

বাংলা কাব্য ও ছন্দের এই বিশেষত্বগুলি তেমন স্পষ্টভাবে না হলেও প্রতিবেশী অসমীয়া, ওড়িয়া এবং হিন্দী সাহিত্যেও প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। যদিও তা পরিমাণে খুবই কম। সে প্রসঙ্গে যাবার আগে তখনকার বাংলা কবিতায় সংস্কৃত ছন্দের বিষয়টিও উল্লেখ করা দরকার।

সংস্কৃত ছন্দ

বাংলায় সংস্কৃত ছন্দের ব্যবহার সর্বপ্রথম লক্ষিত হয় কবি ভারতচন্দ্র রায়ের রচনায়। এ-যুগে যাঁরা বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ রচনার চেষ্টা করেছেন তাঁদের মধ্যে কবি বলদেব পালিত (১৮৩৫-১৯০০), হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬), বিজয়চন্দ্র মজুমদার (১৮৬১-১৯৪২), ভুবনমোহন রায়চৌধুরী (১২৩০-১৩০১) ও হরগোবিন্দ লস্কর (১৮৬৪-১৯০৩) প্রমুখ কবিদের নাম উল্লেখ করা যায়। প্রয়াস ও সাফল্যের বিচারে বলতে হয় সঠিক পাঠক ও উত্তরসূরী তাঁদের ভাগ্যে জোটেনি। তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ কোনো কোনো প্রতিভাধর কবি তাঁদের রচনায় অনুপ্রাণিত হয়ে সংস্কৃত ছন্দে বাংলা গান এবং সংস্কৃত কবিতার আদলে সংস্কৃত ছন্দে বাংলা কবিতার রূপ গড়ে তোলার সার্থক চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের রচনায় কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাব বেশ স্পষ্ট।

কবি বলদেব পালিত সংস্কৃতের লঘু-গুরু উচ্চারণের কৃত্রিমতা স্বীকার করে নিয়ে সংস্কৃত ছন্দে বাংলা কবিতা রচনায় প্রয়াসী হন। তাঁর এই কাজ বঙ্কিমচন্দ্রের মতো মনীষীর প্রশংসা লাভ করলেও, তেমন সফল হতে পারেনি। কারণ "বাঙ্গালা ভাষার যেরূপ গঠন, তাহাতে সংস্কৃত ছন্দ ভালো বসে না।"[৮৮] কবি নিজেও প্রকৃত অসুবিধাটি অনুধাবন করে সংস্কৃত ছন্দে কাব্য রচনার প্রয়াস পরিত্যাগ করেন। তিনি সিদ্ধান্ত করেন :—

"সংস্কৃত কাব্যে যে সমস্ত সুললিত ছন্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, বাঙ্গালা পদ্যে সেই সব ছন্দ প্রয়োগ করিতে পারিলে অবশ্যই তাহার কিছু না কিছু সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু এতদ্দেশে স্বরবর্ণের লঘুত্ব ও গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পাঠ করিবার প্রথা না থাকাতে ঐ সকল ছন্দ সর্বসাধারণের নিকট সমাদৃত হয় না। আমার ভর্তৃহরি কাব্যই তাহার দৃষ্টান্তস্থল। সেই কারণবশতঃ আমি ঐ প্রকার রচনায় প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইলাম না।"

—ভূমিকা, 'কর্ণার্জ্জুন' কাব্য (১২৮২)।

কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লঘু-গুরু উচ্চারণের কৃত্রিমতা মেনে নিয়েও দীর্ঘস্বরের দীর্ঘতা সর্বত্র মানেনি। কোন্ দীর্ঘস্বরটি দীর্ঘ পড়তে হবে তা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এইভাবে তিনি সংস্কৃত ছন্দের বঙ্গীকরণে প্রয়াসী হন।[৮৯] তাঁর এই ব্যবস্থা সেযুগের বিচারে নতুন মনে হলেও এবং কবিতা পাঠে কিছুটা বৈচিত্র্য আনলেও তা বাংলা উচ্চারণের অনুকূল হতে পারেনি—সে কথা বলাই বাহুল্য।

কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনায় ছন্দোবৈচিত্র্য তেমন নেই। তবে বাংলার উচ্চারণ যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রেখে সংস্কৃত ছন্দে বাংলা কবিতা রচনার পরীক্ষা করেন তিনিই সর্বপ্রথম। বাংলার উচ্চারণ অক্ষুণ্ণ রেখে মন্দাক্রান্তা, শিখরিণী, প্রিয়ংবদা ও মালিনী প্রভৃতি সংস্কৃত বর্ণবৃত্ত ছন্দ প্রয়োগের পরীক্ষা করেছেন। সংস্কৃত ছন্দের মাত্রা-সংখ্যা এবং যতিস্থান যথাসম্ভব ঠিক রেখে মন্দাক্রান্তাকে (সতের বর্ণ-সাতাশ মাত্রা ; আট, সাত ও সাত, পাঁচ মাত্রার পর যতি) বাংলা রূপ দান করেছেন এইভাবে—

রম্য এ যে উপবন
কহে কবি তখন
ফিরাইয়া নয়ন
চৌদিক পানে।

পুষ্প পাতা মিলিজুলি
সমীরে হেলিদুলি
করিছে কোলাকুলি
অভেদ প্রাণে।

—স্বপ্ন প্রয়াণ : মনোরাজ্যে প্রয়াণ।

সংস্কৃত বিরোধী কিন্তু বাংলার প্রকৃতি সুলভ চৌপদী পঙ্‌ক্তির পদে-পদে ও পঙ্‌ক্তিতে-পঙ্‌ক্তিতে মিল রচনা লক্ষণীয়। কবির কোনো কোনো বর্ণবৃত্তের রচনায় রুদ্ধদল দ্বিমাত্রক হয়ে বাংলার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যকে স্পষ্ট করে তুলেছে। এইসব ক্ষেত্রে তাঁর 'কাব্যমালা' 'স্বপ্নপ্রয়াণ' প্রভৃতি কাব্যের ছন্দ সংস্কৃতানুসারী হলেও বাংলা উচ্চারণের স্বাভাবিকতা-কবির সাফল্যের সূচক। সংস্কৃত দীর্ঘ উচ্চারণের অস্বাভাবিকতাকে তিনি কখনও কখনও হাস্য-উদ্রেকের উপকরণ রূপে কাজে লাগিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর মন্দাক্রান্তায় 'টঙ্কাদেবী কর যদি কৃপা, না রহে কোনো জ্বালা'—ইত্যাদি এবং শিখরিণীতে (সতের বর্ণ-পঁচিশ মাত্রা)—'বিলাতে পালাতে ছটফট করে নব্য গউড়ে'—ইত্যাদি প্রারম্ভিক পঙ্‌ক্তির রচনাগুলি উল্লেখযোগ্য। এ-ক্ষেত্রে সমসাময়িক কবিদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথই অপেক্ষাকৃত সফল।

ওড়িশার ভক্ত কবি মধুসূদন রাওয়ের জ্যেষ্ঠ জামাতা বিজয়চন্দ্র মজুমদার ইংরেজি, বাংলা, ওড়িয়া, সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত এবং মুণ্ডা ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ রচনায় স্বরের-দীর্ঘ-হ্রস্ব উচ্চারণে স্বাধীনতার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। তবে তাতে বিশেষ সুবিধা হয়নি। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'হেঁয়ালি' কাব্যগ্রন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভুবনমোহন রায়চৌধুরী ও হরগোবিন্দ লস্করের বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ রচনার প্রয়াস তেমন উল্লেখযোগ্য নয়, কারণ তাঁদের প্রয়াসে কোনোপ্রকার অভিনবতা চোখে পড়ে না। এ-বার বাংলা ছন্দের কথা।

বাংলা ছন্দ

সরল কলাবৃত্ত রীতি (Simple Moric Style)

বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথের মানসী (১৮৯০) কাব্যটি প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত বাংলায় নব্য কলাবৃত্ত ছিল অজ্ঞাত। ভাঙা জয়দেবী বা প্রত্নকলাবৃত্তেরই প্রয়োগ

দেখা গেছে সাহিত্যে। কিন্তু রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনায় অজ্ঞাতসারেই রুদ্ধদল দ্বিমাত্রক মর্যাদা লাভ করে বসেছে (দু-এক স্থলে)—সে কথা আমরা যথাস্থানে উল্লেখ করেছি। আলোচ্য যুগে বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫—১৮৯১), হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনায়—নব্য কলাবৃত্তের প্রয়োগের রূপটি দেখার চেষ্টা করা যাক্।

কলাবৃত্ত রীতির রহস্য অনাবিষ্কৃত ও অজ্ঞাত থাকায় যুগের অন্যান্য কবির মতোই বিহারীলাল চক্রবর্তীও যুক্তাক্ষরহীন ষট্‌কলপর্বিক পঙ্‌ক্তি রচনায় তৎপর ছিলেন। তাতে অবশ্য সুললিত ও সুমসৃণ-ধ্বনি মাধুরীই প্রধান হয়ে ওঠে। তাঁর বঙ্গসুন্দরী (১৮৭০) ও সারদামঙ্গল (১৮৭৯) প্রভৃতি কাব্যে এ-রূপ প্রয়োগ মেলে। আবার অনেক ক্ষেত্রে যুক্তাক্ষরকে ভেঙে ('নির্মল'—'নিরমল') আবশ্যক মতো মাত্রা পুষিয়ে নেবার চেষ্টাও লক্ষিত হয়। তবে যুক্তাক্ষর হীন কোমল-মধুর ভাব প্রকাশক্ষম তিন মাত্রার দুটি শব্দের সাহায্যে ছয় মাত্রার পর্বের রচনায় বিহারীলাল দক্ষতা দেখিয়েছেন। যেমন—

মধুর তোমার ললিত আকার, মধুর তোমার সরল মন;
মধুর তোমার চরিত উদার, মধুর তোমার প্রণয় ধন ॥
—বঙ্গসুন্দরী, সর্গ,-২, স্তবক-৩৯।

বিহারীলালের এইরূপ ছন্দ রচনার প্রবণতা বালক রবীন্দ্রনাথকেও প্রভাবিত করেছিল। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'-কাব্যটির কথা স্মরণীয়। তবে এই জাতীয় রচনার অতিলালিত্য ও 'এক-ঘেয়েমি'র প্রভাবমুক্ত হতে রবীন্দ্রনাথের দেরি হয়নি। কারণ এ-প্রয়োগ বাংলার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল না।[৯০]

কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কলাবৃত্তের বেশি প্রয়োগ করেননি। তাঁর 'বৃত্র-সংহার' কাব্যের পঞ্চম সর্গে তিনি ভাঙা জয়দেবী ছন্দের ষোলটি পঙ্‌ক্তি সন্নিবেশ করেছেন। বাংলা গানের প্রকৃতি-অনুসারী এই রচনায় প্রয়োজনমতো দীর্ঘস্বর এবং পঙ্‌ক্তির শেষে হ্রস্বস্বর দীর্ঘ ও দ্বিমাত্রক মর্যাদা লাভ করেছে। আবার কখনো কখনো রুদ্ধদল দ্বিমাত্রক রূপ লাভ করেছে। এই ধরনের প্রয়োগ সম্ভবত কবি কানের সায় পেয়ে করেছেন। 'দশ মহাবিদ্যা' কাব্যের 'নারদের বীণা বাদন' অংশটিও প্রত্নকলাবৃত্তের নিদর্শন রূপে বিচার্য। এখানেও রুদ্ধদল (একটি বাদে)-দ্বিমাত্রক রূপে প্রযুক্ত হয়েছে। বলা যায় নব্য-কলাবৃত্ত

রীতির প্রকৃতি হেমচন্দ্রের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। রুদ্ধদলের দ্বিমাত্রকতা তাঁর কানের সমর্থন লাভ করেছিল। এ-রূপ ছন্দ-নিপুণ কানের কবির সংখ্যা তখন বাংলায় খুবই কম ছিল।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরও কলাবৃত্তের প্রয়োগ করেননি। সাধারণভাবে মিশ্রবৃত্ত রচনার মধ্যেই মাঝে মাঝে রুদ্ধদল দ্বিমাত্রক রূপে দেখা দিয়েছে। কিন্তু রুদ্ধদলের দ্বিমাত্রকতা সাধারণভাবে কলাবৃত্তেই সম্ভব। এখানেও কবি কানের অনুমোদন পেয়েই এ-রূপ প্রয়োগ করেছেন—

কবিয়া জয়, মহা প্রলয়
বাজিয়া উঠিল বাজনা নানা
তাল বেতাল 'দিচ্ছে তাল'
ধেই ধেই নাচে পিশাচ দানা।

—স্বপ্ন প্রয়াণ, পৃ. ৯১।

—'দিচ্ছে তাল'-পাঁচ মাত্রার পর্ব। সুতরাং রচনাটি মিশ্রবৃত্তের হলেও কলাবৃত্তে রূপান্তরিত হয়ে গেছে বলা চলে।

মিশ্র কলাবৃত্ত রীতি (Mixed Moric Style)

কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী, হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১১) এবং নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯) প্রমুখ প্রতিষ্ঠিত কবিদের রচনায় মিশ্রবৃত্তের বিবিধ ও বিচিত্র প্রয়োগ ঘটেছে। তাই সংক্ষেপে তাঁদের প্রয়োগ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম গীতিকবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর রচনায় ছন্দ বিষয়ক কোনো প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষার নিদর্শন মেলে না। সাধারণভাবে তিনি মিশ্রবৃত্ত রীতির পয়ার, ত্রিপদী ও চৌপদী বন্ধের প্রয়োগ করেছেন। ছন্দের মধুর কোমল ধ্বনিতে তাঁর কবিতা মাঝে মাঝে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। তাতে অযুগ্মধ্বনির ত্রিমাত্রক পর্বাংশের প্রয়োগ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বিহারীলালের কবিতার ভাষা ও ছন্দ ত্রুটিমুক্ত না হলেও কৃত্রিমতামুক্ত।[৯১] তবে রুদ্ধদলবহুল মিশ্রবৃত্তের প্রয়োগই কবি বেশি করেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি পদ, পঙ্‌ক্তি ও মিল রচনায় কিছুটা স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন। তাতে

ভবিষ্যতের মুক্তবন্ধ ছন্দ বা মুক্তকের অস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় :—

অকারণ কিকারণ
কেঁদে কেঁদে ওঠে মন।
এই যে কি স্বপ্ন দেখে
চমকিয়া ঘুম থেকে
উঠিলাম
ভাবিলাম,
হায়! সে স্বপন কেন আর মনে পড়ে না
—সাধের আসন : ষষ্ঠ সর্গ, স্তবক-৩।

এখানে পঙক্তিগুলির অসমতা, (৪ থেকে ১৩ মাত্রা পর্যন্ত), দুই মাত্রার 'স্বপ্ন' শব্দের প্রয়োজনবোধে ত্রিমাত্রক 'স্বপন' রূপে ব্যবহার এবং অতিপর্বের (হায়!) বিন্যাস লক্ষণীয়।

কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রখ্যাত কাব্য বৃত্রসংহারে (১৮৭৫-৭৭) ভাষা ও ছন্দের বিচারে মধুসূদন ও ভারতচন্দ্র রায়ের অনুগামী ছিলেন। তাঁর কাব্যে তিনি প্রাচীন ভারতীয় কাব্যের আদর্শ অনুসারে সর্গে সর্গে ছন্দের পরিবর্তন করেছেন। প্রবহমান, অপ্রবহমান, অমিল প্রবহমান পয়ারের ব্যবহার দেখা যায় তাঁর কাব্যে। মধুসূদনের আদর্শে অমিত্রাক্ষর এবং তা নির্ভুল করার প্রয়াসে তিনি বিচিত্র ধ্বনিতরঙ্গসমৃদ্ধ পরিণত অমিত্রাক্ষরের তুলনায় যেন নিষ্প্রভ ছন্দের অবতারণা করে বসেছেন। প্রয়াসে আশানুরূপ ফললাভ না ঘটলেও বাংলা ছন্দের রূপ ও ধ্বনিসম্পদ আরও পরিস্ফুট করে তুলেছেন—হেমচন্দ্র—তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর 'নলিনী বসন্ত' (১৮৬৬) নাটকের সংলাপে তিনি অমিল প্রবহমান পয়ারের প্রয়োগ পরীক্ষা করেছেন। তাতে বাংলা উচ্চারণ-ধর্মিতা বিষয়ে তিনি কতদূর সজাগ ছিলেন তা সহজে বোঝা যায়। 'বীরবাহু' কাব্যে (১৮৬৪) তিনি বিহারীলালের মতো বিযুক্তাক্ষর বর্ণমাত্রিক পর্বিক মিশ্র-বৃত্তের প্রয়োগ করেছেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো বৈশিষ্ট্য না থাকলেও রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবর্তিত আঠারো মাত্রার দীর্ঘ পয়ার বন্ধ[১২] প্রবহমানতা লাভ করেছে এ-কাব্যেই সর্বপ্রথম। ভাব পঙক্তি প্রবাহী হয়ে উঠেছে। কবি সাধারণভাবে অমিল প্রবহমান মহাপয়ার রচনা করলেও মাঝে মাঝে দুর্বল মিলও এসে গেছে। যেমন—

গম্ভীর পাতাল ! যথা কালরাত্রি করাল বদনা
বিস্তারে একাধিপত্য ! শ্বসয়ে অযুতফণিণা
দিবানিশি কাটি রোষে ; ঘোর নীল বর্ণ বিবর্ণ অনল
শিখা সংঘ আলোড়িয়া দাপাদাপি করে দেশময়···
তমোহন্ত এড়াইতে-প্রাণ যথা কালের কবল।

—স্বপ্ন প্রয়াণ : রসাতল প্রয়াণ।

মধুসূদন হ্রস্ব পয়ারকে প্রবহমান করেন। তারই অনুসরণে দ্বিজেন্দ্রনাথ দীর্ঘ পয়ারকে প্রবাহিত করেছেন। বাংলা ছন্দের অভিনবতার এ-দিকটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ মূলত নাট্যকার। তবে 'প্রতিধ্বনি' (১৩১৮) নামে একটি কাব্যও রচনা করেন। নাট্যসংলাপ এবং কবিতায় তিনি প্রধানত মিশ্রবৃত্ত রীতিরই প্রয়োগ করেছেন। বন্ধ-বৈচিত্র্য বা স্তবক-রচনায় তিনি আগ্রহ দেখাননি। নাট্যসংলাপে প্রবহমান পয়ার ও মুক্তকের প্রয়োগই গিরিশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ হেমচন্দ্রের 'নলিনীবসন্ত' ও রাজকৃষ্ণ রায়ের 'হরধনুর্ভঙ্গ' নাটকে সংলাপ রচনার মাধ্যমে অনেকটা মুক্ত-ধর্মী অবস্থা লাভ করে। পাত্র-পাত্রীর ভাব অনুযায়ী বাক্য বা বাক্যাংশের সাহায্যে সংলাপ রচনা করতে গিয়ে গিরিশচন্দ্র সচেতনভাবে পয়ারের চোদ্দমাত্রার সীমাকে অস্বীকার করলেন। বক্তব্যের গুরুত্ব অনুযায়ী সংলাপের চরণ, দুই থেকে চোদ্দ, ষোলো এমন কি আঠারো, বিশ মাত্রা পর্যন্ত দীর্ঘ হয়েছে। অমিত্রাক্ষরকে নাটকে মনোমতো রূপ দিতে তাঁকে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয়েছে। অবশেষে তাঁর 'রাবণবধ' নাটকে (১৮৮২) তিনি প্রথম মুক্তক প্রয়োগে সক্ষম হন। তাঁর প্রসিদ্ধ নাটক 'জনা'তে (১৮৯৪) এই প্রয়োগ পরিণতি লাভ করে। মুক্তকের আশ্রয়ে নাট্যসংলাপ কতদূর সুললিত, সার্থক ও কাব্যগুণ মণ্ডিত হতে পারে তা প্রমাণ করেছেন গিরিশচন্দ্র। এখানে মধুসূদনের দূরদৃষ্টি এবং গিরিশচন্দ্রের ছন্দ-শিল্প সার্থকভাবে সমন্বিত হয়েছে। সাধারণ মানুষের তৃপ্তিসাধনের জন্য গিরিশচন্দ্র মাঝে মাঝে অনুপ্রাস-ছটাও সৃষ্টি করেছেন। বাংলা ছন্দ ও বাংলা নাটকের সংলাপের ইতিহাসে গিরিশচন্দ্রের এই দান সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি পাবার যোগ্য। তাঁর এই ছন্দোবদ্ধ 'গৈরিশ' ছন্দ নামে পরিচিত।

কবি নবীনচন্দ্র সেন বাংলা উচ্চারণের স্বাভাবিকতা রক্ষা করে কবিতা রচনায় দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাঁর কাব্যের একমাত্র বাহন মিশ্র কলাবৃত্ত

রীতির ছন্দ। দ্বিপদী (পয়ার), ত্রিপদী ও চৌপদী বন্ধের প্রবহমান পয়ারের স্বাভাবিক প্রয়োগ দেখা যায় তাঁর রচনায়। তিনিও এই বন্ধগুলির সাহায্যে নানা আকৃতি ও আয়তনের নাট্যধর্মী কাব্য সংলাপ রচনার পরীক্ষা করেছেন। এই ধরনের প্রয়োগে তাঁর রচনায় নাটক ও কাব্য বহুলাংশে কাছে এসে গেছে। নবীনচন্দ্রের এই প্রয়াসের ফলে মধুসূদনের গভীর বা গম্ভীর ভাবের বাহন অমিত্রাক্ষর তার রাজোচিত গরিমা পরিহার করে সাধারণ মানুষের মুখের আটপৌরে ভাষা ও সংলাপের যোগ্য বাহন রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এই নব প্রবর্তনাকে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সহর্ষ স্বীকৃতি ও অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।[১৩] নবীনচন্দ্রের 'ত্রয়ী' (অর্থাৎ 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাস') মহাকাব্যে পঞ্চাশটির মধ্যে একচল্লিশটি সর্গেই বিভিন্ন অংশে এই নাট্যসংলাপধর্মী-নবশৈলী ব্যবহৃত। তবে পরবর্তী কালে নবীনচন্দ্রের এই পদ্ধতির বিশেষ কোনো অনুসৃতি চোখে পড়ে না। স্তবক নির্মাণের ক্ষেত্রেও নবীনচন্দ্র কিছু কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে ছিলেন।

দলবৃত্ত রীতি (Syllabic Style)

এ যুগে বিহারীলাল চক্রবর্তী, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ কোনো কোনো কবির রচনায় লৌকিক ছন্দ বা দলবৃত্তের প্রয়োগ ঘটেছে দেখা যায়। তবে তা সীমিত লঘু ভাবের কবিতাতেই।

বিহারীলাল 'গীতি' বা গান জাতীয় রচনায় দলবৃত্তের প্রয়োগ করেছেন। তাঁর এই জাতীয় গান 'বাউল বিংশতি' (১৮৮১) গ্রন্থে সংকলিত। মাঝে মাঝে অতিপর্বের ব্যবহারও ঘটেছে তাঁর এই জাতীয় রচনায়। তবে উচ্চারণের আড়ষ্টতা এবং পদে-পদে ও পঙ্‌ক্তিতে-পঙ্‌ক্তিতে মাত্রার অসাম্যের জন্য দলবৃত্তের সৌন্দর্য তেমন ফুটে উঠতে পারেনি। যদিও পূর্ববর্তী কবি রামপ্রসাদ সেন তাঁর শ্যামা সঙ্গীতে দলবৃত্তের সার্থক ব্যবহার করেছেন।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দলবৃত্তের ক্ষেত্রে বেশ স্বাচ্ছন্দ্যের পরিচয় দিয়েছেন। 'নলিনীবসন্ত' নাটকে তিনি দলবৃত্ত রীতির একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদী বন্ধের প্রয়োগ করেছেন। অবশ্য তা সর্বত্র নিখুঁত হয়নি। মাঝে মাঝে মুক্তকের আভাস ফুটে উঠেছে। নাটকে দলবৃত্তের প্রয়োগ বালক রবীন্দ্রনাথের

'ম্যাকবেথ' নাটকের অংশ-বিশেষের বঙ্গানুবাদেও চোখে পড়ে। তাতে দলবৃত্তের উপযোগিতা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। হেমচন্দ্র সমসাময়িক বিষয় অবলম্বনে দলবৃত্তে অনেকগুলি ব্যঙ্গাত্মক কবিতাও লিখেছেন। 'বাজিমাৎ' 'হুতোম প্যাঁচার গান', 'হায় কি হলো', গান এবং 'নাকেখৎ' হাস্য-কাব্য নাটিকাটির নাম এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

গিরিশচন্দ্র তাঁর কোনো কোনো নাটকে স্ত্রীজাতীয় অথবা নিম্নশ্রেণীর চরিত্রের মুখে বিচিত্র বন্ধে দলবৃত্তের প্রয়োগ করেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'সীতাহরণ' ও 'ম্যাকবেথ' এর অনুবাদ নাটকের কথা স্মরণীয়। দলবৃত্তের উচ্চারণ মিশ্রবৃত্তের চেয়ে অধিক মুখের কাছা-কাছি। তাই মাঝে মাঝে মিশ্রবৃত্তের দলবৃত্তের মিশ্রণ ঘটে গেছে। এসব ক্ষেত্রে সংলাপের ভাষা শিথিল, গদ্যধর্মী ও অসমপঙ্‌ক্তিক হয়ে উঠলেও তার কাব্যধর্মিতা অক্ষুণ্ণ থেকেছে।

দেখা যাচ্ছে মধুসূদনের পরবর্তীকালে বাংলা ছন্দে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো বিশিষ্টতা না দেখা গেলেও প্রয়োগে কিছু কিছু নতুনত্ব অবশ্যই এসেছে। প্রতিবেশী সাহিত্যেও তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুসৃতি ঘটেছে কি না এবার তা দেখা যেতে পারে।

মধুসূদন-উত্তরযুগে অসমীয়া ছন্দ

মধুসূদনের ছন্দের আকর্ষণে অসমীয়া সাহিত্যে যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল তার ক্রিয়া চলমান ছিল মধুসূদন পরবর্তী যুগেও। তাই বিহারীলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও গিরিশচন্দ্রের ছন্দের তেমন প্রবল প্রভাব অনুভূত হয় নি। হবার সম্ভাবনাও ছিল না। কারণ একদিকে মধুসূদনের আদর্শে কাব্য ও ছন্দ রচনা এবং অন্যদিকে অসমীয়ার পূর্বাগত ছন্দোরীতি ও ছন্দোবন্ধের বিচিত্র ব্যবহার চলছিল। তবে গীতি কবিদের রচনায়—বাংলা এবং ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।[৯৪] এই প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ শর্মার অভিমত স্মরণীয়—

'সেই সময় বঙ্গদেশত বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, আদি ঔপন্যাসিক, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, নবীনচন্দ্র সেন, বিহারীলাল আদি কবি আরু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায় আদি গদ্য লেখকর সাহিত্যর জোওয়ারে বঙ্গদেশ প্লাবিত করিছিলি। আমার লেখক সকলে ইংরাজী সাহিত্যর লগতে তেওঁলোকর

সাহিত্যও তন্নতন্নকৈ অধ্যয়ন করিছিল আরু সেই সাহিত্যর আর্হিত অসমীয়া পুঁথি রচনা করি বলৈ আগ বাঢ়ি ছিল। ইংরাজী রোমান্টিক সাহিত্য দ্বারা যে তেওঁ লোক অনুপ্রাণিত হৈছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যি চালেকি চাই কিন্তু ভাবাদর্শক যি অসমীয়াত রূপ দিলে সেই চানেকি হল সেই সময়র বঙ্গ সাহিত্য। গদ্যত সুসংহত দূরান্বয়ী বাক্য গঠনর রীতি, কবিতার ছন্দ রীতি, আরু উপন্যাস রচনার চানেকি বঙ্গসাহিত্যরপরা অসমীয়া লোক সকলে গ্রহণ করিলে। এই দরেই অরুণোদয় যুগর সাহিত্যর ভাব আরু গঠন-প্রণালী সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত হল। আবার দেশত বঙ্গ ভাষাসাহিত্য প্রচলন নোহোওয়া হঁতেন আরু শিক্ষিত যুবক সকলে কলিকাতাতেও নথকাহেঁতেন অরুণোদয় যুগর ভাষা আরু সাহিত্যর এনে দ্রুত পরিবর্তন হয়তো নহলহেঁতন।"

—অসমীয়া সাহিত্যর সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত (১৯৮১) পৃ. ৩১০।

দেখা যাচ্ছে বিহারীলাল, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের রচনা পাঠে অসমীয়া কবিরা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। সুতরাং তাঁদের রচনায় বঙ্গীয় কবিদের প্রভাব-প্রতিফলিত হওয়া বিচিত্র নয়। তবে ছন্দের ক্ষেত্রে সে সম্ভাবনা কমই মনে হয়। ১৮৮৮-১৯৪০ কাল সীমা অসমীয়া সাহিত্যে প্রধানত গীতিকবিতার যুগ। লক্ষ্মীনাথ বেজ বরুআ, চন্দ্র কুমার আগরওয়ালা, হেমচন্দ্র গোস্বামী, রঘুনাথ চৌধারী, হিতেশ্বর বরবরুআ আদির হাতে অসমীয়া কাব্য বিকশিত হয়ে ওঠে। অসমীয়ায় প্রখ্যাত সাহিত্যপত্র 'জোনাকীর' (১৮৮৯) প্রথম সম্পাদক চন্দ্রকুমার আগরওয়ালাই (১৮৬৭-১৯৩৮) অসমীয়া সাহিত্যে গীতিকবিতার প্রকৃত প্রবর্তক। কবি পদ্মনাথ গোঁহাঞির বরুআ (১৮৭১-১৯৪৫) তাঁর লীলাকাব্যে অমিত্রাক্ষর রচনার জন্য দেবী সরস্বতীর বা কাব্যলক্ষ্মীর কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন এই বলে:

নাজানো পূজার বিধি বন্দনার রীতি
বীণাপাণি বাগ্দেবী চরণ তোমার,
কি রূপে পূজিম হায়, বন্দিম কিমতে
বজোওয়াঁ অনন্ত কাল সঞ্জীবনী বীণা
গহীম ঝোঁকারে তার কঁপাই বনানি
সরাই কত না ফুল কবি-কুল নিত।

—অসমীয়া সাহিত্যর বুরঞ্জী (১৯৫৭) পৃ, ৬৪৪-৪৫

দেখা যাচ্ছে পদ্মনাথ অমিত্রাক্ষরের ভাষাকে ঘরোয়া করে তুলেছেন।

হিতেশ্বর বরবরুআর (১৮৭৬-১৯৩৯) রচনাতেও অমিত্রাক্ষরের এই পরিণতি চোখে পড়ে। তাই ক্রমে ক্রমে ধ্বনির গাম্ভীর্য ও প্রবহমানতা ক্ষীণ হয়ে এসেছে।[৮৬] আবার কবি রঘুনাথ চৌধারীর (১৮৭৯-১৯৬৮) রচনাতে অমিত্রাক্ষর একটু ভিন্ন রঙে প্রযুক্ত। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'কারবালা' ১৯২৪ কাব্যটি উল্লেখযোগ্য। ভাষা অতিমাত্রায় সংস্কৃতগন্ধী হওয়ায় তার স্বাভাবিক সৌন্দর্য ফুটে উঠতে পারে নি। সুতরাং এঁদের রচনায় হেমচন্দ্রের অমিত্রাক্ষর এবং অন্য প্রকারের ছন্দ প্রয়োগের পরিণাম প্রতিফলিত বলা যায়।

কবি চন্দ্রধর বরুআ (১৮৭৪-১৯৬১) কবি নাট্যকার ও হাস্যরসিক লেখক। তিনি গিরিশচন্দ্র ঘোষের অনুসরণে মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের নাট্যরূপ প্রদান করেন ১৯০৪ সালে। তারপর 'ভাগ্য পরীক্ষা' (১৯১৫), 'তিলোত্তমা-সম্ভব' (১৯২৪) ও 'রাজর্ষি' (১৯৩৭) নাটক রচনা করেন। তাঁর একমাত্র প্রকাশিত কবিতারই বই 'রঞ্জন' (১৯২৭)। 'কামরূপ জীয়ারী' ও 'বিদ্যুৎবিকাশ' কাব্যে যথাক্রমে 'সতী বেহুলা' ও 'বৃত্রাসুরবধে'র কাহিনী বর্ণিত। চন্দ্রধর বরুআর নাটক ও কাব্যের ছন্দ অমিত্রাক্ষর নয়, মুক্তকধর্মী। তা গিরিশচন্দ্র ঘোষের গৈরিশ ছন্দের অনুসরণে রচিত। তাঁর এই প্রয়োগ অভিনব এবং সার্থক। তাই কেবল অসমীয়া ছন্দেই নয়, অসমীয়া সাহিত্যেও বরুআ বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। তাঁর ছন্দ সম্পর্কে বিদগ্ধ সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথ শর্মার অভিমত হল—

> "বরুআর এই ছন্দ গিরিশচন্দ্র ঘোষে প্রয়োগ করা গৈরিশীছন্দর অনুরূপ। এই ছন্দত সাবলীল প্রবহমানতা আছে। নাট আরু বর্ণনাত্মক কাব্যর উপযোগী প্রবাহশীল ছন্দর সুপ্রয়োগ বরুআর অসমীয়া সাহিত্যলৈ বিশিষ্ট দান বুলি ক'ব পারি।"
>
> অসমীয়া সাহিত্যর সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত (১৯৮১), পৃ. ৩৩৪।

এযুগের অসমীয়া ছন্দের মিশ্রবৃত্ত রীতিতেই বাঙালি কবি হেম-নবীন প্রমুখের অনুসৃতি লক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে ছান্দসিক মহেন্দ্র বরার অভিমত প্রণিধানযোগ্য—

> "That was the time when Bengali poetry was replete with the crowning achievments of Hemchandra Bandyopadhyay and Nabinchandra Sen. And that was the time when Michael Madhusudan Dutta was a phenomenon by himself in the World of

Bengali Metre. No wonder, that Assamese poets of the time who had had their learning of letters from the famous Bengali primer of Madanmohon Tarkalankar should have felt the spell of these great masters of Bengali metre".

—Fundamentals of Assamese Metre (1977), P. 241.

অসমীয়া সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে অসমীয়া ছন্দকেও অভিনবতামণ্ডিত করে উৎকর্ষদানের তরুণ অসমীয়া কবিদের প্রয়াস যে যুগোচিত এবং সফল হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

সাধারণ কবিরা মিশ্রবৃত্ত পয়ার ত্রিপদী ও চৌপদীর ব্যবহারেই নিজেকে ব্যাপৃত ও সন্তুষ্ট রেখেছিলেন। বাংলা ও আসামের গভীর সম্পর্কসূচক একটি ঘটনার সাক্ষ্যবাহী ত্রিপদীর একটি নিদর্শন :—

কান্দত ভারত আই ছিয়া মোর পুরি যায়,
বিদ্যাসাগরর বিয়োগত।
কি পাপে পাপিনী মই মোহোর মরণ নাই,
যাতনা হে মোর কপালত ॥
যিজনে মোহোর অর্থে ধনে প্রাণে যত্ন করে
যার হস্তে বাঢ়ে মোর আশা।
কোওয়া নিদারুণ বিধি, কিয় তাক হেরুওয়াওঁ,
কিয় মোর এ নুওয়া দুর্দশা ॥
দান্তে তৃণ তুলি লওঁ, তোমাকে কাকুতি করোঁ,
ই দুর্দশা নিদিবা আমাক।
দয়া করা দয়াময়, মই হওঁ নিরাশ্রয়,
কৃপা করা তুমি আমাসাক ॥

—'ভারত বিলাপ' অসমীয়া সাহিত্যর বুরঞ্জী[১৬] (১৯৫৭) পৃ. ৫৯৬।

অসমীয়া সাহিত্যে সংস্কৃত ছন্দ প্রয়োগের প্রবণতা আধুনিক যুগে দেখা যায় নি। সুতরাং এ বিষয়ে আলোচনার অবকাশ নেই।

কলাবৃত্ত রীতির প্রয়োগ নিয়েও এযুগে উল্লেখযোগ্য তেমন প্রয়াস দেখা যায় না। তবে লৌকিক ছন্দ বা দলবৃত্তে কবিতা রচনার প্রয়াস করেছেন কোনো

কোনো কবি। বাংলায় আমরা ঈশ্বর গুপ্ত, মধুসূদন, হেমচন্দ্র প্রমুখের রচনায় দলবৃত্তের প্রয়োগ পেয়েছি—তাঁরা লঘুভাবের কবিতাতেই দলবৃত্তের প্রয়োগ সীমিত রেখেছেন। কিন্তু অসমীয়াতে উনবিংশ শতকের চতুর্থ পাদের প্রারম্ভের দিকেই সাধারণ ভাবের বা তথাকথিত শিশু সাহিত্যের বাহন রূপে দলবৃত্তের প্রয়োগ ঘটেছে দেখা যায়। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার কবি বলিনারায়ণ বরা স্বীয় একক অভিরুচি ও প্রয়াসে এই অভিনব প্রয়োগ করেন। এ পর্যন্ত দলবৃত্ত ছন্দটি শিশুভুলানো ছড়া এবং অনুরূপ জাতীয় রচনায় ছোটো বড়ো পর্ব-পদ ও পঙ্‌ক্তির সাহায্যে রচিত হত—মুখে মুখে, চলতও মুখে-মুখেই। বলিনারায়ণ তাকে সুস্থির সুপরিমিত আধুনিক রূপ দান করেন। 'মৌ'—সাময়িক পত্রে ১৮৮৩ সালে প্রকাশিত তাঁর 'ডাঙরীয়া' কবিতার কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি :—

ডাঙর দীঘল ভূনি মরা মূরত ডাঙর পাগ।
বিয়ায় সভায় ডাঙর চরুত পায় ডাঙর ভাগ॥
ডাঙর জাপীর তলবত যায় ডাঙর পীরাত বহে।
ডাঙর হোকাত ধপাত খায় ডাঙর ডাঙর কাহে॥

—অসমীয়া সাহিত্যর বুরঞ্জী (১৯৫৭), পৃ. ৬২৫।

এই পঙ্‌ক্তি কয়টি বাংলার—'বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর নদেয় এল বান'—ইত্যাদির কথা স্মরণ করায়। পর্ব ভাগ স্পষ্ট। ছড়ার ছন্দের বিশিষ্টতাও লক্ষিত হয়। 'অসমীয়া বাবু' নামক অনুরূপ আর একটি রচনা থেকে চারটি পঙ্‌ক্তি—

লদর পদর ডাঙর দীঘল টেড়ি কাটা চুলি।
নাক খরা তার গোফ পাতল দাড়ি পেলাই তুলি॥
দুই চকু তার পুঁটি মাছ সদাই ধরফর।
খপর পরা ফুটি অলাই মারিব খোজে লর "

—বলিনারায়ণ বরা—'অসমীয়া বাবু'।[৯১]

এখানেও পর্ব, পদ ও পঙ্‌ক্তি বিভাগ স্পষ্ট। তবে ভাব, ভাষা ও ছন্দের বিচারে রচনাটি লৌকিক স্তরেই থেকে গেছে। সুতরাং বাংলায় হেমচন্দ্রের দলবৃত্তের ব্যঙ্গাত্মক কবিতায় প্রয়োগের যে গুরুত্ব কবি বলিনারায়ণ বরাও সেই গুরুত্ব ও কৃতিত্বের অধিকারী। এরীতিটির প্রয়োগ মধ্যযুগের অসমীয়াতেও ছিল। সুতরাং ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে 'ক্ষণিকা' কাব্যে রবীন্দ্রনাথ দলবৃত্তকে যে মর্যাদা দান করেন—অসমীয়াতে তার প্রতীক্ষায় অবসান এখনও হয় নি। এই প্রসঙ্গে কবি

সত্যনাথ বরার 'সভ্যতার মথাউরি' রচনাটিও উল্লেখযোগ্য। তবে দলবৃত্তের স্বরূপ তাতে ফুটে উঠতে পারেনি। তাহলেও সব মিলিয়ে এ-পর্বের অসমীয়া ছন্দে আধুনিকতার আভাস ফুটে উঠেছে সে কথা বলাই বাহুল্য।

মধুসূদন-উত্তর যুগে ওড়িয়া ছন্দ

মধুসূদন দত্তের অনুসরণে রাধানাথ রায়, মধুসূদন রাও, ফকীরমোহন সেনাপতি প্রমুখ কবিগণ ওড়িয়ায় অভিনব ছন্দ ও কবিতা-রূপ প্রবর্তন করেন। মধুসূদনের পরবর্তী বাঙালি কবিদের রচনার সঙ্গে ওড়িয়া কবিদের প্রত্যক্ষ যোগ থাকলেও তাঁরা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হবার মতো কিছু পান নি। তবে কিছু কিছু অভিনবতা লক্ষিত হয় এযুগের ওড়িয়া কবিদের ছন্দ-রচনায়। এবার 'তা দেখা যাক্।

সংস্কৃত ছন্দ

সংস্কৃত ছন্দের বিশেষ প্রয়োগ ওড়িয়া কবিতায় না হলেও এযুগের কয়েকজন কবি এদিকে আকৃষ্ট হয়েছেন বলা যায়। তাঁদের মধ্যে রাধানাথ, মধুসূদন ও ফকীরমোহন প্রমুখ কয়েকজন সংস্কৃত কাব্য ওড়িয়ায় অনুবাদ করেছেন। তাঁদের মৌলিক রচনাতেও কদাচিৎ সংস্কৃতের অনুবাদ অনুপ্রবিষ্ট—দেখা যায়। মধুসূদন রাও তাঁর 'সঙ্গীতমালা' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন—

> "সঙ্গীতমালার প্রায় সমস্ত সঙ্গীত ওড়িয়া ও বঙ্গলা রাগিণীরে রচিত। কেবল তিনোটি সংস্কৃত ছন্দরে এবং তিনোটি সৌরাষ্ট্র অঞ্চলর বন্দনার অনুকরণরে লিখিত। বঙ্গীয় সঙ্গীত লেখক মানে অন্যান্য ভাষায় রাগিণী বৃত্ত প্রভৃতি গ্রহণ করি তদনুসারে নিজ ভাষারে সঙ্গীত রচনা করুথিবা স্থলে, মু, আশা করে যে ওড়িয়া ভাষারে অন্য ভাষায় রাগিণী

সংস্থষ্ট সঙ্গীত লেখিবা দোষাবহ বোলি বিবেচিত হেব নাহিঁ।”

—নিবেদন, সঙ্গীতমালা।

মধুসূদন সংস্কৃত ছন্দেও যে কবিতা রচনা করেন তা ভগদ্‌বিষয়ক। তাঁর সঙ্গীতমালায় অনুষ্টুপ, ভুজঙ্গপ্রয়াত, প্রগ্ধরা প্রভৃতি সংস্কৃত ছন্দ ব্যবহার করেছেন। কবি মণিচরণ মহাপাত্র (১৮৫৭-১৯২০) প্রমুখ কবিরা তাঁদের রচনায় নবীন যুগের উপযোগী নানা আঙ্গিক গ্রহণ করলেও প্রাচীন কাব্যের কিছু কিছু বিশিষ্টতা ছাড়তে পারেননি॥ যেমন—ছন্দোরীতি, সঙ্গীতমাধুরী ও ধর্মচেতনা। তাঁর ‘ব্রজবন্ধু বিরহ’ কাব্যেই তার প্রমাণ মেলে। রচনাটি মধুসূদনের ‘ব্রজাঙ্গনা’ কাব্যের কথা মনে করায়। ওড়িয়ার মাঝে মাঝে সংস্কৃত ছন্দের রূপ, রস এনে বৈচিত্র্য সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন কবি। পণ্ডিত গোপীনাথ নন্দ শর্মা সংস্কৃত মন্দাক্রান্তায় মেঘদূত অনুবাদের চেষ্টা করেছেন। এমন কি নীলকণ্ঠ দাসও সংস্কৃত ছন্দে কবিতা রচনার পরীক্ষা করেছেন। কিন্তু এ-সব প্রয়াস ফলপ্রসূ হয়নি, কারণ সংস্কৃতের দীর্ঘ-হ্রস্ব উচ্চারণ ওড়িয়ায় বসে না।—“ওড়িআকু সংস্কৃত রীতিতে উচ্চারণ কলে তাহা কৃত্রিম ও হাস্যকর হোই পড়ে।” তাই “সংস্কৃতানুসারী ছন্দ ওড়িআরে যে পরিকৃত্রিম সেহি পরি অনাবশ্যক।”[৯৮]

কলাবৃত্ত ও দলবৃত্ত রীতিব বিশেষ প্রয়োগের সম্ভাবনা ছিল না ওড়িয়া গীতি-কবিতায়। এমন কি ঢগ-ঢমালি লোকগীতেও[৯৯] মাঝে মধ্যে সংস্কৃত ছন্দের ব্যবহার ঘটেছে। ওড়িয়া সংস্কৃত মাত্রাবৃত্ত ব্যবহারের প্রয়াসী প্রাচীন কবিদের মধ্যে দেবদুর্লভ দাসের (ষোড়শ-সপ্তদশ শতক) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর ‘রহস্যমঞ্জরী’ কাব্য থেকে সংস্কৃত মাত্রাবৃত্তের দৃষ্টান্ত :—

চরণে অরুণ রাজে
কনক নূপুর সাজে
কটি কিঙ্‌কিণী ঘন্টি ঠণ ঠণ
কঙ্‌কণ ঝংক বাজে।

—রহস্যমঞ্জরী-১০ম ছান্দ।

এখানে এগার মাত্রার একপদী ও পঁচিশ মাত্রার দ্বিপদীর উচ্চারণগত আড়ষ্টতা সুস্পষ্ট। অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগের কবি দাশরথি দাসের ‘ব্রজবিহার’ ও শেষ ভাগের কবি ব্রজনাথ বড়জেনার ‘চতুর বিনোদ’ কাব্যেও সংস্কৃত ছন্দের ব্যবহার ঘটেছে। যেমন—

(১) উজ্জ্বল নীলমণি মঞ্জুল মৃদুল তনু সুন্দর
যুবতী কুল ধীর সাগর মন্থনে কি এ মন্দর
ব্রজ ঈশ্বর বয় কিশোর পসোর ন যাই মনু
মূর্তি মধুর গুণ গম্ভীর গোকুল সুন্দর কাহ্নু ॥
—ব্রজবিহার, ৭ম বোলি।

(২) অষ্টচণ্ডী করালী চ চামুণ্ডা ভদ্রকালিকা
খাই বংশ তোর তুচ্ছা করন্তু নিজ মন্দিরং
সন্নিপাত ত্রিদোষঞ্চ উদরী গ্রহণী হৃগা
তালুকা কামল ব্যাধি খাই সর্বে সুখী হুঅ।
—চতুর বিনোদ, পৃ. ১৮।

কবিদের প্রয়াস উল্লেখনীয় হলেও সার্থকতা আসেনি। তবে হাস্যরস সৃষ্টির কথা স্বতন্ত্র।

যাই হোক বনমালী, গোপালকৃষ্ণ, কবিসূর্য, গৌরহরি ও হরিবন্ধু প্রভৃতি বৈষ্ণব-কবিদের রচনাতেও মাঝে মাঝে সংস্কৃত ছন্দ অনুসরণের প্রয়াস সুস্পষ্ট। দেখা যাচ্ছে ওড়িয়ার বৈষ্ণব কবিদের রচনাতেই সংস্কৃত মাত্রাবৃত্ত প্রযুক্ত হয়েছে। ভক্তিগীতিকে সংস্কৃত শব্দ ও ছন্দে মধুর সুললিত করার প্রয়াসেই তাঁদের এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা। তবে তাতে প্রত্যাশিত সার্থকতা আসেনি। কতকটা বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রয়াস রূপেই তাঁদের কৃতি স্মরণীয়।[১০০] 'চউপদী ওড়িয়া' সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট রচনা। 'চতুষ্পদী' শ্লোক থেকে এই চৌপদী রচনা এসেছে মনে হয়। সংস্কৃত ছন্দেও ওড়িয়া চউপদী রচিত হয়েছে তবে তা খুবই কম। পদ্মনাথ পট্টনায়ক রচিত 'নায়িকা রূপ প্রশস্তিমূলক গীতের' উল্লেখ করা যায় এ প্রসঙ্গে। একটি দৃষ্টান্ত—

প্রীতি কুন্দনারে······
দলিত কজ্জল জলদ মঞ্জুল কেশপাশ সুশোভন
কনক কেতক কান্তি নিন্দক গাত্র মানস-মোহন।
—ওড়িআ লোকগীত কাব্য সংকলন, ১ম ভাগ।

দীনবন্ধু রাজ হরিচন্দন রচিত রাধাকৃষ্ণ, চৈতন্যদেব ও তাঁর পরিকরদের বিষয়ে বহু ভক্তিগীতে সংস্কৃত ছন্দের অনুসৃতি ঘটেছে। নারায়ণবন্ধু পট্টনায়কের 'হোরিখেলা' বিষয়ক পদেও তা লক্ষণীয়।

ঊনবিংশ শতকের কিছু কবির রচনাতেও সংস্কৃত ছন্দের অনুসৃতি ঘটেছে। বিশেষ করে ওড়িষায় দক্ষিণ অঞ্চলের কবিদের রচনায় তা সুস্পষ্ট। তাঁদের মধ্যে কবিচন্দ্র রঘুনাথ পরিচ্ছার নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'গোপীনাথ বল্লভ' নাটকে (১৮৬৮) বিভিন্ন ওড়িয়া বৃত্তের গানের সঙ্গে সংস্কৃত ছন্দের রচনাও মেলে। তাঁর রচিত 'বসন্ততিলকা' ছন্দের একটি উদাহরণ—

কুঞ্জালয়ে বসন ভূষণ নাগবল্লী কর্পূর পুষ্প তল পাদি বিতান সাজি
জ্বালি প্রদীপ বসি বর্ত্মানি চাহিঁ চাহিঁ কৃষ্ণাসি কলস সুভাষিত ভাষী রাধা॥

—গোপীনাথ বল্লভ নাটক, পৃ. ১৯।

এইভাবে নানা কবির রচনায়—মালিনী, স্রগ্ধরা, মন্দাক্রান্তা, শিখরিণী, ইন্দ্রবজ্রা, উপেন্দ্রবজ্রা, তোটক, ভুজঙ্গপ্রয়াত, শার্দূলবিক্রীড়িত প্রভৃতি সংস্কৃত ছন্দের প্রয়োগ মেলে। তবে ওড়িয়া উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গতিপন্ন না হওয়ায় তা সহজ ও স্বাভাবিক এবং সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে উঠতে পারেনি। অবশ্য 'তোটক' প্রভৃতি কোনো কোনো সংস্কৃত ছন্দ ওড়িয়ায় অনুকূল বলে কেউ কেউ মনে করেন।[১০১] তোটক নাকি 'কলহংস কেদার' বৃত্তের মতো পড়া যায় সহজ ও সাবলীল ভঙ্গিতে। কিন্তু আসলে তা নয়। যেমন—

অতি তপ্ত দিনে পড়িলা অবনী
বঢ়িলা দিন যে খসিলা রজনী,
জনমানস চামর চন্দনরে
বড় আদর সাগর সেচন রে।

—বলরাম দাস-'নিদাঘ'।

লক্ষ করলে বোঝা যায় দীর্ঘ স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ করে এ-রচনা পড়া যায় না। আর তা না করলে সংস্কৃত বৃত্ত বলে গণ্যও করা যায় না। অনুরূপভাবে পণ্ডিত গোপীনাথ নন্দের মন্দাক্রান্তা বা স্রগ্ধরা ছন্দের রচনাও আকর্ষণ শূন্য। তাই বলা যায়-বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রয়াসী কবিদের উদ্যম সুফলপ্রসূ হয়নি।[১০২] সে যাইহোক কবি গঙ্গাধর মেহের (১৮৬২-১৯২৪) শার্দূল বিক্রীড়িত ছন্দে 'অহল্যাস্তব' (১৮৯১) রচনা করেন—সে কথাও এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

কলাবৃত্ত রীতি (Moric Style)

ওড়িয়া কবিতার একমাত্র বাহন দাণ্ডিবৃত্ত বা মিশ্র কলাবৃত্ত। সংস্কৃত মাত্রাবৃ ের প্রয়োগ ওড়িয়ার স্বাভাবিক উচ্চারণ সম্মত না হওয়া সত্ত্বেও কোনো কোনো কবি তার সাহায্যে ওড়িয়া কবিতায় বৈচিত্র্য আনতে প্রয়াসী হয়েছেন। তবে আধুনিক কলাবৃত্ত বা সেজাতীয় কোনো ছন্দের প্রয়োগ ওড়িয়াতে ছিল না। ফকীরমোহন, রাধানাথ ও মধুসূদন রাওকে কেন্দ্র করে ওড়িয়া সাহিত্যে যে নবীন চেতনা দেখা দেয় তার প্রভাব ওড়িয়া ছন্দেও পড়ে। তাই কবিতা গেয়ধর্মিতা থেকে মুক্ত হয়ে পাঠ্যধর্মী হয়ে ওঠে। 'অক্ষরগুণে' ছন্দ নিরূপণের যান্ত্রিক নিয়মের নির্ভরতায় আস্থা টলে ওঠে। তাই চোখকে নয়, কানকে বিচারক রূপে খাড়া করার দিকে চিন্তা যায়। কোনো কোনো কবি সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যের অনুসরণে মাত্রাবৃত্ত বা কলাবৃত্তের নিয়ম অনুসরণে কবিতা রচনায় প্রয়াসী হন। এই প্রসঙ্গে মধুসূদন রাওয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি সংস্কৃত মাত্রাবৃত্তে ওড়িয়া কবিতা লিখতে প্রয়াসী হয়ে মাঝে মাঝে মাত্রাবৃত্তের নিয়মে ব্যতিক্রম ঘটিয়েছেন। অর্থাৎ মাঝে মাঝে ওড়িয়া উচ্চারণ সম্মত প্রয়োগ করে বসেছেন। এই প্রয়োগকে আমরা 'ভাঙা মাত্রাবৃত্ত' বা 'ভগ্ন কলাবৃত্ত' বলতে পারি। মধুসূদন-চার, পাঁচ ছয় ও সাত মাত্রার পর্ব রচনা করেছেন। ওড়িয়া কবিতায় এ-জাতীয় প্রয়োগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যেমন—

(১) ভারত অন্তর দীপিত কর তব কিরণে
অমৃত সম্পদ তব বর চরণে
নিত্য ভারত তব ধ্রুবসত্য গগনে
জয় জয় ভারতী দেবি।
—ভারতী বন্দনা।

এই মহা চৌপদীর প্রথম তিন পদে ৪+৪+৪+৪+৪=২০ মাত্রা এবং চতুর্থ পদে ৪+৪+৩=১১ মাত্রা বিন্যস্ত। তবে তৃতীয় পদের চতুর্থ পর্বে 'ধ্রুব সত্য'-পাঁচ মাত্রা হয়েছে। 'সত্য'-এর উচ্চারণ মৃদু করে সঙ্গতি রক্ষা করতে হবে।

(২) জয় দেবি। জন্মভূমি কীর্তি কিরীট ধারিণী,
বন্দে দেবি! আশাময়ী নিগূঢ় শক্তি শালিনী।
—উৎকল গাথা: 'জয়গান'।

এখানে ৫+৬॥ ৬+৫=২২ মাত্রা বিন্যস্ত। 'বন্দে দেবি'র প্রথম 'দে' হ্রস্ব উচ্চারিত হবে। এটি একপ্রকারের দ্বিপদী বন্ধ।

(৩) এ প্রাণ অর্পই চরণে তোহর যেন মা প্রাণদায়িনী।
দে মা শক্তি দে মা বীর্য সর্ব কল্যাণ রূপিণী॥
—পূর্ববৎ।

এখানে ৭+৭॥ ৭+৫=২৬ মাত্রার দ্বিপদী পঙ্ক্তি রচিত। 'এ', 'তো', 'য',-স্থলে এই তিন দীর্ঘস্বরের উচ্চারণ হ্রস্ব।

মধুসূদন রাওয়ের এই প্রয়াস বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সে কথা উল্লেখ করে নটবর সামন্ত রায় বলেছেন—

"মাত্রিক ছন্দ ওড়িয়া সাহিত্যরে নূতন কহিলে চলে।···
আধুনিক ওড়িআ কবিতার ইতিহাসরে মধুসূদন হেউছন্তি এ ক্ষেত্ররে প্রথম কলাকার। তাঙ্কর এই প্রাথমিক উদ্যম হেতু সে ছন্দর নির্ভুল পরীক্ষা সর্বত্র তাঙ্ক সাহিত্যরে আশা করা যাই ন পারে।···কিন্তু আধুনিক কবিতারে কানর যে এক প্রধান ভূমিকা অছি তাহা সে উপলব্ধি করি থিবার স্পষ্টতঃ অনুভূত হুএ।···প্রায় ১৯১০ সাল পর্যন্ত কোণসি গীতিকার ছন্দ দৃষ্টিরু মধুসূদনংক ঠারু বিশেষ অধিক অগ্রসর হোই পারি থিলে বোলি অময় বিশ্বাস হেউ নাহি।"
—ওড়িআ সাহিত্যর সমীক্ষা ও সংগ্রহ (১৯৭৭) পৃ. ১১০-১১৪।

মিশ্রবৃত্ত রীতি (Mixed Moric Style)

কবি গঙ্গাধর মেহের (১৮৬২-১৯২৪), চিন্তামণি মহান্তি (১৮৬৭-১৯৪৩), পদ্মচরণ পট্টনায়ক (১৮৮৫-১৯৫৬), নন্দকিশোর বল (১৮৭৫-১৯২৮), গোবিন্দরথ (১৮৪৮-১৯১৮) প্রমুখ ওড়িয়া কবিগণ কাব্য রচনায় রাধানাথ রায়ের অনুসরণে প্রয়াসী হয়েছেন। তবে তাঁদের রচনায় প্রাচীন ও আধুনিক উভয়বিধ ছন্দই

পাওয়া যায়। মিশ্রবৃত্তের প্রয়োগে তাঁরা কোনো নতুনত্ব আনতে পারেন নি। মিশ্রবৃত্তের একটি উদাহরণ দেখলেই তা বোঝা যাবে—

মঙ্গলে আইলা উষা　　　　বিকচ রাজীব দৃশ্য
জানকী দর্শন তৃষা হৃদয়ে রহি,
কর পল্লবে নীহার　　　　মুক্তা ধরি উপহার
সতীংক বাস-বাহার প্রাঙ্গণে রহি,
কলাকণ্ঠ কণ্ঠে কহিলা
দরশন দিঅ সতী, রাতি পাহিলা

—গধাধর মোহর, তপস্বিনী।

লক্ষণীয় ৮ ॥ ৮ ॥ ১৪=৩০ মাত্রার দুইটি ত্রিপদী পঙ্‌ক্তির সঙ্গে ৯ মাত্রার একটি একপদী ও ১৩ (৮ ॥ ৫) মাত্রার একটি দ্বিপদী বন্ধের সমবায়ে গঠিত স্তবকটির বৈচিত্র্য।

সাধারণভাবে একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদী পঙ্‌ক্তি রচনা করেছেন এ-যুগের কবিরা। অমিত্রাক্ষর বা প্রবহমান অমিল পয়ারের প্রয়োগ খুবই কম। তবে নাট্যকার রামশংকর রায় (১৮৫৮-১৯১৭) ও ভিকারীচরণ পট্টনায়ক (১৮৭৮-১৯৬১) নাটককে অমিত্রাক্ষর প্রয়োগের সফল পরীক্ষা করেছেন। রামশংকরের 'কাঞ্চি কাবেরী' (১৮৮০) ও 'চৈতন্যলীলা' (১৯০৬) এবং ভিকারীচরণের 'কটক বিজয়' (১৯০১) নাটক এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কাঞ্চি কাবেরীতে নাটকীয় স্পন্দন সৃষ্টির ক্ষেত্রে সংলাপ অমিত্রাক্ষরে রচিত। ভিকারীচরণের নাটকের সংলাপও অমিত্রাক্ষরে রচিত। পরবর্তীকালে গীতিনাট্যেও মুক্তকধর্মী বন্ধে সংলাপ সৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায়। রাধামোহন গড়নায়কের (১৯১১—) 'কালিদাস' থেকে একটু অংশ :—

"বৎস মোর, ভক্ত মোর ভুলিনাহুঁ মোতে
প্রীত মুহিঁ হোইছি তো পরে,
বহি খিলি যেউ বীণা এই মোর করে
দেউঅছি তোতে আজি যোগ্য যেণু তুহি
নেই এহা বজাঅ মধুরে মুগ্ধ হেউ নিখিল জগত
তোর সেহি বীণার ঝংকারে। —'কালিদাস' (গীতিনাট্য ।

রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি' প্রতিভা' এবং অন্য গীতিনাট্যের কোনো কোনটির অংশবিশেষের সঙ্গে তুলনীয়।

দলবৃত্ত রীতি (Syllabie Ttyle)

ওড়িআ লোক-সাহিত্যে যে-সব ছন্দের প্রয়োগ হয়েছে তা 'ঢগঢমালিবৃত্ত' রূপে পরিচিত। এই ছন্দটির উচ্চারণ প্রবণতা অনেকটা মিশ্রবৃত্তের মতোই। তাই এই লৌকিক ছন্দটিকে দাণ্ডিবৃত্ত বা মিশ্রবৃত্তের একটি রূপ বলে মনে করা হয়। তা হলেও ওড়িয়া লোক-গীতি ছন্দ যেমন মিশ্রবৃত্ত ভিত্তিক তেমনি দলবৃত্ত ভিত্তিক—দুই প্রকারেরই পাওয়া যায়।

আলোচ্য যুগের পল্লীকবি নন্দকিশোর বলের পল্লীর জীবন, পল্লীর প্রকৃতি ও শিশুজীবন ভিত্তিক রচনায় এই উভয় প্রকার ছন্দেরই প্রয়োগ মেলে। তাঁর ছন্দ প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচক নটবর সামন্ত রায় বলেছেন—

> "কাব্য ও অন্যান্য ক্ষুদ্র কবিতারে নন্দকিশোর এদেশ সাহিত্যর পারম্পরিক ছন্দ অনুসরণ করি থিলেহেঁ কিন্তু সঙ্গীতর কেতেক স্থলরে সে বাক্‌ছন্দর প্রয়োগ করি ওড়িআ কবিতার অন্তঃস্বররে এক নূতন স্বাদর দিগন্ত উন্মোচন করি দেইছন্তি। অক্ষর সংখ্যা গণনা উপরে ওড়িয়া প্রাচীন ছন্দ প্রতিষ্ঠিত। এথিরে আম শব্দগত উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য কৌনসি মান্যতা লাভ করি ন থিলা। আঁখিরে অক্ষর সংখ্যা গণনা করি কানরে ধ্বনি-সৌন্দর্য অনুভব করিবাকু হেলে শব্দর উচ্চারণ রীতি মান্যতা পাইবাকু বাধ্য।··· অক্ষর অসামানতা থিলে মুদ্ধা উচ্চারণ বেলে সে সবু কেবে শ্রুতি কটুকর বোলি অনুভূত হুঅন্তি নাহিঁ। নন্দকিশোরংক ছন্দর এপরি নূতন পরীক্ষা পরবর্তী সময়র ওড়িআ সাহিত্যরে অনুসৃত হোই থিবার দেখিবাকু মিলে নাহিঁ।"
>
> —ওড়িআ সাহিত্যরে সমীক্ষা ও সংগ্রহ (১৯৭৭), পৃ. ২২৩।

নন্দকিশোর বল যে নতুন ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা করেন তার হুবহু অনুসৃতি পরবর্তীকালে লক্ষিত হয় না, কিন্তু সেরূপ প্রয়োগের প্রবণতা লোপ পেয়ে গেছে —এমন নয়। তাই উচ্চারণ-আশ্রিত যে নতুন ছন্দ তিনি প্রয়োগ করেন তারই পরিমার্জিত ও সংস্কৃত রূপের পারিভাষিক নাম দেওয়া যায় দলবৃত্ত। যেমন—

হেই চালিযা। উপরকু ।। হেই চালিযা। তল। I ১৬ বর্ণ
দোলি খেল। খেল ধন ।। বাড়ি যিব। বল ।। I ১৪ „

দোল দোল। ধনমণি॥ পাখে আচ্ছন্তি। মা। I ১৪ „
যা চালি যা। উপরকু॥ আ পাখ কু। অ॥ I ১৩ „

এই চার পঙ্‌ক্তির বর্ণ সংখ্যা যথাক্রমে ১৬, ১৪, ১৪, ও ১৩। আর দল-সংখ্যা যথাক্রমে ১৪, ১৪, ১২, ও ১৩। প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি চোদ্দ দলমাত্রার পয়ার বন্ধ আর পরের দুই পঙ্‌ক্তি তের দলমাত্রার উন পয়ার। লক্ষণীয় 'হেই'-একটি রুদ্ধদল রূপে উচ্চারিত এবং একদল মাত্রার। আর 'অচ্ছন্তি' শব্দটি রূপে উচ্চার্য ও দ্বিদলমাত্রক। এইভাবে পড়লে কানে লাগে না। আর একটু-আধটু লাগলেও তাতে পাঠে বৈচিত্র্য আসে। বলতে কি ওড়িয়াতে দলবৃত্তের যাত্রা শুরু এখান থেকেই, নন্দকিশোর বলের রচনা থেকেই। এই প্রসঙ্গে তাঁর পল্লীচিত্র, নির্ঝরিণী', 'বসন্ত কোকিল', 'তরঙ্গিণী', 'চারুচিত্র', 'নির্মাল্য', 'প্রভাতসঙ্গীত' ও 'নানাবায়া গীত' প্রভৃতি রচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দেখা যাচ্ছে দলবৃত্ত ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বাংলা, অসমীয়া এবং ওড়িয়া ভাষার কবিরা করেছেন। তবে তার স্বরূপ নির্ধারণ এবং ব্যাপক প্রয়োগে কেউ তেমন আগ্রহের ছাপ রাখেন নি।

মধুসূদন উত্তর-যুগে হিন্দী ছন্দ

মধুসূদন ও তাঁর পরবর্তী বাঙালি কবিদের সমকালীন হিন্দী কবিতায় সাধারণ ভাবে মধ্যযুগের হিন্দী ছন্দের ধারাই অনুসৃত হয়েছে। অবশ্য যুগের অনুকূল কিছু কিছু পরিবর্তনও ঘটেছে। সাধারণভাবে সংস্কৃত বর্ণবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তের (কলাবৃত্তের) প্রয়োগ যেমন হয়েছে, তেমনি কোনো কোনো কবি কিছু কিছু নবীন প্রয়োগের চেষ্টাও করেছেন। সব মিলিয়ে প্রয়োগের সীমা তেমন উল্লেখযোগ্যভাবে অতিক্রান্ত হয়নি। মধুসূদন প্রবর্তিত নতুন ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা যে চলছিল সে কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। সুতরাং আলোচ্য যুগের হিন্দী ছন্দ নিয়ে স্বতন্ত্র আলোচনার অবকাশ কম। তাই এযুগের বাংলা, অসমীয়া এবং ওড়িয়া ছন্দের সঙ্গে হিন্দী ছন্দের কোনো সাম্য পাওয়া সম্ভব কি না-তা দেখার চেষ্টা করা যেতে পারে।

কিছুটা বিলম্বে হলেও মধুসূদনের ছন্দ-প্রতিভা সহজেই ভারতের বিভিন্ন

ভাষা-ভাষী সাহিত্যানুরাগীদের কান-মনকে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়েছিল। প্রতিবেশী ভাষার কবিতায় মধুসূদনের ছন্দ কতখানি স্বীকৃতি লাভ করেছিল তা আমরা দেখেছি। মধুসূদন পরবর্তী কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও নবীনচন্দ্র সেনের ছন্দ রচনায় এমন কোনো বিশিষ্টতা ও আকর্ষণ ছিল না যা হিন্দীর মতো প্রতিবেশী সাহিত্যের ছন্দ-শিল্পকে সমৃদ্ধ হতে সাহায্য করতে পারে। আসলে এই কবিরা সে রূপ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না। তাই হিন্দী ছন্দে তাঁদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব পড়ার সুযোগ ছিল কম। তবে হিন্দী কবি মৈথিলীশরণ গুপ্ত 'মধুপ' ছদ্মনামে নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের হিন্দী অনুবাদ করেন ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি নবীন সেনের মিশ্রবৃত্তের প্রবহমান পয়ার ও ত্রিপদী সমবায়ে দশ পঙ্‌ক্তির অনুচ্ছেদ অনুসরণ না করে দশ, আট ও ছয় পঙ্‌ক্তির স্তবক রচনা করেছেন এবং কাব্যের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। অনূদিত কাব্যের প্রথম সর্গটি পনের মাত্রার মিশ্রবৃত্ত পঙ্‌ক্তিতে রচিত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্গ কলাবৃত্ত রীতির 'দিগ্‌পাল' ও 'রাধিকা' এবং চতুর্থ-পঞ্চম সর্গ কলাবৃত্ত রীতিরই সরসী বন্ধে রচিত। বলা যায় অনুবাদে হিন্দী ছন্দেরই অনুসৃতি ঘটেছে। হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' কাব্যও মৈথিলীশরণ অনুবাদ করেন ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে। তার ছন্দের বিষয়ে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের কোনো কোনো রচনায় হেমচন্দ্রের প্রভাব অনুভূত হয়। তবে ছন্দের বিচারে সে কথা বলা যায় না। হিন্দীতে পয়ার ছন্দ প্রয়োগের কথা তো পূর্বেই বলা হয়েছে। গিরিশচন্দ্র ঘোষের মুক্তক ও 'গৈরিশছন্দ' হিন্দী নাট্য সাহিত্য ও কাব্যে কোনো সুস্পষ্ট প্রভাব না ফেললেও গিরিশচন্দ্র হিন্দী সাহিত্যে পুরোপুরি অপরিচিত ও অচর্চিত ছিলেন না। এ-প্রসঙ্গে কবি সূর্যকান্ত ত্রিপাঠি নিরালার একটি উক্তিই এস্থলে পর্যাপ্ত হবে। এই নিরালাই হিন্দীতে 'মুক্তক' বা 'রবড় ছন্দ' প্রবর্তন করেন। তিনি বাংলায় অমিত্রাক্ষর ও মুক্তক রচয়িতা রূপে যথাক্রমে মধুসূদন এবং গিরিশচন্দ্রের নাম সশ্রদ্ধচিত্তে উল্লেখ করেছেন তাঁর 'পরিমল কাব্য গ্রন্থটির (১৯২৯) ভূমিকায়। লিখেছেন—

> "বাংলার মধুসূদন দত্ত অতুকান্ত (অমিত্রাক্ষর) কবিতা প্রবর্তন করার পর নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র তাঁর স্বচ্ছন্দ ছন্দের [মুক্তকের] প্রয়োগ নাটকেই করেছিলেন।"
>
> —পরিমল, (১৯৫০, ২য় সং) ভূমিকা, পৃ ২৩।

তাঁর নিরালা কাব্যে মুক্তকের প্রয়োগ তো করেনই, নাটকের সংলাপও রচনা করেন এই অভিনব ছন্দোবন্ধে। কলকাতাতেই তাঁর রচিত নাটকটি মঞ্চস্থও হয়। সুতরাং নিরালার মুক্তক রচনায় গিরিশচন্দ্রের অনুপ্রেরণার কথা অবশ্য স্বীকার্য। পরবর্তীকালে হিন্দী কবি ও নাট্যকারদের কেউ কেউ এই প্রয়োগের দ্বারা প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন—সে কথা বলাই বাহুল্য।

এই যুগের কোনো কোনো কবি, বিশেষভাবে ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র এবং বদরীনারায়ণ চৌধুরী 'প্রেমঘন' (১৮৫৫-১৯১৩) প্রমুখের রচনায় 'লাবনী' বা 'কজরী' (কজলী) জাতীয় লৌকিক গীতি ও ছন্দ প্রয়োগের সূচনা চোখে পড়ে। 'লাবনী' ও 'কজরী'—লোকগীতির রূপ দুইটির ছন্দ আপাতভাবে কলাবৃত্তের মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা লৌকিক বা দলবৃত্তই। পর্বভাগ, তাল এবং উচ্চারণ ভঙ্গির বিবেচনায় তাই মনে হয়। পরবর্তীকালে এই প্রবণতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং লৌকিক ছন্দের আগে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

আলোচ্য যুগে বাংলায় লৌকিক ছন্দ বা দলবৃত্তের প্রয়োগ হাল্‌কা ভাবের রচনায় শুরু হয়েছে—যদিও ব্যাপকভাবে নয়। অসমীয়াতেও তাই। ওড়িয়াতে সাধুসাহিত্যের জগতে লৌকিক ছন্দকে নিয়ে কারো মনে কোনোপ্রকার চিন্তা-ভাবনাই ছিল না, প্রয়োগের কথা বলাই বাহুল্য। আর হিন্দীতে তার সূচনা মাত্র ঘটেছে। এক্ষেত্রে বাংলা ও অসমীয়াই ওড়িয়া ও হিন্দীর পথপ্রদর্শকের ভূমিকা নিয়েছে সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

উল্লেখ পঞ্জী

১। "অপভ্রংশ মেঁ আকর দীর্ঘ অক্ষর কো হ্রস্ব তথা হ্রস্ব কো দীর্ঘ বনা দেনে কী প্রবৃত্তি প্রমুখ ছন্দোগত বিশেষতা বন বৈঠী হৈ। অপভ্রংশ ছন্দোঁকে মূলতঃ লোকগীতোঁ কী গেয় প্রবৃত্তি সে প্রভাবিত হোনেকে কারণ উনমেঁ অক্ষর কী ব্যাকরণিক হ্রস্বতা য়া দীর্ঘতা কা ইতনা মহত্ব নহীঁ হৈ জিতনা উসকী উচ্চারণগত হ্রস্বতা য়া দীর্ঘতা কা।"

—ভোলাশংকর ব্যাস : প্রাকৃত পৈঙ্গলম্-২ (১৯৬২), পৃ. ৩০৫।

২। (ক) It is in these Caryas that we come across certain verse-forms, more or less in an unstable state, which unmistakably, contained the germs of all the principal forms of the earliest Assamese metre. Besides, it is in these Caryas that we get the evidence of the earliest manifestation of certain basic principles of the future Assamese metre".

—M. Bora : Fundamentals of Assamese Metre (1977). P. 166.

(খ) "চর্যা গুড়ি করে সংস্কৃত জাতি ছন্দ অনুসৃত...হোই অছি। এহাহিঁ প্রকৃতরে ওড়িআ ছন্দর মূল ভিত্তি।"

—জানকীবল্লভ মহান্তি : ওড়িআ ছন্দর বিকাশ (১৯৬১), পৃ. ১৩।

৩। Suniti Kumar Chatterjee: The Origin and Developmept of the Bengali Language (Vol. 1) 1926 PP. 106-7.

৪। Do PP. 107-09.

৫। (ক) "প্রবচন, চৌতিশা ও কোইলির কথা বাদ দিয়া, সারলা দাসের মহাভারত (চতুর্দশ শতক) কে নিঃসন্দেহে ওড়িয়া সাহিত্যের প্রথম জয় স্তম্ভ বলা যাইতে পারে।"

—প্রিয়রঞ্জন সেন : ওড়িয়া সাহিত্য, পৃ. ১৩।

(খ) "প্রথমতঃ বৌদ্ধগান বা দোহা, দ্বিতীয়তঃ শূন্যপুরাণ, আরু তৃতীয়তঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, অসমীয়া-বাঙলা ভাষার এই তিনটিয়েই থাই খাপ সন্দেহ নাই।"

—ডিম্বেশ্বর নেওগ : অসমীয়া সাহিত্যর বুরঞ্জী (১৯৫৭), পৃ. ১৫৭।

৬। ডিম্বেশ্বর নেওগ : অসমীয়া সাহিত্যর বুরঞ্জী (১৯৫৭), পৃ. ১৬৮, ১৭২-১৭৩।

৭। "To speak history, it is the archaic varient, which gave rise to modern Assamese morric style of the rigid variety."

—M. Bora, Fundamentals of Assamese Metre (1977), P. 80.

৮। M. Bora : Fundamentals of Assamese Metre (1977) P. 182.

৯। Do. P. 192.

১০। ডিম্বেশ্বর নেওগ : অসমীয়া সাহিত্যর বুরঞ্জী (১৯৫৭) পৃ. ৬৭৬-৭৭।

১১। M. Bora Fundamentals of Assamese Metre (1977) P. 233.

১২-১৬। M. Bora : Fundamentals of Assamese Metre Pp. 226-281.

১৭-১৮। শ্রীশ্যামসুন্দর ধীর : 'উৎকল সঙ্গীত পদ্ধতি' (১৯৬৪), পৃ. ৩৩৯।

১৯। পূর্ববৎ, পৃ. ৩৪৭।

২০। দ্র. জানকীবল্লভ মহান্তি : ওড়িআ ছন্দর বিকাশ (১৯৬১), পৃ. ৩৪।

২১। দ্র. লেখকের 'আধুনিক ওড়িয়া ছন্দ' (১৯৮০), পৃ. ৩৬-৫২।

২২। দ্র. নটবর সামন্ত রায় : 'আধুনিক ওড়িআ সাহিত্যর ভিত্তিভূমি' (১৯৬৪), পৃ. ১৬৩-৮১।

২৩। (ক) অনিয়মিত অক্ষর বিশিষ্ট থিবা পদ্যাবলীকু 'দাণ্ডিবৃত্ত' কহন্তি"।

—শ্রীশ্যামসুন্দর ধীর, 'উৎকল সঙ্গীত পদ্ধতি' (১৯৬৪) পৃ. ৩৪৬।

(খ) "পাদর অক্ষর অসমানতা বা অস্থির রূপ হেউচি অক্ষর-প্রধান

ওড়িআ কবিতার আদি ছন্দ। এ ছন্দ দাণ্ডিবৃত্ত নামরে সর্বত্র পরিচিত।"
—নটবর সামন্ত রায়ঃ "মু কি পরি গবেষণা কলি' পৃ. ১০০।

২৪। (ক) F. E. Key: Hindi Literature (1920), Pp. 101-63.
(খ) M. Bora: Fundamentals of Assamese Metre (1977), pp. 218.
(গ) রবীন্দ্রনাথঃ ছন্দ (১৯৭৫), পৃ. ৫৬।

২৫। রামবহাল তেওয়ারীঃ আধুনিক বাংলা ও হিন্দী ছন্দ' (১৯৭৭), পৃ. ৪৪।

২৬। পূর্ববৎ, পৃ. ৪৫।

২৭। রামচন্দ্র শুক্লঃ 'হিন্দী সাহিত্যকা ইতিহাস' (১৯৪২), পৃ. ২৩ এবং রামকুমার বর্মাঃ 'হিন্দী সাহিত্যকা আলোচনাত্মক ইতিহাস' (১৯৪৮), পৃ. ৪৪।

২৮। রামবহাল তেওয়ারীঃ 'আধুনিক বাংলা ও হিন্দী ছন্দ' (১৯৭৭), পৃ. ৪৭।

২৯। ড. শিবনন্দন প্রসাদঃ 'মাত্রিক ছন্দোঁ কা বিকাস' (১৯৬৪), পৃ. ৪০০।

৩০। ড. ভোলাশংকর ব্যাস (সং) প্রাকৃত পৈঙ্গলম্‌-২, (১৯৬২), পৃ. ৫৭৫।

৩১। (ক) সুমিত্রানন্দন পন্তঃ পল্লব (কাব্য), 'প্রবেশ' (১৯৪৮), পৃ. ২৬।
(খ) ড. পুত্তুলাল শুক্লঃ আধুনিক হিন্দী কাব্য মেঁ ছন্দ-য়োজনা (১৯৫৮), পৃ. ১৬০।

৩২। Dr. J. N. Singh, 'Manoj' 'The contribution of Hindi Poets to prosody' unpublished.

৩৩। রামচন্দ্র শুক্লঃ 'হিন্দী সাহিত্যকা ইতিহাস' (১৯৪২), পৃ. ১৫২।

৩৪। রামবহাল তেওয়ারীঃ 'আধুনিক বাংলা ও হিন্দী ছন্দ' (১৯৭৭), পৃ. ৬১-৬২।

৩৫। এই প্রসঙ্গে মধ্যযুগের বাংলার 'চরিত সাহিত্য', অসমীয়ার 'বৈষ্ণব

সাহিত্য' এবং ওড়িয়ার 'পঞ্চসখা সাহিত্য' প্রভৃতি রচনায় মিশ্রবৃত্তের মধ্যেই মাঝে মাঝে দলবৃত্তের অস্তিত্ব-ঘোষণা প্রয়াস অনুধাবনীয়।

৩৬। (ক) সুকুমার সেন : 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, পূর্বাধ (১৯৭০), পৃ. ৪৮।

(খ) S. K. Chatterjee : The Origin and Devel9pment of the Bengali Language (1975) Vol. 1, P. 123.

(গ) S. K. Chatterjee : Indo.-Aryan and Hindi (1960)' P. 182.

(ঘ) রামচন্দ্র শুক্ল : 'হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস' (১৯৭২), 'দেশভাষা কাব্য' পৃ. ২১।

(ঙ) M. Singh : The Historycal Development of Mediaeval Hindi Poetry (1964), P. 68.

৩৭। (ক) ভোলাশংকর ব্যাস (সং): প্রাকৃত পৈঙ্গলম্-২ (১৯৬২), 'অপভ্রংশ ছন্দ পরম্পরা', পৃ. ৩৩৬।

(খ) M. Singh : Historycal Development of Mediaeval Hindi Poetry (1964), P. 72.

৩৮। সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা : অসমীয়া সাহিত্যর সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত (১৯৮১), পৃ. ৮৯।

৩৯। ভোলাশংকর ব্যাস (সং): প্রাকৃত পৈঙ্গলম্-২ (১৯৬২), 'অপভ্রংশ ছন্দ পরম্পরা', পৃ. ৩৪২।

৪০। (ক) হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সং): বৈষ্ণব পদাবলী (১৯৬১), গ্রন্থে কবীরের ১টি (পৃ. ১০৫৭), সুরদাসের ৩টি (পৃ. ১০৭৩-৭৪), তুলসী দাসের ১টি (পৃ. ১০৫৮) এবং মাধোর ৪টি (পৃ. ১০৫০-৫১) পদ সংকলিত। অনুরূপ পদ 'পদকল্পতরুর' বিভিন্ন খণ্ডেও পাওয়া সম্ভব।

(খ) প্রসঙ্গটির বিশদ অবগতির জন্য দ্রষ্টব্য বর্তমান লেখকের 'সুরপদ রত্নাবলী' (১৯৮৪), অনুবাদ গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশের 'সুরপদাবলীতে জাতীয় সংহতির সুর' প্রবন্ধ (পৃ. ১৭০-৮৬)।

৪১। "মহাপুরুষ শংকরদেব তীর্থভ্রমণ করিবলৈ যাঁওতে মৈথিলী ভাষাত

রচিত বিদ্যাপতির গীত আরু নাটকসমূহ দ্বারা নিশ্চয় আকৃষ্ট হৈ তেনে ভাষাতে গীত আরু নাট রচনার প্রয়াস করে।"

—সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা: অসমীয়া সাহিত্যর সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত, (১৯৮১) পৃ. ১৪১।

৪২। এই প্রসঙ্গে কটক থেকে প্রকাশিত গবেষণামূলক পত্রিকা 'এষণা'র সপ্তম খণ্ড, (১৯৮৩), পৃ. ২৩-৪১ দ্রষ্টব্য।

৪৩। সুকুমার সেন: বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড অপরার্ধ (১৯৬৫), পৃ. ৫৫৩।

৪৪। ডিম্বেশ্বর নেওগ: অসমীয়া সাহিত্যর বুরঞ্জী (১৯৫৭), পৃ. ১৫৫-৫৬।

৪৫। (ক) রামচন্দ্র শুক্ল: হিন্দী সাহিত্যকা ইতিহাস (১৯৭৩), পৃ. ৭১-৭২।
(খ) সুকুমার সেন: ইসলামিক বাংলা সাহিত্য (১৩৫৮), পৃ. ১০।

৪৬। সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা: অসমীয়া সাহিত্যর সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত (১৯৮১) পৃ. ১৬৭।

৪৭। দ্রষ্টব্য—ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী (ব. সা. প.)—'মানসিংহের দিল্লীতে উপস্থিতি'র প্রাসঙ্গিক অংশ।

৪৮। —হিন্দী ছন্দশাস্ত্রকারদের মধ্যে স্বয়ম্ভূ ও হেমচন্দ্র প্রমুখ মনে করেন—এটি কলাবৃত্ত দ্বিপদী, কিন্তু মুরলীধর কবিভূষণের মতে—এটি 'মত্তগজেন্দ্র গতি' নামক বর্ণবৃত্তের বন্ধ। দ্রষ্টব্য—লেখকের আধুনিক বাংলা ও 'হিন্দী ছন্দ' (১৯৭৭) পৃ. ৬৮।

৪৯। দ্রষ্টব্য—লেখকের 'আধুনিক বাংলা ও হিন্দী ছন্দ (১৯৭৭) পৃ. ৭২-৭৬।

৫০। দ্রষ্টব্য—পূর্ববৎ, পৃ. ৬৬-৭২।

৫১। ডঃ ভবতোষ দত্ত: 'ঈশ্বরগুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব' (১৯৬৮), পৃ. ২৪৬।

৫২। দ্রষ্টব্য—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত: 'বোধেন্দুবিকাশ' (নাটক, ১২৭০), দ্বিতীয় অংক, পৃ. ৫৮।

৫৩। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী (বসুমতী), পৃ. ৩৯২।

৫৪। ডিম্বেশ্বর নেওগ: অসমীয়া সাহিত্যর বুরঞ্জী (১৯৫৭) পৃ. ৩৭১।

৫৫। পূর্ববৎ, পৃ. ৩৭২-৭৩।

৫৬। সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা : অসমীয়া সাহিত্যর সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত (১৯৮১) পৃ. ৬৯।

৫৭। পূর্ববৎ, পৃ. ৮৯-৯০, ১১২, এবং ১৩৩-৩৪।

৫৮। বংশীধর মহান্তি : ওড়িআ সাহিত্যর ইতিহাস, ৩য় ভাগ, (১৯৭৭) পৃ. ৩৬৬।

৫৯। পূর্ববৎ, পৃ. ৪২১।

৬০। পূর্ববৎ, পৃ. ৪৩২-৪৩৩।

৬১। পূর্ববৎ, পৃ. ৫৫২।

৬২। পূর্ববৎ, পৃ. ৫৫৬।

৬৩। নীলকণ্ঠ দাস : ওড়িআ সাহিত্যর ক্রমপরিণাম (১৯৭৭), পৃ. ৫২৬।

৬৪। (ক) আকুল মিশ্র সম্পাদিত : রাধানাথ গ্রন্থাবলী (১৯৪৮), পৃ. ।০
(খ) ভূদেব মুখোপাধ্যায় : এডুকেশন গেজেট, ২৩ মে, ১৮৭৯।

৬৫। মায়াধর মানসিংহ : ওড়িআ সাহিত্যর ইতিহাস' (১৯৬৭) পৃ. ৩৪১।

৬৬। ভারতেন্দু গ্রন্থাবলী (না. প্র. স.) ২য় খণ্ড ৬৮৬ পৃষ্ঠায় 'প্রাতসমীরণ' কবিতাটির পাদটীকায় আছে—"হরিশ্চন্দ্র চন্দ্রিকা, খণ্ড-২, সংখ্যা-১ (অক্তূবর সন ১৮৭৪ ঈ.) মেঁ প্রকাশিত। ইসকা ছন্দ বঙ্গলা কা পয়ার হৈ।"

৬৭। ভারতেন্দুর বাংলা পদ ও তার ছন্দ বিষয়ক আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য:—
(ক) লেখকের প্রবন্ধ—'কবি ও নাট্যকার ভারতেন্দুর বাংলা পদ', সমকালীন, ১৩৭৫ ফাল্গুন, এবং হিন্দী প্রবন্ধ—'ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র কী বঙ্গলা কবিতা' 'রাষ্ট্র ভারতী', ১৯৬৯, জুন।
(খ) বিপিন বিহারী ত্রিবেদী : ভারতেন্দু কী ভারতীয় ছন্দ যোজনা 'ভরতেন্দুদা' কল গ্রন্থ (১৯৫০), পৃ. ৫০।

৬৮। দ্রষ্টব্য—সুধাকর চট্টোপাধ্যায় : 'আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে বাংলার স্থান' (১৩৬৪) পৃ. ৩৬-৪১।

৬৯। দ্রষ্টব্য—ভারতেন্দু নাটকাবলী, ২য় খণ্ড, (২য় সং, ১৮৮২), 'বিদ্যাসুন্দর' উপক্রম।

৭০। 'হংস' (পত্রিকা), ১৯৩১, জানুআরি সংখ্যা।

৭১। রবীন্দ্রনাথ : 'ছন্দ' (১৯৭৮), 'বিহারীলালের ছন্দ', পৃ. ১২-১৩।

৭২। দ্রষ্টব্য—মধুসূদন গ্রন্থাবলী (ব. সা. প.)-বিবিধ কাব্য 'গদা ও সদা' শীর্ষক রচনা।

৭৩। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাসকার ডিম্বেশ্বর নেওগের অভিমত : "ইংরাজ কবি মিল্টনর ব্লেংক ভার্ছর অনুকরণত বঙ্গদেশর কবি কুলমণি মাইকেল মধুসূদন দত্তই যি অমিত্রাক্ষর উলিয়াই বঙ্গভাষা-জননীর ভরির ছন্দর শিকলি মোকলাই দিয়ে তারে অনুকরণত রমাকান্তই নিভাঁজ ভাষা আরু নিমজ ছন্দর গতিত লিখা 'অভিমন্যুবধ' কাব্য ১৮৭৫ ত প্রকাশিত হয়।"

—অসমীয়া সাহিত্যর বুরঞ্জী (১৯৫৭), পৃ. ৬১৩-৬১৪।

৭৪। M. Bora: Fundamentals of Assamese Metre (1977) P. 299.

৭৫। "ওড়িআ কবিতারে এহি [অমিত্রাক্ষর] ছন্দর সফল বিনিয়োগ করিথিলে হেঁ রাধানাথ এহার আদি প্রবর্তক মুহন্তি। সাময়িক ক্ষুদ্র কবিতারে অনেক গৌণ কবি এহার ব্যবহার করিছন্তি।"

—ডঃ নরেন্দ্র মিশ্র : আধুনিক ওড়িআ কাব্যধারা (১৯৮০) পৃ. ৩১৩-১৪।

৭৬। পূর্ববৎ, পৃ. ৩১৫।

৭৭। শচি রাউতরায় : কবিতা ১৯৬২ ও নতুন কবিতার ভূমিকা (১৯৭১), পৃ. ১১৭।

৭৮। রাধানাথ রায় গ্রন্থাবলী (১৯৪৮), পৃ. ৪৯২।

৭৯। ক্ষেত্রবাসী নায়ক : আধুনিক ওড়িআ কাব্য সাহিত্যরে পাশ্চাত্য প্রভাব (১৯৭৭), পৃ. ২৪৭।

৮০। দ্রষ্টব্য লেখকের প্রবন্ধ : 'হিন্দী অমিত্রাক্ষর ও মধুসূদন', চতুষ্কোণ মধুসূদন সংখ্যা, ১৩৮০ বৈশাখ।

৮১। রামচন্দ্র শুক্ল : হিন্দী সাহিত্যকা ইতিহাস (১৯৪২), পৃ. ৭১৮ এবং অযোধ্যা সিংহ উপাধ্যায়ের 'প্রিয় প্রবাস' কাব্য (৫ম সং), ভূমিকা, পৃ. ৭-৮।

৮২। রামচন্দ্র শুক্ল : হিন্দী সাহিত্যকা ইতিহাস (১৯৪২), পৃ. ৬৭৫।

৮৩। সরস্বতী (পত্রিকা), ১৯০৩ জুলাই-অগাস্ট।

৮৪। প্রিয় প্রবাস (৫ম সং) ভূমিকা, পৃ. ১০।

৮৫। মেঘনাদবধ কাব্য (মধুপ-অনূদিত, ১৯২৭), ভূমিকা, পৃ. ৮।

৮৬। পূর্ববৎ, পৃ. ৮।

৮৭। দ্রষ্টব্য : লেখকের 'আধুনিক বাংলা ও হিন্দী ছন্দ' (১৯৭৭), পৃ. ১০৫।

৮৮। বঙ্গদর্শন (পত্রিকা), ১২৭৯, পৌষ।

৮৯। 'দশ মহাবিদ্যা' (কাব্য) গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপন, (ব. সা. প.) পৃ. ৩।

৯০। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অভিমত স্মরণীয় :—

(ক) "বাংলা যে ছন্দে যুক্ত অক্ষরের স্থান হয় না, সে ছন্দ আদরণীয় নহে"।

—ছন্দ (১৯৭৬), পৃ. ১২।

(খ) "তিন মাত্রামূলক ছন্দের দিকে আমার কলমের একটা স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল।...যুক্তাক্ষর অর্থাৎ যুগ্মধ্বনি বর্জন করার একটা দুর্বল অভ্যাস আমাকে ক্রমেই পেয়ে বসেছিল।"

—পূর্ববৎ, পৃ. ১০৫-০৬।

৯১। দ্রষ্টব্য—রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ 'বিহারীলালের ছন্দ', ছন্দ (১৯৭৬) পৃ. ১০-১১।

৯২। দ্রষ্টব্য—লেখকের 'আধুনিক বাংলা ও হিন্দী ছন্দ' (১৯৭৭), পৃ. ৯১।

৯৩। দ্রষ্টব্য—নবীনচন্দ্র সেনের রচনাবলী (ব. সা. প.) ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭১।

৯৪। "রোমাণ্টিক প্রভাব দুটা পথেদি অসমীয়া সাহিত্যত প্রবেশ লাভ করিছিল।—

(১) বঙালীর সাহিত্যর যোগেদি আরু (২) ইংরাজী সাহিত্যর যোগেদি।"

—সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা : অসমীয়া সাহিত্যর সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত (১৯৮১) পৃ. ৩০৮।

৯৫। দ্রষ্টব্য ডিম্বেশ্বর নেওগ : অসমীয়া সাহিত্যর বুরঞ্জী (১৯৫৭) পৃ. ৬৪৫।

৯৬। ১৮১২ শকাব্দের 'বিজুলী' পত্রিকার প্রথম বর্ষে কবি গুণাভিরাম

'গুরুদত্ত' ছদ্মনামে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রয়াণে (২৯ জুলাই, ১৮৯১) ব্যথিত হয়ে এই কবিতাটি রচনা ও প্রকাশ করেন। সে যুগের বাংলা তথা অসমীয়া সাহিত্য এবং বাঙালি তথা অসমীয়ার নিগূঢ় সম্পর্কের স্মারক এই কবিতাটি।

৯৭। M. Bora: Fundamentals of Assamese Metre (1977) P. 245.

৯৮। জানকীবল্লভ মহান্তি: ওড়িআ ছন্দর বিকাশ (১৯৬১), পৃ. ২৪।

৯৯। লক্ষণীয়:—(ক) পণ্ডা পিণ্ডা তলকু বসিলে মণ্ডপে শাসনীয়ে
চাণ্ডে চাণ্ডে বসি বসি গলে চত্বরে পাট্টা ধাড়ি
মণ্ডা গণ্ডা লড় গড়্ খণ্ড পাকে স জাড়ি
ভেণ্ডা ভেণ্ডা দ্বিজ পরষিলে পত্রে পত্রে, অজাড়ি ॥
—গোপাল প্রহরাজ: 'ঢগ ঢমালী বচন'-২, পৃ. ২২০।

(খ) গর্জন্তি মেঘা বরষন্তি পাণি
উঠন্তি গড়িশা বেল কাল জানি।
—পূর্ববৎ, পৃ. ৮।

১০০। দ্রষ্টব্য:—

(ক) জয় হে ব্রজরাজ নন্দন মোহন নটবর ভাঙ্গিয়া।
দলিত কজ্জল কান্তি মঞ্জুল কুঞ্চিত ঘন-নীল কুন্তল।
পুষ্প বেষ্টিত চল পরিমল বরহী চন্দ্র কচুলিয়া॥ ১ ॥
—বনমালী পদ্যাবলী, পৃ. ২।

(খ) রস-মানস রাধীকেশ যার রস কথারে
সোবিত শুক সনক শেষ অমিশ নত মথারে।
ভ্রম-না ভব-ভোগ লোভরে লভি ধন প্রমদা রে
ভব সরসিজ ভবদুর্লভ প্রেম ভক্তি দারে॥ ১ ॥
—গোপালকৃষ্ণ পদ্যাবলী, পৃ. ২১৭।

(গ) কোটি শারদ চন্দ্রমা মুদ বনজ রুচি মুখ শ্যামল,
গণ্ড সুশোভিত রতন সুজড়িত্ত মকর সুরুচির কুণ্ডল।
—কবি সূর্য গ্রন্থাবলী, পৃ. ২৭৯।

(ঘ) জয় গোপাল, জয় গোপাল, জয় গিরিবর ধারী
জয় জয় শ্রীরাধা মাধব ব্রজ বধূ মনোহারী।
গোপ বাল, গোপীরমণ গোকুল হিতকারী
বংশী বদন কঞ্জ নয়ন কুঞ্জবন বিহারী ॥

—হরিবন্ধু পদ্যাবলী, পৃ. ৮৩।

১০১। "ওড়িআরে সংস্কৃত ছন্দ অনুপ্রবিষ্ট হেলে ভল কবিতা সৃষ্টি হোই পারিব নাহিঁ—এহা অবশ্য কুহা যাই ন পারে; পরন্তু কৌণসি কৌণসি সংস্কৃত ছন্দ যে ওড়িআ ভাষা প্রতি অনুকূল এথিরে সন্দেহরে অবকাশ নাহিঁ। সংস্কৃত 'তোটক' ছন্দটির ওড়িআ ভাষা প্রতি বিশেষ উপযোগিতা প্রমাণিত।"

—জানকীবল্লভ মহান্তি: 'ওড়িআ গীতিকাব্য, (১৯৭৬) পৃ. ২০৩-০৪।

১০২। পূর্ববৎ, পৃ. ২০৫।

তৃতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের ছন্দ ও প্রতিবেশী কাব্যে তার অনুসৃতি

উনবিংশ শতকের শেষ ভাগ থেকে বিংশ শতকের মধ্যভাগ (১৮৭৫-১৯৪১) পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সৃজন যজ্ঞ অব্যাহত ছিল। তাঁর কবিতায় বাংলা ভাষা, অলংকার ও ছন্দ—এই তিনের প্রয়োগ—সৌকর্য চরমতায় পৌঁছেছে বলা যায়। রবীন্দ্র আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা কাব্যের প্রধান বাহন ছিল মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দ। দলবৃত্ত সাধুসাহিত্যে ছিল অস্বীকৃত। আধুনিক কলাবৃত্তের ধ্বনিরহস্য ছিল অনাবিষ্কৃত। দীর্ঘদিনের ব্যবহৃত মিশ্রবৃত্তে ভাবের প্রবাহ এনে মধুসূদন ছন্দটির প্রাণশক্তির নব পরিচয় তুলে ধরলেন। সম্ভাবনাময় হয়ে উঠলো তার ভবিষ্যৎ। বাংলা ছন্দে বৈচিত্র্যের দিকটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ছন্দ। বাংলা ছন্দের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের দান প্রধানত তিনটি—(১) রুদ্ধদলকে দুই মাত্রা মর্যাদা দিয়ে আধুনিক কলাবৃত্ত রীতির প্রবর্তন ও তাতে বৈচিত্র্য সম্পাদন ; (২) লৌকিক ছন্দ বা দলবৃত্ত রীতির বিশিষ্টতা নিরূপণ, তার সৌষ্ঠব সাধন ও সাধুসাহিত্যে তাকে মর্যাদার আসন দান এবং (৩) মিশ্রবৃত্তের প্রকৃত স্বরূপ নির্ধারণ ও বিবিধ-বিচিত্র প্রয়োগের সাহায্যে তার শক্তি ও সৌন্দর্যকে প্রতিষ্ঠা দান। বলতে কি রবীন্দ্র-কল্যাণেই বাংলা ছন্দের তিনটি সুস্পষ্ট রীতি—কলাবৃত্ত, মিশ্রবৃত্ত ও দলবৃত্ত পাওয়া গেল। বর্তমান অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা ছন্দের উৎকর্ষ লাভের স্বরূপ সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করা যাবে।

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব এবং প্রতিবেশি অসমীয়া ওড়িয়া ও হিন্দী কবিতায় তাঁর কাব্য ও কাব্যশক্তির সুপরিচিতির পূর্ব পর্যন্ত মোটামুটি পুরাতন ধারারই অনুসৃতি অব্যাহত ছিল। রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হবার (১৯১৩) পর অসমীয়া, ওড়িয়া এবং হিন্দী সাহিত্যের স্রষ্টা ও পাঠকদের দৃষ্টি তাঁর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। তার মানে এই নয় যে প্রতিবেশী সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ অজ্ঞাত ছিলেন। অতঃপর রবীন্দ্রছন্দের পরিচিতি, অনুকৃতি ও অনুসৃতির ফলে নিজ নিজ ছন্দের পুরাতন রীতির প্রতি আকর্ষণ ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। ছন্দের চিরাগত বিধিবিধানকে অস্বীকার

এবং হিন্দীতে করে নূতন ধরনের কবিতা রচনার সার্থক প্রয়াস লক্ষিত হয়। অসমীয়াতে অম্বিকাগিরি রায় চৌধুরী (১৭৮৫-১৯৬৭) ওড়িয়াতে অন্নদাশংকর রায় (১৯০৪—) সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী (১৮৯৬-১৯৬১) নিরালা প্রমুখের রচনায়। অমিত্রাক্ষর ও মুক্তক জাতীয় আধুনিক ছন্দবন্ধের প্রয়োগ ঘটেছে স্বাভাবিক কারণেই। এইসব প্রয়োগ ইংরেজি থেকে বাংলার মাধ্যমে অসমীয়া, ওড়িয়া এবং হিন্দীতে এসেছে। আধুনিক অসমীয়া, ওড়িয়া এবং হিন্দী কবিতায় লোকগীতির বা লৌকিক ছন্দের ব্যবহারও প্রারম্ভ হয়েছে। হিন্দী কলাবৃত্তের লঘু-গুরু বা হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণের সুনির্দিষ্টতাও ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে আসছে। অসমীয়া এবং ওড়িয়াতে লঘু-গুরু বা হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণের অবকাশ নেই। এ-যুগের আলোচ্য প্রতিবেশী ভাষায় কোনো কোনো কবির রচনায় রবীন্দ্রনাথের ভাব-ভাষা ও ছন্দের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ছন্দোরীতি ও ছন্দোবন্ধের বিচারে আধুনিক যুগে বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া ও হিন্দী ছন্দ বেশ সমৃদ্ধ। কাব্য-শিল্পের এই দিকটি আশ্রিত প্রধানত ছন্দোবন্ধের বিচিত্র প্রয়োগের উপরই। এইরূপ ছন্দের উৎকর্ষ কোনো ভাষার কবিতাতেই এর আগে আর সম্ভব হয়নি। তাই বর্তমান অধ্যায়ে বাংলা ছন্দের রবীন্দ্রনাথের দান এবং অসমীয়া, ওড়িয়া ও হিন্দী ছন্দে রবীন্দ্র ছন্দের প্রভাব ও পরিণতির প্রসঙ্গ আলোচনার চেষ্টা করা যাবে।

বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান

আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-সৃজন ধারাকে প্রয়োগ বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ রেখে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করতে পারি।—

১। উন্মেষ বা ছন্দ নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পর্ব, (১৮৭৫-১৮৯০)।

২। মানসীর ছন্দ (১৮৯০—)।

৩। ক্ষণিকার ছন্দ (১৯০০—)।

৪। বলাকার ছন্দ (১৯১৬—)।

৫। পুনশ্চর ছন্দ (১৯৩২—)।

পূর্বসূরীদের ছন্দের অনুকরণে রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-শিল্পের সূচনা ঘটে। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁর ছন্দ-শিল্প উজ্জ্বল ও ভাস্বর হয়ে ওঠে। মানসীর পূর্ব পর্যন্ত তাঁর কাব্য-রচনা কালকে ছন্দের বিচারে পূর্বানুসৃতি ও পরীক্ষা-

নিরীক্ষার যুগ রূপে চিহ্নিত করা যায়। তবে কাব্যে ও ছন্দে রবীন্দ্র-প্রতিভার স্বকীয়তার আভাসও ফুটে উঠেছে এই যুগে। মানসীর পর্বে রবীন্দ্র কাব্য ভাব ও ছন্দের বৈচিত্র্যে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। নবযুগের সূচনা ঘটেছে। নবকলাবৃত্ত রীতির আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। বাংলা ছন্দ বিকাশের ইতিহাসে দ্বিতীয় গৌরবময় যুগ হল—ক্ষণিকার পর্ব। লৌকিক বা দলবৃত্ত রীতির ছন্দ সুগঠিত ও বিচিত্র বন্ধে সুসজ্জিত হয়ে বাংলা সাহিত্যের আসরে মর্যাদার আসন লাভ করেছে। বলাকার পর্বটি বাংলা ছন্দের মুক্তির যুগ বলা যায়। বাংলা মিশ্রবৃত্ত-দলবৃত্ত রীতির ছন্দ সুনিরূপিত ও সুনির্দিষ্ট বন্ধের সংস্কার ও বিধান থেকে মুক্ত হওয়ায় নূতন শক্তি সঞ্চারিত হয় বাংলা ছন্দে। বাংলা ছন্দের এই নবলব্ধ শক্তির প্রয়োগগত প্রভাব প্রতিবেশী ছন্দেও সঞ্চারিত হয়। পুনশ্চ কাব্যের যুগ আসলে বাংলা ছন্দের ক্ষেত্রে এক অভিনবতা ও বিশিষ্টতামণ্ডিত পর্ব। গদ্য ছন্দের প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠাই এ-যুগের প্রধান পরিচয়। অবশ্য গদ্যছন্দের পাশাপাশি সুস্থির ছন্দোবদ্ধ-কবিতা রচনার ধারার প্রবাহও অক্ষুণ্ণ ছিল। গদ্যছন্দ-মুক্তবন্ধ ছন্দ বা মুক্তকেরই পরিণত রূপ বলা যায়। মুক্তকে ছন্দের বন্ধ বা বাইয়ের বাঁধন থেকে মুক্তি ঘটে, কিন্তু ধ্বনিবিন্যাসের বিধিবিধান অক্ষুণ্ণ থাকে। আর গদ্যছন্দে ধ্বনিবিন্যাসের বিধিবিধানের খোলসও খসে পড়ে যায়। তবে ভাষা একেবারে আটপৌরে গদ্যের নয়, তাতেও একপ্রকার সূক্ষ্ম ছন্দের প্রবাহ থাকে, তাকেই রবীন্দ্রনাথ 'ভাবের ছন্দ' বলেছেন।

আধুনিক অসমীয়া, ওড়িয়া ও হিন্দী কবিতায় গদ্যছন্দের প্রভাব বেশ সুস্পষ্টতর ও বলিষ্ঠতর। ছন্দ প্রয়োগের অভিনব এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ চারটি কাব্যগ্রন্থ পরবর্তী কাব্যের ছন্দ রচনাকে বহুলাংশে অনুপ্রাণিত ও নিয়ন্ত্রিত করেছে—তাই তাদের গুরুত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ রবীন্দ্র-ছন্দ রচনা কালকে তাদের নাম অনুসারে চিহ্নিত করা হয়েছে।

উন্মেষ বা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পর্ব

বাংলা কাব্যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব কালে—মিশ্রবৃত্ত রীতিই ছিল একমাত্র প্রচলিত ছন্দোরীতি। যার বেশ কয়েক রকমের বন্ধে কবিতা লেখা হত। রবীন্দ্রনাথ প্রথমদিকে পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক অগ্রজ কবিদের ছন্দ রচনাপদ্ধতির

অনুকারী ছিলেন। এই প্রসঙ্গে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারীলাল চক্রবর্তী প্রমুখ কবিদের নামোল্লেখ করা যায়। তবে তখনও মিশ্রবৃত্তের সুগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত রূপ ফুটে ওঠেনি। তার কৃত্রিমতা ও অপূর্ণতা নাড়া দিত কবির সহজাত ছন্দোবোধকে। তাই তাঁর সে যুগের রচনায় প্রচলিত ছন্দকে ভেঙে-চুরে নব ছন্দ সৃজনের একটা অনলস প্রয়াস লক্ষিত হয়। এই অশ্রান্ত প্রয়াসের পরিচয় আছে—বনফুল, (১৮৮০) শৈশব সঙ্গীত (১৮৮৪-৮৫) প্রভৃতি কাব্যে। তাই দেখা যায়—কোথাও রুদ্ধদল একমাত্রক, কোথাও বা তা ভেঙে দ্বিমাত্রক এবং কখনো বা অজ্ঞাতসারে সহজভাবে তা দ্বিমাত্রক রূপেও প্রযুক্ত হয়েছে।

আবার মধ্যযুগের কবিদের অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' (১৮৮৪-৮৫) রচনা করেন। তাতে প্রত্ন কলাবৃত্তের নিখুঁত প্রয়োগে মাঝে মাঝে জয়দেবের সংস্কৃত ছন্দ রচনায় অনুসৃতি লক্ষিত হয়। ভানু সিংহের পদাবলী প্রধানত গেয়। তাই তাতে রবীন্দ্রনাথ জয়দেবী বা সংস্কৃত মাত্রাবৃত্ত রীতির প্রয়োগ করেছেন দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'জনগণমন অধিনায়ক' জাতীয় সঙ্গীত, 'অয়ি ভুবন মনো মোহিনী', 'বিশ্ববিদ্যা তীর্থ প্রাঙ্গণ', 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি' প্রভৃতি সঙ্গীতে সংস্কৃত মাত্রাবৃত্তের উপযোগিতার কথা স্মরণীয়। এ সব রচনায় দীর্ঘস্বরের দ্বিমাত্রকতায় ছন্দের লালিত্য ও আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সে যাই হোক রুদ্ধদলকে সর্বত্র এক মাত্রা রূপে ব্যবহারে রবি কবির মন দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। কানের সায় না পেয়ে তিনি রুদ্ধদল বাদ দিয়ে কবিতা লিখেছেন কিছুদিন। অবশ্য কড়ি ও কোমল (১৮৮৬) কাব্যে আবার রুদ্ধদল এসে গেছে। শুধু তাই নয় কোথাও কোথাও রুদ্ধদল দুই মাত্রার মর্যাদায় ভূষিত হয়েছে—এমনও দেখা যায়। যেমন—

> দুটি একটি পথিক চলে 'গল্প' করে হাসে।
> 'লজ্জাবতী' বধূটি গেল ছায়াটি নিয়ে পাশে ॥
>
> —কড়ি ও কোমল : খেলা।

এখানে 'গল্প' ও 'লজ্জা'—দুই মাত্রার বদলে তিন মাত্রারূপে স্বীকৃত। তবু স্বাভাবিক কারণেই রবীন্দ্রনাথের প্রথমদিকের রচনায় মিশ্রবৃত্তেরই প্রাধান্য। তিনি মিশ্রবৃত্ত রীতির পয়ার সমিল ও অমিল প্রবহমান পয়ার, দ্বিপদী ত্রিপদী ও চৌপদী বন্ধ এবং বিভিন্ন আকৃতির পঙক্তি পদ প্রভৃতির সমবায়ে বিচিত্র স্তবক সজ্জার অভিনবতায় বাংলা কবিতাকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন।[২] কোথাও কোথাও আবার পরবর্তীকালের মুক্তকের আভাস ফুটে উঠেছে।[৩] 'ছবি ও

গান' কাব্যে মিশ্র কলাবৃত্তের মাঝে মধ্যে দলবৃত্তও এসে গেছে। মুখের ভাষা বা বাক্‌ছন্দও যে কাব্য ভাবের যোগ্য বাহন হয়ে উঠতে পারে—এমন চিন্তাও তরুণ কবির মনে উঁকি দিয়েছে। তারই পরিচয় রয়েছে এ-পর্বে রচিত তাঁর কবিতার স্তবক, পঙ্‌ক্তি পদ এমন কি পর্বের আদলে।[৪] ক্রমে দলবৃত্ত রীতিটি সুস্পষ্টও হয়ে উঠছে দেখা যায়। ছবি ও গানের অন্তত চারটি এবং 'কড়ি ও কোমলের' এগারটি কবিতা দলবৃত্তে লেখা-বলা যায়।[৫]

মধুসূদনের পর রবীন্দ্রনাথই ব্যাপকভাবে সনেট রচনায় প্রয়াসী হন। তাঁর প্রথম সনেট পেত্রার্কের একটি সনেটের অনুবাদ। তাঁর মৌলিক সনেট মেলে প্রথম 'কড়ি ও কোমল' কাব্যে। মিশ্রবৃত্ত রীতির সনেটে তিনি সনেটের পূর্বাগত বিধিকে পুরোপুরি মানেননি। তাই সনেটের পঙ্‌ক্তি তার আয়তন, স্তবক ভাগ ও মিল-রচনায় বৈচিত্র্য আনতে প্রয়াসী হয়েছেন। দেখা যাচ্ছে এই পর্বে নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভারাক্রান্ত কবির ছন্দ প্রতিভা বিচিত্র রকম চিন্তন-মনন ও প্রয়োগ-পরীক্ষার সাহায্যে মিশ্রবৃত্ত রীতি প্রয়োগবৈচিত্র্যের, কলাবৃত্ত রীতি রুদ্ধদলের দ্বিমাত্রকতার এবং দলবৃত্তের মনোমতো প্রয়োগের সম্ভাবনাময় দ্বারে এসে পৌঁছেছে। ধ্বনিপ্রবাহে ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে রুদ্ধদল-ব্যবহার-সৌকর্য এনে যুক্ত বর্ণের ধ্বন্যাঘাতে কবিতাকে তরঙ্গিত ও ঝংকৃত করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। বাংলা ছন্দে নব প্রাণ ও নবীন প্রত্যাশা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তার বাঞ্ছিত অভিব্যক্তি ঘটেছে পরবর্তী 'মানসীর' পর্বে।

মানসীর ছন্দ (১৯৩০—)

বাংলা ছন্দের ইতিহাসে মানসী কাব্য গ্রন্থটির ছন্দ-শিল্প একটি অবিস্মরণীয় সংযোজন। এই কাব্যেই রুদ্ধদলের ধ্বনি মর্যাদা সুন্দর ও সুস্পষ্ট রূপে ধরা পড়ে। রবীন্দ্রনাথ নিজেকে 'ছন্দশিল্পী' রূপে প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর মতে—

"আমার রচনার এই পর্বে যুক্ত অক্ষরকে পূর্ণ মূল্য দিয়ে ছন্দকে নূতন শক্তি দিতে পেরেছি। 'মানসী'তেই ছন্দের নানা খেয়াল দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। কবির সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিল।"

—মানসী সূচনা, রচনাবলী।

অর্থাৎ কবি রবীন্দ্রনাথকে আমরা আগেই পেয়েছি, এবার পেলাম—শিল্পী রবীন্দ্রনাথকে। নানা আকৃতির পর্ব, পদ, পংক্তি ও স্তবকের সুসজ্জাকে নব্য কলাবৃত্তের ধ্বনি সুষমায় মণ্ডিত করে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছন্দের অভূতপূর্ব সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করে দিলেন। মানসীর বিভিন্ন কবিতায় কলাবৃত্তের ধ্বনিসুষমা অনবদ্য হয়ে ফুটে উঠল। মানসীর 'ভুলভাঙা' কবিতায় এই রীতির প্রথম প্রয়োগ ঘটে। ১৮৮৭ সালে রচিত ওই কবিতাটির কিছু অংশ—

চেয়ে আছে আঁখি, নাই ও আঁখিতে প্রেমের ঘোর।
বাহুলতা শুধু 'বন্ধন' পাশ, বাহুতে মোর।…
'বসন্ত' নাহি এ-ধরায় আর আগের মতো,
জ্যোৎস্না-যামিনী যৌবন-হারা জীবন হ'ত।

—মানসী : 'ভুল ভাঙা'।

কড়ি ও কোমলের 'বিরহ' কবিতায় যার পূর্বাভাস, মানসীর 'ভুল ভাঙা'য় তার পরিণত প্রকাশ। তবে তাকে সহজ স্বচ্ছন্দ বলতে দ্বিধা বোধ হয়। তার কারণও আছে। এই দ্বিধা কেটেছে বৎসরকাল পরে রচিত—'অপেক্ষা' কবিতায় (১৮৮৮, মে)। তাতে বাংলা কাব্যসরোবরের নিস্তরঙ্গ ধ্বনিতল ঊর্মিমুখর ধ্বনি-সঙ্গীতে স্পন্দিত হয়ে উঠেছে। ধারাটি অব্যাহত পাই কবিজীবনের শেষ পর্যন্ত। এই নব্যকলাবৃত্তের শক্তি সুষমা ও আকর্ষণ যেমন অভিনব তেমনি অনবদ্য। যেমন—

বধূরা দেখ আইলা ঘাটে, এলোনো ছায়া তবু।
কলস ঘায়ে 'ঊর্মি' টুটে,
'রশ্মি' রাশি 'চূর্ণি' উঠে,
'শ্রান্ত' বায়ু, 'প্রান্ত' নীর,
'চুম্বি' যায় কভু।…
উরসে পরি যূথীর হার বসনে মাথা ঢাকি
বনের পথে নদীর তীরে
'অন্ধ'কারে বেড়াবে ধীরে
'গন্ধ'টুকু 'সন্ধ্যা' বায়ে, রেখার মতো রাখি।

—মানসী : 'অপেক্ষা'।

এ-ছন্দে ধ্বনি-পরিমাণ নির্ভর সুরের লালিত্য অস্বীকার করা যায় না। তাই বাংলা গীতিকবিতার সর্বশ্রেষ্ঠ বাহনের মর্যাদায় ভূষিত এই রীতি। সুরময়তার

নিস্তরঙ্গ একঘেয়েমিকে প্রতিহত করার জন্য রবীন্দ্রনাথ অভিরুচি অনুযায়ী রুদ্ধ-দলের ব্যবহার করে বিচিত্র ঊর্মিমুখরতা এনে দিয়েছেন। পরিণত দেখা যেতে পারে বয়সের একটি অনুরূপ রচনা—

নীল অঞ্জন ঘন পুঞ্জছায়ায় সম্বৃত অম্বর,
হে গম্ভীর।
বনলক্ষ্মীর কম্পিত কায়, চঞ্চল অন্তর,
ঝংকৃত তার ঝিল্লীর মঞ্জীর।
বর্ষণগীত হল মুখরিত মেঘমন্দ্রিত ছন্দে,
কদম্ব বন গভীর মগন আনন্দ ঘন গন্ধে—
নন্দিত তব উৎসব মন্দির,
হে গম্ভীর।

—স্বরবিতান-৩।

প্রথম উদাহরণটি ষট্‌কল পর্বিক দ্বিপদী ও চৌপদী এবং পরেরটি একপদী, দ্বিপদী ও ত্রিপদী পংক্তি বন্ধে রচিত।

কলাবৃত্তের চতুষ্কল, পঞ্চকল ও সপ্তকল পর্বের রচনার মনোহারী ধারা মানসী থেকেই শুরু। এখানে তার কয়েকটির দৃষ্টান্ত দেখা যেতে পারে—

১। চতুষ্কল পর্বিক দ্বিপদী :—

(ক) নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল,
ঊর্ধ্বে পাষাণ তট শ্যাম শীতল।
মাঝে গহ্বর তাহে পশি জলধার
ছল ছল করতালি দেয় অনিবার

—মানসী : 'নিষ্ফল-উপহার'।

এ-টি ৮ ॥ ৬ পদ ভাগের ১৪ মাত্রার পয়ার পঙ্‌ক্তি বন্ধ। বাংলায় মিশ্রবৃত্ত পয়ার অতি প্রাচীনকাল থেকে লেখা হলেও কলাবৃত্ত-পয়ার প্রথম রবীন্দ্রনাথের হাতেই রচিত হল। বাংলার প্রথম কলাবৃত্ত পয়ারের নিদর্শনের গৌরব প্রাপ্য এই রচনাটির। 'চিত্র-বিচিত্র' গ্রন্থে কলাবৃত্ত পয়ারের বহু রচনা আছে। তার থেকে দুইটি উদাহরণ নেওয়া যাক। এই পর্বের ছন্দে যতি-লোপ বা লুপ্ত যতির সাহায্যে কেমন বৈচিত্র্য আসতে পারে তাও স্পষ্ট হবে আশা করি।

১। (ক) ফাল্গুনে বিকশিত কাঞ্চন ফুল,
ডালে ডালে পুঞ্জিত আম্র মুকুল।
চঞ্চল মৌমাছি গুঞ্জরি গায়,
বেণুবনে মর্মরে দক্ষিণ বায়।

—চিত্রবিচিত্র: 'ফাল্গুন'।

এখানে চারমাত্রার পর্বের ভাগ স্পষ্ট। তাই ধ্বনি-রূপ একরকম, আর নিম্নের নিদর্শনে মাঝে মাঝে এই পর্ব ভাগে ব্যতিক্রম ঘটায়—ধ্বনিবোধ ভিন্নতর হয়ে পড়েছে—

(খ) পূর্ণিমা চন্দ্রের জ্যোৎস্না ধারায়
সান্ধ্য বসুন্ধরা তন্দ্রা হারায়।

—চিত্রবিচিত্র: 'উৎসব'।

এই দৃষ্টান্তে তিন স্থানে ('ধা : রায়', 'ব : সুন্ধরা' ও 'হা : রায়') যতিলোপ ঘটেছে। যতির অভাবে ভাব ও ধ্বনির ঘনতা এসেছে—সে কথা বলাই বাহুল্য।

২। পঞ্চকল পর্বিক দ্বিপদী :—

(ক) নূতন জাগা কুঞ্জ বনে কুহরি উঠে পিক
বসন্তের চুম্বনেতে বিবশ দশ দিক।
বাতাস ঘরে প্রবেশ করে ব্যাকুল উচ্ছ্বাসে,
নবীন ফুল মঞ্জরির গন্ধ লয়ে আসে।

—সোনারতরী: 'সুপ্তোত্থিতা'।

এই পঞ্চকল পর্ব জয়দেব, বিদ্যাপতি বা শশিশেখর প্রমুখ কবিদের রচনায় যেমনটি পেয়েছি তেমনটি রবীন্দ্রনাথের রচনাতেও পাই।[৬] যেমন—

(খ) পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একি সন্ন্যাসী
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।
ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে উঠে নিশ্বাসি,
অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে।

—কল্পনা: 'মদন ভস্মের পর'।

বাংলা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গতিপন্ন এই ছন্দোরচনা রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য দান বললে চলে। আরও সহজ গতির অনুরূপ একটি নিদর্শন—

বিপদে মোরে রক্ষা কর এ-নহে মোর প্রার্থনা
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখ তাপে ব্যথিত চিত্তে নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।

—গীতাঞ্জলি-৪।

বাংলা কলাবৃত্ত রীতির ছন্দে রবীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ দান ষট্‌কল পর্ব। সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া না গেলেও প্রাকৃতে ও মধ্যযুগের ব্রজবুলি রচনায় তার প্রয়োগ মেলে।

৩। ষট্‌কল পর্বিক দ্বিপদী ও চৌপদী এবং দ্বিপদী ও ত্রিপদী :—

(ক) বিপুল গভীর মধুর মন্দ্রে
কে বাজাবে সেই বাজনা ?
উঠিবে চিত্ত করিয়া নৃত্য,
বিস্মৃত হবে আপনা।
টুটিবে বন্ধ, মহা আনন্দ,
নব সঙ্গীতে নূতন ছন্দ,
হৃদয়-সাগরে পূর্ণ চন্দ্র
জাগাবে নবীন বাসনা।

—সোনার তরী : 'বিশ্বনৃত্য'।

(খ) মুদিত আলোর কমল কলিকাটিরে
রেখেছে সন্ধ্যা আঁধার পর্ণ পুটে।
উত্তরিবে যবে নব প্রভাতের তীরে
তরুণ কমল আপনি উঠিবে ফুটে।
উদয়াচলের সে তীর্থ পথে আমি
চলেছি একেলা সন্ধ্যার অনুগামী,
দিনান্ত মোর দিগন্তে পড়ে লুটে।

গীতালি-১০৭।

লক্ষণীয় প্রথম দৃষ্টান্তে ১২ ॥ ৯—২১ মাত্রার দ্বিপদীর সঙ্গে ১২ ॥ ১২ ॥ ১২ ॥ ৯ —৪৫ মাত্রার চৌপদী এবং দ্বিতীয়টিতে ১৪ ॥ ১৪—২৮ মাত্রার দ্বিপদীর সঙ্গে ১৪ ॥ ১৪ ॥ ১৪—৪২ মাত্রার ত্রিপদী সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এবার ১৫ ॥ ১৫ ॥ ১৫ ॥ ৯—৫৪

মাত্রার চৌপদী ও ১৫ ॥ ৯—২৪ মাত্রার দ্বিপদীর সমন্বয়ে গঠিত স্তবকের দৃষ্টান্ত :—

(গ) কত না বর্ণে কত না স্বর্ণে গঠিত,
কত যে ছন্দে কত সঙ্গীতে রটিত,
কত না গ্রন্থে কত-না কণ্ঠে পঠিত
তব অসংখ্য কাহিনী।
জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমিহে
তুমি বিচিত্র রূপিণী।

চিত্রা : 'চিত্রা'।

রবীন্দ্রনাথ আরও বহু বিচিত্র ভাবে ও ভঙ্গীতে ষট্‌কল পর্বের ব্যবহার করেছেন। কলাবৃত্ত রীতির আর একটি পর্ব আয়তন হল—সাতকলামাত্রার। এই সপ্তকল পর্বও সংস্কৃতে অজ্ঞাত ছিল বলা যায়। তবে মধ্যযুগের বাংলা রচনায় তা দুর্লভ নয়। রবীন্দ্রনাথের রচনায় ষট্‌কল পর্বের তুলনায় সপ্তকল পর্বের ব্যবহার কম। পুরো বাংলাকাব্যেও তাই। প্রথমদিকে যুক্তবর্ণহীন সপ্তকল পর্ব রচিত হলেও এই পর্বটির যথার্থ সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে—রুদ্ধদলের প্রয়োগেই। যেমন—

৪। সপ্তকলপর্বিক দ্বিপদী :—

(ক) জীবন-মরণের বাজারে খঞ্জনি
নাচিয়া ফাল্গুন গাহিছে।
অধীরা হল ধরা মাটির বন্দিনী
বাতাসে উড়ে যেতে চাহিছে।
আজিকে আলো ছায়া করিছে কোলাকুলি
আজিকে এক দোলে দুজনে দোলাদুলি
শুকানো পাতা আর মুকুলে।
আজিকে শিরীষের মুখর উপবনে
জড়িত পাশা-পাশি নূতনে পুরাতনে
চিকন শ্যামলের দুকূলে।

—পরিশেষ ; সংযোজন : 'জীবন-মরণ'

উদ্‌ধৃতাংশে ১৪ ॥ ১০—২৪ মাত্রার দ্বিপদী ও ১৪ ॥ ১৪ ॥ ১০—৩৮ মাত্রার ত্রিপদী পঙ্‌ক্তির জোড়া সন্নিবেশ ঘটেছে। অপেক্ষাকৃত বেশি রুদ্ধদলপুষ্ট রচনায় ধ্বনিভঙ্গির ঊর্মিল প্রকৃতির দৃষ্টান্ত—

(খ) ধ্বনিল আহ্বান মধুর গভীর
প্রভাত-অম্বর মাঝে,
দিকে দিগন্তরে ভুবনমন্দিরে
শান্তি সঙ্গীত বাজে।
হেরো গো অন্তরে অরূপ সুন্দরে,
নিখিল সংসারে পরম বন্ধুরে,
এসো আনন্দিত মিলন অঙ্গণে
শোভন-মঙ্গল সাজে ॥

গীতবিতান : পূজা-৩০৩।

লক্ষণীয় প্রথম দৃষ্টান্তের 'খঞ্জনি' 'ফাল্গুন' ও "বন্দিনী"—এই তিন জায়গায় যুক্তবর্ণাশ্রিত রুদ্ধদল স্থান পেয়েছে কিন্তু পরেরটিতে প্রতি পূর্ণ পর্বেই যুক্তবর্ণাশ্রিত রুদ্ধদল আছে। আর এই রুদ্ধদল আছে সবক্ষেত্রেই পর্বের দ্বিতীয়াংশে। তাতে সমান তালে ঝোঁকের একপ্রকার বিশেষ আবেদন অনুভূত হয়।

সপ্তকল পর্বের ব্যবহার কম হলেও তার পূর্তির জন্য রবীন্দ্রনাথ সাত মাত্রার পর্বের সঙ্গে ছোট আয়তনের পর্বের বিন্যাসে বৈচিত্র্য এনেছেন দেখা যায়। তাঁর এই প্রয়োগও উল্লেখের দাবি রাখে।[৭]

(গ) মিশ্রপর্বিক দ্বিপদী :—

গাহিছে কাশীনাথ নবীন যুবা
ধ্বনিতে সভাগৃহ ঢাকি,
কণ্ঠে খেলিতেছে সাতটি সুর
সাতটি যেন পোষা পাখি।

—সোনারতরী : 'গানভঙ্গ'।

এখানে ৭+৫ ॥ ৭+২ ক্রমে মাত্রা বিন্যস্ত।

ষট্‌কল পর্বের ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য আনার মানসে বিভিন্ন আয়তনের পর্বের মিশ্রণ ঘটেছে দেখা যায়। অতিপর্বের সংযোগে-ধ্বনিমাধুরী আরও বিচিত্র হয়ে উঠেছে :—

তব পিঙ্গল ছবি মহাজট
সেকি চূড়া করি বাঁধা হবে না!
তব বিজয়োদ্ধত ধ্বজপট
সেকি আগে-পিছে কেহ রবে না!

তব মশাল আলোকে নদীতট
আঁখি মেলিবে না রাঙাবরণ?
ত্রাসে কেঁপে উঠিবে না ধরাতল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ?

—উৎসর্গ-৪৫।

প্রতি পংক্তির প্রারম্ভে ২ মাত্রার অতি পর্ব এবং পদে ৬+৪ ॥ ৬+৫ ক্রমে পর্ব বিন্যাসে ধ্বনিবৈচিত্র্য এসেছে—সে কথা বলাই বাহুল্য।

মিশ্রবৃত্ত রীতির পর্ব যে 'চতুষ্কল' মাত্রক তা স্থির হয়ে গেছে এই যুগেই। তাই পূর্বে ৬ বা ৭ মাত্রার পর্ব মিশ্রবৃত্তে লেখা হলেও অতঃপর আর তা ঘটেনি। মানসীর 'নিষ্ফল কামনা' কবিতায় মিশ্রবৃত্ত রীতির মুক্তক যেন পরিণত হয়ে ফুটে উঠতে চেয়েছে। অন্যদিকে সনেট রচনার ক্ষেত্রেও কবি নব-নব প্রয়োগে প্রয়াসী হয়েছেন স্তবক ভাষা ও মিল রচনার বিচারে। মহাপয়ারকে প্রবাহ দান করেছেন। সমিল প্রবহমান মহাপয়ারের প্রথম রচনা রূপে সোনারতরী কাব্যের 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাটি স্মরণীয়। সমিল প্রবহমান পয়ারে রচিত একটি সনেটের কয়েকটি পঙ্‌ক্তি :—

অপূর্ব রহস্যময়ী মূর্তি বিবসন;
নবীন যৌবন স্নাত সম্পূর্ণ যৌবন—
পূর্ণস্ফুট পুষ্প যথা শ্যাম পত্র পুটে
শৈশবে যৌবনে মিশে উঠিয়াছে ফুটে
এক বৃন্তে। বিস্মৃতি-সাগর নীল নীরে
প্রথম উষার মতো উঠিয়াছে ধীরে।

—মানসী : 'অহল্যার প্রতি'।

সমিল প্রবহমান মহাপয়ারের উদাহরণ :—

প্রসন্ন বদনে মন্দ হেসে
পরাবে মহিমালক্ষ্মী ভক্ত কণ্ঠে বরমাল্য খানি,
করপদ্ম পরশনে শান্ত হবে সর্বদুঃখ গ্লানি
সর্ব অমঙ্গল। লুটাইয়া রক্তিম চরণ তলে
ধৌত করি দিব পদ আজন্মের রুদ্ধ অশ্রুজলে।

সুচির সঞ্চিত আশা সম্মুখে করিয়া উদ্‌ঘাটন
জীবনের অক্ষমতা কাঁদিয়া করিব নিবেদন,
মাগিব অনন্ত ক্ষমা। হয়ত ঘুচিবে দুঃখনিশা,
তৃপ্ত হবে একপ্রেমে জীবনের সর্বপ্রেম তৃষা।
—চিত্রা : 'এবার ফিরাও মোরে'।

স্বাভাবিক বাংলা ছন্দ বা দলবৃত্তের স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের কাছে অজ্ঞাত ছিল না। তাই তাঁর দৃঢ় ধারণা হয়েছিল গভীর ভাবমূলক কবিতাও এই ছন্দে লেখা হতে পারে। এই ধারণতার যথার্থতা যাচাই করতে তিনি বিলম্ব করেননি। 'ছবি ও গান' এবং 'কড়ি ও কোমল' কাব্যে কোনো কোনো কবিতায় লঘু ভাবের বাহনরূপে তিনি দলবৃত্তের প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু মানসী পর্বে সেরূপ প্রয়োগ আর চোখে পড়ে না। তবে গভীর ভাবের বাহন রূপে এই ছন্দটির উপযোগিতা যাচাইয়ের কথা তাঁর মনে জাগরূক ছিল। কথা কাব্যের 'নকলগড়', 'হোরিখেলা' ও 'বিবাহ' এবং কল্পনা কাব্যের 'হতভাগ্যের গান'—কবিতা চারটিতে তার পরিচয় মেলে। এই সাফল্য তাঁকে বিনা দ্বিধায় 'ক্ষণিকা' কাব্য (১৯০০)-এর কবিতা রচনায় প্রণোদিত করে। তাই ক্ষণিকা থেকেই শুরু হয় দলবৃত্তের বিজয় অভিযান।

দেখা গেল—মানসীর পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রধান বাহন ছিল মিশ্রবৃত্ত। মাঝে মধ্যে কলাবৃত্তের অস্তিত্ব আভাসিত হলেও মিশ্রবৃত্তের সঙ্গে তার পার্থক্য সুস্পষ্ট ছিল না। দলবৃত্তের ব্যবহার থাকলেও তার প্রয়োগ তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। মানসীর যুগে এসে রুদ্ধদলের দ্বিমাত্রকতা ও মিশ্রবৃত্তের বিশিষ্টতা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল। দলবৃত্তের উপযোগিতা গভীর ভাবের বাহন রূপেও প্রমাণিত হল। বলতে কি 'মানসী পর্ব'ই ক্ষণিকা পর্বের ভূমিকা করে রাখল।

(ক্ষণিকার ছন্দ ১৯০০—)

মানসীর পর্বে কলাবৃত্তের যে শক্তি ও সৌন্দর্য প্রকাশ পেয়েছে, তার ধারা ক্ষণিকা ও তার পরবর্তী পর্বেও অব্যাহত আছে। ধ্বনি বিন্যাসের বিবিধ ও বিচিত্র কৌশল প্রয়োগ করে রবীন্দ্রনাথ যেন ছন্দ নিয়ে খেলায় মত্ত হয়েছেন।

আমরা তার প্রমাণ ক্ষণিকার পর্বেও পাই। মিশ্রবৃত্ত রীতির প্রয়োগেও রবীন্দ্রনাথ পূর্ব ধারণাই অনুসরণ করেছেন। তবে লক্ষণীয় হল ১৯০০—১৯১৬ সালের মধ্যে রচিত ১৩২টি মিশ্রবৃত্ত কবিতার মধ্যে ১১৮টিই সনেট। অর্থাৎ সনেটেরই প্রাধান্য এ-যুগে। নৈবেদ্যের এই রীতির ৭৮টি কবিতার সবগুলিই সনেট। তবে সনেট পঙ্‌ক্তি-দৈর্ঘ্য, মিল ও স্তবক-বিচারে বৈচিত্র্যমণ্ডিত। তার মধ্যেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল—সমিল প্রবহমান মহাপয়ার সনেট। সনেট মূলে কবিতাই। তাই কাব্যভাব অক্ষুণ্ন রেখে বাহ্য রূপের নানা প্রকার শৈথিল্য ও নব রূপায়ণে রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় সনেট-মনস্কতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।[৮]

রবীন্দ্রনাথের 'বাংলা স্বাভাবিক ছন্দ'কে সাধুসাহিত্যের আসরে মর্যাদার আসন দানের মহৎ ইচ্ছাটি ক্ষণিকা পর্বেই চরিতার্থ হয়। তাই বাংলা ছন্দের ইতিহাসে 'ক্ষণিকা'র একটি অনন্য সাধারণ স্থান আছে। এই কাব্যেই প্রথম দলবৃত্ত রীতির নানা ধ্বনির রূপময় বিচিত্র প্রয়োগে বাংলা কবিতা সহজ সুর ও চটুল ভঙ্গিতে গভীর কথা বলে ওঠে। লৌকিক বা দলবৃত্ত ছন্দে রচিত বাংলা কবিতার শক্তি ও সৌন্দর্য কিরূপ, তা কতদূর শ্রুতি-সুখকর হতে পারে তা জানা গেল 'ক্ষণিকা'র কবিতাগুলি পড়ে। এই রীতিটি ছড়ার ছন্দ নামেও পরিচিত। কিন্তু ছড়াজাতীয় রচনার ছন্দে থাকে সংস্কারজাত অপটুতা, শৈথিল্য ও ফাঁক। আর গভীর ভাবের কবিতায় প্রযুক্ত ছন্দটি সেই সব দুর্বলতা থেকে মুক্ত। গভীর ভাব, বিচিত্র মিল, রুদ্ধদলের স্পন্দন ও লঘু চপল গতির আবেগ প্রভৃতির সাহায্যে দলবৃত্তের যে শক্তি ও সুষমা ফুটে উঠল তা সত্যই বিস্ময়কর। দলবৃত্ত বা বাংলার স্বাভাবিক ছন্দে যে এমন শক্তি ও সুষমা-বৈচিত্র্য থাকতে পারে সে কথা কে জানত? তাই 'ক্ষণিকা'র প্রকাশে কাব্যানুরাগী পাঠক সম্প্রদায় চমকিত ও বিস্মিত না হয়ে পারে নি।[৯] এবার রবীন্দ্রনাথের হাতে দলবৃত্তের যে শিল্পমাধুরী উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে—তার কিছু পরিচয় দেওয়া যাক্।—

১। আমি নাব্‌ব মহাকাব্য সংরচনে
ছিল মনে—
ঠেকল কখন তোমার কাঁকন
কিঙ্কিণীতে
কল্পনাটি গেল ফাটি
হাজার গীতে।

মহাকাব্য সেই অভাব্য
দুর্ঘটনায়
পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে
কণায় কণায়।

—ক্ষণিকা 'ক্ষতিপূরণ'।

ছন্দের অপরূপ নৃত্য, ভাষা ও ভঙ্গির স্বাভাবিকতায় যে 'অভাব্য সংঘটন' ঘটেছে তাতে তখনকার দিনে লোকের ধাঁধা লাগবারই কথা। অতিপর্বের সাহায্যে ছন্দের নৃত্যভঙ্গিমা আরও অপরূপ হয়ে ওঠে—

২। যদি ননি ছানার গাঁয়ে
কোথাও অশোক-নীপের ছায়ে
আমি কোনো জন্মে পারি হতে
ব্রজের গোপবালক
তবে চাইনা হতে নববঙ্গে
নবযুগের চালক।

—ক্ষণিকা: 'জন্মান্তর'।

কোথাও বা শিশুমনের উপযোগী রূপকথার আমেজ নিয়ে ছড়ার সুর অশিথিল ভঙ্গিতে দলবৃত্তে বেজে উঠেছে—

এমনি তরো মেঘ করেছে, সারা আকাশ ব্যেপে,
রাজপুত্তুর যাচ্ছে মাঠে একলা ঘোড়ায় চেপে।
গজমোতির মালাটি তার বুকের পরে নাচে,—
রাজকন্যা কোথায় আছে খোঁজ পেলে কার কাছে।

—শিশু: 'ছুটির দিনে'।

এ-ছন্দে দর্শন-সুলভ গুরু-গম্ভীর ধ্বনিও সংযত ভাবে বেজে ওঠে অবলীলায়।—

৩। এই জ্যোতিঃ সমুদ্র মাঝে
যে শতদল পদ্মরাজে
তারি মধু পান করেছি
ধন্য আমি তাই।
যাবার দিনে এই কথাটি
জানিয়ে যেন যাই।

—গীতাঞ্জলি-১৪২।

গুরুগম্ভীর ভাবের অবলীলায় অভিব্যক্তির লাভ সঙ্গে সঙ্গে। প্রতি পঙ্‌ক্তির প্রারম্ভে তিনদল মাত্রার পর্ববিন্যাসে কেমন নাচের ভঙ্গিও স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে তারও নিদর্শন আছে। যেমন—

৪। ফাগুনের কুসুম ফোটা হবে ফাঁকি,
আমার এই একটি কুঁড়ি রইলে বাকি।
সেদিনে ধন্য হবে তারার মালা,
তোমার এই লোকে লোকে প্রদীপ জ্বালা;
আমার এই আঁধার টুকু ঘুচলে পরে।
—গীতিমাল্য-৮০।

এখানে ৩+৪+৪ ক্রমে দলমাত্রার এবং নীচেরটিতে ৪+৪+৩ মাত্রাক্রমের ধ্বনির খেলা লক্ষণীয়—

৫। মাণিক-গাঁথা ওই যে তোমার কঙ্কণে
ঝিলিক লাগায় তোমার শ্যামল অঙ্গনে।
কুঞ্জ-ছায়া গুঞ্জরণের সঙ্গীতে
ওড়না ওড়ায় এ কী নাচের ভঙ্গিতে,
শিউলি-বনের বুক যে ওঠে আন্দোলি।
—গীতালি-২৬।

আবার ৩+৪+৩+৪ ॥ ৩+৪+৪+১ — ২৬ মাত্রার দ্বিপদী রচনার পর্ব-ধ্বনিতে বৈচিত্র্য এসেছে, ঝোঁক স্পষ্ট হয়েছে।[১০] কোথাও বা এই ৩+৪+৩+৪ মাত্রার পর্বেই ভাব ও কবির অভিরুচি অনুযায়ী ধ্বনি মন্থর হয়ে উঠেছে—

৬। ভরা থাকা স্মৃতি সুধায় বিদায়ের পত্রখানি
মিলনের উৎসবে তায় ফিরায়ে দিও আনি।...
সারা দিন সংগোপনে সুধারস ঢালবে মনে
পরানের পদ্মবনে বিরহের বীণাপাণি।
—গীতাবিতান: 'ভরা থাক স্মৃতি সুধায়'।

দেখা যাচ্ছে চতুর্দল পর্ব বিশিষ্ট দলবৃত্ত ছন্দে কবি নানা বৈচিত্র্য এনেছেন। তাঁর ৩+৪ বা ৪+৩ ক্রমের মাত্রা-বিন্যাসকে 'সপ্তদল' পর্বিক রচনা রূপেও দেখা যেতে পারে।[১১] সে যাই হোক-ছন্দের উৎকর্ষ বিবেচনায় কানের

তৃপ্তিই আসল কথা। মানসীর পর্বে পরীক্ষিত দলবৃত্ত এ-যুগে পরিপূর্ণ শক্তি ও সুষমা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। ক্ষণিকা, শিশু, খেয়া, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালিতে দলবৃত্তেরই প্রাধান্য। পরবর্তীকালে দলবৃত্তের আরও বহু অভিনব প্রয়োগ সার্থকতায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে বাংলা কাব্য। যা এতকাল চিন্তার অতীত ছিল। রবীন্দ্রনাথই প্রথম অনুধাবন করেন—"চলতি ভাষাটাই স্রোতের জলের মতো চলে, তাহার নিজের একটি ধ্বনি আছে"।[১২] অনেকদিন আগে ১২৯০ সালের শ্রাবণ-সংখ্যা ভারতীতে রবীন্দ্রনাথই দৃঢ়তার সঙ্গে সিদ্ধান্ত করেছিলেন—"যদি কখনো স্বাভাবিক দিকে বাংলা ছন্দের গতি হয়, তবে ভবিষ্যতের ছন্দ রামপ্রসাদের ছন্দের [দলবৃত্তের] অনুযায়ী হবে।[১৩] বলতে কি রবীন্দ্রনাথের এই ছন্দ-চিন্তার সার্থকতা প্রমাণিত হয়েছে—তাঁর নিজের রচনা থেকেই। ছন্দোবিদ্ ও ছন্দঃশিল্পীর এরূপ সমন্বয় সর্বত্রই দুর্লভ। লক্ষণীয় হল—ক্ষণিকায় যে নবীন ছন্দধারার সূচনা তার প্রবাহ আজও অব্যাহত।

বলাকার ছন্দ (১৯১৬—)

মানসীতে নব্য কলাবৃত্তের যে ধারার প্রারম্ভ ঘটেছে তা এ-যুগেও অব্যাহত। তবে তাতে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো বিশিষ্টতা ফুটে ওঠেনি। তবু লক্ষণীয় হল—চতুষ্কল পর্বের প্রতি কবির প্রবল আকর্ষণ। যা 'খাপছাড়া', 'ছড়া' ও 'গল্প-সল্প' প্রভৃতিতে প্রত্যক্ষ করা যায়। ছড়ার প্রধান বাহন দলবৃত্ত হলেও রবীন্দ্রনাথ কলাবৃত্তেও ছড়া লিখেছেন চমৎকার। এমন কি কলাবৃত্তে সনেটও রচনা করেছেন যা বাংলা সাহিত্যে প্রথম। বাংলার সেই প্রথম কলাবৃত্ত সনেটটির প্রথম পঙ্‌ক্তি হল—

'পাবনায় বাড়ি হবে গাড়ি গাড়ি ইঁট কিনি'

—খাপছাড়া-সংযোজন, ।

এ-পর্বের বিশিষ্টতা যা কিছু প্রত্যক্ষ করা যায় তা মূলত মিশ্রবৃত্তে ও কিছুটা দলবৃত্তে।

বলাকার ছন্দ আসলে মিশ্রবৃত্ত রীতির অভিনব রূপের ছন্দ। ক্ষণিকার পর্বে এই রীতির প্রয়োগ অন্য দুই রীতির তুলনায় কম। সম্ভবতঃ এ-রীতির নানা রকম বিচিত্র প্রয়োগের পরীক্ষা-নিরীক্ষা কবি শেষ করে এনেছিলেন।

তবে সন্ধ্যা-সঙ্গীতের 'সন্ধ্যা' ও 'তারকার আত্মহত্যা' (১৮৮২) এবং মানসীর 'নিষ্ফল কামনা'য় (১৮৮৭) যে অনেকটা বন্ধনহীন স্বচ্ছন্দ কাব্যরূপ ফুটে উঠতে চেয়েছিল—সেই মুক্তকের শক্তি ও সৌন্দর্য পুরোপুরি বিকাশের অপেক্ষায় ছিল। এবার মিশ্রবৃত্তের সেই দিক্‌টি আবার কবির চিন্তা-ভাবনা অধিকার করে দীর্ঘ প্রায় বত্রিশ বছর পরে।

পঙ্‌ক্তি প্রান্তিক ভাবযতির অস্বীকৃতির ফলে ভাবের প্রবহমানতা আসে। কিন্তু সাধারণ বা মহাপয়ারের পঙ্‌ক্তি-আয়তন নির্দিষ্টই থাকে। তা হলে সেই পঙ্‌ক্তি-আয়তন অক্ষুণ্ণ রেখেই বা কি লাভ? এই প্রশ্ন জাগে মুক্তির পূজারী কবি মনে। তারই আভাস লক্ষিত হয়েছিল উন্মেষ বা মানসী যুগের দু-একটি কবিতায়। এখন দ্বিধাহীন চিত্তে কবি নির্দিষ্ট মাত্রা-সংখ্যার পঙ্‌ক্তি সীমার বন্ধন ভেঙে ফেললেন। বলাকায় (রচনাকাল—১৯১৪-১৬) কবিতার সম-আয়তনের পঙ্‌ক্তি-বন্ধনের খোলস খসে যায়। দেখা দেয় মুক্তক। তবে বাইরের বন্ধন খসলেও ছন্দের অন্তরের বন্ধন রয়ে গেল। কারণ ছন্দ মানেই একপ্রকার বন্ধন। সেই বন্ধন খসলে ছন্দ আর ছন্দ থাকে না। তাই মুক্তকেও মাত্রা সমাবেশ, পর্ব গঠন ও যতিস্থাপনের বিধান সুস্থিরই থাকে। পঙ্‌ক্তি ও স্তবক রচনা ও মিলের ক্ষেত্রে কবির রইল পূর্ণ স্বাধীনতা। এটাই এ-যুগের বিশিষ্টতা। রবীন্দ্রনাথের মতে—"বলাকায় নূতন পর্ব এসেছে, ভাব ভাষা ও ছন্দ নূতন পথে গেছে।"[১৪] এই সব কারণে বাংলা কাব্য ও মিশ্র কলাবৃত্ত রীতির ছন্দ বিবর্তনের ইতিহাসে বলাকার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। মিশ্রবৃত্ত রীতির সাধারণ পয়ার মুক্তক মানসীতে রচিত হলেও মহাপয়ার মুক্তক পাওয়া গেল বলাকা কাব্যেই (ছবি, ১৯১৪ অক্টোবর)। মিশ্রবৃত্ত রীতির সমিল মুক্তকের নিদর্শন এটি। চরণ-আয়তন দুই থেকে আঠারো মাত্রা পর্যন্ত দীর্ঘ, ভাবের উপযোগী পঙ্‌ক্তি সমিল ও জোড়মাত্রক পর্ব বা উপপর্ব। দৃষ্টান্তের সাহায্যে তা স্পষ্ট হবে—

তোমার চিকন
চিকুরের ছায়াখানি বিশ্ব হতে যদি মিলাইত
তবে
একদিন কবে
চঞ্চল পবনে লীলায়িত
মর্মর-মুখর ছায়া মাধবী বনের
হত স্বপনের। —বলাকা-৬।

ভাব সাত চরণে পূর্ণ হয়েছে। চরণগুলি অসমান কিন্তু সমিল।

একমাত্র বলাকা কাব্যেই তেইশটি মিশ্রবৃত্ত সমিল মুক্তক রয়েছে। 'লেখন' ও 'বনবাণী' ছাড়া পরবর্তী প্রায় প্রত্যেক কাব্যেই মুক্তক আছে। কোনো কোনো কাব্যে চোদ্দ মাত্রার দীর্ঘতম পঙ্‌ক্তির মুক্তকও আছে। এই প্রসঙ্গে 'পরিশেষ' (১৯৩২) কাব্যের 'অগোচর' কবিতাটি উল্লেখযোগ্য। তার থেকে কিছু অংশ—

হে প্রিয় তোমার যতটুকু
দেখেছি শুনেছি
জেনেছি পেয়েছি স্পর্শ করি—
তার বহু শতগুণ অদৃশ্য অশ্রুতে
রহস্য কিসের জন্যে বদ্ধ হয়ে আছে।
কার অপেক্ষায়।
সে নিরালা ভবনের…
কুলুপ তোমার কাছে নেই।
কার কাছে আছে তবে।

—পরিশেষ : 'অগোচর'।

এখানে হ্রস্বতম চরণ ছয় ও দীর্ঘতম চরণ চোদ্দ মাত্রার। অমিল প্রবহমান পয়ারের মুক্তক। অমিল প্রবহমান মহাপয়ার মুক্তকের নিদর্শনরূপে 'নবজাতক' (১৯৩৯) কাব্যের 'রাত্রি' কবিতাটি স্মরণীয়।

মিশ্রবৃত্তের মতোই দলবৃত্তেও মুক্তক রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ এই যুগেই। সে-বিচারে প্রয়োগে নবীন হলেও দলবৃত্ত মিশ্রবৃত্তের সমকক্ষতার দাবিদার। কিন্তু মিশ্রবৃত্তের প্রবহমান পয়ার ও মহাপয়ার জাতীয় কোনোপ্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা দলবৃত্ত নিয়ে হয়নি। এ-ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য একটি প্রয়োগ হল—দলবৃত্তে প্রবহমান মহাপয়ার রচনা। পূরবী কাব্যের (১৯২৫) প্রথম কবিতা 'পূরবী'ই (১৯১৭) তার একমাত্র নিদর্শন। অবশ্য এ-কবিতাটি 'পলাতকার' (১৯১৮) শেষ কবিতা 'শেষ গান' রূপেও নির্দিষ্ট।…তার প্রথম অংশটুকু, দেখা যাক—

যারা আমার সাঁঝ-সকালের গানের দীপে জ্বালিয়ে দিলে আলো
আপন হিয়ার পরশ দিয়ে, এই জীবনের সকল সাদা-কালো
যাদের আলো-ছায়ার লীলা, সেই যে আমার আপন মানুষগুলি
নিজের প্রাণের স্রোতের পরে আমার প্রাণের ঝরণা নিল তুলি,

তাদের সাথে একটি ধারায় মিলিয়ে চলে, সেই তো আমার আয়ু ;
পাই সে কেবল দিন-গণনার পাঁজির পাতায় নয় সে নিশাস বায়ু ॥

—পূরবী : 'পূরবী'।

এই ৪+৪ । ৪+৪+২=১৮ মাত্রার দলবৃত্ত প্রবহমান মহাপয়ার রচনার সতের বৎসর পর দলবৃত্তের শক্তির পরিচয় দান প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'মেঘনাদবধ' কাব্যের প্রারম্ভিক কয়েক পঙ্‌ক্তির (মিশ্রবৃত্ত থেকে) দলবৃত্তে রূপান্তরিত করেছেন। যেমন—

যুদ্ধ তখন সাঙ্গ হল বীরবাহু বীর যবে
বিপুল বীর্য দেখিয়ে হঠাৎ গেলেন মৃত্যুপুরে
যৌবনকাল পার না হতেই। কও মা সরস্বতী,
অমৃতময় বাক্য তোমার, সেনাধ্যক্ষ পদে
কোন্ বীরকে বরণ করে পাঠিয়ে দিলেন রণে
রঘুকুলের পরম শক্র রক্ষকুলের নিধি।

—ছন্দ : 'ছন্দের প্রকৃতি' (১৯৭৬), পৃ. ১৬১।

সে যাই হোক, মিশ্রবৃত্ত মুক্তকের কয়েক মাস পরেই দলবৃত্ত মুক্তক দেখা দিল বিনা আয়াসেই। মিশ্রবৃত্ত মুক্তকের আদর্শেই দলবৃত্ত মুক্তকের আত্মপ্রকাশ ঘটল। কেবল বাংলা ছন্দেই নয় সমগ্র ভারতীয় ছন্দেরই ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যে কি অভাবনীয় পরিবর্তন এনে দিলেন—তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। বাংলা দলবৃত্ত মুক্তকের প্রথম নিদর্শন রূপে আমরা 'বলাকার' বাইশ-সংখ্যক কবিতাটি উল্লেখ করতে পারি (রচনা ১৯১৫ ফেব্রুআরি)।

চার দলমাত্রা থেকে আঠারো দলমাত্রা পর্যন্ত চরণ হতে পারে দলবৃত্ত মুক্তকে। এই রীতির একটি সমিল মুক্তকের দৃষ্টান্ত :—

এবারে ফাল্গুনের দিনে সিন্ধুতীরের কুঞ্জবীথিকায়
এই যে আমার জীবন-লতিকায়
ফুটল কেবল শিউরে ওঠা নূতন পাতা যত
রক্তবরণ হৃদয়ব্যথার মতো ;
দখিন হাওয়া ক্ষণে ক্ষণে দিল কেবল দোল,
উঠল কেবল মর্মর কল্লোল,
এবার শুধু গানের মৃদু গুঞ্জনে
বেলা আমার ফুরিয়ে গেল কুঞ্জবনের প্রাঙ্গণে।

—বলাকা:২৬।

বলাকা কাব্যের এগারটি এইরূপ কবিতা দলবৃত্ত মুক্তকে রচিত। তবে এই ছন্দের অন্তর্নিহিত শক্তির স্বচ্ছন্দ প্রকাশ ঘটেছে পলাতকায় (১৯১৮) কবিতায়। পলাতকায় পনেরটির মধ্যে বারোটিই দলবৃত্ত মুক্তক। বলাকা ও পলাতকা দলবৃত্ত মুক্তকের সংখ্যা তেইশ। বলাকায় মিশ্রবৃত্ত মুক্তকের সংখ্যাও তেইশ। চোদ্দ মাত্রার দীর্ঘতম চরণের দলবৃত্ত পয়ারও লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ। এ-প্রসঙ্গে পরিশেষ কাব্যের 'তেহি নো দিবসাঃ' উল্লেখযোগ্য।—

এই অজানা সাগর জলে বিকেল বেলার আলো
লাগল আমার ভালো।
কেউ দেখে কেউ নাই-বা দেখে রাখবে না কেউ মনে,
এমন তরো ফেলা ছড়ার হিসাব কি কেউ গোনে।
এই দেখে মোর ভরল বুকের কোণ ;
কোথা থেকে নামল রে সেই খেপাদিনের মন,
যেদিন অকারণ,
হঠাৎ হাওয়ায় যৌবনেরি ঢেউ
ছলছলিয়ে উঠত প্রাণে জানত না তা কেউ।

—পরিশেষ ঃ 'তেহি নো দিবসাঃ'।

ক্ষণিকা পর্বে দলবৃত্ত রীতির প্রতিষ্ঠা ও জয়যাত্রা শুরু হয়। বলা যায়—তার পূর্ণ পরিণতি ঘটল—বলাকার পর্বে এসে। বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণের স্বাভাবিক ছন্দটি এই বলাকার পর্বেই যেন পুনশ্চ কাব্যের 'গদ্যছন্দের' ভূমিকা করে রাখল। এই প্রসঙ্গে পরিশেষ (১৯৩২) কাব্যের প্রথম সংস্করণের 'খেলনার মুক্তি' প্রভৃতি কবিতাও স্মরণীয় যা পরে 'পুনশ্চ' কাব্যে সমাহৃত হয়।

'বলাকার ছন্দ' বলতে সাধারণভাবে আমরা মিশ্রবৃত্ত মুক্তকের কথাই বুঝে থাকি। কিন্তু যে কোনো রীতির মুক্তককেই 'বলাকার ছন্দ' বলা যেতে পারে। মিশ্রবৃত্ত মুক্তকের মতোই দলবৃত্ত মুক্তকের জয়যাত্রা শুরু বলাকা কাব্য থেকেই। বলাকায় মিশ্রবৃত্ত মুক্তকের সংখ্যা ২৩ এবং বলাকা ও পলাতকায় মিলে দলবৃত্ত মুক্তকের সংখ্যাও ২৩। পলাতকায় মিশ্রবৃত্ত মুক্তক নেই। কলাবৃত্ত মুক্তকের প্রয়োগ ঘটেছে বলাকার পরেই, সেই ধারাতেই। সুতরাং সব মুক্তকই 'বলাকার ছন্দ' রূপে অভিহিত হতে পারে। তাতেই নিহিত বলাকাছন্দের যথার্থ পরিচয়।

পুনশ্চ কাব্যের ছন্দ (১৯৩২—)

কি ভাব, কি ভাষা, কি ছন্দ—সকল ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ নিত্য নূতনের পূজারী। তাঁর ছন্দ বিবর্তনের ধারাটি নানা বাঁক ঘুরে জীবনের শেষে এসে গদ্যছন্দে পরিণতি লাভ করেছে। অভিনব রূপ ও রসের আস্বাদে নবীন হয়ে উঠল বাংলা কাব্য। অবশ্য অভিনবতার অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন গদ্যছন্দ প্রবর্তনের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল ধরে চিন্তা-ভাবনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তবে স্থির চিত্তে গদ্যকবিতার সূত্রপাত করেন।

বাংলা গান ও কবিতা ইংরেজি গীতাঞ্জলির Song Offerings গদ্যে অনুবাদ করে স্বীকৃতি ও সম্মানলাভ করেন রবীন্দ্রনাথ (১৯১৩)। সে সময়ই বাংলা গদ্য কবিতার কথা তাঁর মনে উঁকি দেয়।[১৫] তাঁর এই চিন্তার পরিচয় পাই প্রথম সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে গদ্যকবিতা লেখার আমন্ত্রণে ও পরে গদ্যকবিতার পরীক্ষায়, লিপিকার (১৯২২) কয়েকটি রচনায় সেগুলি গদ্যরূপী কবিতা। আকৃতিতে গদ্য হলেও প্রকৃতিতে কবিতাই। কবিতার মতো খণ্ডিত বাক্য বা বাক্যাংশের সজ্জায় কবির মন তখনও দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। এই দ্বিধা কাটতে কিছুটা সময় লাগে। বাক্ পর্বাশ্রয়ী এ-ছন্দ মাত্রা সমাবেশ, নির্দিষ্ট পর্ব-গঠন ও পর্ব-যতি স্থাপনের বিধান থেকেও মুক্ত। তবু কাব্যশিল্প বা ভাবের ছন্দের বাঁধন থেকেই গেল।[১৬] গদ্যছন্দের স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"গদ্যকাব্যে অতি নিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয়, পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশ রীতিতে যে একটি সসজ্জ, সলজ্জ অবগুণ্ঠন-প্রথা আছে, তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীন ক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে। অসংকুচিত গদ্য-রীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব।"

—'ভূমিকা' : পুনশ্চ, (প্রমথ সং)।

কবিতায় ক্রমে ক্রমে ভাষাগত ছন্দের আঁটা-আঁটির সমান্তরে ভাবগত ছন্দ উদ্ভাবিত হচ্ছে। ভাবের ছন্দ দিয়ে কাব্য গদ্যের সীমানায় তার স্থান করে নিয়েছে। অর্থাৎ গদ্যকবিতার গদ্য ও সাধারণ বা আটপৌরে গদ্য একবস্তু নয়। কাব্য ভাবানুসারী নিয়ন্ত্রিত শিল্পিত গদ্যই কবিতার বাহন। আটপৌরে জীবনের গদ্য বা কেজো গদ্য নয়। উপরন্তু গদ্যছন্দ শ্রুতি সর্বস্ব নয় তার পরিমিতি বোধ মনের

ব্যাপার। গদ্যছন্দে রচিত যথার্থ বাংলা কবিতার সঙ্গে বাঙালি পাঠকের প্রথম সুস্পষ্ট সাক্ষাৎ ঘটে পুনশ্চ কাব্যে (১৯৩২)। ব্যাপারটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বোঝা সহজ হবে।—

আমি বললেম, "সুরসিকে, খুশি হবে না,
এ গদ্যকাব্য।"
কপালে ভ্রূকুঞ্চনের ঢেউ খেলিয়ে
বললে, "আচ্ছা তাই সই।"
সঙ্গে একটু স্তুতিবাক্য দিলে মিলিয়ে ;
বললে, "তোমার কণ্ঠস্বরে
গদ্যে রঙ ধরে পদ্যের।"
বলে গলা ধরলে জড়িয়ে।
আমি বললেম, "কবিত্বের রঙ লাগিয়ে নিচ্ছ
কবিকণ্ঠ থেকে তোমার বাহুতে ?"
সে বললে, "অকবির মত হল তোমার কথাটা ;
কবিত্বের স্পর্শ লাগিয়ে দিলেম তোমারিই কণ্ঠে,
হয়তো জাগিয়ে দিলেম গান।"
শুনলুম নীরবে, খুশি হলুম নিরুত্তরে॥

—আকাশপ্রদীপ, 'ময়ূরের দৃষ্টি'।

পুনশ্চ, শেষ সপ্তক, পত্রপুট, শ্যামলী, এবং আকাশপ্রদীপ কাব্যে মোট ১২২টি গদ্যকবিতা সংকলিত। প্রবহমান পয়ারে যে ছন্দোমুক্তির আভাস সূচিত হয়েছিল তার পরিণতি গদ্য ছন্দে অর্থাৎ গদ্য কবিতায়। 'মানসী', 'ক্ষণিকা' ও 'বলাকার' মতো 'পুনশ্চ' কাব্যও বাংলা ছন্দের ইতিহাসে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করেছে। অপরাপর ছন্দের মতো গদ্যছন্দও অচিরে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সমসাময়িক প্রায় সব কবিই গদ্য কবিতা রচনায় আকৃষ্ট হন। সে আকর্ষণ আজও সমমাত্রায় অব্যাহত রয়েছে। এমন কি সুমিত-সুনিয়মিত ছন্দের তুলনায় আজকাল গদ্যছন্দেই কবিতা লেখা হচ্ছে বেশি। তবে সব রচনাই কবিতা নয়। কারণ ভাবহীন, ছন্দ-হীন ছত্র সমাবেশ কোনো ক্রমেই কবিতা নয়। কিন্তু আজ সেরূপ, রচনাই বেশি চোখে পড়ে। তবে তা হারিয়েও যাচ্ছে অচিরে।

আলোচ্য পর্বে গদ্যকবিতার প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠা করলেও রবীন্দ্রনাথ ছন্দোবদ্ধ কবিতাই লিখেছেন বেশি। কলাবৃত্ত রীতির পয়ার এবং চার, পাঁচ, ছয় ও

সাত মাত্রার পর্বে প্রবহমানতা এনে মুক্তক রচনা করেছেন কবি। লক্ষণীয় কলাবৃত্ত রীতির প্রবহমান পয়ার বা মহাপয়ার রচনা করেননি। এই প্রসঙ্গে নবজাতকের 'রাতের গাড়ি'; বীথিকার 'আদিতম' রূপকার' ও 'রাতের দান'; নবজাতকের 'শেষবেলা'; সেঁজুতির 'যাবার মুখে' এবং সানাই কাব্যের 'ব্যথিতা' প্রভৃতি কবিতার কলাবৃত্ত মুক্তক রূপ উল্লেখযোগ্য। 'ব্যথিতা' ষট্‌কল পার্বিক অমিল মুক্তক রূপে বিবেচ্য। পঞ্চকল পর্বিক মুক্তকের একটি দৃষ্টান্ত :—

রাতের পরে কেটেছে দুখ রাত,
দিনের পরে দিন
দারুণ তাপে করেছে তনু ক্ষীণ।
সৃষ্টিকারী বজ্রপাণি যে-বিধি নির্মম
বহ্নি তুলি সম
কল্পনা সে দখিন হাতে যার
সব-খোয়ানো দীক্ষা তারি নিঠুর সাধনার
নিয়েছে ও যে প্রাণে ;
নিজেরে ও কি বাঁচাতে কভু জানে !
—বীথিকা : 'রূপকার'।

এ-যুগেই কবি কলাবৃত্তের চতুষ্কল পর্বে ৮ ও ৬ মাত্রার পদ ভাগের সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা লিখেছেন। বাংলা সাহিত্যের কলাবৃত্তের সেই প্রথম সনেটটি হল—

পাবনায় বাড়ি হবে, গাড়ি গাড়ি ইঁট কিনি,
রাঁধুনি মহল-তরে করোগেট শীট কিনি।
ধার করে মিস্ত্রির সিকি বিল চুকিয়েছি,
পাওনাদারের ভয়ে দিন রাত লুকিয়েছি,
শেষে দেখি জানলায় লাগে নাকো ছিট্‌কিনি।
দিন রাত দুদ্দাড় কী বিষম শব্দ যে,
তিনটে পাড়ার লোকে হয়ে গেল জব্দ যে,
ঘরের মানুষ করে খিট্‌ খিট্‌ খিটকিনি।
কী করি-না ভেবে পেয়ে মথুরায় দিনু পাড়ি,
বাজে খরচের ভয়ে আরেকটা পাকা বাড়ি
বানাবার মতলবে পোড়া এক ভিট কিনি।

তিনতলা ইমারত শোভা পায় নবাবেরই,
সিঁড়িটা রইল বাকি চিহ্ন সে অভাবেরই
তাই নিয়ে গৃহিণীর কী যে নাক সিটকিনি !
—খাপছাড়া, সংযোজন-১ ।

জীবনের শেষ পর্বেও রবীন্দ্রনাথ মিশ্র কলাবৃত্ত রীতিরই প্রয়োগ করেছেন সবচেয়ে বেশি। তবে তাতে আর অভিনবতার ছাপ নেই বললেই হয়। বরং ভাব ও অনুভূতিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে কবিতার অঙ্গসজ্জা বা মিলের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়েছেন। তাই প্রান্তিক কাব্য থেকে শুরু করে অধিকাংশ মিশ্রবৃত্ত কবিতাই মিলহীন।

তবে দলবৃত্ত রীতিতে যথাসম্ভব বৈচিত্র্য আনতে প্রয়াসী হয়েছেন কবি। পুনশ্চ কাব্যের কয়েকটি কবিতা দলবৃত্ত রীতির মুক্তক।[১৭] রবীন্দ্রনাথ দলবৃত্ত রীতির সমিল মুক্তক উপহার দিয়েছিলেন বলাকা কাব্যে, আর দলবৃত্ত অমিল মুক্তক রচনা করলেন পুনশ্চ কাব্যে। শুধু তাই নয়, দলবৃত্ত রীতিতে সনেট রচনারও পরীক্ষা করেছেন। সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্যে মাত্র দুইটি দলবৃত্ত সনেট মেলে। সে দুইটি হল—'ছড়ার ছবি' (১৯৩৭) কাব্যের 'আকাশ প্রদীপ' এবং 'আরোগ্য' (১৯৪১) কাব্যের আঠার-সংখ্যক কবিতা। দুইটিই সাধারণভাবে সমিল প্রবহমান পয়ার বন্ধে রচিত। সনেটের মিল বিন্যাস ও স্তবক ভাগের নীতি অনুসৃত হয়নি। সনেটের কঠোর বন্ধনমুক্ত এই কবিতাগুলি 'রাবীন্দ্রিক সনেট' রূপে বিবেচ্য। মধুসূদন মিশ্রকলাবৃত্ত রীতির প্রবহমান পয়ারেই সনেট রচনার আদর্শ স্থাপন করেন। রবীন্দ্রনাথ মিশ্রকলাবৃত্তের একাধিপত্যকে অস্বীকার করে কলাবৃত্ত ও দলবৃত্ত রীতিতেও সনেট রচনা করে ছন্দোরীতি দুইটির উপযোগিতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। কিন্তু কিছু প্রয়োগ পরীক্ষা করেই নিরস্ত হয়েছেন। তাই সনেট রচনায় কলাবৃত্ত ও দলবৃত্তের শক্তির যথার্থ পরিচয় পাওয়া সম্ভব হয়নি। তা রইল ভাবীকালের জন্য।

বলাকার পর্বে পূরবী কাব্যের-'আশা', 'ঝড়', 'আনন্দ' ও 'চিঠি', নটরাজ গ্রন্থের 'বর্ষার প্রত্যাশা' ও 'শেষ মিনতি', এবং নবজাতক কাব্যের 'ইষ্টিশন' ও 'জবাবদিহি'—কবিতায় একাধিক রীতির ছন্দের সমবায়ের পরিচয় সুস্পষ্ট। পূরবীর কবিতা চারটির ভূমিকাংশ দলবৃত্তে এবং বিষয়বস্তু মিশ্রবৃত্তে রচিত, নটরাজের কবিতা দুইটিতে পর পর কলাবৃত্ত ও দলবৃত্তের স্তবক সন্নিবেশিত এবং নবজাতকের 'ইষ্টেশনে' পর পর দলবৃত্ত ও চতুষ্কল পর্বিক কলাবৃত্তের

স্তবক ও 'জবাবদিহিতে' প্রথম আট ছত্র চতুষ্কল পর্বিক কলাবৃত্ত তথা অবশিষ্টাংশটুকু দলবৃত্তে রচিত। এই ধরনের রচনায় বৈচিত্র্য এবং পাঠের আকর্ষণ বাড়ে। তবে রবীন্দ্রনাথ ছন্দের দিক্‌ দিয়ে কবিতার এই জাতীয় আকর্ষণ সৃষ্টির প্রয়াস বেশি করেননি।

রবীন্দ্রনাথের রুদ্ধদলাশ্রিত পঞ্চকল পর্বিক কলাবৃত্ত এবং তিনটি মুক্তদল ও একটি রুদ্ধদলের চতুর্দল পর্বিক দলবৃত্ত কবিতা পাঠের ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দেয়। সে-ক্ষেত্রে কলাবৃত্তকে দলবৃত্ত এবং দলবৃত্তকে কলাবৃত্তের কবিতা রূপেও পড়া যায়। তাহলে পঞ্চকল পর্বিক কলাবৃত্ত ও একটি রুদ্ধ সহ চতুর্দল দলবৃত্তের মধ্যেকার সীমারেখাটি কি? এ-ক্ষেত্রে লক্ষ করলেই দেখা যাবে পঞ্চকল পর্বিক কবিতায় এক বা একাধিক পর্ব পাঁচটি মুক্তদলে রচিত এবং চতুর্দল পর্বের কবিতায় চারটি মুক্তদলের পর্ব থাকলে, তাতেই কবিতার মূল ছন্দোরীতি ধরা পড়ে। সাধারণভাবে পাঁচটি মুক্তদলের পর্ব না থাকলে তা দলবৃত্ত এবং চারটি মুক্তদলের পর্ব না থাকলে তা কলাবৃত্ত হবে। এক্ষেত্রে ক্ষণিকার 'যথা সময়' কবিতাটি স্মরণীয়। তাতে কোনো পূর্ণ পর্বে পাঁচটি মুক্তদলের ব্যবহার নেই। সুতরাং এটি দলবৃত্তে রচিত। অবশ্য চার মুক্তদলের পর্বও নেই। তবে পড়ার ভঙ্গীতেই তার দলবৃত্ত সুস্পষ্ট। অন্যথায় কলাবৃত্তের রুদ্ধদল প্রসারিত এবং দলবৃত্তের রুদ্ধদলের উচ্চারণ সংকুচিত হয়—সুতরাং সঠিক পর্বেই কবিতার ছন্দ স্বরূপটি স্পষ্ট বোঝা যাবে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুদীর্ঘ কবিজীবনে (১৮৮২-১৯৪১) কবিতা লিখেছেন ২৯৪৯টি।[১৮] তার মধ্যে মিশ্রবৃত্তে—১২১৬; কলাবৃত্তে—৮৪৯; দলবৃত্তে—৭৬০ ও গদ্যছন্দে ১২৪টি[১৯] রচিত। মানসীর (১৮৯০) পূর্বে মিশ্রবৃত্তের প্রাধান্য ছিল। মানসীর যুগে কলাবৃত্ত ও ক্ষণিকার (১৯০০) যুগে দলবৃত্ত রীতির বিচিত্র ভাবের বাহী শক্তি ও সৌন্দর্যের অনুপম প্রকাশ ঘটে। এই সময় মিশ্রবৃত্তের প্রাধান্য হ্রাস পেয়েছে। যদিও মুক্তক প্রবর্তনের ক্ষেত্রে বলাকার বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। সে যুগে বাংলা ছন্দের তিন রীতির ছন্দেরই প্রয়োগ ও গুরুত্ব প্রায় সমান বলা চলে। পুনশ্চ পর্বে গদ্যছন্দের প্রবর্তন ঘটলেও মিশ্রবৃত্তের প্রাধান্য ফিরে এসেছে। দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ও বহুল প্রচলিত মিশ্রবৃত্তের সংস্কার সাধন করে দৃঢ়, সার্থক ও উপযোগী শিল্পরূপ দান করে তার শক্তি ও সম্পদের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটিয়েছেন, কলাবৃত্ত রীতির অজ্ঞাত শক্তি, সৌন্দর্য ও সম্পদের আবিষ্কার, প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠা দান করে বাংলাছন্দের অভূতপূর্ব সমৃদ্ধির সন্ধান এনে দিয়েছেন। আর

বহুদিনের অবহেলিত অ-কুলীন লৌকিক বা দলবৃত্ত ছন্দোরীতির যথোচিত সংস্কার সাধন করে—তাকে গভীর ও গম্ভীর ভাবের বাহন রূপে সাধুসাহিত্যের আসরে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিন রীতিতেই মুক্তক রচনা করেছেন। অবশেষে গদ্যছন্দে গদ্যকবিতার প্রবর্তন করে অকল্পনীয় সমৃদ্ধি এনে দিয়েছেন বাংলা কবিতা ও ছন্দে। প্রাচীনের সমাদর ও সমৃদ্ধি এবং নবীনের প্রবর্তন ও স্বীকৃতির মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের ছন্দশিল্প প্রতিভার অনন্য মহিমা নিহিত। তাঁর এই ছন্দ-প্রতিভা বাংলা কবিতা ও ছন্দকে তো বটেই, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সর্বভারতীয় ছন্দকেই প্রভাবিত ও সমুন্নত করেছে। তবে আবশ্যকতা ও সম্ভাব্যতা বিচারে এখানে কেবল প্রতিবেশী সাহিত্যের কবিতা ও ছন্দে রবীন্দ্র-ছন্দের অনুপ্রেরণা এবং অনুসৃতির পরিচয় লাভের চেষ্টা করা যাবে।

প্রতিবেশী সাহিত্যে রবীন্দ্র-ছন্দের অনুসৃতি

রবীন্দ্র-কবিপ্রতিভার উত্তরোত্তর স্ফূর্তি এবং প্রতিষ্ঠার ঢেউ বাংলার মধ্যেই সীমিত থাকেনি। প্রতিবেশী সাহিত্যেও তার ছোঁয়া লাগে এবং কম্পন জাগে। এলাহাবাদ তো রবীন্দ্র সাহিত্যের মুদ্রণ-প্রকাশন, অনুবাদ ও আলোচনার কেন্দ্রেই পরিণত হয়েছিল। বাংলা থেকে অসমীয়া এবং ওড়িয়াতে আধুনিকসাহিত্য চর্চার ধারা যায় কলকাতায় আগত অসমীয়া এবং ওড়িয়া উচ্চশিক্ষা-লাভার্থী যুবকদের মাধ্যমে। কলকাতা থেকে অধ্যয়ন শেষে ফিরে যাওয়ার সময় বাংলা সাহিত্য এবং তারই সঙ্গে রবীন্দ্র-সাহিত্যের কিছু কিছু পরিচয় তাঁরা নিয়ে যেতেন। প্রতিবেশী সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্র-সাহিত্যের, বিশেষ করে তাঁর কাব্য ও ছন্দের পরিচয় সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কারে রবীন্দ্র-কাব্যপ্রতিভা সম্মানিত হবার পর। বিশ্বময় স্বীকৃতির ফলে ভারতীয় জনচিত্তেও নতুন করে ব্যাপক আকর্ষণ অনুভূত হল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্যানুরাগীও রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। স্বাভাবিক কারণেই অসমীয়া, ওড়িয়া ও হিন্দী সাহিত্য জগতেও রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ হবার আবেগ নতুন করে অনুভূত হল। ক্রমে ক্রমে রবীন্দ্রনাথ প্রতিবেশী সাহিত্যে সুপরিচিত আপন-জন হয়ে উঠলেন। সসম্মানে গৃহীত হলেন বহু তরুণ সাহিত্যিকের আদর্শ ও প্রেরণার উৎস রূপে। বিপুলভাবে আকৃষ্ট হলেন

বিভিন্ন ভাষার কবিরা। ভাবে, ভাষায় ও ছন্দে ক্রমে ক্রমে অভিনবতামণ্ডিত হয়ে উঠল—আধুনিক অসমীয়া, ওড়িয়া এবং হিন্দী কাব্য-কানন। গড়ে উঠলো রবীন্দ্রানুসারী কবিগোষ্ঠী।[২০] অসমীয়াতে 'জোনাকী' পত্রিকা (১৮৮৯) প্রকাশের সময় থেকে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময় সীমাকে, সাহিত্যে নেতৃত্বদাতা লক্ষ্মীনাথ বেজ বড়ুয়ার স্বীকৃতিকল্পে 'বেজবড়ুয়া যুগ' (১৮৮৯-১৯৪০) বলা হয়। স্বয়ং বেজবড়ুয়া তো বটেই এ-যুগের আরও বহু অসমীয়া কবি রবীন্দ্র-প্রভাবিত।[২১] ওড়িয়াতে গড়ে ওঠে রবীন্দ্র-আদর্শে উদ্বুদ্ধ 'সবুজ গোষ্ঠী' (১৯২১-১৯৩৫)। এই গোষ্ঠীর অবদান ওড়িয়া সাহিত্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বীকৃত। আর হিন্দীতে দেখা দেয় 'ছায়াবাদী' কবিতা ও কবিগোষ্ঠী (১৯১০-৩০)। তবে তিন ভাষার কবিতায় ও ছন্দে রবীন্দ্র-অনুসৃতি সোজাসুজি রবীন্দ্র কবিতা পাঠ এবং রবীন্দ্রছন্দের মননের সাহায্যেও সম্ভব হয়েছে। ভাবে-ভাষায় ও ছন্দে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ প্রতিবেশী সাহিত্যের কবিদের যেমন আকৃষ্ট, মুগ্ধ, প্রণোদিত ও উদ্বুদ্ধ করেছেন তেমনটি আর কারও পক্ষে সম্ভব হয়নি। মধুসূদনের প্রসঙ্গ আমরা সংক্ষেপে চর্চা করেছি। এবার রবীন্দ্রনাথের ছন্দের আকর্ষণ ও তার অনুসৃতি অসমীয়া, ওড়িয়া ও হিন্দী কাব্যের ছন্দে কতটা প্রতিফলিত এবং কিরূপ বিশিষ্টতা দান করেছে তা দেখার চেষ্টা করা যেতে পারে।

অসমীয়া কবিতায় রাবীন্দ্রিক ছন্দ

রবীন্দ্র-সাহিত্যের নবীনতার ঢেউ ভারতের অন্যান্য ভাষার সাহিত্যের মতোই অসমীয়া সাহিত্যেও লাগে। কলকাতায় শিক্ষিত অসমীয়া যুবক সম্প্রদায় বিশেষভাবে এই নবীনতা অনুভব করে। অসমীরা ছাত্রগণ ১৮৮২ সালে কলকাতায় 'অসমীয়া সাহিত্য চ'রা (Assamese Literary Society) স্থাপন করেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তার প্রভাব ক্ষীণ হয়ে আসে। ততদিনে রবীন্দ্রনাথ নতুন আকর্ষণের এবং উদ্দীপনার কারণ হয়ে দেখা দিয়েছেন। তাঁর কাছ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে সে যুগের ছাত্রসম্প্রদায় সভার 'পূর্ব' নাম পরিবর্তন করে 'অসমীয়া ভাষা উন্নতি-সাধিনী সভা' (১৮৮৮) নাম দিয়ে নতুন উদ্যমে কাজে লাগে। এই সভার ব্যবস্থাপনায় ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুআরিতে 'জোনাকী' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বলতে কি এই জোনাকী গোষ্ঠীর কবি-সাহিত্যিকরা

সকলেই রবীন্দ্রানুরাগী পাঠক ও বোদ্ধা ছিলেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—

> "...জোনাকী যুগর লেখক সকলে ল'রালি কালর পরা বঙলা ভাষাত শিক্ষা লাভ করাত বঙলা সাহিত্যর লগতো তেওঁলোকর পরিচয় ঘটেছিল। আমার লেখক সকলে.. বঙ্গীয় লেখনর সাহিত্যও তন্ন-তন্নকৈ অধ্যয়ন করিছিল আরু সেই সাহিত্যর আর্হি অসমীয়া পুথি রচনা করি বলৈ আগ বাঢ়িছিল।...যি চানেকি চাই সেই ভাবাদর্শক অসমীয়াত রূপ দিলে সেই চানেকি হ'ল সেই সময়র বঙ্গ সাহিত্য। গদ্যত সুসংহত দূরান্বয়ী বাক্য গঠনরীতি, কবিতার ছন্দরীতি, আরু উপন্যাস রচনার চানেকি বঙ্গ-সাহিত্যরপরা অসমীয়া লোক সকলে গ্রহণ করিলে।[২২]

সাধারণভাবে অসমীয়া কবিতায় বাংলা ছন্দ বিশেষ করে রাবীন্দ্রিক ছন্দের প্রয়োগ বেশ সহজ এবং স্বাভাবিকভাবে শুরু হয়। ভাব-ভাষা ও ছন্দের বিচারে অসমীয়া কাব্যে রবীন্দ্র-অনুস্মৃতি সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। অহোম সাহিত্যে রবীন্দ্র-ছন্দের অনুস্মৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য আমরা অসমীয়া সাহিত্যের পাঁচজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিক—চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা (১৮৬৭-১৯৩৮), অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরী (১৮৮৫-১৯৬৭), রত্নকান্ত বরকাকতি (১৮৯৭-১৯৬৩), নলিনীবালা দেবী (১৮৯৮-১৯৭৭) এবং ডিম্বেশ্বর নেওগ (১৯০০-১৯৬৬) সহ কয়েকজনের কবিকৃতির ছন্দ আলোচনা করব।

এ-যুগের অসমীয়া কবিতায় বাংলার মতোই—কলাবৃত্ত, মিশ্রবৃত্ত এবং দলবৃত্ত তিন রীতিরই বিবিধ ও বিচিত্র রূপের সম্যক প্রয়োগে উৎকর্ষ দেখা যায়। মিশ্রবৃত্ত বাংলার মতোই অসমীয়াতেও প্রাচীন রীতি। কিন্তু কলাবৃত্ত ও দলবৃত্ত বাংলার অনুসরণে নব গৃহীত ছন্দোরীতি। প্রথমটির রহস্য নব আবিষ্কৃত এবং দ্বিতীয়টি রূপ পরিমার্জিত। বাংলার মতোই অসমীয়া ছন্দেও এমন উৎকর্ষ ও বৈচিত্র্য পূর্বে কখনও সংঘটিত হয়নি।[২৩] কলাবৃত্ত ও দলবৃত্ত রীতির সমিল ও অমিল প্রবহমান এবং মুক্তক আর গদ্যকবিতার ছন্দও এ-যুগের উল্লেখযোগ্য প্রবণতা, তাতে বিদেশী বা পাশ্চাত্য প্রোৎসাহন থাকলেও রবীন্দ্র-অনুপ্রেরণার সুস্থ এবং স্বচ্ছন্দ রূপটিও অম্লান।

কলাবৃত্ত রীতি (Moric Style)

কলাবৃত্তের চার থেকে সাত কলামাত্রা পর্যন্ত পর্বের বিভিন্ন পংক্তিবন্ধ রচিত হয়েছে অসমীয়া কবিতায়। এখানে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত এবং রবীন্দ্র-রচনায় তার মূল রূপ দেখার চেষ্টা করা যেতে পারে।—

১। চতুষ্কল পর্বিক দ্বিপদী :—

ফু টোঁ নে হু : ফুটোঁ কৈ। কুমলীয়া কলিটি
ওঁঠত লা : জেরে রৈ মিচিকীয়া। হাঁহিটি,
সামরি, পা : হরি গৈ মেলি আধা। প্রাণ টি
উদঙ্গাই। ঢাকি বৈ উঠি অহা। বুকুটি।

—চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা, 'মাধুরী'।

'উদঙ্গাই' শব্দটির উচ্চারণ অসমীয়াতে 'উদঙাই' হয়। ৮+৭=১৫ মাত্রার দ্বিপদী। সাধারণভাবে চোদ্দ মাত্রার পয়ারবন্ধই অধিক রচিত হয়। বাঙালি কবি সতীশচন্দ্র রায়ের (১৮৮২-১৯৪০) অনুরূপ দুইটি পংক্তি—

ফাল্গুন। চঞ্চল ॥ ফোটা ফুল। রয়না,
অবহেলে। ফেলে দেয় ॥ পুষ্পের। গয়না।

—সতীশচন্দ্রের রচনাবলী।

পড়ার ভঙ্গিতে কিছুটা ভিন্নতা অনুভূত হয়, তার কারণ অসমীয়াতে তিনটি লঘু এবং চারটিই অর্ধযতির লোপ ঘটেছে। কিন্তু বাংলায় পর্ব ও পদ-বিভাগ সুস্পষ্ট।

রবীন্দ্রনাথের কলাবৃত্ত পয়ার—

পূর্ণিমা রাত্রের জ্যোৎস্না ধারায়
সান্ধ্য বসুন্ধরা তন্দ্রা হারায়।

—চিত্রবিচিত্র : 'উৎসব'।

এখানে প্রথম পঙ্‌ক্তিতে একটি (ধা : রায়) এবং দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে দুইটি ('র : সুন্ধরা' 'হা : রায়') পর্বযতি লুপ্ত হয়েছে।

অনুরূপ অসমীয়া কলাবৃত্ত পয়ার—

অশ্বর হ্রেষা-রব দুন্দুভি নাদ···
উন্মান উমাদ আজি উমাদ।

—দেবকান্ত বরুওয়া।

চতুষ্কলপর্বে দ্বিপদীর ব্যবহারই অসমীয়াতে বেশি। তেমনি পঞ্চকল পর্বের কেবল একপদী ও দ্বিপদী পংক্তি মেলে। তাও খুবই কম।[২৪] আমরা এখানে পঞ্চকল পর্বিক একপদী ও দ্বিপদীর দৃষ্টান্তই মিলিয়ে দেখতে পারি।—

১। পঞ্চকল পর্বিক একপদী :—

নদীর সোঁত সদাই যায়
রাখিব তাক নওয়ারি ভাই।
সময় যায় তারেই দরে
রাখিব তাক নওয়ারে নরে।

—মোহাম্মদ সুলেমান : 'সময়র গতি'।

৫+৫=১০ মাত্রার এই একপদী মদনমোহন তর্কালংকারের (১৮১৭-১৮৫৮) নিম্নের পংক্তির কথা মনে করায়—

সরস-দল পনস ফল।
সরল নল তরল জল।

—শিশুশিক্ষা (প্রথম ভাগ)

রবীন্দ্রনাথের ত্রিপর্বিক একপদী—

নিজের দুটি চরণ ঢাকো তবে
ধরণী আর ঢাকিতে নাহি হবে।

—কল্পনা : 'জুতা-আবিষ্কার'।

এখানে ৫+৫+২=১২ মাত্রা বিন্যস্ত হয়েছে।

২। পঞ্চকল পর্বিক দ্বিপদী :—

আজি না জানো কোনে মাতিছে মোক
মেঘর লগত যাব লই
আজি সুবুজোঁ কোনে গাইছে গান
বহাহে বতা হে অকলই।

—রত্নকান্ত বরকাকতি, 'উন্মনা'।

৫+৫ ॥ ৫+৫=২০ মাত্রার দ্বিপদী। প্রারম্ভে দুই মাত্রার ('আজি') দুইটি অতিপর্ব আছে। তবে পুরো কবিতায় কলাবৃত্তের পঞ্চকল পর্বের ধর্ম অক্ষুণ্ণ থাকেনি। রবীন্দ্র রচনা থেকে পঞ্চকল পর্বিক একটি দ্বিপদী—

সবাই বড়ো হইলে তবে স্বদেশ বড়ো হবে,
যে-কাজে মোরা লাগাব হাত সিদ্ধ হবে হবে।

—মানসী : 'দেশের উন্নতি'।

দ্বিপদীটি ৫+৫ ॥ ৫+২=১৭ মাত্রার। ২০ মাত্রার দ্বিপদীও বাংলায় দুর্লভ নয়—

ঘুচাতে চাস যদি রে এই হুতাশাময় বর্তমান,
বিশ্বময় জাগায়ে তোল। ভায়ের প্রতি ভায়ের টান।

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : 'কিসের শোক করিস ভই'।

অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরীর রচনা থেকে ষট্‌কল পর্বিক ত্রিপদী ও চৌপদীর নিদর্শন।—

৩। ষট্‌কল পর্বিক ত্রিপদী :—

সোমা আহি মোর বুকুর মাজত,
ডোওয়া পোরা হোওয়া জ্বালা—যাতনাত
জগতর যত ছিন্ন হৃদয় বোর—
মই আজি দুখ-বেদনা বিজয়ী—
নির্ভয় হোওয়া সমাগত হৈ,
যাতনা-লীনোওয় অতল হিয়াত মোর।

—অনুভূতি : 'বেদনা-বিজয়'।

১২+১২+১৪=৩৮ মাত্রার ত্রিপদী।

১২+১২+৯=৩৩ মাত্রাররবীন্দ্র-ত্রিপদী—

ওগো কোথা মোর আশার অতীত,
ওগো কোথা তুমি পরশ-চকিত,
কোথা গো স্বপন বিহারী।…
সবার অজানা, হে মোর বিদেশী।
তোমারে না যেন দেখি প্রতিবেশী,
হে মোর স্বপন বিহারী॥

—উৎসর্গ-৩।

৪। ষট্‌কল পর্বিক চৌপদী :—

সকলো খিনিকে নিব উটুওৱাই,
ফাঁকি, দুর্নীতি, কচ়াল কোবাই,
দূর করি দিব মানবীয়তার
সীমারেখা বাজ করি,—
সত্য-সাম্য, পবিত্রতার
সংযমাপ্লুত অহিংস তার,
সোণর ভেটিত জয়-জয়কার
তুলিব সমাজ গাঢ়ি।

—অনুভূতি : 'আকাঙ্ক্ষা'।

১২+১২+১২+৮=৪৪ মাত্রার এই অসমীয়া চৌপদীর অনুরূপ রবীন্দ্র-চৌপদী—

তুরঙ্গ সম অন্ধ নিয়তি,
বন্ধন করি তায়,
রশ্মি পাকড়ি আপনার করে
বিঘ্ন-বিপদ লঙ্ঘন ক'রে
আপনার পথে ছুটাই তাহারে
প্রতিকূল ঘটনায়।

—মানসী : 'গুরুগোবিন্দ'।

পঞ্চকল পর্বের মতোই কলাবৃত্ত রীতির সপ্তকল পর্বের প্রয়োগও অসমীয়াতে খুবই কম।[২৫] যে কয়টি নিদর্শন পাওয়া যায় —তা সব দ্বিপদী বন্ধেই। যেমন—

চিনাকি অতীতর নো হোবা তরা তুমি,
নো হোবা অচিনাকি উল্কাফুল
মাটির পৃথিবীয়ে হিমেরে লিখি দিয়া
অশ্রু আখরর কবিতা ফুল

—নবকান্ত বড়ুআ, 'মনর চিনাকি'।

৭+৭+৭+৫=২৬ মাত্রার এই বন্ধের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার নিম্নের অংশটি তুলনীয়—

উঠিলে নব শশী ছাদের পরে বসি
আর কি রূপকথা বলিবি না গো।

হৃদয় বেদনায় শূন্য বিছানায়
বুঝি মা আঁখি জলে রজনী জাগো।
কুসুম তুলি লয়ে প্রভাতে শিবালয়ে
প্রবাসী তনয়ার কুশল মাগো।

—মানসী : বধূ।

কলাবৃত্ত রীতির বিভিন্ন বন্ধ বেশ আগ্রহ এবং আন্তরিকতার সঙ্গে অসমীয়াতে প্রযুক্ত হচ্ছে। এই প্রয়োগের মূলে রবীন্দ্রনাথের ছন্দশিল্পের প্রমুগ্ধতা এবং প্রেরণা কাজ করেছে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। কবিতাশিল্পের বিচারে বহু আধুনিক অসমীয়া কবি রবীন্দ্রনাথের পরম শিষ্য। কেউ কেউ সে কথা সশ্রদ্ধচিত্তে ঘোষণাও করেছেন। কবি কমলেশ্বর চালিহা (১৯০৪-১৯৮৪) তাঁর ছন্দিতা (১৯৪১) বইটির ভূমিকায় সানন্দে বলেছেন—

> "পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবির পদাঙ্ক অনুসরণে সক্ষম হয়েছি এমন দাবির ধৃষ্টতা আমার নেই, কিন্তু আমার ছন্দশিল্পের জন্য আমি অবশ্যই তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) কাছে ঋণী।"[২৬]

এই প্রসঙ্গে অসমীয়া কবিতায় অতিপর্ব প্রয়োগের দিকটিও স্মরণীয়। বাংলার মতোই অসমীয়াতে অতিপর্ব প্রয়োগের প্রবণতাও লক্ষিত হয়। তার পরিচয় আমরা পূর্বে পেয়েছি। এখানে আর একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

তোমার আলোর বুকত
হিয়ার চুকত
সকলো লুকাই রাখি—
কিয় দিয়া নাই ঢালি,
মোর হিয়া জালি ফালি,
দি আছা কেবল ফাঁকি ?

—রায়চৌধুরী, অনুভূতি : 'ইঙ্গিত'।

তিন ও দুই-দুই মাত্রার তিনটি অতিপর্বের সাহায্যে ষট্‌কল পর্বিক ত্রিপদীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'তাল গাছ' কবিতাটি মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। তার থেকে কিছু অংশ—

তারপরে হাওয়া যেই নেমে যায়,
পাতা-কাঁপা থেমে যায়,

ফেরে তার মনটি—
যেই ভাবে, মা যে হয় মাটি তার,
ভালো লাগে আরবার
পৃথিবীর কোণটি ॥
—শিশু ভোলানাথ : 'তালগাছ'।

লক্ষণীয় চতুষ্কল পর্বিক ত্রিপদীর প্রারম্ভিক অতিপর্বও চতুষ্কল।

মিশ্র কলাবৃত্ত রীতি (Mixed Moric Style)

বাংলার মতোই অসমীয়া কবিতার প্রাচীন এবং প্রধান বাহন মিশ্রবৃত্ত ছন্দোরীতি।[২৭] পয়ার ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি বন্ধের প্রয়োগও প্রাচীন। আধুনিক যুগে মধুসূদন 'অমিত্রাক্ষর' বা অমিল প্রবহমান পয়ার প্রবর্তন করেন বাংলায়। যথাসময়ে অসমীয়াতেও তা সঞ্চারিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই রীতিটিকে সংহত এবং মার্জিত রূপ দান করেন। সমিল-অমিল প্রবহমান এবং মুক্তকও রচনা করেন। অসমীয়া কবিরাও রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে মিশ্রবৃত্ত রীতির প্রবহমান ও মুক্তকের সমিল ও অমিল রূপের রচনা শুরু করেন অসমীয়া সাহিত্যে। এ-যুগের কবিদের রচনা থেকে আমরা মিশ্রবৃত্তের বিভিন্ন রূপের নিদর্শন তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

১। (ক) পয়ার ৮+৬—১৪ মাত্রা

ধারা সারে অশ্রুজল দিম বগরাই,
দিনরাতি লক্ষ্য করি তোকে চাই চাই।
সি যদি গরব তোর নোওরারে দমাব,
সি যদি আসন তোর নোওয়ারে টলাব,
তেতিয়াহে বুজি পাম তোর প্রবলতা,
তেতিয়াহে মানি লম মোর দুর্বলতা।
—রায়চৌধুরী : অনুভূতি : 'দৃঢ়পণ'।

৮+৬—১৪ মাত্রার এই পয়ার বন্ধটি অসমীয়াতে 'পদ' নামেও পরিচিত।

(খ) মহাপয়ার ৮+১০=১৮ মাত্রা

দুখ-দৈন্য-বেদনার জ্বালাময় অগ্নিশিখা ঘোর,
ঢালি দিয়া ধারা সারে পূর্ণ করি হিয়া-কুম্ভ মোর।
—পূর্ববৎ, অনুভূতি : 'বেদনা-বিজয়'।

৮+১০=১৮ মাত্রার এই বন্ধটি দীর্ঘ পয়ার নামেও পরিচিত।

২। (ক) লঘু ত্রিপদী বা ছবি ৬+৬+৮=২০ মাত্রা

চকুলো টুকিলোঁ কেও-নে দেখিলোঁ
কিনো বুজিবা লোকে।
নিচিনি চিনিলোঁ নেমানি মানিলোঁ
নেৰিবি আইছে মোকে।
—চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা : 'নহয় সপোন'।

ত্রিপদীর দুই রূপ—ছবি বা লঘু ত্রিপদী এবং ডুলরি বা দীর্ঘ ত্রিপদী—

(খ) দীর্ঘ ত্রিপদী বা ডুলরি—৮+৮+১০=২৬ মাত্রা

গহীন দিখউ নই আজিলো বইছে ধীরে
কতদিন গইছে উকলি।
মোর কত লগরীর চিতার জুইরে হায়
এদিন ইয়ার পার
হয়ে গেল ধুঁৱালি-কুঁওয়ালি।
—ডিম্বেশ্বর নেওগ : 'মোর গাঁও'।

লক্ষণীয় প্রথম পংক্তিটি ত্রিপদী কিন্তু পরেরটি ৮×৩+১০=৩৪ মাত্রার চৌপদী।

এবার ৮+৮+৮+৬=৩০ মাত্রার চৌপদী

কালর কুঁওয়লী ঢকা
জীবন পটত আঁকা
পাহরণি আঁরে আঁরে
অতীত বেদন,
এন্ধারে পোহরে ভরা
সোনালী জীবন তরা
মানসর ছাঁয়া-ছবি
নিশার সপোন।
—নলিনীবালা দেবী : পরশমণি : 'রূপের পরস'।

অসমীয়া কবিগণ মিশ্রবৃত্তের বিবিধ ও বিচিত্র রূপ-বন্ধের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। তাঁরা একাবলী, দ্বিপদী (পয়ার), ত্রিপদী এবং চৌপদীর প্রত্যেকটি বন্ধেরই তিন-চার রকমের রূপায়ণ ঘটিয়েছেন।[২৮] তার ফলে অসমীয়া ছন্দ অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি ও শিল্পোৎকর্ষ লাভ করেছে।

প্রবহমান ও মুক্তক বন্ধ

বাংলার মতোই মিশ্রবৃত্ত রীতিতেই, পয়ার বন্ধকে আশ্রয় করেই প্রবহমান ও মুক্তক বন্ধের উদ্ভব ঘটেছে অসমীয়া ছন্দে। বাংলায় তা কলাবৃত্ত ও দলবৃত্তেও প্রবর্তনের চেষ্টা হয়েছে। তাতে অনেকখানি সাফল্যও এসেছে। কিন্তু অসমীয়াতে মিশ্রবৃত্ত রীতিতেই তা আবদ্ধ থেকে গেছে। অন্য দুই রীতিতে প্রবহমানতা ও মুক্তক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা কেউ করেনি।[২৯] তবে কলাবৃত্তেও যে মুক্তক সম্ভব তাতে সন্দেহ নেই। যেমন—

ঘোর দুর্নীতি, শোষণ, ব্যভিচারর
বিরাট দানব নির্ভয়েরে জাগি উঠিল,
তার নিদারুণ নিষ্পেষণত,
দেশর জনতা বিভ্রান্ত হল, মূর্চ্ছিত হল—
আশা নিরাপত্তা থান-বান হৈ
    সন্ধি নো পোওয়া বিপদ-জালত
    বাগরি পরিল—
বাহির-ভিতর সমানে আগুরি,
    শত্রুর আক্রমণ উপচি উঠিল,
    কি সত্য বুঝায় দেশর এনেটো পরিণামে ?

—অ. রায়চৌধুরী, দেশেই ভগবান : 'ছাব্বিশ জানুওয়ারী'।

এ-টি ষট্কল পর্বিক কলাবৃত্ত অমিল মুক্তকের উদাহরণ রূপে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু পর্বের আয়তন সর্বত্র সঠিক নেই। রচনায় শৈথিল্য আছে সেকথা বলাই বাহুল্য।

যাইহোক মিশ্রবৃত্ত রীতির প্রবহমান পয়ার রচনার ক্ষেত্রে রমাকান্ত রায়-

চৌধুরী (১৮৪৬-১৮৮৯), ভোলানাথ দাস (১৮৫৮-১৯২৯), পদ্মনাথ গোহাঁই বরুআ (১৮৭১-১৯৪৬), হিতেশ্বর বরবরুআ (১৮৭৬-১৯৩৯) এবং দণ্ডীনাথ কলিতা (১৮৯০-১৯৫৩) প্রমুখ অসমীয়া কবির নাম উল্লেখযোগ্য। অসমীয়া ছন্দে দীর্ঘ পয়ারে প্রবহমানতা আনেন প্রথম মহেশ্বর নেওগ ১৯৪৫ সালে। প্রবহমান মহাপয়ারের গুরুত্ব ও সৌন্দর্যে আকৃষ্ট অপরাপর অসমীয়া কবিরাও ক্রমে ক্রমে তার প্রয়োগ শুরু করেন। কমলেশ্বর চালিহা সমিল প্রবহমান মহাপয়ার রচনা করেন। মিশ্রবৃত্ত রীতির প্রবহমান রূপ—

১। (ক) অমিল প্রবহমান পয়ার—

স্বদেশর স্বাধীনতা, তার অর্থ যিটে
জীবন উৎসর্গ করি মরে সমরত,
মৃত্যু তার হয় শান্তি ; মহা নিদ্রা তার
অনন্ত বিশ্রাম মাথো ; বিশ্বজননীর
কোলাত (শান্তিরে ভরা) ; অগ্নি তার কাষে
সুধাংশুর রশ্মি যেন, ভূমি শয্যা তার
ফুলর কোমল শয্যা ; শেল-শূল গাত
মাথো পুষ্প বরিষণ ; কিয় করা শোক
তোমার স্বামীর অর্থে ?

—হিতেশ্বর বরবরুআ, 'যুদ্ধক্ষেত্রত অহোমীয়া রমণী'।

(খ) সমিল প্রবহমান পয়ার—

বন্ধু তুমি সাধু তুমি তোমার করুণা
মাগো আজি সকাতরে বিরহিনী প্রিয়া
মোর আছে অলকাত। যদি আনি দিয়া
কুশল বারতা হায় ! প্রিয়া অশ্রুজল
পূর্ণ। কিবা অলকার মণি-হর্ম্যতল
কৃষ্ণ পক্ষ জোমদয়ে প্রিয়া কিবা মোর
জহির লাগিছে ক্রমেই বিরহ ঘোর
কি রূপে সহিব হায় খন্তেক আঁতরে
ভূ·লুণ্ঠিতা প্রিয়া মোর বিরহ কাতরে।

—সিংহদূত দেওয় অধিকারী : 'মেঘদূত'।

২। (ক) অমিল প্রবহমান মহাপয়ার—

তোমার পদূলি পাওঁ তেই মই, বলিল মলয়া—
ছাটি, হঠাতেই গধূলি গোপালে ওরণি গুচাই
করিলে কটাক্ষপাত। তীব্রগন্ধী হাসানাহানার
খোপার মাজর আতরর সঁগাতীয়া সঁকুরাটি কাঢ়ি
সন্ধিয়ার দুষ্ট মলয়াই বাটে-পথে দিলে ছেটিয়াই।
—মহেশ্বর নেওগ: 'অন্তরর শান্তি ফুল রঙ্গা-কলা পরী'।

(খ) সমিল প্রবহমান মহাপয়ার—

আজি এই ফাগুনর ডাওয়রর ছায়া পোহরত
নতুন জোনার কৃশ হাস্যময় কলা উদয়ত
জাগে মোর এটি কথা। প্রকৃতির বিধানর পরে
প্রিয়াক বিচারে নরে। জীবনর সঙ্গী বুলি ভাবে
অচিনাকি এটি গাভরুক তেওঁরে হাতত অর্পি
সংসারর সচার-কাঠিটি।
—কমলেশ্বর চালিহা: 'প্রসাদ'।

কবি চন্দ্রধর বরুআ (১৮৭৪-১৯৬১), নলিনী বালা দেবী (১৮৯৮-১৯৭৭) প্রসন্নলাল চৌধুরী (১৯০২) এবং জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা (১৯০৩-১৯৫১) প্রমুখ কবি প্রবহমানতার সৌন্দর্যে পংক্তির চোদ্দ বা আঠারো মাত্রার আয়তনকেও অস্বীকার করেন। তাতে পরবর্তী স্তরের মুক্তকের পূর্বাভাস ফুটে ওঠে। অসমীয়া মুক্তক সুস্পষ্ট রূপ নিয়ে দেখা দেয়—নবকান্ত বড়ুআ (১৯২৩) বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য (১৯২৪) কেশব মহন্ত (১৯২৬) সৈয়দ আবদুল মালিক (১৯১৯), মহিম বোরা (১৯২৬), বীরেন বরকাকতি (১৯২৭), হরি বরকাকতি (১৯২৯), মহেন্দ্র বোরা (১৯২৯) এবং হোমেন বরগোহাইন (১৯৩১) প্রমুখের রচনায়। তবে বাংলার মতো 'হ্রস্বপয়ার মুক্তক-জাতীয় কোনো মুক্তক অসমীয়ায় লেখা হয় না। মুক্তক দুই থেকে কুড়ি-বাইশ মাত্রা পর্যন্ত দীর্ঘ চরণের হয়। অমিল ও সমিল মুক্তকের উদাহরণ।

(ক) অমিল মুক্তক—

মোর চেতনার এই অন্ধবিশাল নদীর
ঘাটে ঘাটে

ফুল হৈ ফুলি রওয়া তেজী মলা
তোমার সন্ধ্যার সেই বন্ধ্যা বাসনার
নির্মেঘ আকৃতি।
রাতির বুকুত হায়! জাগে নেকি কোনো এক নারীর হৃদয়?
স্ফীতোদরা কোনো এক প্রগল্‌ভা নারীর
আসঙ্গ কামনা।
অনিমেষ স্তব্ধকার বোবা চাওয়নিত
সুদূর আহবান
তন্দ্রা আরু মরণর।

—হোমেন বরগোহাইন: 'রাতি'।

হ্রস্বতম চরণ চার ও দীর্ঘতম চরণ বাইশ মাত্রার।

(খ) সমিল মুক্তক :—

ধনর সুহুরি লাগি ন কঁপিল বুকু আজি মইর পায়র
তামেলিত রাগী নাই চেনেহীর কোমল হাতর।
ঢেকীশাল রিঙ্গা রিঙ্গা বিহুর চিরার চাব না বাজে কালত,
ঢেকীর শালত কিয় নামতী নিমাত
এই উরুকার রাতি তুপরিয়া?
রাঁধনি-ঘরত আজি খারুর আমনি কতা জুমুক-জানাক
উচপ না খায় কিয় ওঠ আরু চকু মোর
মুগা-রিহা-মেখলার আহিছে আহিছে লগা লাগি?

—কেশব মহন্ত: 'চরই হৈ পরিমৃগই'।

এখানে হ্রস্বতম চরণে বারো এবং দীর্ঘতম চরণে বাইশ কলামাত্রা আছে। প্রবহমান ও মুক্তকের অমিল ও সমিল রূপ সহজেই রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ প্রয়োগের অনুপ্রেরণার কথা স্মরণ করায়।

অসমীয়াতে দলবৃত্ত-প্রবহমান ও মুক্তকের ব্যবহার হয়নি বলা চলে। কিন্তু কাব্যের ভাব ভাষা ও ছন্দের ক্ষেত্রে সর্বাধিক রবীন্দ্র প্রভাবিত কবি রত্নকান্ত বরকাকতি দলবৃত্তেরও প্রয়োগে নানা বৈচিত্র্য আনতে চেষ্টিত হয়েছেন। এমন

কি দলবৃত্ত মুক্তক রচনারও প্রয়াস করেছেন। তাঁর সে প্রয়াস সফল হয়েছে বলা চলে। যেমন—

দলবৃত্ত সমিল মুক্তক :—

যদি তোমার চকুর মাজত
হুজলে মোর
কেশর লহর
ছুটি চকুর প্রভা
মেঘর বুকুত বিদ্যুৎ পোহর
সন্ধ্যা তরার
মুঠে লহর
মুঠে চকুত মোরো মোহোর
এ কো মধুর শোভা
যদি তোমার বুকু ভাহি
মুঠে হাঁহি
হঠাৎ আহি
মোরে মুখর রূপ।

—রত্নকান্ত বরকাকতি : 'বিশ্বহরণ' (?)।

এখানে চার, ছয় ও আট দলমাত্রার চরণের বিন্যাস ঘটেছে।

এবার অম্বিকা গিরী রায়চৌধুরীর রচনা থেকে একটি সমিল মুক্তক :—

মোর জীবন-মরণ মথি
তুমি কি সুধানো তোলোঁ বুলি
ভাবিছা হে রথী ?
তোমার মুখত কিবা হাঁহির
শত শিখা জ্বলে ?
কি হেঁপাহর আকুল-আবেগ
চলে কল কলে,...হে মহারথী
তুমি কি ভাবি করিছা মোর
এনে লটি-ঘটি।

ভঙ্গিমাতে ভঙ্গা গড়ার কিমান সাধুকথা
কতভাবে আছে আছা ! গরিমারে গঁথা
তুমি ঘি ভাবিছা তাকে করা
তুমি য়ে মোর গতি

—গীতর শরাই : ৪।

দলবৃত্তের এই অমিল মুক্তকে চার থেকে চোদ্দ মাত্রার চরণ বিন্যস্ত। গতি কিছুটা আড়ষ্ট হলেও প্রয়াস প্রশংসনীয়।

দলবৃত্ত রীতি (Syllabic Style)

লৌকিক বা দলবৃত্ত রীতির প্রয়োগ বাংলায় অলিখিত লোকগীতি থেকে লিখিত লোকগীতি স্তরের রচনায় আসে মধ্যযুগেই। আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথ এই ছন্দকে সাধুসাহিত্যে ব্যবহার করলেন। অতঃপর বাংলা কবিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণীয় বাহন হয়ে ওঠে ছন্দটি। অসমীয়া ছন্দের ক্ষেত্রেও দলবৃত্তের কাহিনী অনেকটা এই রকমই। কবি বলিনারায়ণ বুবার (ঊনবিংশ শতক) পূর্ব পর্যন্ত লোকগীতি ; ছেলে ভুলানো ছড়া প্রভৃতিতেই এই ছন্দোরীতিটি আবদ্ধ ছিল। বলিনারায়ণই সর্ব প্রথম দলবৃত্তের ওজন ও সৌন্দর্য উপলব্ধি করে নিজের কবিতায় তার প্রয়োগ শুরু করেন। তবে তিনি ধ্বনির খেলা এবং লঘু ভাবাত্মক কবিতার বাহন রূপেই তার ব্যবহার করেন। অতঃপর রীতিটির শক্তি-সৌন্দর্য এবং উপযোগিতা বুঝে অন্যান্য অসমীয়া কবি ছন্দটি আয়ত্ত করে উচ্চস্তরের কবিতায় বা সাধুকবিতায় প্রয়োগ শুরু করেন। কবি ডিম্বেশ্বর নেওগ, কমলেশ্বর চালিহা,[৩০] রত্নকান্ত বরকাকতি, পার্বতী প্রসাদ বরুআ (১৯০৪-৬৫), মো. ইব্রাহিম আলি (১৯:৮-৭৫) প্রমুখ কবির হাতে দলবৃত্তের শক্তি ও সুষমা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দলবৃত্ত রীতির একপদী, দ্বিপদী (পয়ার), ত্রিপদী এবং চৌপদীর নানা আয়তন এবং বিভিন্ন পঙ্‌ক্তির সমাবেশে স্তবকসজ্জা অসমীয়া কবিতায় অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি এনে দিয়েছে। রত্নকান্ত বরকাকতির হাতে দলবৃত্ত ছন্দের পূর্ণ বিকাশ এবং পরিণতি ঘটেছে। ছন্দটি সাধুকবিতার যথার্থ বাহন রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।[৩১] দলবৃত্তের কয়েকটি দৃষ্টান্ত—

১। দ্বিপদী (পয়ার)—

এটি মুক্ত শিশুর প্রাণত নাচে আকাশ জুরি,
ইটি যুক্ত আপন কামত মারে ডেই পুরি।
এটি স্তব্ধ গিরি গুহা সরিৎ সাগর জিনি.
এটি ক্ষুব্ধ ঘুরি মহা না-পাই কতো চিনি।
—রত্নকান্ত বরকাকতি, শতপত্র : 'দুটি মাহুহ'।

সুতরাং পয়ার বন্ধটি তিন রীতিতেই লেখা যায়—অসমীয়াতেও। কলাবৃত্ত ও মিশ্রবৃত্তী পয়ার আমরা আগেই পেয়েছি।

২। ত্রিপদী—

ফাগুন হেরা তোমার ছবি আঁকো
মনত মোর স্মৃতি তোমার রাখোঁ
কাগজ পুথিত কলা চিয়াঁ হীরে।
সরা পাতেরে বাটর ধূলি ঢাকোঁ
ভাবি গুণি ভায়েরে ধীরে ধীরে।
—কমলেশ্বর চালিহা : 'ফাগুন'।

প্রথম পংক্তি ত্রিপদী (১০ × ৩ = ৩০ দলমাত্রার) এবং দ্বিতীয়টি দ্বিপদী (১০ × ২ = ২০ দলমাত্রার)। 'মনত মোর', 'সরা পাতেরে' এবং 'ভায়েরে ধীরে'—পর্ব তিনটিতে যথাক্রমে 'তিন ও পাঁচ-পাঁচ' দলমাত্রার অবস্থান লক্ষণীয়। প্রথম পর্বে প্রসারণ এবং পরের দুটিতে সংকোচনের সাহায্যে মাত্রা সাম্য বজায় থাকে। এই বিশিষ্টতা বাংলা ছড়াতে লক্ষিত হয়।

৩। চৌপদী—

অপ্রকাশর প্রকাশ-ভঙ্গী, সেয়ে তো এই সৃষ্টি—
অন্তবিহীন ছন্দ তুলি চলিছে তার দৃষ্টি
একতিথিতে জীবন-মরণ,
এক আঁকতে পূরণ-হরণ,—
এক বিন্দুতেই অগণনর প্রকাশ-বিকাশ-লয়,
একাঙ্কতেই বিচিত্রতর ভাওনা অভিনয়।
—অ. রায়চৌধুরী, অনুভূতি : 'রহস্যধার'।

প্রথমে দুইটি ও শেষে একটি পয়ার এবং মাঝখানে একটি চৌপদী (৮×৩+৬= ৩০ দলমাত্রা) পংক্তির সমন্বয়ে এই স্তবকটি গঠিত। অসমীয়া দলবৃত্তের একটি সার্থক নিদর্শন রূপ স্তবকটি বিবেচ্য।

একটি লক্ষণীয় বিষয় হল—বাংলা দলবৃত্তের তুলনায় অসমীয়া দলবৃত্তের পংক্তি-পদের আয়তন কিছুটা বড়োও হতে পারে। অবশ্য বড়ো পংক্তি রচনায় কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই বাংলাতেও।

দলবৃত্তে প্রবহমান বন্ধ চোখে না পড়লেও সমিল ও অমিল মুক্তক রচিত হয়েছে মিশ্রবৃত্ত মুক্তকের প্রসঙ্গে আমরা তা দেখেছি। সুতরাং বলা যেতে পারে বাংলার মতোই অসমীয়া ছন্দও দলবৃত্ত রীতি সহযোগে পরিপুষ্ট, এবং সুসমৃদ্ধ, তার বিচিত্র প্রয়োগে।

সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা

মধুসূদন দত্তের অনুসরণে অসমীয়া ভাষায় প্রথম সনেট রচনায় প্রয়াসী হন, কবি হেম গোস্বামী (১৮৭২-১৯২৮)। তাঁর প্রথম সনেট 'প্রিয়তমার চিঠি'। উনিশ শতকের শেষ ভাগে পেত্রার্কের আদর্শে রচিত। পদ্মনাথ গোহাঁই বরুআও সনেট রচনা করেন। তাঁর আদর্শ সেক্‌সপীয়র। কিন্তু স্তবক-ভাগ ও মিল স্থাপনে তিনি স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন। এ-ক্ষেত্রে তিনি রবীন্দ্র-আদর্শী। রবীন্দ্র-নাথের মতোই প্রবহমানতা অক্ষুণ্ণ রেখে, স্তবক-ভাগ ও মিলের ক্ষেত্রে স্বীয় অভিরুচী অনুযায়ী চালিত হয়েছেন। তাই তাঁর চতুর্দশপদী কবিতা রাবীন্দ্রিক-চতুর্দশ পদীর অনুস্মৃতি বলা যায়।[৩২] যেমন—

সহস্র চকুরে দেখা কত কি যে গুণী
ফুটাব নোওয়ারি ভাব তোকে চকুপানী
কতকাল নীলাকাশে, আগ্নেয় কুসুম
সুরুজ বুকুত লই জ্বলে চতুর্গুণ।
অৰ্ঘভরা হাঁহি মারি ফুল কুঁওয়ারীয়ে
চিপি যায়। কবলই পুনু এরি দিয়ে
রূপহী জোনায়ে দেহি, কত প্রেম ভাব
সংক্ষেপে বুজাই ভাবে, কতর অভাব।

সম্ভিয়ার রঙ্গাবেলি আপুনি তপত
বিচ্ছেদ পরাণি ভাপ নহয় বেকত।
কুল-কুল নই বয় কত কি বিনাই,
সুবুজি নো সোধে কেওয়ে কি তার বিলাই।
নসহি কবিতা-রাণী জড় জগতত
দিলেহি বুজানি স্থর অব্যক্ত ভাবত।
—পদ্মনাথ গোহাঁই বরুআ : 'কবিতা-২'।

সনেট বা চতুর্দশপদীও মূলে কবিতাই। তার অন্যান্য বিধিবিধান, কৌশলের কসরত মাত্র। এই বিবেচনায় উদ্ধৃত চতুর্দশপদী একটি সার্থক সৃষ্টি।[৩৩]

অসমীয়া চতুর্দশপদীকারদের মধ্যে সর্বাধিক সফল এবং প্রতিষ্ঠিত কবি রূপে গণ্য হিতেশ্বর বরবরুআ (১৮৭৬-১৯৩৯)। কবি দুর্গেশ্বর শর্মা (১৮৮৫-১৯৬১) এবং নীলমণি ফুকন (বড়, ১৮৮০) প্রমুখের নামও এক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই সব কবিরা মিশ্রবৃত্ত রীতিতেই সনেট রচনা করেছেন। তবে কলাবৃত্ত রীতিতেও যে সনেট লেখা যায় তা রবীন্দ্রনাথের পরীক্ষা থেকে এবং হিন্দী কবিদের প্রয়াস থেকে বোঝা যায়। অসমীয়াতেও তা সম্ভব। সে পরীক্ষা করেছেন এক অজ্ঞাতনামা আধুনিক কবি তাঁর 'মৃতু' নামক সনেটে। আসলে 'এটা রঙিয়াল মার্কিন কবিতার অনুকরণ ত' রচিত।[৩৪] তাহলেও অসমীয়া ছন্দ ও সনেটের ধারায় তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। সনেটটি হল—

খান চাহেবক খুওয়া লেহি ভয় মৃত্যুর টেকে লা আছি
লাগে ততালিকে প্লেনর টিকিট দিল্লীত আছে মাহি
নহলে ফেরার ভীষণ বিপদ চমন হবই জারী,—
আহিছোঁ ওলাই নকরি গাফিলি মুখুরালোঁ ভাই দাড়ি।
ফুল-বাগিচাত রুই ছিলোঁ ফুল পুলি টো জানিছা দামী
কাম করি করি গোটেই পুওয়াটো উঠি ছিলোঁ মইঘানি
জোপদি আছিল গোলাপ-জোপাতে চকু দুটা তার ক্রু
কৈ থাকোঁতেও খান চাহেবর কোচ খাই গেল ভ্রূ
প্লেনত উঠাই ওলালোঁ বিচারি টেকেলাটো কেনে কুওয়া
বেচ তো মজার চিগারেট হুপি সাগুলি আছিল গুওয়া।

সুধি দিলোঁ তাক ভয় খুওয়ালাহি কিয় খান চাহেবক
দিলে সমিধান মোক হে দেখোন খুওয়ালে বিরাট চক
ফুল-বাগিচাত ফুল রুই আছে মুটেই ফিকির নাই
কালিলই পুওয়া নিম ধরি যাক দিল্লীত বিচারি পাই ।

—অজ্ঞাত কবি : 'মৃত্যু' ।

এই চতুর্দশ পদীতে ষট্‌কল পর্বের (৬+৬ ॥ ৬+২=২ মাত্রার) সমিল পংক্তির সুন্দর প্রয়োগ লক্ষিত হয়। আশা করা যায় কলাবৃত্ত ও দলবৃত্ত রীতিতে সনেট রচনার প্রবণতা সাধারণ ভাবে কবিদের মধ্যে দেখা দেবে এবং অসমীয়া কবিতা আরও সমৃদ্ধ ও বিচিত্র হয়ে উঠবে।

গদ্য কবিতা

মুক্তকে ছন্দ-পর্বের বাঁধনটুকু অবশিষ্ট ছিল। কবির বাক্‌পর্বের দুর্বার আকর্ষণের জন্য ক্রমে ক্রমে সে বাঁধন কোথায় খসে পড়ে গেল। দেখা দিল বাক্‌পর্বাশ্রিত গদ্য কবিতা। গদ্য কবিতা ও গদ্য ছন্দের কথা আমরা আলোচনা করেছি। মনে রাখতে হবে নিয়মিত-নিশ্চিত ছন্দ আশ্রিত কবিতার ভাষা, গদ্য-কবিতার ভাষা এবং সাধারণ গদ্যের ভাষা—তিনটি পৃথক বস্তু। অর্থাৎ গদ্য-কবিতার ভাষা সাধারণ কবিতার ভাষা থেকে ভিন্ন, সাধারণ গদ্য থেকেও তেমনি পৃথক। অন্যান্য ভারতীয় ভাষার কবিতা-শাখার মতোই অসমীয়াতেও গদ্যকবিতা লেখা শুরু হয় বর্তমান শতকের মধ্যভাগ থেকেই। এই প্রসঙ্গে কবি হেম বড়ুআর (১৯১৪-৭৭) নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি এই গদ্যকবিতা বা 'আধুনিক কবিতা'র স্বরূপ স্পষ্ট করেন অসমীয়াতে। অবশ্য তারও আগে অমূল্য বরুআর (১৯২২-৪৬) 'বেশ্যা', 'কুকুর', 'কয়লা' আদি রচনায় গদ্য কবিতার আভাস পাওয়া যায়। অসমীয়া গদ্যকবিতার সমৃদ্ধরূপ ফুটে ওঠে নবকান্ত বড়ুআর (১৯২৬-) হাতে। ক্রমে ক্রমে নীলমণি ফুকন (নবীন), নলিনী কুমার ভট্টাচার্য (১৯২৭) রাম গগই (১৯৩৪), নির্মল প্রভা বরদলই (১৯৩৩-) বীরেশ্বর বড়ুআ (১৯৩১), সুশীল শর্মা (১৯৩৩), সদা সাইকিয়া (১৯৩০), মাণিক গগই (১৯৩৬), দিনেশ গোস্বামী (১৯৩১-১৯৯১) প্রভৃতি কবি গদ্য কবিতা

রচনায় খ্যাতির অধিকারী হয়েছেন। নীলমণি ফুকন (নবীন) ও নবকান্ত বড়ুআর দুইটি গদ্য কবিতার অংবিশেষ উদ্ধৃত করছি।—

(ক) গোটেই আঘোণ মাহিয়া রাতিটো
ইন্দ্র মালতীর ফুলবোরে কান্দি আছিল,
উঠি গৈ দক্ষিলোগে
গাঁওয়র এটা গোধূলির দরে
তোমার হাঁহিটো
তমাল জোপাত ওলনি আছে।

—নীলমণি ফুকন (নবীন), 'ছ'টা বিভিন্ন কবিতা'

ছন্দময় গদ্যকবিতার ভাবকে ছন্দোময় করে তুলেছে। তবে এ-ছন্দ কানের নয়, মনের, অনুভূতির বস্তু।

(খ) এদিন আমি নাওয়েরে গইছিলোঁ।
গঙ্গার বুকুরে,
ছিরাজর কবরর ওপরেদি ওলাই ছিলোঁ।
জার কালির হালধীয়া জো নেটা।
মনত আছে আমি কথা পাতিবার চেষ্টা করিছিলোঁ।
বতাহে আমনি করা না ছিল যদিও
কোনেও কারো কথা শুনা নাছিলোঁ—
আকাশ খান কেনে কুওয়া আছিল মনত নাই।

—নবকান্ত বড়ুআ, 'এদিন আমি নাওয়েরে'।

অসমীয়া ভাষায় গদ্য কবিতার প্রসার, পরিণতি এবং সানন্দ স্বীকৃতির ফলে অসমীয়া কবিতার একটি নবতম ছন্দ-মাধ্যম রূপে গদ্য-ছন্দ পাঠকের মন জয় করতে সমর্থ হয়েছে। তার অগ্রগতি আজও অব্যাহত।[৩৫] অসমীয়া গদ্যকবিতার সূচনা এবং বিকাশের মূলে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ আলোচনা কালে অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাসকার ডিম্বেশ্বর নেওগে বলেছেন—

"বর্তমান দিনত সকলো ক্ষেত্রতে সরলতার দরে মিতব্যয়িতাও মূলমন্ত্র দরে হৈছে; আরু গদ্য-পদ্য উভয় সাহিত্যতেই কেনেদরে জেউতি চরাইছে রবীন্দ্রনাথর সাহিত্যলৈ লক্ষ্য করিলেই তাক বুজিব পারি।

ভাষার বর নাও চলি যায়, কিন্তু ভাবর ঢৌ তেতিয়াও থাকে ; এয়ে যেন সাহিত্যর শেষর মাজত অশেষ, সীমার মাজত অসীম। বর্তমান জগতত গদ্যর আদর আরু মহিমা যে বাঢ়িছে, অতি-আধুনিক কবিতাত গদ্যর হেচাই তার প্রমাণ।"

—অসমীয়া সাহিত্যর বুরঞ্জি (১৯৫৭), পৃ. ৬৫৬।

আমরা জানি প্রায় সমস্ত প্রতিষ্ঠিত আধুনিক অসমীয়া কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যশিল্পে বিমোহিত এবং অনুপ্রাণিত। অসমীয়া সমালোচকদের দৃষ্টিতে তা কেমনভাবে প্রতিফলিত, অতি সংক্ষেপে তার উল্লেখ করা যেতে পারে। সমালোচক যোগেন্দ্রনাথ ভূয়া রত্নকান্ত বরকাকতির চিন্তা ও সৃজনে রবীন্দ্রপ্রভাব প্রসঙ্গে বলেছেন—

"আধুনিক ভারতীয় ঋষি বুলিয়েই হওক বা আধুনিক বিশ্বর এজন বরণ্যে লেখক বুলিয়েই হওক রবীন্দ্রনাথ-চর্চাই বরকাকতির মন যেনদরে আপ্লুত করি রাখিছিলি,…। এক কথাত, রবীন্দ্র-সাহিত্যর ওপরত বরকাকতির যি আধিপত্য আছিল, মৃত বা জীবিত কোনোজন আধুনিক অসমীয়া লেখকরে তেনে আধিপত্য না ছিল বা নাই। 'আলাপ' গ্রন্থর পাতনিত বরকাকতি লিখছে, 'এই ক্ষুদ্র লিখক জগত-কবি রবীন্দ্রনাথর একাগ্র শিষ্য, আরু সেই অগ্নিময় প্রাণর জলন্ত প্রভাবেরে এই ভস্মাবৃত হৃদয়ো অনুপ্রাণিত।' সেই বাবেই বরকাকতির কবিতাত রাবীন্দ্রিক-স্পর্শর আধিক্য অনুভব করা হয়।"

—ভূমিকা, রত্নকান্ত বরকাকতির গদ্যসম্ভার (১৯৭৭), পৃ. দুই।

রাবীন্দ্রিক ছন্দ স্পর্শের প্রসঙ্গে আরও স্মরণীয় :—

"বঙলা সাহিত্যর প্রখ্যাত কবি সকল, বিশেষকৈ রবীন্দ্রনাথ, ঔপনিষদ দর্শন আরু পৃথিবীর বহুতো মণীষীর চিন্তার লগত বরকাকতীর পরিচয় আছিল, ছন্দ-বৈচিত্র্য আরু ধ্বনি প্রধান ভাষাশৈলী বরকাকতির কবিতার আন দুটো বৈশিষ্ট্যও উপেক্ষণীয় নহয়। শব্দ প্রয়োগ, ছন্দ-রীতি আরু চিত্র-রচনাত বরকাকতি বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথর দ্বারা প্রভাবান্বিত।"

—সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা : আ. সা. স. ইতিবৃত্ত (১৯৮১), পৃ. ৩৫০।

রবীন্দ্র-অনুপ্রাণিত শিষ্য বরকাকতি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলেছেন—

"রবীন্দ্রনাথর গীতাঞ্জলি বঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্য ন হয় নেকি? গীতাঞ্জলির

স্থরত কেবল বঙ্গালীর কথা, বঙ্গালীর আশা-ভরসা হে বাজিছে নে? পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথর সমগ্র কাব্য-দুন্দুভি-গোটেই মানবর অন্তরর আশা আকাঙ্ক্ষার ধ্বনিত নিনাদিত বুলিয়েই তো রবীন্দ্রনাথ-'রবীন্দ্রনাথ'।"

—স্বরাজ আন্দোলন আরু অসমীয়া সাহিত্য, ঐ (১৯৭৭) পৃ. ৮২।

কবি অম্বিকা গিরি রায়চৌধুরীর রচনাবলীর ভূমিকায় তাঁর সঙ্গীত সাধনা প্রসঙ্গে ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা উল্লেখ করে বলছেন—

"এই প্রসঙ্গও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আহোঁতে রায় চৌধুরীয়ে গোওয়া বরগীতর রাগ সম্বন্ধে···আলোচনাই তেঁওর রাগ-জ্ঞানর কিছু আভাস দিয়ে।···'তোমার চরণ ধূলির তলত', 'প্রভু সকলো তোমারে দান', 'প্রভু বিমানে উৰাই যাওঁ', 'না লাগে দয়া, না লাগে মায়া'—আদি গীত সমূহত ভগবানর সত্য, শিব আরু মঙ্গলময়-রূপ উপলব্ধি করি কবিয়ে ভক্তির আঁজলি যাচিছে, দয়া করুণা ভিক্ষা করিছে বিরহর উপশম ঘটাবলৈ সান্নিধ্য ভিক্ষা করিছে, আরু ভগবানর অপার মহিমাত মুগ্ধ হৈছে।···রায়চৌধুরীর কোনো কোনো গীত কবিতার লগত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরর গীত-কবিতার সমধর্মিতা লক্ষ্য করা যায়।"

—ভূমিকা, রায়চৌধুরী রচনাবলী, (১৯৮৬)।

আলোচক সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা লক্ষ্মীনাথ বেজবরুওয়ার (১৮৬৪-১৯৩৮) কবিতা প্রসঙ্গে যা বলেছেন তাও অনুধাবণীয়—

বেজ বরুআর "কোনো কোনো কবিতাত সংস্কৃত কবিতার প্রতিধ্বনিও শুনা যায়। অসমীয়া লোকগীতর ছন্দ আরু বর্ণনায়ো বেজবরুআর কাব্যরীতিত প্রভাব নেপেলোওয়া কৈ থকা নাই। দুই-এটাইত রবীন্দ্রনাথয়ো কবিতাই তেওঁর সৃষ্টি প্রক্রিয়াত ইন্ধন যোগাইছে।"

—ইতিবৃত্ত (১৯৮১), পৃ ৩২২।

নলিনীবালা দেবীর কবিতায় রবীন্দ্র প্রভাব সম্পর্কে সমালোচক শর্মার অভিমত স্মরণীয় মনে হয়—

"ভারতীয় দর্শন বিশেষকৈ 'গীত' আরু উপনিষদর বাণী আরু দর্শন, রবীন্দ্রনাথর কবিতা আরু অসমীয়া 'কীর্তন', 'নামঘোষা' আরু বরগীতর ধর্মীয় কথা আরু সুরে নলিনীদেবীর ভাবচিন্তা আরু বিশ্বাসক গঢ় দিয়াত বরঙণি যোগায়।···নলিনীদেবীর কাব্য-ভঙ্গীত রবীন্দ্রনাথর প্রভাবো অবজ্ঞা

কৰিব নোওৱাৰি। ছন্দ-প্ৰয়োগ, শব্দ-চয়ন, ভাববাঞ্জনা আৰু চিত্ৰৰচনাৰ মাধুৰ্যৰে নলিনীদেবীৰ কাব্য সমৃদ্ধ, কিন্তু বহুতো কবিতাৰ আপাত বিভিন্নতাৰ মাদত একে ভাবৰ পুনৰুক্তি দেখিবলৈ পোওৱা যায়।"

—পূর্ববৎ, পৃ. ৩৪৭-৪৮।

কবি ভগবতী প্রসাদ বরুআর রচনায় স্বভাবসুলভ রবীন্দ্রকাব্যের ভাব-ভাষা ও ছন্দের অনুসৃতি মেলে। তাছাড়া কবি রঘুনাথ চৌধুরীর রচনায় কবি হেমচন্দ্রের এবং কবি পদ্মধর চালিহা ও বিনোদ চন্দ্র বরুআর কবিতায় কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ছন্দের অনুসৃতি ঘটেছে।[৩৬]

ছন্দের শিল্প এবং সেই ছন্দের ব্যাকরণ বা ছন্দশাস্ত্রের বিচারে বাংলা ও অসমীয়ায় বেশ সাম্য রয়েছে। বলা যায় দুই ভাষার ছন্দ ও ছন্দশাস্ত্র মূলত একই। এক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়—ছন্দ-শিল্প ও তার শাস্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ প্রথমে বাংলায় এবং পরে অসমীয়াতে সংঘটিত হয়। তার কারণ অসমীয়া কবি ও ছান্দসিকদের বাংলা ছন্দ, বিশেষ করে রাবীন্দ্রিক ছন্দের ও ছন্দ-চিন্তার অনুসৃতি প্রয়াস। তাই কবিদের রচনায় রবীন্দ্র-ছন্দের অনুসৃতি সুস্পষ্ট রূপে দেখা দেয়। অসমীয়া ছন্দশাস্ত্রও বাংলার ছন্দ-শাস্ত্রের অনুগামী—সে কথা স্পষ্ট করে বলেছেন ড: মহেন্দ্র বোরা তাঁর অসমীয়া ছন্দ বিষয়ক গবেষণা গ্রন্থে। তাঁর অভিমতের প্রাসঙ্গিক অংশটুকু লক্ষণীয়।—

> "I have examined the facts of Assamese metre on their own plane and where necessary, with reference to analogous circumstances in the prosody of certain other languages familiar to me. On this point, I owe a great deal to the authors of several authoritative books on prosody of some such languages. The extent of my indebtedness to those prosodists is very eloquently testified by the bibliography…. It is my bounden duty to mention specially the titles of three such books. These books are: Chandoguru Rabindranath by Prabodhchandra Sen, Banglachander Mulsutra by Amulyadhan

Mukhopadhyay, and principles of English Metre by Egerton Smith. I have found in the first two books, many of the complicated problems of Assamese metre are there already solved with reference to identical ones of Bengali metre. On many occasions, I was required only to project the problems and interpret the solutions in terms of the pattern of things prevalent in Assamese Metre."

—Preface, Fundamentals of Assamese Metre
(1977), pp. 8-9

অসমীয়ার শ্রেষ্ঠ ছান্দসিক অধ্যাপক মহেন্দ্র বোরার গভীর, ব্যাপক, সূক্ষ্ম এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গির সাক্ষ্যবাহী তাঁর উল্লিখিত ছন্দগ্রন্থটি কেবল অসমীয়া ছন্দেই নয়, সমগ্র ভারতীয় ছন্দের আধুনিক তত্ত্ব এবং রূপ ও রীতির আলোচনায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য সংযোজন।

সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে অসমীয়া ছন্দ শিল্প ও শাস্ত্রের বিচারে বেশ ব্যাপক উন্নত এবং প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠেছে। সুতরাং কবি-সমালোচক ডিম্বেশ্বর নেওগের ১৯৫৭ সালের ক্ষুব্ধ উক্তি—"অসমীয়া কাব্যসাহিত্যর আন আন বিভাগর দরে ছন্দশিল্পরো বিশেষ চর্চা প্রয়োজনীয়।"[৩৭] অসমীয়ার ছন্দশিল্প চর্চা ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হতে শুরু করেছে আজ আর তাই তা ততখানি প্রযোজ্য নয়, যেমন ছিল আজ থেকে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর আগে।

ওড়িয়া কাব্যে রাবীন্দ্রিক ছন্দ

প্রারম্ভেই সমালোচক সুরেন্দ্র মহান্তির একটি অভিমতের আশ্রয় নেওয়া যাক। তাতে আমাদের বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি শোনা যাবে। তিনি বলেছেন—

"১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দরে রবীন্দ্রনাথংক নোবেল্-পুরস্কার প্রাপ্তি, ভারতীয় সাহিত্য ও জাতীয়তার ইতিহাসরে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এহাপরে রবীন্দ্রনাথংক প্রভাব, সেতেবেলে প্রায় সবু প্রান্তীয় সাহিত্যরে, কবিতাকু অতি গভীর ভাবরে প্রভাবিত ও প্রণোদিত

করিথিলা। 'সবুজ-কবিতা' থিলা, এ সবু মার্মিক ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির পরিণতি।"

—ওড়িআ সাহিত্যর ক্রমবিকাশ (১৯৭৮), পৃ ৩৪৫

রবীন্দ্রনাথের সৃজন প্রতিভার অভিনব দানের সাহিত্যিক উৎকর্ষের আকর্ষণে হিন্দীতে যেমন 'ছায়াপদী' যুগের অসমীয়াতে 'জোনাকী' যুগের সূচনা ঘটে তেমনি ওড়িয়াতে দেখা দেয় 'সবুজ কবিতা'র যুগ বা সবুজ যুগ। এই সবুজ যুগের ক্ষেত্র প্রধানতঃ কবিতা নিয়েই সীমিত ছিল। কিন্তু ভাবে-ভাষায় ও ছন্দে যে নবীনতা এলো তার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রবাহ আজও অব্যাহত বলা যায়।

রাধানাথ রায় ও মধুসূদন রাওয়ের অনুসারী ওড়িয়া কবিসমাজ বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত মোটামুটি তাঁদের ধারা বজায় রেখেছিলেন। তবে প্রথম দশকেই নূতন এক দলের আবির্ভাব ঘটে। তাঁরা রাধানাথ-মধুসূদনের বিরূপ সমালোচক ছিলেন। গোপবন্ধু প্রতিষ্ঠিত 'সত্যবাদী বন-বিহার' ছিল এই দলের পরিচয়। গোপবন্ধু দাশ (১৮৭৭-১৯৭৮) নীলকণ্ঠ দাশ (১৮৮৪-১৯৬৩) ও গোদাবরীশ মিশ্র (১৮৮৬-১৯৫৬) ছিলেন সত্যবাদী গোষ্ঠীর প্রথম তিন স্তম্ভ। এই সত্যবাদী গোষ্ঠীর শক্তি ও কর্মোদ্যম শেষ হয়ে এলে দেখা দেয় সবুজগোষ্ঠীর অভ্যুদয় (১৯২:-১৯৩৫)। এই অভ্যুদয়ের গতি ত্বরান্বিত করেছে সত্যবাদী দলের অসহিষ্ণু মনোভাব এবং রবীন্দ্রনাথের অমোঘ আকর্ষণ। এই 'নবীনের দল' বাংলা ভাষা ও সাহিত্য থেকে প্রেরণা এবং যুগোচিত সৃষ্টির উপাদান সংগ্রহ করে।

সবুজ গোষ্ঠীর প্রধান হোতা অন্নদাশংকর রায় (১৯০৪)। তাঁর সহযোগী কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী (১৯০১), বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়ক (১৯০৪), হরিহর মহাপাত্র এবং শরৎচন্দ্র মুখার্জি (১৯০২)। এই তরুণ পঞ্চকের দলটি 'সবুজদল' এবং তাঁদের সাহিত্য 'সবুজসাহিত্য' নামে পরিচিত। এই প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর পত্রিকা 'সবুজ পত্র' (১৯১৪) এবং তার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'সবুজের অভিযান' (বলাকা কাব্যের প্রথম কবিতা অনুপ্রেরণা বিশেষভাবে স্মরণীয়। সবুজদলের মুখ্য কবি প্রধানত দুই জন—কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী ও বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়ক। পরবর্তীকালে অন্নদাশংকর বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ ও স্বীকৃতি লাভ করেন। হরিহর মহাপাত্র এবং শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সাহিত্যের জগৎ থেকে সরে আসেন জীবিকার সৌকর্যে। তাহলেও সবুজ গোষ্ঠীর কল্যাণে ওড়িয়া কবিতার পরিধি ও দিগবলয় সম্প্রসারিত হয়েছে সে কথা বলাই বাহুল্য। সমালোচক সুরেন্দ্র মহান্তির মতে—

"সবুজ গোষ্ঠীর পলায়নপন্থী রহস্যবাদ, পরিচ্ছন্ন সৌন্দর্যবোধ, স্মৃতিকারুণ্য, প্রকৃতি-চিত্রণরে অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী, অশরীরী বা সশরীরী কৌণসী মানসী-কন্যা পাঁই অতৃপ্ত রোমান্টিক আকুলতা। পুণি ছন্দক্ষেত্ররে নানা অভিনব অনুশীলন ওড়িয়া কবিতা ক্ষেত্ররে এক নতুন হিল্লোল সৃষ্টি করিথিলা। নূআ নূআ ছন্দ বিন্যাসরে সবুজ-গোষ্ঠীর কবিমানে কবিতা রচনা পাঁই প্রয়াসী থিলে…।

—ওড়িআ সাহিত্যর ক্রমবিকাশ (১৯৭৮), পৃ. ৩৪৬।

বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়ক অকপটে স্বীকার করেছেন—"শুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট রুচিহেতুরু রবীন্দ্রনাথংকর রচনাবলী মো জীবনরে গীতার স্থান লাভ করি অছি। কলেজরে পড়িথিবা বেলে এহি দৃষ্টিভঙ্গিরু মুঁ বহু বিপদর সম্মুখীন হোইঅছি।

—বৈকুণ্ঠনাথ গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড (১৯৭৬), পৃ. ৩৪।

এই প্রসঙ্গে অড়িআ-সাহিত্যের কবি সমালোচক মায়াধর মানসিংহের অভিমতও উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন—

"সবুজমানে ওড়িয়া ভাষারে নূতন ছন্দ নূতন সাঙ্গীতিকতা প্রবিষ্ট করাইলে, যাহা আত্মকালর বৈদেশিক দ্বেষ সত্ত্বে, বর্তমান ওড়িআ ভাষা সহিত যে অঙ্গীভূত হোই গলানি, তাহা মানিবাকু হেব। সবুজমানে প্রেম, নারী ও জীবন ইত্যাদি প্রতি যেউঁ সংকারশূন্য, সাহসিক চিন্তাকল্প পরিবেশিত কলে, সে সমস্ত আজি সাধারণ ওড়িআ বুদ্ধিজীবীর মানসিক ছাঞ্চর স্বীকৃত অংশ। পুণি সবুজমানেহিঁ ওড়িআ ভাষারে প্রথম করি আন্তর্জাতিক বাতাবরণ সৃষ্টিকলে।"

—ওড়িআ সাহিত্যর ইতিহাস (১৯৭৬), পৃ. ৩৪৯।

দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্র-কাব্যের ভাব-ভাষা ও ছন্দে-অনুপ্রাণিত 'সবুজ কবিতা'র পঞ্চ সখা 'এক সবুজ' প্রতিশ্রুতি নিয়ে ওড়িআ সাহিত্যে আবির্ভূত হন। অন্নদা, হরি, বৈকুণ্ঠ, শরৎ, কালিন্দী'—সবুজ পঞ্চক ক্রমে সবুজত্রয়ে এসে দাঁড়ান। রবীন্দ্র ঐশ্বর্য অর্থাৎ খরা ও বর্ষায় সবুজতার অভিবৃদ্ধি হয়েছে ওড়িয়া সাহিত্যের তাবড়-তাবড় পণ্ডিতদের অভিমত। তার পরে আত্মপ্রকাশ করে স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন আরও চারজন মুখ্য কবি। তাঁরা হলেন—মায়াধর মানসিংহ (১৯০৫-৭৩), রাধামোহন গড়নায়ক (১৯১১), কুঞ্জবিহারী দাস

(১৯১৪) ও সচ্চিদানন্দ রাউত রায় (১৯১৫)। এই কবি চতুষ্টয়ের সকলে ভাবের বিচারে রবীন্দ্র-অনুসারী না হলেও ভাষা ও ছন্দের বিবেচনায় সকলেই রবীন্দ্র-শিষ্য। রবীন্দ্র প্রবর্তিত, সংস্কৃত, স্বীকৃত এবং বিচিত্র ভাবে বহুল বিরচিত বাংলা ছন্দের তিন রীতি, নানা আয়তনের পংক্তি, পদ, পর্ব, অতিপর্ব, সমিল-অমিল প্রবহমান (পয়ার ও মহাপয়ার) মুক্তক এবং গদ্যকবিতার বিভিন্ন ও বিচিত্র রচনা-রূপ দেখা দিয়েছে—ওড়িয়া সাহিত্যে। অল্প-স্বল্প অসমর্থন ও বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও ওড়িয়া সাহিত্য সহজ-স্বাভাবিক ভাবে আপন অভিনব পথে অগ্রসর হয়েছে।[৩৯]

প্রধানত উল্লিখিত কবিদের রচনা থেকে নিদর্শন সংগ্রহ করে এবং আবশ্যক মতো পাশা-পাশি রবীন্দ্র-রচনা থেকে সমজাতীয় দৃষ্টান্ত উদ্ধার করে ওড়িয়া কবিতায় রবীন্দ্র-ছন্দের অনুসৃতির স্বরূপ বোঝার চেষ্টা করা যাবে। তা থেকে জানা যাবে-ওড়িয়া ছন্দ তার প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিশিষ্টতা ও জটিলতা থেকে সরে এসে, সঙ্গীতধর্মিতা, রাগরাগিণীর নামাশ্রিত ছন্দোনাম, এমন কি দাণ্ডিবৃত্তেরও প্রভাব ছিন্ন করে, কেমন যুগোপযোগী হয়ে উঠেছে। দীর্ঘদিনের গেয় ওড়িয়া কবিতা ছন্দের কল্যাণেই পাঠ্য ও আবৃত্তিধর্মী হয়ে উঠেছে। লৌকিক বা দলবৃত্ত ছন্দের ওড়িয়া সাধু কবিতায় প্রয়োগের উদ্যোগ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সংস্কৃত ছন্দ

বাংলা ও অসমীয়ার মতো ওড়িয়া ভাষাতেও সংস্কৃত-উচ্চারণ খাপ খায় না। তাই ওড়িয়াতেও সংস্কৃত ছন্দ-প্রয়োগের প্রয়াস তেমন দেখা যায় না। প্রাচীন ও মধ্যযুগের মতোই আধুনিক যুগেও খুব কম কবিই সংস্কৃত ছন্দে ওড়িয়া কবিতা রচনার প্রয়াস করেছেন। আর সে প্রয়াস তেমন আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারে স্বাভাবিক কারণেই। ১৮৬৮ সালে প্রকাশিত রঘুনাথ পরিছা রচিত ও গৌরীশংকর রায়-সম্পাদিত 'গোপীনাথ বল্লভ' নাটকে ওড়িয়া পদ্যাংশটুকু সংস্কৃত ছন্দের গুরু-লঘু নিয়মে রচিত। মন্দাক্রান্তার একটি অংশ থেকেই এ-ছন্দের সার্থকতার স্বরূপ আন্দাজ করা যাবে।—

পণ্ডা-পিণ্ডা তলকু বসিলে মণ্ডপে শাসনীয়ে
চাণ্ডে চাণ্ডে বসি বসিগলে চত্বরে পাঢ়ী-ধাড়ি,
গণ্ডা-গণ্ডা লড়ু লড়ু সমে খণ্ড পাকে সজাড়ি
ভেণ্ডা ভেণ্ডা দ্বিজ পরষিলে পূর্ন পণ্ডে অজাড়ি।

—ও. সা. ই (মা. মানসিংহ) (১৯৭৬), পৃ. ৩১১।

অংশটিতে পাঠের অস্বাভাবিকতা সুস্পষ্ট। এ-কাব্য পর্বে অনুরক্তি বোধ সহজ নয়।

এই প্রসঙ্গে কবি নীলকণ্ঠ দাসের সংস্কৃত রচনার কথা স্মরণীয়। তিনি তাঁর 'ভক্তি গাথা' (১৯১৯)কাব্যে বিভিন্ন সংস্কৃত ছন্দের প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু তা সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারেনি। একটি দৃষ্টান্ত নিয়ে দেখা যাক্—

বিমল বিমোহন বিপিন নিকুঞ্জে
অভিনব শোভা পুণ্য বসন্তে,
ভুবন বিদীপন দিব্য বিকাশে
চিন্ময় সৌরভ দেশ দিগন্তে।
আদি ভবন তব পাবন দেশে,
অবতর ভারতী ভারতবর্ষে।
জয় ভারত জয় ভারতরাণী
ব্রহ্ম বিলাসিনী জয় মা বাণী
তুটু এ ভারত জড়িত রাত্রি,
জয় জয় ভারত বেদ-বিধাত্রী ॥

—সত্যবাদী পত্রিকা, কুম্ভ, ১৩২২।

ওড়িয়া ছন্দে বৈচিত্র্য আনার প্রয়াসের বিচারে প্রশংসনীয় এবং গান হিসাবে সমর্থনীয় হলেও কবিতার সহজ-স্বাভাবিক ধ্বনি মাধুর্য এখানে অনুপস্থিত—সে কথা বলাই বাহুল্য। তবু নীলকণ্ঠ দাস সংস্কৃত ছন্দে কবিতা রচনা করেছেন। তিনি মনে করতেন ওড়িয়ায় দ্রাবিড় প্রভাব থাকায় তা সম্ভব এবং স্বাভাবিক। কারণ 'মোহমুদ্গর' ও 'গীতগোবিন্দ' রচনা করে শংকরাচার্য ও জয়দেব তার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

"অন্য ভাষা রু গ্রহণ করিবারে মনা নাহিঁ। মাত্র গ্রহণ করি জীর্ণ করিবা উচিত। নিজ ভাষার এই প্রকৃতি বুঝি শংকরাচার্য দিনে সংস্কৃতরে 'মোহমুদ্গর' লেখিখিলে—ছন্দরে মুহে, জাতিরে। জয়দেব মধ্য তাহাই

করিথিলে। সে মানে যথার্থ দ্রাবিড় বর্ণ ও স্বর নিয়মরে সংস্কৃত কবিতা লেখিচন্তি। মোহমুদ্গর বা গীতগোবিন্দের সংস্কৃত ছন্দ-নিয়মর দীর্ঘ হ্রস্ব স্বরর বন্ধাগত নাহিঁ। 'ধীর সমীরে'-এই পাঞ্চটি বর্ণর পরিমাণ যেতিকি, পীন পয়োধর' এই ছয়টি অক্ষর মধ্য সেতিকি। এ সবু বঙ্গলা, হিন্দী প্রভৃতির প্রকৃতি হুহে, ওড়িয়া তেলেগুর অনুকূল। ওড়িআ ছন্দ ও কবিতারে এই প্রকৃতি স্পষ্ট।"

—ওড়িআ ভাষা ও সাহিত্য (১৯৫৮), পৃ. ৮৩।

উদ্ধৃতির মূল কথা ওড়িয়া কবিতায় সংস্কৃত মাত্রাবৃত্ত ছন্দের পক্ষ সমর্থন। কিন্তু আজও তা সম্ভব হয়নি অর্থাৎ সংস্কৃত ছন্দে ওড়িয়া কবিতা সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি। সে যাই হোক অন্য ভাষার ছন্দ গ্রহণে সমালোচকের আপত্তি নেই—এটাই লক্ষণীয়। সে প্রসঙ্গে আমরা পরে আসছি। বাংলায় হাস্যরস সৃষ্টির জন্য বর্ণবৃত্তের প্রয়োগ করেছেন কেউ কেউ। হ্রস্ব-দীর্ঘস্বরের বদলে মুক্ত-রুদ্ধদলের প্রয়োগে নতুনত্ব আনতেও প্রয়াসী হয়েছেন অনেকে। হিন্দীতে এরূপ প্রয়োগের কোনো নিদর্শন নেই, নেই অসমীয়া এবং ওড়িয়াতেও। রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত মাত্রাবৃত্ত ছন্দে বাংলা গান (রবীন্দ্র-সঙ্গীত) রচনা করেছেন। হিন্দীতেও এই জাতীয় প্রয়াস লক্ষিত হয়; অসমীয়া এবং ওড়িয়াতেও লক্ষিত হয়, তবে তুলনায় খুবই কম।

কলাবৃত্ত রীতি (Moric Style)

কলাবৃত্ত ছন্দ ওড়িয়া সাহিত্যে নব সংযোজন।[৪০] ওড়িয়া ছান্দসাহিত্যে কলাবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্তের কোনো নিদর্শন বা উল্লেখ নেই। কবি মধুসূদন রাও ওড়িয়াতে সংস্কৃত মাত্রাবৃত্ত ব্যবহার করতে গিয়ে ওড়িয়া উচ্চারণ-প্রভাবে, সম্ভবত অজ্ঞাতসারেই কলাবৃত্তের স্বরূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। যদিও তা অসংস্কৃত স্তরের সামগ্রী রূপে বিবেচ্য। যেমন—

অবতর অবতর অবতর সন্ধ্যে
'শ্রান্তজন' বাঞ্ছিত ঋষিজন 'সেবিত'
সুরনর বন্দিত তবপদ বন্দে।

—মধুসূদন গ্রন্থাবলী, উৎকল গাথা, পৃ. ৩১১।

চতুষ্কল পর্বিক পনেরো মাত্রার দ্বিপদী ও একত্রিশ মাত্রার চৌপদী নিয়ে এই অংশটি গঠিত। চৌপদটির প্রথম পদের প্রথম ও দ্বিতীয় পদের দ্বিতীয় পর্বটি লক্ষণীয়। 'শ্রান্তজন' পাঁচ মাত্রার এবং 'সেবিত' তিন মাত্রার। তাতে ছন্দে মাত্রাগত ত্রুটি সুস্পষ্ট। অবশ্য 'শ্রান্তজন'-এর স্থলে 'থকাজন' করলে এবং 'সেবিত'-এর 'এ' দীর্ঘ উচ্চারণ করলে আর ছন্দের ত্রুটি থাকে না। সে যাই হোক, মধুসূদনের এই প্রয়াস ওড়িআ ছন্দের আলোচনায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।[৪১] মধুসূদনের এই প্রয়াসের মূলে বাংলা কবিতার ছন্দ, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের ছন্দ যে প্রেরণার স্রোত রূপে কাজ করেছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। এই প্রসঙ্গে সমালোচক নটবর সামন্তরায়ের একটি উক্তি স্মরণীয়।—

> "মাত্রাবৃত্ত ছন্দরে রচিত আধুনিক কবিতা এক দৃষ্টিতে অক্ষরবৃত্ত-অনুসৃত কবিতা অপেক্ষা অধিক শ্রুতি সুখকর। আধুনিক ওড়িআ কবিতারে সেই হেতুরু কবিমানে সংস্কৃত ও বঙ্গলা সাহিত্যরে অনুসরণরে মাত্রাবৃত্ত নিয়ম প্রয়োগ করিথিবার দেখিবাকু মিলে।"
>
> —'ওড়িআ সাহিত্যরে সমীক্ষা ও সংগ্রহ', পৃ. ১১১।

ওড়িয়া সাহিত্যে আধুনিক মাত্রাবৃত্ত বা কলাবৃত্ত প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিংশ শতকের প্রথম দুই দশক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাল রূপে চিহ্নিত।[৪২] তাই এই সময়ের কলাবৃত্তে ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশয় তারল্যের পরিচয় সুস্পষ্ট। তৃতীয় দশকের প্রারম্ভে এল আস্থার ভাব। গড়ে উঠলো সবুজ-গোষ্ঠী। আত্মবিশ্বাসে ধীর গম্ভীর পদক্ষেপে যাত্রা শুরু হল 'ওড়িয়া কলাবৃত্তের'। এই নব ছন্দের প্রয়োগবৈচিত্র্যে ওড়িআ কবিতার সমৃদ্ধির নতুন পথ উন্মোচিত হল। সকলের কাছে সহজ ও সমগ্রাহ্য না হলেও তার অগ্রগতিতে আর ভাঁটা পড়েনি। সবুজদলের সূচনা ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে হলেও 'সবুজ কবিতা' নামে তাঁদের কবিতা চয়নিকা প্রকাশিত হয় ১৯২৯-৩০ সালে। তাতে অন্নদাশংকর, কালিন্দীচরণ, বৈকুণ্ঠনাথ, হরিহর ও শরৎ মুখোপাধ্যায়ের ১৯২০ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত রচিত সবুজধর্মী কবিতা সংকলিত। সব কবিতার কলাবৃত্ত ছন্দ যে পুরোপুরি নিখুঁত তাও নয়। তবে তাদের প্রয়াসেই যে ওড়িয়া কবিতার ছন্দের নবযুগ সূচিত হল—তাতে সন্দেহ নেই।[৪৩] ওড়িআ সবুজ দলের প্রতিষ্ঠাতা অন্নদাশংকর রায়ের ছন্দ প্রয়োগ যেমন অভিনব তেমনি সার্থক। তাঁর ছন্দ সংঘর্ষ-মথিত তরুণ প্রাণের বেদনাকে কোমল-সৌন্দর্যানুভূতিমণ্ডিত বাণী রূপে দান করেছে। জীবন, যৌবন ও সৌন্দর্যের গান অপরূপ নবীনতা নিয়ে কান ও মনকে তৃপ্তি দান করেছে।

পরবর্তীকালে সবুজগন্ধী নানা কবির হাতে কলাবৃত্ত রীতির বিচিত্র ও বিভিন্নতর রূপ ফুটে উঠে ওড়িয়া কাব্যকাননকে সুসমৃদ্ধ করে চলেছে। এবার ওড়িয়া কলাবৃত্তের বিবিধ ও বিচিত্র রূপের নিদর্শন দেখা যাক্।—

চতুষ্কল পর্ব :—

একপদী ৪ + ৪ + ২ = ১০ মাত্রা।

শুভ্র শিউলি পড়ে ঝরি
বিরহ মলিন হাস পরি,

—বৈ. গ্রন্থাবলী ১ম, 'প্রভাত স্বপ্ন'

তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের-৪ + ৪ + ৪ = ১২ মাত্রার একপদী।

খ্যাতি আছে সুন্দরী বলে তার
ত্রুটি ঘটে নুন দিতে ঝোলে তার।

—খাপছাড়া-৩৪।

দ্বিপদী—৪ + ৪ ॥ ৪ + ১ = ১৩ মাত্রা।

ন ফেরই থর থর চারু চাহাণি
ন ফেরই ছন ছন মন কাহাণী।
পরথম প্রণয় মো সরম রঙ্গা
বিরহ দীরঘ শ্বাস মরম ভাঙ্গা।
সুখর বেদনা মোর নীরব প্রীতি।
ন ফেরিব কণ্ঠ গো তা মধু গীতি।

—অন্নদাশংকর ; 'সবুজ কবিতা'।

লক্ষণীয় ছন্দের খাতিরে কবি 'প্রথম', 'সর্ম', 'মর্ম', ও 'দীর্ঘ', শব্দ কয়টিকে যথাক্রমে 'পরথম', 'সরম', 'মরম' ও 'দীরঘ' রূপে ব্যবহার করেছেন। তিনমাত্রার প্রথম চার মাত্রার 'পরথম' হয়েছে। বাকি শব্দ ক'য়টিতে মাত্রার তারতম্য ঘটেনি কিন্তু ছন্দের লালিত্য এসেছে। লক্ষণীয়—উন্মেষপর্বে রবীন্দ্রনাথও মাঝে-মাঝে যুক্তাক্ষর ভেঙে ছন্দের ধ্বনি ও মাত্রা ঠিক রেখেছেন। যেমন—

যেমন কাছে বসি নিজে 'গ ল প' কত যে
করিতেন আহা তখন মাতা।

—বনফুল-৩য় সর্গ।

এই ছন্দেই 'সোনার তরী' কবিতাটি রচিত। যার প্রারম্ভিক অতি পরিচিত দুইটি পংক্তি হল—

গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা,
কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা।
—সোনারতরী : 'সোনারতরী'।

এই ধরনের প্রয়োগ বাংলা বা ওড়িয়া সাহিত্যে খুব বেশি নেই। কবি বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়কের রচনা থেকে অনুরূপ ছন্দের নিদর্শন—

তার কনক আখি,
তার কজল আখি,
ঝর ঝর বরষারে যাউছি ডাকি।
—বৈকুণ্ঠনাথ গ্রন্থাবলী (১ম), বর্ষা সাথী,

অতিপর্ব সহ প্রথম দুই পদে মাত্রাবিন্যাস ৪+১=৫ লক্ষ্য করার মতো।

দ্বিপদী ও চৌপদী—

নির্জন উপবনে একাকিনী ফুল গো
ভুল চির সুন্দর নিজ রূপে ভুল গো।
নীরবে রহিবি চাহিঁ,
মো গীতটি থিব গাই,
বিভোর পরাণে মৃদু সমীরণে ঝুল গো।
—বৈ. গ্রন্থাবলী ১ম, 'নির্জন উপবন',

১৫ মাত্রার দুইটি দ্বিপদী ও ৩১ মাত্রার একটি চৌপদীর সমবায়ে রচিত এই স্তবকটির আদল রূপে রবীন্দ্রনাথের নিম্নের অংশটি লক্ষণীয় :—

পথপাশে মল্লিকা দাঁড়ালো আসি,
বাতাসে সুগন্ধের বাজাল বাঁশি।
ধরার স্বয়ম্বরে
উদার আড়ম্বরে
আসে বর অম্বরে ছড়ায়ে হাসি।
—মহুয়া : 'বরযাত্রা'।

এখানে ৮+৫=১৩ মাত্রার দ্বিপদী ও ৮+৮+৮+৫=২৯ মাত্রার চৌপদীর সন্নিবেশ ঘটেছে। অনুরূপ নিদর্শন—

দূর দেশে দিশে কার কনক তরী,
কিএ য়ে গো জণাপড়ে তুমন্নি পরি ।
শান্ত তটিনী জল,
পীর তিরে ঢল ঢল,
সন্ধ্যারে রাগ নভুঁ পড়ই ঝরি,
তুমে অবা বহি নিঅ কনক তরী ।
—বৈ. গ্রন্থাবলী ১ম,-স্মৃতি-১১, ।

ত্রিপদী :—৮+৮ ॥ ১১=২৭ মাত্রা ।

শুনা গো অবলা শুণ
বজ্র এ নিদারুণ
থরা উচি অম্বর কম্পি,
সুন্দরী সরসা গো
তন্ময়ী বরষা গো
থরি যাএ নিকি তব বন্ধ ?
—রা. : গ. গ্রন্থাবলী ১ম, (১৯৬৮), 'তন্ময়ীবর্ষা'

এর সঙ্গে স্মরণীয় রবীন্দ্রনাথের ঃ—

অঘ্রাণ হল সারা,
স্বচ্ছ নদীর ধারা
বহি চলে কল সঙ্গীতে ।
কম্পিত ডালে ডালে
মর্মর তালে তালে
শিরীষের পাতা ঝরে শীতে ।
—চিত্রবিচিত্র-'শীত' ।

এখানে অবশ্য ৪+৪ ॥ ৪+৪ ॥ ৪+৪+২=২৬ মাত্রার বিন্যাস ঘটেছে ।

পঞ্চকল পর্ব :—

দ্বিপদী ৫+৫ ॥ ৫+৩=১৮ মাত্রা ।

বসন্তর চম্পাসম তরুণী যেবে ফুটিল,
সৌরভ স্বুরা তাহার দিগ্‌বিদিগে ছুটিল ।
—অন্নদাশংকর, সবুজকবিতা

এই বন্ধের আদর্শরূপে স্মরণীয়-রবীন্দ্রনাথের—

তোমারে প্রিয়ে, হৃদয় দিয়ে, জানি তবুও জানিনা।
সকল কথা বলনি অভিমানিনী।
—লেখন-১৬১।

প্রথম পঙ্‌ক্তিটি ১৮ মাত্রার দ্বিপদী কিন্তু দ্বিতীয়টি ১৩ মাত্রার একপদী।

সে দিন যেবে হাতটি ধরি কহিল
"যাঅনা সখা যাঅনা দূর বিদেশে।"
কজ্জল-কলা নয়ন তোলি চাহিল
বিদায় বেল লোতক ভরা আবেশে।
কহিল-"সখি, সজল আখি পোছ গো
পুরুষ মুঁ যে করম মোর ধরম,
করম বিনা জীবন মোর তুচ্ছ গো
করমহীন পতি তো পক্ষে সরম গো।
যাউছি, সখি, করমস্রোতে ভাসিবি
আসিবি জিণি জয় গৌরব মালাটি,
সে কলা আখি মরমে রখি নাশিবি
দিবস-নিশি মোর বিরহ জ্বালাটি।
—শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।[৪৪]

২৬ মাত্রার এই দ্বিপদী বন্ধে ৫+৫+৩ ॥ ৫+৫+৩ ক্রমে মাত্রা বিন্যস্ত হয়েছে। এমন পর্বসজ্জার নিদর্শন বাংলাতেও কম। লক্ষণীয় 'কজ্জল' 'পক্ষে' এবং 'গৌরব' শব্দের উচ্চারণ যথাক্রমে কজল, পখে এবং গোরব হয়ে মাত্রাসাম্য ঠিক রাখে। চতুর্থ পঙ্‌ক্তির শেষ ধ্বনি 'গো' অতিরিক্ত অর্থাৎ অতিপর্ব। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'কল্পনা' কাব্যের মদনভস্মের পর কবিতার ছন্দ স্মরণীয়। তাতে পঞ্চকল পর্বিক দ্বিপদীর প্রথমপদে ৫+৫+৫+৪ এবং দ্বিতীয় পদে ৫+৫+৩ কলামাত্রা বিন্যস্ত।

ত্রিপদী—৫+৫ ॥ ৫+৫ ॥ ৫+৩=২৮ মাত্রা।

ঝিঝি পলাই দূরে সুদূরে
স্বপন লোকে গোপন পুরে
গ্রহ তারকা এড়াই,

ষউবনর ঝরণা কূলে
মলয় যহিঁ নিয়ত বুলে
কুসুম কেতু উড়াই
—অন্নদাশংকর ; সবুজ কবিতা ।

এই অংশের পূর্বরূপ মেলে রবীন্দ্রনাথের নিম্নোদ্ধৃত অংশে—

কোথায় কবে আছিলে জাগি
বিরহ তব কাহার লাগি,
কোন্ সে তব প্রিয়া ।
ইন্দ্র তুমি, তোমার শচী
জানি তাহারে তুলেছ রচি
আপন মায়া দিয়া ।
—বীথিকা, 'পাঠিকা' ।

এখানে অবশ্য শেষ পদে ৫+২=৭ মাত্রা আছে পূর্বের ৮ মাত্রার বদলে।

চৌপদী—৫+৫ ।। ৫+৫ ।। ৫+৫ ।। ৫+৩=৩৮মাত্রা ।

নাহিঁ মো মনে ঝটিকা ভীতি,
জীবন লাগি জীবন প্রীতি,
প্রকৃতই মো পিয়ারী রাধা
তা' গীত হৃদে বরষে ।
যেতে যা শোভা শইল বনে,
কুসুম হোই মোহরি মনে
তথ্যে দিঅ সত্যে দিঅ,
সুন্দরর ঝলসে ।
—কুঞ্জবিহারী দাস, সঞ্চয়ন : 'মনর যেতে রাগিণী মোর' ।

রবীন্দ্র রচনা থেকে ৫+৫ ।। ৫+৫ ।। ৫+৫ ।। ৫+২=৩৭ মাত্রার অনুরূপ বন্ধের দৃষ্টান্ত। এই চৌপদীর প্রথমে ও শেষে ৫+৫ ।। ৫+২=১৭ মাত্রার দ্বিপদী পঙ্‌ক্তি রয়েছে।—

জগৎ পারাবারের তীরে ছেলেরা করে খেলা ।
অন্তহীন গগনতল
মাথার 'পরে অচঞ্চল,

ফেনিল ওই সুনীল জল
নাচিছে সারা বেলা।
উঠিছে তটে কী কোলাহল ছেলেরা করে খেলা।
—শিশু (ভূমিকা), : 'জগৎ পারাবারের তীরে'

পঞ্চকল পর্বের বিচিত্র প্রয়োগ যেমন রবীন্দ্র-কবিতায় তেমনি ওড়িয়া কবিতাতেও ঘটেছে। এই পর্বের প্রস্বর-আশ্রিত একপ্রকার বিশিষ্ট প্রয়োগের নিদর্শন দেওয়ার লোভ সম্বরণ করা কঠিন। তা হল—বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়কের 'যৌবন পূজা' কবিতাটির ছন্দরূপ। যেমন—

পৌষ জাগে, শিশির লাগে, পরাণ করে ক্রন্দন ;
এ তনু মোর, নবীন কর, শ্যামল কর যৌবন।
—কাবসঞ্চয়ন : 'যৌবন পূজা'

কবিতাটির ঝোঁক ও দুলনী-আশ্রিত ছন্দ-মাধুরীর উৎস খুঁজে পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের গীতিমাল্যের ১০২-সংখ্যক কবিতায়। যার প্রারম্ভিক দুই পঙ্ক্তি হল—

এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর।
পুণ্য হল অঙ্গ মম, ধন্য হল অন্তর।
—গীতিমাল্য-১০২।

বলাই বাহুল্য বাংলা এবং ওড়িয়া দুই ক্ষেত্রেই পঞ্চলকল পর্বের প্রয়োগ অনবদ্য হয়ে উঠেছে। কবিতা, গান ও অনুভূতি একাকার!

ষট্‌কল পর্ব :—

একপদী—৬+৬+২=১৪ মাত্রা।

অনাগত কাল বাণী উপাসক কুল,
গহন তিমিরে দৃষ্টি উঢ়ালে
স্ফুটিত পদ্ম ফুল।
—বৈ. গ্রন্থাবলী ১ম, পূজা অর্ঘ্য, 'ভূমিকা'।

দ্বিতীয় পঙ্ক্তিটি ১২।। ৮=২০ মাত্রা দ্বিপদী। একপদীটির সঙ্গে তুলনীয়-রবীন্দ্রনাথের এই পঙ্ক্তি দুইটি—

পথের প্রান্তে আমার তীর্থ নয়।
পথের দুধারে আছে মোর দেবালয়।
—লেখন, 'পথের প্রান্তে'

এখানেও ৬+৬+২=১৪ মাত্রা লক্ষণীয়।

দ্বিপদী—৬+৬ ॥ ৬+২=২০ মাত্রা।

আদিম যুগুরু দুনিআ ভিতরে গঢ়া যেতে সরকার
নিরেখি চহিঁলে, সবু গুড়িকত ধর্মর অবতার।
দুনিআ যাকর মণিষ পাই ত ধর্ম ন মিলে এক
সবু পূজা, সবু খিয়ান ভজন নুহেঁ কি ভোজন-ভেক ?

—কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী : আধুনিক কবিতা।[৪৫]

এই বন্ধটির রাবীন্দ্রিক নিদর্শন—

এ জগতে হায়, সেই বেশি চায়, আছে যার ভূরি ভূরি,
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।...
আমি শুনে হাসি, আঁখি জলে ভাসি এই ছিল মোর ঘটে—
তুমি মহারাজ, সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে !

—কাহিনী 'দুইবিঘা জমি'।

ত্রিপদী—৬+৬+২ ॥ ৬+৬+২ ॥ ৬+৬+২=৪২ মাত্রা।

সম্মুখে থোই অর্ঘ্যকুসুম ফল
ভক্তি আবেগে বন্দি রচণ-তল,
আহে গুরুদেব। 'কহিলা বিনয় ভাষে,
মাল বাসিনী মুঁ, শ্রমণা মোহর নাম
আসি অছি তব শিষ্যা হেবার আশে।"

—রা. গ. গ্রন্থাবলী ১ম, 'শবরী',

ত্রিপদীর শেষে ২৮ মাত্রার একটি দ্বিপদীও আছে। রবীন্দ্র-রচনা থেকে অনুরূপ ত্রিপদীর একটি উদাহরণ—

চক্ষে তোমার কিছু বা করুণা ভাসে,
ওষ্ঠে তোমার কিছু কৌতুক হাসে,
মৌনে তোমার কিছু লাগে মৃদু সুর।
আলো-আঁধারের বন্ধনে আমি বাঁধা,
আশা-নিরাশায় হৃদয়ে নিত্য ধাঁধা,
সঙ্গ যা পাই তারি মাঝে রহে দূর।

—বীথিকা: 'ঈষৎ দয়া'।

চৌপদী—৬+৬ ॥ ৬+৬ ॥ ৬+৬ ॥ ৬+৩=৪৫ মাত্রা।

আত্মারে করি চির অবনত
বলি দেই মোর মান ইজ্জত
পশু হেবি রাজা, পশু জাতি কেবে কাব্যে কি থাএ বিলসি ?

—কুঞ্জবিহারী দাস, সঙ্কলন : 'বিপ্লবী কবি দীনকৃষ্ণ',

রবীন্দ্র-কবিতা থেকে অনুরূপ পঙ্‌ক্তি বন্ধ দেখা যাক্—

তুরঙ্গসম অন্ধ নিয়তি
বন্ধন করি তায়—
রশ্মি পাকড়ি আপনার করে
বিঘ্ন-বিপদ লঙ্ঘন করে
আপনার পথে ছুটাই তাহারে
প্রতিকূল ঘটনায়।

—মানসী : 'গুরুগোবিন্দ'।

প্রথম পঙ্‌ক্তিটি ৬+৬ ॥ ৬+২=২০ মাত্রার দ্বিপদী এবং পরেরটি ৪৪ মাত্রার চৌপদী। অর্থাৎ ওড়িয়ার চৌপদী থেকে এক কলামাত্রা কম।

আমরা জানি আধুনিক যুগে কাব্যের বা গীতিকাব্যের প্রকৃষ্ট বাহন এই ষট্‌কল পর্ব। তাই এর প্রয়োগ প্রচুর এবং রূপ বহু বিচিত্র। বাংলা ও অসমীয়ার মতোই ওড়িয়া সাহিত্যেও তার বলিষ্ঠ প্রমাণ মেলে। রবীন্দ্রনাথ গানে ভাঙা-মাত্রাবৃত্ত বা প্রত্নকলাবৃত্তের প্রয়োগ করেছেন। ওড়িয়াতেও তার অনুসৃতি সুলভ। বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়কের রচনা থেকে একটি উদাহরণ যেমন—

পাপ তাপ কলুষ প্রাণে বরিবাকু তব দীক্ষা,
শ্রান্ত ক্ষুব্ধ ভিক্ষু আসিছি দিয়হে মুক্তি ভিক্ষা,
মুক্ত কর হে মুক্ত মো মন মন্দির অবরুদ্ধ,
বুদ্ধ হে, বুদ্ধ হে, অবিনশ্বর শুদ্ধ।

—বৈ. গ্রন্থাবলী, ১ম, (১৯৭৬), বুদ্ধ-বন্দনা,

এখানে 'পাপ-তাপ' এবং 'প্রাণে', 'দীক্ষা' ও 'ভিক্ষা'-র 'আ' দীর্ঘ, অন্যত্র হ্রস্ব। আবার শেষ পঙ্‌ক্তির 'হে'-দুই ক্ষেত্রেই অতি দীর্ঘ অর্থাৎ ত্রিমাত্রক। ৬+৬ ॥ ৬+৪=২২ মাত্রার দ্বিপদী বন্ধের এই রচনাটি ভাবে ভাষায় এবং ছন্দো বিচারে রবীন্দ্রনাথের পরিশেষ কাব্যের 'বুদ্ধজন্মোৎসব' কবিতাটি মনে করিয়ে দেয়। তার অংশ বিশেষ উদ্ধৃতি করছি।—

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব,
ঘোর কুটিল পন্থ তর লোভ জটিল বন্ধ।…
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্ত পুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলংক শূন্য।

—পরিশেষ, 'বুদ্ধজন্মোৎসব'।

'ঘোর' 'তার' 'লোভ' 'করুণা' 'ধরণী'—প্রভৃতির দীর্ঘস্বর দ্বিমাত্রক। তৃতীয় পংক্তির তিনটি 'হে'-র প্রথম দুইটি ত্রিমাত্রক, কিন্তু শেষেরটি দ্বিমাত্রক। দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ কলাবৃত্তে বৈচিত্র্য সৃষ্টির যে সব পথ নির্দেশ করেছেন তা ওড়িয়া ছন্দ জগতে অজ্ঞাত বা অনায়ত্ত ও অপ্রযুক্ত থাকেনি। তাই ওড়িয়া ছন্দ অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি ও সার্থকতায় ভাস্বর করে তুলেছে ওড়িয়ার আধুনিক কাব্যকুঞ্জকে।

সপ্তকল পর্ব :—

সাতমাত্রার একপদী :—

কবিতা গঢ়ে এক বিরাট সমাজর
সবুর পাঁই যহিঁ বখরে হেলে ঘর।
সকলে লভিবাকু মুঠাএ দুধ-ভাত
যোগ্য যেতে যহিঁ বালক-বালিকাত।…
কহিবা পাঁই কথা সবুরি দাবি অছি
মুঁ সেহি সমাজর কবিতা বসে রচি।

—পাণিগ্রাহী, আগামী : 'রিচ্ছুচটিয়ে লোড়া'।

রবীন্দ্র রচনা থেকে সাতমাত্রারপর্বের একপদী—৭+২ ও ৭+৭মাত্রার :—

কে এসে যায় ফিরে ফিরে
আকুল নয়নের নীরে ?
কে বৃথা আশাভরে চাহিছে মুখ পরে ?
সে যে আমার জননী রে !

—কল্পনা 'সে আমার জননীরে'।

দ্বিপদী—৭+৭ ॥ ৭+২=২৩ মাত্রা।

নবীন সহকার পত্রেকেবে হার রচিমুঁ দিয়ে মন লাখি,
তা পরে চম্পক দিশই জকজক মহক মনে দিয়ে মাখি।

লোধ্রপরাগরে কেবে বা সরাগরে সজাড়ি থাএ মোর থালা।
বকুল মুকুল রে গুম্ফে বলয়রে সরাগে ঘেনে রাজবালা।
—শচি রাউতরায়, পল্লীশ্রী : 'মালুণী'।

সাতমাত্রার পর্বের সুন্দর দ্বিপদীর দৃষ্টান্ত এটি। ভাব-ভাষা ও ছন্দের সৌষম্যে রচনাটি অপূর্ব হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্র-কাব্য থেকে অনুরূপ শিল্প-নিদর্শন দেখা যাক।—

ধ্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর প্রভাত-অম্বর মাঝে,
দিকে দিগন্তরে ভুবন-মন্দিরে, শান্তি-সঙ্গীত বাজে।
—গীতবিতান : 'পূজা-৩০৩'।

এই অংশটির ধ্বনিগাম্ভীর্য অপেক্ষাকৃত অধিক তা না বললেও চলে।

বাংলায় সপ্তকল পর্বের ত্রিপদী লেখা হয় নি বললেই চলে। কিন্তু ওড়িয়াতে সপ্তকল পর্বিক ত্রিপদীর বেশ কয়েক রকমেরই নিদর্শন পাওয়া যায়। এখানে তার দুয়েকটি উদ্ধৃত করছি।—

(ক) হ্রস্ব ত্রিপদী—৭ ॥ ৭ ॥ ১০ = ২৪ মাত্রা।

সকল স্রষ্টা তু সকল স্রষ্টা তু
সকল করু তু হি বিধান
ভোহরি ইঙ্গিত লভিমু পুলকিত
এ গীত করেঁ নিতি ভিয়াণ।
—বৈকুণ্ঠ গ্রন্থাবলী, কাব্যসঞ্চয়ন : শেষ পৃষ্ঠা।

(খ) দীর্ঘ ত্রিপদী ১৪ ॥ ১৪ ॥ ৯ = ৩৭ মাত্রা।

প্রভাতু উঠি পুণি দেখই নয়নরে
দেখই সেই পরি পূর্ব অয়নরে
উষার উঠে রবিকর
অচিরে কানে মোর পড়ই সকাতর
ঝাউর সেই মর মর।
—রা. মো. কাব্যনায়িকা : 'রূপহীনার ব্যথা'।

(গ) দীর্ঘ ত্রিপদী ১৪ ॥ ১৪ ॥ ১৭ = ৪৫ মাত্রা।

ওষ্ঠ অধরকু দুইটি নিমেষরে
ঝরিলা সীধু-ভরা বচন বিশেষ রে,

শিল্পী সতকথা, মিথ্যা তুমে কহু নাইঁত।
আহুরি কহি তাহা কর না মোতে আউ আহত।
—পূর্ববৎ, ধূসর ভূমিকা : 'বিবি খামুন্ ও শিল্পী-১।'

দেখা যাচ্ছে কলাবৃত্ত রীতির সপ্তকল পর্বের রচনায় ওড়িয়া কবিগণ সমধিক আগ্রহ ও সফলতা দেখিয়েছেন। এই জাতীয় প্রয়োগ বিশিষ্টতা ও মৌলিকতার পরিচায়ক।

চৌপদী—১৪ ॥ ১৪ ॥ ১৪ ॥ ১৪—৫৬ মাত্রা।

নিজ বাসনাজালে বিকল বিধৃত,
তিমির অজ্ঞানে মিলে কি অমৃত ?
ছাড়িবি দূরে যিবি পারাবারে ভাসিবি
লংঘি হিম গিরি যিবি গো বেল থাউ ॥
—বৈ. প. পট্টনায়ক কাব্যসঞ্চয়ন : 'যাত্রা সঙ্গীত'।

রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে একটি সপ্তকল পর্বিক কলাবৃত্ত চৌপদী—

বিদায় বেলা এল মেঘের মতো ব্যেপে,
গ্রন্থি বেঁধে দিতে দুহাত গেল কেঁপে,
সেদিন থেকে থেকে চক্ষু-দুটি ছেপে
ভরে যে এল জল ধারা।
আজকে বসে আছি পথের এক পাশে,
আমের ঘন বোলে বিভোল মধুমাসে
তুচ্ছ কথাটুকু কেবল মনে আসে
ভ্রমর যেন পথ-হারা।
—উৎসর্গ—৪।

এখানে ১৪ ॥ ১৪ ॥ ১৪ ॥ ৯—৫১ মাত্রার বিন্যাস ঘটেছে। তবে ওড়িয়া ও বাংলা কবিতার অংশ দুটিতে ধ্বনি মাধুরীর সাম্য সুস্পষ্ট।

ওড়িয়াতে এই কলাবৃত্ত রীতির বিচিত্র ব্যবহারের পরিমাণ এবং সৌন্দর্য সহজেই বলে দেয়—ছন্দোরীতিটি বাংলা এবং অন্য ভারতীয় ভাষার মতোই ওড়িয়া ভাষার উচ্চারণ এবং ধ্বনি ভঙ্গির সঙ্গেও সঙ্গতিপন্ন। বর্তমানে কলাবৃত্ত ওড়িয়ার নিজস্ব ছন্দোরীতিতে রূপান্তরিত। এই প্রসঙ্গে অতিপর্ব ব্যবহারের বৈচিত্র্যও লক্ষ করার মতো। প্রাচীন হিন্দী এবং ওড়িয়াতে অতিপর্বের ব্যবহার

থাকলেও তার তেমন স্বীকৃতি ছিল না, নিদর্শনও কমই চোখে পড়ত। এখানে একটি করে ওড়িয়া ও বাংলার উদাহরণ দেওয়া গেল।—

অতিপর্ব— যহিঁ সন্ধ্যা পবনে গোলাপ পড়ে না তুটি
যহিঁ সৌরভাকুল মালতী মল্লী ফুটি।
যহিঁ নিত্য প্রণয় সমীরণ করে লুটি
সে দেশ যিবি মুঁ সে দেশে উড়ি।

—বৈ. প. পট্টনায়ক অরুণ শ্রী : 'সে দেশে যিবি'।

ষট্‌ককল পর্বিক একপদীতে ১৪ মাত্রার বিন্যাস ঘটেছে। প্রথম তিন পঙ্‌ক্তির প্রারম্ভেই দুই মাত্রার ('যহিঁ') অতিপর্ব থাকায় পাঠে ধ্বনি-তরঙ্গে বৈচিত্র্য এসেছে। অনুরূপ বিশিষ্টতা লক্ষিত হবে নিম্নের কবিতাংশেও :—

সখী, প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে।
তারে আমার মাথার একটি কুসুম দে॥
সখী সে আমি ধুলায় বসে যে তরুর তলে
সেথা আসন বিছায়ে রাখিস বকুল দলে।

—রবীন্দ্রনাথ : গীতবিতান, প্রেম-৬১।

সর্বৈব সম উদ্ধৃতাংশ দুটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। দ্বিতীয়টির প্রথম দুই পঙ্‌ক্তির 'কে' এবং 'দে'-এর উচ্চারণ প্রসারিত হবে।

প্রবহমান ও মুক্তক বন্ধ

ওড়িয়া কবিগণ বাংলা, হিন্দী ও অসমীয়ার মতোই কলাবৃত্ত রীতিতে পর্ব ভাগ অক্ষুণ্ণ রেখে পঙ্‌ক্তি ও যতির বন্ধন থেকে কবিতাকে মুক্ত রাখতে প্রয়াসী হয়েছেন, কিন্তু এ-রীতিতে অমিত্রাক্ষর বা অমিল প্রবহমান বন্ধ রচনায় আগ্রহ দেখাননি। কলাবৃত্ত প্রবহমানতা আনার অসুবিধা বঙ্গ-অসমীয়া কবিদের মতো তাঁরাও অনুভব করেন। অবশ্য কোনো কোনো কবি যে তা নিয়ে পরীক্ষা চালাননি, এমন নয়। তবে সে প্রয়াস যেন পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরকে অতিক্রম করতে পারেনি। কিন্তু মুক্তক বেশ আত্মবিশ্বাস ও বলিষ্ঠতা নিয়ে দেখা দিয়েছে। প্রবহমান ও কলাবৃত্তের অমিল মুক্তকের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন চোখে পড়েনি। সবুজদলের কবিদের সম্ভবত কেউই অমিত্রাক্ষর ও মুক্তক রচনায় প্রয়াসী হননি।

পরবর্তীকালের রাধামোহন গড়নায়ক, মায়াধর মানসিংহ এবং শচি রাউত রায় প্রমুখ এক্ষেত্রে আগ্রহ দেখিয়েছেন। পরবর্তীকালে এই আগ্রহ আরও ব্যাপক হয়েছে দেখা যায়। সবুজকবি বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়ক সহজেই বলেছেন—"রসপূর্ণ লেখা মধ্যরু মোর যেতে দূর মনেঅছি-দুই-তিনি গোটি কবিতা ১ম সঞ্চয়নরে স্থান পাইঅছি। "নবযৌবন পত্তর ছন্দ বিন্যাস ও তার অবাধ উচ্ছ্বসিত গতি মূলরে বঙ্গীয় কবি কাজি নজরুল ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথংক প্রভাব পড়িথিবার মুঁ অনুভব করে। 'নিমেষদেখা পদ্য আজি থাএ উৎকল সাহিত্যরে সীমিত রহি অছি।..."

—(বৈ. গ্রন্থাবলী ১ম, 'জীবনী ও কৃতি', পৃ. ৫৬)

অমিত্রাক্ষর-মুক্তক আদি রচনায় তিনি সফলকাম হননি। সে কথাও অকপটে স্বীকার করেছেন।

...অমিত্রাক্ষর ছন্দরে লেখিবা লাগি কেতে চেষ্টা করিছি। কিন্তু মনঃপূত ন হেবারু সেথিরে বিশেষ অগ্রসর হোইনাহিঁ। তা ছড়া-পাদমিলেই লেখুথিবা পদ্য লেখিবারে মোর কেবে কষ্ট হোইনাহিঁ। তেণু অমিত্রাক্ষর বা মুক্তচ্ছন্দ কবিতা লেখিবারে মুঁ চিরকাল অনভ্যস্ত রহিগলা।"

—পূর্ববৎ, পৃ. ৩৬।

সুতরাং পরবর্তী কবিদের রচনা থেকেই ওড়িয়া মুক্তকের নিদর্শন সংগ্রহ করছি। কবি কুঞ্জবিহারী দাশের কবিতা থেকে কলাবৃত্ত রীতির প্রবহমানতার একটি নিদর্শন :—

সপ্তকল পর্বিক অমিল প্রবহমান একপদী :—

শুনে মুঁ বিজনতা করুণ অন্তর
কবিতা কলরব, ভাসিমুঁ যাএ কহিঁ
অন্তরর দেশে, সীমার সীমা শেষে
ফগুল মেঘ সম, শান্ত গোধূলির
কাহানী কহে মুহিঁ, অসীম কানে কানে।
অসীম কহে মোহে অরূপ রূপ কথা
উপল দ্বীপতীরে লহরী লপ লপ
কাঁহিকি ভাঙ্গে সে প্রীতির গভীরতা ॥

—'নাউরী নাআরথ' : চিত্রাচিত্র সঞ্চয়ন, পৃ. ৯২।

রবীন্দ্র রচনা থেকে অনুরূপ সমিল মুক্তক—

রাতের পরে কেটেছে দুখ রাত
দিনের পরে দিন
দারুণ তাপে করেছে তনু ক্ষীণ,
সৃষ্টিকারী বজ্রপাণি যে-বিধি নির্মম
বহ্নি তুলি সম…।

—বীথিকা-'রূপকার'।

কলাবৃত্ত রীতির প্রবহমান প্রয়োগের নিদর্শন কম। রবীন্দ্ররচনায় এরূপ প্রয়োগ নেই। এবার কলাবৃত্ত মুক্তকের দু-একটি নিদর্শন দেখা যাক।—

পঞ্চকল পর্বিক মুক্তক :—(অমিল)

"পুঞ্জিবাদ" অর্থ যদি হএ—
'মণিষ দ্বারা শোষণ মণিষর'
কম্যুনিজম্ সংজ্ঞা হেব ভেবে
ঠিক ওল্‌টাটা তার।

—শচি রাউতরায় : খাপছাড়া-কবিতা, ১৯৬৯।

ষট্‌কল পর্বিক-মুক্তক : (সমিল)—

বিপ্লব নাচে বিশ্ব-দুআরে
নি স্বর আজি নিঃস্ব সাহারে
দলিত জনর মিলিত যত্নে শোষণ হেব রে শেষ ;
জাগো দুর্ভাগা দেশ।

—কবি অনন্ত : 'আরে দুর্ভাগা দেশ'।

অনুরূপ সমিল মুক্তকের রবীন্দ্র রচনা থেকে একটি নিদর্শন :—

যায় যদি তবে যাক
এল যদি শেষ ডাক—
অসীম জীবনে এ ক্ষীণ জীবন শেষ রেখা এঁকে যাক
মৃত্যুতে ঠেকে যাক।

—সেঁজুতি : 'যাবার মুখে'।

রবীন্দ্রনাথ চার মাত্রারও কলাবৃত্ত মুক্তক লিখেছেন। কিন্তু ওড়িয়াতে তার

নিদর্শন চোখে পড়েনি। এবার হ্রস্বতম চরণ ৬ ও দীর্ঘতম চরণ ২০ মাত্রার ষট্‌কল পর্বিক কলাবৃত্তের একটি মুক্তকের নিদর্শন দিয়ে প্রসঙ্গটি শেষ করা যাক। কলাবৃত্ত রীতি যে গুরুগম্ভীর বিষয় আলোচনার অনুকূল তা আমরা জানি এবং প্রয়োজনে তার ভাষা মুখের ভাষার কত কাছে আসতে পারে তা বোঝা যাবে এই রচনাংশটি থেকে।—

তু থিলে মুঁ থিবি
তু গলে মুঁ যিবি
তু মো সাথে সাথে মুঁ তো সাথে সাথে তু জীলে মুঁত জীবী।
মুঁউ ত কুসুম তুউ ত সউরভ
তো বিনা কাহিঁরে কহ মোর গউরব
মুঁ ছবিল তুত ছবি
তো বিনা সিনা মো জীবনর যেতে নির্যাস যিব লিভি।
মুঁ সিলা প্রেমিক তুউ ত প্রেমর ধারা
কর্মী মুঁ সিনা কর্ম তু মোর মর্ম মোহন-কারা।

—বাসুদেব সাহু : 'দ্বৈতাদ্বৈত'।

আকৃতি এবং প্রকৃতির বিচারে ওড়িয়া কলাবৃত্ত অসমীয়া ও হিন্দীর মতোই বাংলার প্রায় সমকক্ষ হয়ে উঠেছে। তার প্রয়োগে ওড়িয়া কবিতায় যে নব সৌন্দর্য এবং ঐশ্বর্য এসেছে তা অবশ্য স্বীকার্য। তবু তার বহুল প্রয়োগের অবকাশ আছে। এই বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত উদারমনা সমালোচক ডঃ নটবর সামন্ত রায়ের একটি অভিমত স্মরণীয়। তিনি বলেছেন—

> "কবিমানে ওড়িআ ভাষারে আত্মমর্যাদাকু সম্মান দেখাইবা সঙ্গে সঙ্গে যে পরি অতি দক্ষতার সহিত বিভিন্ন দিগরে এ ছন্দর উপযোগ করিছন্তি, তাহা হিঁ অতীব প্রশংসার কথা। আজি 'মাত্রাবৃত্ত' [কলাবৃত্ত] ছন্দ ওড়িআ কবিতা রাজ্যরে বিভিন্ন ভাব প্রকাশরে এক সহজ ও নিরাপদ পন্থা বোলি অনুমিত হুএ।"

—আধুনিক ওড়িআ সাহিত্যর ভিত্তিভূমি (১৯৬৭), পৃ. ১৮০।

ওড়িয়া কলাবৃত্ত যে বাংলা কলাবৃত্তের প্রেরণা ও অনুসৃতির ফল তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। কোনো কোনো ওড়িয়া সমালোচক এই প্রেরণা ও অনুসৃতিকে সহজ মনে স্বীকার করতে পারেননি। কিন্তু স্বীয় ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির

অভাবপূর্তি ও মানোন্নয়নের জন্য সমৃদ্ধতর অন্যের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় উপকরণ-উপাদান এবং কলা-কৌশল গ্রহণ দোষণীয় নয়। হোক্ না তা অনুকরণ বা অনুসরণের মাধ্যমে।[৪৬]

আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ সরল কলাবৃত্ত রীতিতেও সনেট রচনা করেছেন, যদিও একটিই। ভারতের অন্যান্য ভাষাতেও তা রচিত হয়েছে দেখা যায়। ওড়িয়াতেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। সবুজ গোষ্ঠীর পাঁচ কবির একজন বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়কের রচনা থেকে একটি চতুর্দশপদীর দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ চোদ্দর বদলে তের পঙ্‌ক্তির সনেটও দুই-একটি লিখেছেন। এখানে ষট্‌কল পর্বিক তের পঙ্‌ক্তির সমাবেশ লক্ষিত হবে।

মূক পরবত, কথা কহ, কথা কহ।
মানবর বাণী হেলা আজি দুঃসহ !
ফেড়ি দিঅ তব রুদ্ধ অশ্রু হার,
মিশু তহিঁ মোর অন্তর হাহাকার।
বাধই পরাণে কুহেলি মৃত্যু রাস,
ভরে অবসাদ পৌরুষ উপহাস।
তহুঁ বলি মোর আকুল হৃদয় প্রীতি,
শুনিবাকু আজি মৌন পাষাণ গীতি !
হে পাষাণ জড় মৌন তুমরি ভাষা
মুখর বিশ্বে চির অমৃত আশা।
শুনি সে বারতা অশ্রু যাউ মো বহি।
পাষাণ ? পাষাণ ? মুহিঁই দুর্বিষহ।
মূক পরবত, কথা কহ, কথা কহ !

—উৎকল সাহিত্য, ১৩৮০ বৈশাখ।

কবি বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়কের সনেট বা চতুর্দশপদী ভাবনা যে রবীন্দ্র প্রভাবিত তা বোঝা যায় সনেট সম্পর্কে কবির অভিমত থেকে। কবির 'অরুণশ্রী' কাব্যে 'চতুর্দশপদী' নামে মিশ্রবৃত্ত রীতির আটটি সনেট সন্নিবিষ্ট। অষ্টম সনেটের শেষে 'রচয়িতা'র বক্তব্য রূপে আছে—

"চতুর্দশপদী Sonnet নুহেঁ। Sonnet-র technique বাদ দেলে মধ্য চতুর্দশপদী যে সূক্ষ্ম চিন্তা ও ভাবধারার সহায়ক একথা কেহি

অস্বীকার করিবে নাহিঁ। এহার প্রমাণ বঙ্গ ও উৎকল সাহিত্যরে কেতেগুড়িএ পরিবর্তিত (Acclimatized) সনেট। ভাব বা চিন্তার বিকার ন ঘটিলে Technique-র হানিরে বিশেষ কিছি ক্ষতি হুএ বোলি মোর মনে হুঁএ নাহিঁ।"

—বৈ. না. গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড, (১৯৭৬), পৃ. ৪৩।

এই প্রসঙ্গে সনেট বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অভিমত এবং বর্তমান লেখকের সিদ্ধান্তও বিচার্য। [দ্রষ্টব্য—লেখকের 'রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দী ছন্দ' (১৮৯৬) গ্রন্থের অনুষঙ্গ—'রবীন্দ্রনাথের কবিতা চতুর্দশপদী' পৃ. ১০৯-২৫।] বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়ক অন্তত একশটি মিশ্রবৃত্ত সনেট লিখেছেন। যা ভাব-ভাষা, ছন্দ এবং আঙ্গিক বিচারে রবীন্দ্রনাথের সনেট (বিশেষ করে 'নৈবেদ্যর')-র আদর্শে রচিত।

এই প্রসঙ্গে রাধামোহন গড়নায়কের কাব্য নায়িকা-কাব্যগ্রন্থের 'অশ্রু সাধন' কবিতাটিও স্মরণীয়। মোটামুটি একান্তর মিলের সনেটটি ষট্‌কলপর্বিক ২০ মাত্রার পঙ্‌ক্তির কলাবৃত্তে রচিত। যার শেষ দুই পঙ্‌ক্তি হল—

পোছ না পোছ না নির্মম হাতে অশ্রু দিওটি মোর,
পোছি দেব যদি জলি যিব হিয়া বহ্নির তাপে ঘোর।

—রা. সো. গ. গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড (১৯৬৮) পৃ. ১৫১।

হিন্দীতে এই জাতীয় দীর্ঘ পঙ্‌ক্তির কলাবৃত্ত সনেট বেশি লেখা হয়।

মিশ্র কলাবৃত্ত রীতি (Mixed Moric Style)

ওড়িয়া সাহিত্যের ছন্দশাখায় যা দাণ্ডিবৃত্ত নামে পরিচিত তা বাংলা মিশ্র-বৃত্তেরই অসংস্কৃত রূপ সে কথা আমরা জানি। রবীন্দ্রনাথ এই মিশ্রবৃত্তকে তার পূর্ব অবস্থা থেকে মার্জিত ও সংস্কৃত করে বাংলা কবিতায় তার শক্তি ও সৌন্দর্য বিচিত্র ও বিবিধ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন—তা আমরা দেখেছি। সবুজগোষ্ঠীর প্রচেষ্টায় এই ছন্দটি রবীন্দ্র-কবিতার অনুসরণ ও আকর্ষণে ওড়িয়াতেও গৃহীত হল। কালের প্রভাবে ওড়িয়া কবিতা আর গান ও তথাকথিত দাণ্ডিবৃত্তের আশ্রয়ে থাকা সমীচীন বোধ করেনি। তাই এই পরিবর্তন। দাণ্ডিবৃত্তে একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদী প্রভৃতি পঙ্‌ক্তিবন্ধ এবং চতুষ্কল পর্বরূপ সব সুস্পষ্ট ছিল

না। কিন্তু বিংশ শতকে এই বিভিন্ন পঙ্‌ক্তিবদ্ধ এবং পর্ব রূপ খুব সুস্পষ্ট এবং সার্থক রূপ লাভ করেছে। প্রাচীন সাহিত্যের রস-ঘন সৌম্যমূর্তি কেবলমাত্র গানেই বিকাশলাভের পথ খুঁজে পেয়েছিল। কিন্তু আধুনিক যুগে তা ক্রমে ক্রমে 'পাঠ' ও আবৃত্তি নির্ভর হয়ে উঠেছে। প্রাচীন ছন্দের বর্জন ও নবীন ছন্দের আহরণ এ-যুগের ওড়িয়া কবিতার একটি বিশেষ প্রবৃত্তি। এক্ষেত্রে দুইজন ওড়িয়া ছন্দ-সমালোচকের প্রাসঙ্গিক অভিমত স্মরণীয়।—

(ক) "আধুনিক যুগরে কাব্য, কবিতা, পদ্য প্রভৃতি স্বর সংযোগরে গীত ন হোই পঠিত হেবারে বর্ধবসতি হোইছি।"

—জানকীবল্লভ মহান্তি : ওড়িআ ছন্দর বিকাশ (১৯৬১), পৃ. ৩৭।

(খ) "স্থূলতঃ সুসঙ্গত যতিপাত, মার্জিত ভাষা প্রয়োগ, শব্দ উপরে ঝুংক দেবার প্রয়াস ও পরিশেষরে সহজ বাক্য গঠন রীতি—এ চারোটি কৌশলর প্রাধান্য লক্ষ্য হেউচি কবিতার ভাবসম্পদকু পাঠক নিকটরে অতি সহজভাবে উপস্থাপন করিবা।"

—নটবর সামন্ত রায় : আধুনিক ওড়িআ সাহিত্যর ভিত্তিভূমি (১৯৬৪) পৃ. ১৪৩-৪৪।

মিশ্রবৃত্ত রীতিতে সাধারণ মহাপয়ার ও অমিল প্রবহমান রূপের ব্যবহার বেশ দক্ষতার সঙ্গে হয়েছে তা আমরা আগেই দেখেছি। এবার প্রবহমানের সমিল রূপ এবং সমিল ও অমিল মুক্তক বন্ধের বিষয়ে আসা যাক। প্রথমে সাধারণ পঙ্‌ক্তি বন্ধ তার পর প্রবহমান ও মুক্তকের নিদর্শন পর পর দেওয়া গেল।—

একপদী—৪ + ৪ + ২ = ১০ মাত্রা।

"তুম্ভর কি নাহিঁ কিছি ভিক্ষা ?"
"তব ইচ্ছা সেই মোর দীক্ষা।"

—রাধামোহন গড়নায়ক, কাব্যনায়িকা : 'মাটি'।

এ-টি দশ মাত্রার একপদী। ওড়িয়াতে বাংলার মতোই ৮, ৯, ১০ ও ১২ মাত্রার একপদী পঙ্‌ক্তির প্রয়োগ অধিক। রবীন্দ্ররচনা থেকে অনুরূপ একটি দৃষ্টান্ত—

ভিক্ষা-অন্নে বাঁচাব বসুধা,
মিটাইব দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা।

—কথা : নগরলক্ষ্মী।

দ্বিপদী—সাধারণ দ্বিপদী, পয়ার ও মহাপয়ারের নিদর্শন, পর পর—

(ক) ৪+৪ ॥ ৪+৩=১৫ মাত্রা।

অনন্ত অমৃত প্রেম সুধাময় সুবাসে
মোহিবি মো প্রাণ প্রিয় দেবতাকু উল্লাসে।

—কুন্তলা কুমারী সবত, উল্লাস : 'শেফালিপ্রতি'।

রবীন্দ্রনাথ ১৫ থেকে ২০-২২ মাত্রা পর্যন্ত দীর্ঘ দ্বিপদীও রচনা করেছেন। এখানে ষোল মাত্রার একটি দ্বিপদী দেওয়া গেল—

এখন বিশ্বের তুমি, গুন্ গুন, মধুকর
চারিদিকে তুলিয়াছে বিস্ময়-ব্যাকুল স্বর।
গাহে পাখি, বহে বায়ু, প্রমোদ হিল্লোল-ধারা
নবস্ফুট জীবনেরে করিতেছে দিশাহারা।

—মানসী : 'শেষ উপহার'।

(খ) ৪+৪ ॥ ৪+২=১৪ মাত্রা (পয়ার)।

জীবনে মাতর সার চিত্ত সম্প্রয়োগ,
স্থির লক্ষ্য যোগী নিষ্ঠা ন জাগে বিয়োগ।

—বৈ. না. পট্টনায়ক, কাব্যসঞ্চয়ন : 'মহানির্বাণ'।

অনুরূপ দৃষ্টান্ত রবীন্দ্র রচনা থেকে—

জীবন মন্থন-বিষ নিজে করি পান
অমৃত যা উঠেছিল করে গেছ দান।

—চৈতালি : 'কাব্য'।

(গ) ৪+৪ ॥ ৪+৪+২=১৮ মাত্রা (মহাপয়ার)।

অগ্নি কণা! অগ্নিকণা! দেহ দীপে জাল দীপ্ত শিখা,
তীব্রতেজে দহিবি মুঁ জড়তার অন্ধ কুজ্ঝটিকা।

—অন্নদাশংকর রায়, সবুজ কবিতা : 'প্রলয় প্রেরণা'।

এই মহাপয়ার বন্ধের প্রেরণার উৎস রবীন্দ্রকাব্য। সে কথা বলাই বাহুল্য। রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের রচনা থেকে মহাপারের রূপ—

অভ্র-ভেদী ঐশ্বর্যের চূর্ণীভূত পতনের কালে
দরিদ্রের জীর্ণদশা বাসা তার বাঁধিবে কঙ্কালে।

জন্মদিনে : —২২।

ওড়িয়াতে ত্রিপদী ও চৌপদীর ছোট বড়ো নানা রূপের প্রচলন দেখা যায় মধ্যযুগ থেকেই। সেই সব প্রয়োগে ওড়িয়া কাব্য ও ছন্দের নিজের বিশেষত্ব সুস্পষ্ট। বর্তমান যুগে হ্রস্ব ত্রিপদী (বঙ্গলাশ্রী—৬ ॥ ৬ ॥ ৮) এবং মহাত্রিপদী ও চৌপদীর প্রয়োগ বেশি চোখে পড়ে। তাই এখানে বঙ্গলাশ্রী ও আরও দুই-একটা বন্ধের উদাহরণ দেওয়া গেল।—

(ক) ত্রিপদী—৮ ॥ ৮ ॥ ১৩—২৯ মাত্রা।

গ্রাম শেষে শমশান কুঢ়ি কুঢ়ি হাড়মান
বাঁউশ, মাঠিআ পুণি অঙ্গার মাল,
পাঁউশ বিভূতি বোলি গোগীসম অছিপড়ি
হাতরে ধরিছি সে ত খপুরি থাল।
—শচি রাউতরায়, পল্লীশ্রী : 'গ্রাম শ্মশান'।

রবীন্দ্ররচনা থেকে অনুরূপ উদাহরণ যাতে ১০ ॥ ১০ ॥ ১০=৩০ মাত্রার বিন্যাস লক্ষণীয়।—

যে দিন প্রথম কবিগান, বসন্তের জাগাল আহ্বান
ছন্দের উৎসব সভাতলে,
সেদিন মালতী যুথী জাতি কৌতূহলে উঠেছিল মাতি
ছুটে এসেছিল দলে দলে।
—পূরবী : 'আকন্দ'।

(খ) চৌপদী—১৪ ॥ ১৪ ॥ ১৪ ॥ ১০=৫২ মাত্রা।

দিহর অতল জলে পাতাল পহরে।
বাবুরি হসর দাঢ়ে, হঠাৎ-পাহাড়ে,
গরম টব্‌রে পরে, নরম টাওয়ালে
পাহাস্তিয়া সপন ছুআরে ॥
—শচি রাউতরায় : 'তুমে কিআঁতরতরহুঅ'।

অমিত্রাক্ষর বা প্রবহমান পয়ারের অমিল রূপের প্রয়োগ প্রচুরভাবে হয়েছে সে বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা হওয়ায় এখানে সে বিষয়ে নিরস্ত থাকা গেল।

সমিল প্রবহমান পয়ার—৮ ॥ ৬=১৪ মাত্রা।

পাষাণ চরণে রক্ত ! বাল রবিকর
পহিলি লোহিত রেখা অতি মনোহর

লগিছি কি স্নেহভরে উদয়াস্ত পরে
পদে তব ? অবা ছিন্ন রক্তজবা জলে ।
পল্লীর পূজারী কিএ কেউ বর আশে
পূজাহিঁ কি দেবি ভাবি ? মহিমা প্রকাশে।
—কুঞ্জবিহারী দাস, সঞ্চয়ন-২ : 'পাষাণ চরণে রক্ত'।

এই সমিল প্রবহমান পয়ার বাংলায় রবীন্দ্রনাথের দান। তাঁর এই ছন্দের একটি প্রসিদ্ধ রচনার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি—

কবিবর, কবে কোন্‌ বিস্মৃত বরষে
কোন্‌ পুণ্য আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
লিখেছিলে মেঘদূত। মেঘমন্দ্র শ্লোক
বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক
রাখিয়াছে আপন আঁধার স্তরে স্তরে
সঘন সংগীত মাঝে পুঞ্জীভূত করে ।
—মানসী : 'মেঘদূত'।

বাংলার মতোই ওড়িয়াতেও প্রবহমান মহাপয়ারের সমিল ও অমিল দুই রূপেরই রচনা মেলে।—

সমিল প্রবহমান মহাপয়ার—৮ ॥ ১০ = ১৮ মাত্রা।

ধন্য আজি জন্মভূমি ! শাক্যমুনি আগত নগরে,
পুরপল্লী দূর গ্রাম নরনারী আনন্দ কে ধরে,
নিবসন্তি (প্রভু) মেলে নগর উপান্ত বংশ বনে
উপেক্ষিতা যশোধরা কি অবা কল্পনা রখি মনে—
পুছন্তি রাহুলে—"বৎস শুণিছু না আগত তো পিতা ?"
অন্ধ করি জননী কি প্রাণে তার জালিলে যে চিতা
আসিছন্তি সে নিষ্ঠুর ! হুএ পছে মুহিঁ না র খার,
যাঅ বৎস ! মাগ যাই সন্তানর চির অধিকার !
গলে যেতে বংশ বনে সকলে প্রাসাদে হেলে ধন্য
মহা কারুণিক বুদ্ধ সর্বজীব আশ্রয় পরম ।
—বৈ. না. পট্টনায়ক, কাব্য সঞ্চয়ন : 'বুদ্ধ ও রাহুল'।

রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে অনুরূপ বন্ধের উদাহরণ—

হে আদি জননী সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার,
একমাত্র কন্যা তব কোলে। তাই তন্দ্রা নাহি আর
চক্ষে তব, তাই বক্ষ জুড়ি সদা শংকা, সদা আশা,
সদা আন্দোলন ; তাই উঠে বেদমন্ত্র সম ভাষা
নিরন্তর প্রশান্ত অম্বরে, মহেন্দ্র মন্দির পানে
অন্তরের অনন্ত প্রার্থনা ; নিয়ত মঙ্গল গানে
ধ্বনিত করিয়া দিশি দিশি ; তাই ঘুমন্ত পৃথ্বীরে
অসংখ্য চুম্বন কর আলিঙ্গনে সর্ব অঙ্গ ঘিরে
তরঙ্গ বন্ধনে বাঁধি, নীলাম্বর অঞ্চলে তোমার
সযত্নে বেষ্টিয়া ধরি সন্তর্পণে দেহখানি তার
সুকোমল সুকৌশলে।

—সোনার তরী : 'সমুদ্রের প্রতি'।

অমিল প্রবহমান মহাপয়ার—৮ ॥ ১০ = ১৮ মাত্রা।

মুঁ তমকু ডাকুথিলি সতে অবা মঝি পোখরীরে
ভাসুথিবা হংস এক ডাকুথিলা পহঁচা হংসকু
পোখরীর হুড়া ভাঙ্গি যেতে বেড়ে পাণি আসিগলা
তুমে ফেরি চাহিঁলনি। কাহা পাইঁ এতে বেশি ভয় ?
এবং ওদা শালপত্রে চক্ চক্ খরা ঝলসু থিলা
সতে অবা পলটণ কেতে শোইথিলে সূর্য মুহাঁ হোই
এবং তাংক নশ্বরমান পালিস্‌রে জলিলা জলিলা।

—রমাকান্ত রথ : ইন্দ্রধনু (কবিতা ১৯৬৯, পৃ. ১৫৬)।

রবীন্দ্র কবিতা থেকে এই বন্ধের উৎসরূপ—

একদা পরম মূল্য জন্মক্ষণ দিয়েছে তোমায়
আগন্তুক। রূপের দুর্লভ সত্তা লভিয়া বসেছি
সূর্য নক্ষত্রের সাথে। দূর আকাশের ছায়া পথে
যে আলোক আসে নামি ধরণীর শ্যামল ললাটে
সে তোমার চক্ষু চুম্বি তোমারে বেঁধেছে অনুক্ষণ
সখ্য ডোরে দ্যুলোকের সাথে ; দূর যুগান্তর

হতে মহাকাল যাত্রী মহাবাণী পুণ্য মুহূর্তেরে তব
শুভক্ষণে দিয়েছে সম্মান ; তোমার সম্মুখ দিকে
আত্মার যাত্রার পন্থ গেছে চলি অনন্তের পানে,
যেথা তুমি একা যাত্রী, অফুরন্ত এ মহাবিস্ময় ।

—প্রান্তিক-১৩ ।

মনে রাখা দরকার প্রবহমান পয়ারে মিলের অভাব কানে লাগে না। কারণ 'এর ভঙ্গি পদ্যের মতো, কিন্তু ব্যবহার গদ্যের তালে'। প্রবহমান পয়ার ও মহাপয়ারের সমিল ও অমিল রূপের মতোই সমিল ও অমিল মুক্তকও রচিত হয় ওড়িয়া কাব্যে।—

সমিল মুক্তক—

বাহারে কলহ রত ভিখারী দ্বিজণ,
উপরে টিণর জন্থ,
যাএ বুড়ি
ঈষৎ কুহুড়ি ।
কদম্ব ফুলিআ জন্থ হেলা আমি নাল ।
মনে হুএ এক মৃত হরিণর ছাল
ঢাংকে পৃথিবী
পাহাড় নদী বি ॥

—শচি রাউতরায় পাণ্ডুলিপি : 'লাবণ্যবতীকু চন্দ্রভানুর চিঠাউ'।

এখানে চার থেকে চোদ্দ মাত্রার লম্বা চরণ লক্ষণীয়। 'ঢাংকে পৃথিবী'তে পাঁচ মাত্রা আছে মনে হলেও 'ঢাং' রুদ্ধদলটি প্রসারিত তাই 'ঢাংকে পৃ' চার মাত্রা এবং 'থিবী' দুই মাত্রা—মোট ছয় মাত্রা ধরতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ মুক্তক :—

অজস্র দিনের আলো, জানি, একদিন
দু'চক্ষুরে দিয়েছিলে ঋণ ।
ফিরায়ে নেবার দাবি জানায়েছ আজ,
তুমি মহারাজ ।
শোধ করে দিতে হবে জানি,
তবু কেন সন্ধ্যাদীপে ফেল ছায়াখানি ।…

ছায়াপথে লুপ্ত আলোকের পিছু
হয়তো কুড়ায়ে পাবে কিছু—
কণামাত্র লেশ
তোমার ঋণের অবশেষ।

—রোগ শয্যায়-৪।

এখানে হ্রস্বতম চরণে ছয় ও দীর্ঘতম চরণে চোদ্দ মাত্রা বিন্যস্ত।

অমিল মুক্তক :—

কাহিঁ সেই কেশ সজ্জা
কুসুমকুমারী বেশ, নিকুঞ্জ দোলন
কর্পূর চন্দন ঘোটা, কস্তূরী কুংকুম
উষার মৃণাল
দীপালোকে, ধূপগন্ধ
সারী গীত, কাকতুআ প্রশ্ন চমৎকার।

—কুঞ্জবিহারী দাস, সঞ্চয়ন ১ম : 'রাজকন্যা'।

হ্রস্বতম চরণে ছয় মাত্রা ও দীর্ঘতম চরণে চোদ্দ মাত্রা রয়েছে।

অনুরূপ—রাবীন্দ্রিক অমিল মুক্তক (ছোট)—

বহু লক্ষ বর্ষ ধরে জ্বলে তারা,
ধাবমান অন্ধকার কাল স্রোতে
অগ্নির আবর্ত ঘুরে ওঠে।
সেই স্রোতে এ ধরণী মাটির বুদ্‌বুদ্‌
তারি মধ্যে এই প্রাণ
অণুতম কালে
কণাতম শিখালয়ে
অসীমের করে সে আরতি।

—পরিশেষ : 'প্রাণ'।

সমিল মুক্তক (বড়ো)—

সকলে চাহিঁলে মান, উচ্চাসন, স্বাধিকার ভোগ,
প্রথমে পাইলে যেবে স্রষ্টার নিয়োগ।

স্থষ্টি পরে
অনশ্বর জণাইলে সুপ্তশান্ত স্বরে,
বাঞ্ছিত আসন মোতে হে বিধাতা দিঅ, মতে আগে
নিখিল স্থষ্টির ঊর্ধ্ব ভাগে ।
অংশুমান দিবাকর কলে আবেদন
"মোহর বিহার লাগি মিলু তেবে অনন্ত অঙ্গন
এই গগনর বক্ষ
সাধিবি মুঁ তুহ্মর যা লক্ষ্য ।"
—রাধামোহন গড় নায়ক, কাব্যনায়িকা : 'মাটি' ।

বড়োচরণ আঠারো এবং ছোটচরণ চারমাত্রার। রবীন্দ্র-রচনা থেকে অনুরূপ নিদর্শন।—

তোমায় কি গিয়েছিনু ভুলে ?
তুমি যে নিয়েছ বাসা জীবনের মূলে,
তাই ভুল ।
অন্যমনে চলি যবে পথে, ভুলি নে কি ফুল ?
ভুলি নে কি তারা ?
তবুও তাহারা
প্রাণের নিশ্বাস বায়ু করে সুমধুর
ভুলের শূন্যতা মাঝে ভরি দেয় সুর ।
ভুলে-থাকা নয় সে তো ভোলা ;
বিস্মৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছ যে দোলা ।
—বলাকা-৬ ।

অমিল মুক্তক (বড়ো)—

কি হেব বা শাস্ত্র পঢ়ি ?
পাঞ্জিরে লেখিচি এতে অড়া জল,
কিন্তু মিলে কি টোপাএ পাণি সারা পাঞ্জিটা চিপুড়ি ?
দেখ্ দেখ্ দেখ্ । ভল করি দেখ ।
যিএ যার সিএ তার সিএ তা গয়াখ ।
দেখ্ দেখ্ দেখ্ ।।
—শচি রাউতরায়, কবিতা-১৯৬৯ : 'প্রথম রাত্রি'

তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের কবিতাংশ—

বিশ্বনাট্যে প্রথম অঙ্কের
অনিশ্চিত প্রকাশের যবনিকা
ছিন্ন করে এসেছিল দিন,
নির্ধারিত করেছিল বিশ্বের চেতনা
আপনার নিঃসংশয় পরিচয়।...
আমি কর্তা আমি মুক্ত দিবসের আলোকে দীক্ষিত,
কঠিন মাটির পরে
প্রতি পদক্ষেপে যার
আপনারে জয় করে চলে।

—নবজাতক : 'রাত্রি'।

দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ মিশ্রবৃত্ত রীতির বিচিত্র প্রয়োগে যেমন বাংলা ছন্দকে সমৃদ্ধ এবং বাংলা কাব্যকে সুশোভিত করেছেন, তাঁর অনুসরণে ওড়িয়া ছন্দ এবং ওড়িয়া কাব্যেরও অনুরূপ শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। অস্পষ্ট, অসংস্কৃত দাণ্ডিবৃত্তের যুগ কবে শেষ হয়ে গেছে। মিশ্রবৃত্ত উদ্ভাসিত করেছে আধুনিক ওড়িয়া কাব্যশাখাকে বিবিধ ও বিচিত্র রূপে, রঙে এবং স্বাদে।

দলবৃত্ত বা লৌকিক ছন্দ (Syllable Style)

নব্য ভারতীয় আর্য ভাষায় পূর্বাঞ্চলীয় লোকসাহিত্যের বাহন হল লৌকিক রীতির ছন্দ। এই ছন্দকেই কোথাও 'ছড়ার ছন্দ', 'ঢামালি' বা 'ধামালি ছন্দ', কোথাও 'গাঁউলি গীতির ছন্দ' বা 'ঢগবৃত্ত' বলা হয়—সে কথা আমরা জানি। তাকে যে নামেই ডাকা হোক—ছন্দ একই। আবার 'স্বরবৃত্ত', 'শ্বাসঘাতপ্রধান' বা 'দলবৃত্ত'ও বলা হয় তাকেই। এ-টি গানের তাল আশ্রিত ছন্দ। 'ধামালি' বা কাওয়ালির চার মাত্রার তালকে আশ্রয় করে এই ছন্দোরীতিটি গড়ে উঠেছিল। ক্রমে ক্রমে গেয়ধর্মিতা মুক্ত হয়ে তা সুরাশ্রিত কবিতা রচনার মাধ্যম হয়ে ওঠে। এই ছন্দটি জনগণের উচ্চারণভঙ্গি আশ্রিত আর বাক্ ছন্দের প্রভাবপুষ্ট। সংস্কৃত-প্রাকৃত ছন্দ থেকে পৃথক লোক মুখের ভাষার উচ্চারণপুষ্ট

হওয়ায় বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া এবং হিন্দী ভাষার বা সাহিত্যের স্বাভাবিক ছন্দই এই লৌকিক ছন্দ। বাংলা সাহিত্যেই রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম সাধু-সাহিত্যের বাহন রূপে এই লৌকিক ছন্দোরীতিটির সংস্কার সাধন করে প্রয়োগ করেন। পরে তা অসমীয়াতেও পরিগৃহীত হয়েছে সাধু সাহিত্যে। কিন্তু ওড়িয়া সাধু সাহিত্যে তার প্রয়োগ তেমন হয়নি। লৌকিক সাহিত্যে এবং শিশু সাহিত্যে যে ছন্দের প্রয়োগ ঘটেছে তা লৌকিক অবশ্যই। কিন্তু তার সংস্কার সাধন এবং সুনির্দিষ্ট রূপদানের প্রয়াস হয়নি বললেই হয়। অবশ্য অসংস্কৃত বেশে ছন্দটি মাঝে মধ্যে সাধু সাহিত্যেও উঁকি দিতে শুরু করেছে। বাংলা, হিন্দী ও অসমীয়ার সঙ্গে ওড়িয়া ভাষার উচ্চারণগত পার্থক্য থাকায়, অর্থাৎ ওড়িয়াতে স্বরান্ত-উচ্চারণ প্রবণতা সাধু ভাষায় অক্ষুন্ন থাকায় রুদ্ধ দলের পরিমাণ এ-ভাষায় অন্য তিন ভাষার তুলনায় কম। তাই দলবৃত্তের, যা একান্ত-ভাবে দল-নির্ভর ছন্দর আনুকূল্য ওড়িয়ায় কম। তবু ভাষার উচ্চারণ বিবর্তনের ক্রিয়া অব্যাহত থাকায় শব্দান্তিক স্বর—বিশেষ করে 'অ'-এর উচ্চারণ মাঝে মাঝে লোপ পেয়ে যায়। সম্বলপুরী উপভাষার উচ্চারণ সম্পর্কে ড সত্যনারায়ণ রাজগুরু বলেছেন—"এহি উপভাষারে অধিকাংশ শব্দ হলন্তযুক্ত হোই থাএ।" এই প্রসঙ্গে ঐ ভাষার কয়েকটি ছড়ার উচ্চারণ লক্ষ করার মতো। যেমন—

১. 'গাঁ ভিন্ ভিন্ মনুস্ একা'। ২. 'সাগ্ ভাত্ খাই্ মাছ্ কণ্টে অড়ুআ।' ৩. 'উপর্ বড্ডা খয়ছে / তল্ বড্ডা উঁয়সে। রর রে তল্ বডডা / তোর্ দিন্ কাল্ আয়ছে।"

—ওড়িয়া ভাষার উপভাষা (১৯৮২), পৃ. ১০৭-১২।

এই প্রসঙ্গে ওড়িয়া ভাষাবিদ্ ব্রজমোহন মহান্তির অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তিনি তাঁর 'ওড়িআ ভাষা বিজ্ঞান' ১ম ভাগ (১৯৬৮) গ্রন্থে বলেছেন—

> "সাধু ওড়িআ ভাষা দেহরে কেবল হিন্দী, বঙ্গলা ও দ্রবিড় ভাষার প্রভাব যোগু আঞ্চলিক ভাষাগুড়িক সৃষ্টি হোইছি বোলি কহিলে মধ্য ভুল হেব। এগুড়িকু কেতেক পণ্ডিত বিভাষা বোলি কহি থান্তি, তেবে এহি বিভাষা সৃষ্টির আউ এক প্রধান কারণ হেলা বিভিন্ন আদিবাসী ভাষার প্রভাব।"

—ওড়িআ ভাষা বিজ্ঞান, ১ম (১৯৬৮), পৃ. ৩৫৫।

বলাই বাহুল্য লৌকিক বা দলবৃত্ত ছন্দের সঙ্গে আদিবাসী ভাষার একটি

অবশ্যস্বীকার্য সম্পর্ক বিদ্যমান। ওড়িয়া দলবৃত্ত ছন্দও তার ব্যতিক্রম নয়। তার সঙ্গে প্রতিবেশী অন্যান্য ভাষার এমন কি ইংরেজি ভাষার উচ্চারণজাত প্রভাবের কথাও স্মরণীয়। অধ্যাপক মহান্তি আরও বলেছেন—

"আঞ্চলিক ভাষা সৃষ্টির প্রধান হেতু হেলা যুক্ত বা সংযুক্ত ব্যঞ্জনর উচ্চারণকু সরল করি উচ্চারণ করিবা।"…এই সরল বা স্বাভাবি উচ্চারণের ফলে—"ওড়িয়া সাধু ভাষার বহু শব্দ, স্বরান্ত শব্দ, অর্থাৎ শব্দগুড়িকর অন্ত্যবর্ণরে স্বরর ঝংকার অধিকতর হুএ। হেলে আঞ্চলিক ভাষা গুড়িকরে সে পরি স্বরান্ত সমাপ্তি প্রায় হুএ নাহিঁ। এহি বৈশিষ্ট্য বিশেষ পরিমাণরে দক্ষিণাঞ্চল ভাষা দেহরে ও পশ্চিমাঞ্চল ভাষা দেহরে পরিদৃষ্ট হুএ।…

পেট	=	পেট্	ওইল	=	ওইল্
হাট	=	হাট্	পাএন	=	পাএন্
লোক	=	লোক্	রাএত	=	রাএৎ
গোবর	=	গোবর্	বাএড়	=	বাএড্
আইল	=	আইল্	জন	=	জন্
কাইল	=	কাইল্			

এঠারে স্পষ্ট যে আঞ্চলিক ভাষাভাষী লোকমানে শেষ স্বর উপরে জোর ন দেই প্রথম স্বর উপরে জোর দেই থাআন্তি; তেণু পেট শব্দেরে পে উপরে জোর দেই দিঅন্তি, তথা এহি স্থানরেহিঁ স্বরাঘাত আরম্ভ হুএ। তেণু অন্ত্য বর্ন উপরে স্বরাঘাত ন হোই হোই লঘু বল প্রয়োগ হেউথিবা হেতু তাহা ব্যঞ্জনান্ত হোই থাএ।"

—পূর্ববৎ, পৃ. ৩৫০-৩৫২।

অধ্যাপক মহান্তি ব্যঞ্জনান্ত উচ্চারণ প্রবণতার সমর্থনে বিশেষ করে উড়িষ্যার দক্ষিণাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের কথা বললেও, ক্রমে ক্রমে তা উড়িষ্যার সর্বত্র বিস্তার লাভ করেছে—বলা যায়। এই উচ্চারণ ভঙ্গি কত সুস্পষ্ট এবং ব্যাপক হবে—ওড়িয়া কবিতায় দলবৃত্তের মাটিও ততই শক্ত হবে। কারণ ব্যঞ্জনান্ত রুদ্ধ দলের অস্তিত্ব—লৌকিক বা দলবৃত্ত ছন্দের অনুকূল। সুতরাং আপাতভাবে ওড়িয়া লৌকিক ছন্দে চার, পাঁচ ও ছয় দলমাত্রার বিন্যাস থাকলেও বাস্তবে চারমাত্রার

পর্বের দিকেই তার প্রবণতা।[৪৭] যেমন—

কিএ বোলুছি মোহর ঠানে নাহিঁ লুগা পটা
কিএ বোলুছি পহলা রোইলে কেতে খাইবি পিঠা।
—পল্লীগীতি সঞ্চয়ন (কু. জি. দা.) পৃ ৬২২।

এই অংশের 'কিএ', 'মোহর', 'পহলা', 'রোইলে' ও 'খাইবি' শব্দকয়টি-যথাক্রমে কিএ্, মোহর্, বোই্লে, ও খাই্বি রূপে উচ্চারিত হবে। ফলে তা দাঁড়াবে—

১ ১১১ ১ ১১১ ১১ ১১ ১১
কিএ্ বোলুছি। মোহর্ ঠানে॥ নাহিঁ লুগা। পটা
১ ১১১ ১ ১১ ১ ১ ১১ ১ ১১
কিএ্ বোলুছি। পোহ্লা রোই্লে॥ কেতে খাই্বি। পিঠা।

অর্থাৎ প্রত্যেকটি রুদ্ধদল সংকুচিত ও একমাত্রার। প্রত্যেক পূর্ণ পর্বে চারদলমাত্রা পাওয়া যায়। ফলে প্রত্যেক পঙ্‌ক্তি ৪+৪॥ ৪+২=১৪ দলমাত্রার পয়ার পঙ্‌ক্তি হয়ে ওঠে।

ওড়িয়া সাধু সাহিত্যে এ-ছন্দের প্রয়োগ তেমন হয়নি। তবু কোনো কোনো কবির রচনায় তার আভাস ফুটে উঠেছে। এখানে কবি রাধামোহন গড়নায়কের রচনা থেকে দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক্।—

"জয় হিন্দ্।
জয় হিন্দ্।"
সিন্ধু সে পারু। সেনানী সুভাষ্। ডাকে
"আজাদ্ ফউজ। মৃত্যু কবচ্। পিন্ধ্
জয় হিন্দ্। জয় হিন্দ্"
—মৌসুমী : 'সেনানী সুভাষ'।

এখানে 'সিন্ধু সে পারু' ছাড়া অন্যত্র চার দলমাত্রা স্পষ্ট।

গ্রীষ্‌র কবি আই বিকস
প্রাণরু দেই করুণ রস।
—পশুপক্ষীর কাব্য : 'বলাকা'

কবি গড়নায়কের 'বলাকা' কবিতাটি পঞ্চকল পর্বিক হলেও এখানে চতুর্দলপর্বের রূপ আভাসিত।

কবি কৃষ্ণবিহারী দাসও মাঝে মাঝে দলবৃত্তের রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর রচনা থেকে দলবৃত্ত একপদী, দ্বিপদী ও চৌপদীর একত্রে নিদর্শন :—

আস বীর ভাই হে I
তুরী ভেরী ঢক্কা যোড়ী ॥
নাগরা বজাই হে I
দুন্দুভি বজাঅ দমাম্ দমাম্ ॥
হিন্দু শিখ হে মুসলমান্ ॥
স্বাধীন ভারত মুক্ত ভারত ॥
ভারত গীত গাই হে I
—সঞ্চয়ন,—৩ : আস বীর ভাই হে'।

ওড়িয়াতে এই দলবৃত্ত বা লৌকিক রীতি সাধু সাহিত্যে স্বচ্ছন্দে গৃহীত না হলেও তার দিকে কবিদের প্রবণতা যে বাড়ছে তাতে সন্দেহ নেই। তাই এ-রীতিতে অমিত্রাক্ষর ও মুক্তক রচনার প্রত্যাশাই করা যায় না। তবু কোনো কোনো কবির রচনায় যে দলবৃত্ত মুক্তক ফুটে ওঠেনি তা বলা যায় না। এখানে কবি শচি রাউতরায়ের একটি রচনার কিছু অংশ তুলে দেওয়া যেতে পারে। তার আগে দলবৃত্ত চৌপদী—

দিব্য জ্যোতির মহাকাশে
পতঙ্গ মু ভাসে ভাসে।
ক্ষুদ্র মোর অগ্নিকণা
মিলাই যাএ মহা তেজ সে।
ক্ষিতি বায়ু জল আদি
পঞ্চভূত নিয়ে সমাধি,
মহাজ্যোতির পারাবারে
জ্যোতিরিগণ মু মিশে ॥
—কবিতা ১৯৬২ : 'দিব্যজ্যোতির মহাকাশে'।

দলবৃত্তের প্রকৃতি অনুযায়ী চতুর্দল মাত্রিক পর্বভাগ সুস্পষ্ট। তবে তাতে পাঁচ দলমাত্রার পর্বও আছে। অকারান্ত 'জ্যোতির' কে ব্যঞ্জনান্ত করা যায়। শব্দান্তিক 'ই'-রও খণ্ড উচ্চারণ করা যায়, তবু 'মহাতেজ সে' এবং 'নিয়ে সমাধি'-এই দুইটি পর্ব পঞ্চদলমাত্রক'ই থেকে যায়। অর্থাৎ দলবৃত্ত রীতিটির ব্যবহার হলেও প্রয়োজনীয় সংস্কার হয়নি তা সুস্পষ্ট।

ওড়িয়া কাব্যে রাবীন্দ্রিক ছন্দ : দলবৃত্ত

কবি শচি রাউতরায় দলবৃত্ত মুক্তকের ছন্দকে 'বাক্‌ছন্দ' বলে অভিহিত করেছেন—

মাটিয়া বুরুজর মইলা আকাশ রে
জহ্ন উঠিচি।
ছোট ছোট আলুঅর বীচি
চারি আড়ে খেলে।
জহ্ন উঠিচি, আহা, উঠ, উঠু।
পদ্ম-ফুটু
এই সন্ধ্যারে।
মো মনরে বি বেলে বেলে
জহ্ন উঠে,
সূর্য ছুটে।
মুঁ বি কবিতা লেখে,
স্বপ্ন দেখে
ছন্দ-শিখী পুচ্ছ তোলে,
নাচে।
মো মনর পাহাতে পাহাতে,
উহয়র পাদ চিহ্ন ফুটে।"

—পাণ্ডুলিপি : 'মটিয়া বুরুজর জহ্ন'।

এই মুক্তকেও চার এবং পাঁচ দলমাত্রার পর্বের প্রয়োগ হয়েছে। তবে মুক্তকের রূপটি বেশ বোঝা যায়।

ওড়িয়া লৌকিক বা দলবৃত্ত ছন্দে চার, পাঁচ ও ছয় মাত্রার পর্ব থাকতে পারে। তবে পর্বগুলির প্রবণতা যে চতুর্দল মাত্রার দিকে তাতে সন্দেহ নেই। ওড়িয়ার উচ্চারণ যত বেশি উপভাষা সম্মত হবে, যা প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে, দলবৃত্ত রচনার অবকাশ এবং প্রয়োজন তত বৃদ্ধি পাবে। আর কবি ও ছান্দসিকগণ ততই এর শক্তি, সুষমা এবং প্রয়োগ কৌশলের প্রতি আকৃষ্ট হবেন। তবেই ওড়িয়া ছন্দের তিন রীতির দৌলতে তার কাব্যকুঞ্জ বিচিত্র রূপের সজ্জায় অপূর্ব শোভা ধারণ করবে—এইরূপ প্রত্যাশা অসমীচীন নয়।

বাংলা, হিন্দী, অসমীয়ার মতোই বিংশ শতকের চতুর্থ দশকের শেষ এবং পঞ্চম দশকের প্রারম্ভে ওড়িয়াতেও গদ্যকবিতা লেখার সূচনা ঘটে। বলাই বহুল্য কলাবৃত্ত ছন্দোরীতি যেমন রবীন্দ্রনাথ থেকে ওড়িয়ায় এসেছে—গদ্য-কবিতাও তাই। বলতে কি রবীন্দ্রনাথের রচনায় অনুপ্রাণিত হয়েই গদ্যকবিতা লিখতে শুরু করেন ওড়িয়া কবিদের মধ্যে কেউ কেউ। ওড়িয়াতে গদ্যছন্দ বা গদ্যকবিতা বিষয়ে নীলকণ্ঠ দাস, জানকীবল্লভ মহান্তি, শচি রাউতরায় এবং গৌরীকুমার ব্রহ্ম প্রমুখ কিছু কিছু আলোচনা করেছেন। বেশ কয়েকজন আধুনিক কবি গদ্যকবিতা লিখে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁদের মধ্যে শচি রাউতরায়, হরিহর মিশ্র ও সৌভাগ্য মিশ্র প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের রচনা থেকে একটি করে গদ্য কবিতার উদাহরণ দেওয়া গেল।—

(১) অধুনা বিস্তীর্ণ এই বালুচরে—খণ্ড খণ্ড শস্য দ্বীপে
খেলুথিলা দিনে সাগররে অসংখ্য অসংখ্য সাধা ঢেউ
হালুকা পাল তোলি ভাসি যাউ থিলা লক্ষ লক্ষ বলাকা-পোত
এই বালুকা জীর্ণ জঙ্গলর ধারে ধারে
অনেক অনেক ধূসর শতাব্দীর যবনিকা ভেদি।
আজি দেখা যাএ তাংকর মাস্তুল।
জাভা, বোর্ণিও, সুমাত্রা এবং লবঙ্গ দ্বীপ
কিংবা ডাল চিনির শ্যামল অন্তরীপ
ছুই,
মসলা বোঝাই অসংখ্য জাহাজব যাআ-আসা
এই ট্রেনর লাইন্ ধরি লুহার সেতু পইঁরি ॥

—শচি রাউতরায়, পাণ্ডুলিপি : 'মৃত বন্দর'।

এই সুন্দর অংশটিতে নির্দিষ্ট ছন্দোরীতি ও পর্বমাপ খোঁজা বৃথা। বাক্-পর্ব-আশ্রিত কবিতার ছন্দ-মাধুরী অনুভূত হয় যথার্থভাবে কবিতা পাঠে। মূলতঃ পাঠক এবং গৌণতঃ শ্রোতার হৃদয়ে গদ্যছন্দের আবেদন জাগে।

(২) ন্যারো আউ টি সার্ট পিন্ধা দলে টোকা ভলি টেড়িজ্ পবন,
চলন্তা ইঞ্জিন সবু দলি যাস্তি স্টিঅরিঙ্ দোহলাই

কানরে মো ফিস্ ফিস্ কথা,
তাংক অর্থ সবু অশ্রাব্য গালির
বেশ কিন্তু ভল লাগে 'মেরে ম্বার্'
কুহুড়ির শুভ্র অন্ধকার।

—হরিহর মিশ্র : 'শংখনাভী'।

এখানে ওড়িয়াতর শব্দের ব্যবহারে গদ্যকবিতাটি আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

(৩) গছ মূলরে কিএ ছাড়ি যাইথিবা
একান্ত বাদ্যগুড়িক মুঁ বজাই দেলি,
এবং চালি গলি ছকরে জমি যাইথিবা সভাকু
ভারীখরা হেউথিলা আজি।
ছকরে মোর ঠিআ হেবা এমিতি
বোধে কাহার পসন্দ হেলা নাহিঁ
আলমিরা ভিতরু কণ্টেই গুড়া আনি
ধাড়ি করি বসাই দেলি পরিচ্ছন্ন আলুআরে॥

—সৌভাগ্য মিশ্র, নঙ্গপইঁরা : 'অপসন্দ'।

দেখা যাচ্ছে বিবিধ ও বিচিত্র ছন্দের প্রয়োগে ওড়িয়া কবিসম্প্রদায় আর পিছিয়ে নেই।

সবুজগোষ্ঠীর মাধ্যমে রাবীন্দ্রিক ছন্দ বাংলা থেকে ওড়িয়াতে অনুগৃহীত হয়ে স্বীকৃতি লাভ করে। বিষয়টি সম্পর্কে ওড়িশার সাহিত্যপ্রিয় মানুষের অনুকূল প্রতিক্রিয়ার স্বরূপটি জানা যায় নিম্নের অভিমত ও উদ্ধৃতি কয়েকটি থেকে।

(ক) "কলেজে আমরা জনকয়েক বন্ধু মিলে একটা ক্লাব করি। তার নাম ননসেন্স ক্লাব।···আমাদের সেই ননসেন্স ক্লাবের দলটি [বিশ্বনাথ] কর মহাশয়ের ['উৎকল সাহিত্য'] মাসিকপত্রে স্থায়ী আসন পেয়ে 'সবুজদল' বলে সুপরিচিত হয়। অন্নদাশংকর রায়, বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়ক, কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী, শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও হরিহর মহাপাত্র মিলে 'সবুজকবিতা' নামে একখানি বই বার করেন। ননসেন্স ক্লাবের মেম্বর নন এমন কয়েকজন লেখক ও লেখিকা পরে এঁদের সঙ্গে যোগ দিয়ে

'বাসন্তী' নামে একখানি বারোয়ারী উপন্যাস সংরচন করেন।...সবুজদল বলতে এঁদের সবাইকে বোঝায়। বাংলায় যেমন 'কল্লোল যুগ' ওড়িয়াতে তেমনি সবুজ যুগ"।

—অন্নদাশংর রায়-আত্মস্মৃতি'—আধুনিকতা (১৯৫২)
পৃ. ১১১-১২।

(খ) "নন্‌সেন্‌স ক্লাব গঠন বা সবুজসমিতি প্রতিষ্ঠা ও নামকরণ সম্পর্কর কৌণসি সত্য কিছি প্রকাশ করিণ থিলে। স্বদ্ধ এহারি প্রেরণা মূলরে বঙ্গ সাহিত্যর 'সবুজ' বাতাবরণ ও বিভিন্ন ক্লাব প্রতিষ্ঠা থিলা, এহা দিবালোক পরি স্পষ্ট। বঙ্গলারে সমবেত প্রচেষ্টারে সাহিত্য স্বষ্টির প্রেরণারু সম্ভবতঃ ওড়িআরে 'সবুজ' কবিতা বা 'বাসন্তী উপন্যাস স্বষ্টি।"

—দেবীপ্রসন্ন পট্টনায়ক, 'সাহিত্যবীক্ষা' (১৯৬৫), পৃ. ১২০।

(গ) "তেণে স্বুবর্ণরেখার আর পটে রবীন্দ্র-প্রতিভার স্বর্যতেজরে সেতে বেলকু সমগ্র ভারত আলোকিত। ফলরে ওড়িশার তরুণ কবিদল—অন্নদা, কালিন্দী, বৈকুণ্ঠ-ধরিলে রবীন্দ্রংকু তাংকর আশ্রয় করি।"

—সম্পাদকীয়ঃ 'শংখ' (পত্রিকা), ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা।

(ঘ) "ওড়িআ আধুনিক যুগ ঠারু ছন্দ ক্ষেত্ররে মধ্য বঙ্গ সাহিত্যাভিমুখী হোই অছি।...ওড়িশা কবিগণ এহি সময়রে রবীন্দ্রনাথংক প্রবর্তিত ছন্দকু অবিচার্য ভাবরে অনুকরণ কলে।...যুক্তাক্ষরমানংকু দ্বিমাত্রিক ধরিবাকু পড়িল। এহাহি পরিবর্তিত মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। আজিকালি এই ছন্দকু ওড়িশার সবু প্রতিষ্ঠিত লেখক অনুসরণ করুছন্তি ...এহি পরি এই কবিমানে রবীন্দ্রনাথংক প্রবর্তিত সম (২+২), অসম (৩+৩) ও বিষম (২+৩) মাত্রা চলনর ছন্দ সবু ওড়িশা সাহিত্যরে মধ্য অনুপ্রবিষ্ট করি থাইছন্তি।[৪৮]...স্বর্গত মানসিংহ ও গড়নায়ক মধ্য মিত্রাক্ষর, অমিত্রাক্ষর, অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, মুক্তছন্দ, প্রাচীন ওড়িআ, বাঙ্গলা ও ইংরাজী ছন্দ অনুসরণরে কাব্য-কবিতা লেখিছন্তি। মাত্র নবীন ছন্দ নিয়োজনরে রাধামোহন গড়নায়ক হিঁ সর্বাধিক কৃতিত্ব ও সাফল্যর অধিকারী।"

—জানকীবল্লভ মহান্তি : ওড়িআ সাহিত্য পরিক্রমা' (১৯৭৬),
পৃ. ৮৮, ১০৭ এবং ১১০-১১।

(ঙ) "কবি রাধামোহন ওড়িআ ছন্দকলা প্রয়োগরে ও বিজ্ঞানরে যাত্নকর কহিলে

চলে। ডক্টর মানসিংহ তাংক History of Oriya Literature-ৱে সেথিপাঁই লেখিছন্তি—"He is now considered the greatest metrieist in Oriya Literature. ২৯"

—ভূমিকা, রাধামোহন-গ্রন্থাবলী,—১, (১৯৬৮), পৃ. ১৫-১৬।

(চ) "রবীন্দ্রনাথ মধ্য এই [কলাবৃত্ত] রীতিরে সবু কবিতা লেখন্তি নাহিঁ। পুণি এই রীতির সৌষ্ঠব রাখিবারে রবীন্দ্রনাথংক পরি সিদ্ধহস্ত মনীষী বাট দেখাইছন্তি। ওড়িআরে কিন্তু এই রীতির অনুকরণ-মহানদী বঢ়ি পরি চালিচি।...ভল জিনিষটিএ আণিবারে আপত্তি নাহিঁ, তাহা পুণি জানিলে মধ্য খুব ভল।"

—নীলকণ্ঠ দাস : ওড়িআ ভাষা ও সাহিত্য (১৯৫৮) পৃ. ৬৯।

প্রতিটি অভিমতই গুরুত্ববাহী। তাতে একদিকে যেমন রবীন্দ্রছন্দের প্রণোদনার কথা আছে, তেমনি অন্যদিকে, ওড়িয়া ছন্দ-শিল্পের উৎকর্ষ লাভের দিক্‌টিও সশ্রদ্ধ ভাবে ব্যঞ্জিত।

হিন্দী কাব্যে রাবীন্দ্রিক ছন্দ

শিল্পের বিচারে মধ্যযুগের হিন্দী কবিতা বেশ উৎকর্ষ লাভ করেছিল। এই উৎকর্ষের মূলে হিন্দী ছন্দের গুরুত্বও কম নয়। তাই দেখা যায়-আধুনিক যুগে এসেও হিন্দী ছন্দ বহুলাংশে তার পূর্বের ধারাই অক্ষুণ্ণ রাখতে সচেষ্ট। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর হিন্দী কবি, সাহিত্যিক ও পাঠকের দৃষ্টি তাঁর কাব্য-কৃতির প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। রবীন্দ্র-প্রভাবের ফলে হিন্দী কাব্যশিল্প ও ছন্দ-রচনার ক্ষেত্রে প্রাচীন রীতির আকর্ষণ যেন ক্ষীণ হতে থাকে। ছন্দের প্রাচীন-বিধানকে অস্বীকার করে নতুন ধরনের কবিতা রচনার সার্থক প্রয়োগ লক্ষিত হয়—কবি সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী 'নিরালা'র মধ্যে। হিন্দী কাব্যে ছন্দের নবরূপ অমিত্রাক্ষর ও মুক্তক ইংরেজি থেকে বাংলার মধ্য দিয়েই এসেছে। আধুনিক হিন্দী কবিতায় লৌকিক ছন্দেরও অল্প-স্বল্প ব্যবহার দেখা যায়। এ-টিও রবীন্দ্রনাথের লৌকিক ছন্দের আদর্শানুসৃতির ফল বলা চলে।

কোনো কোনো হিন্দী কবির রচনায় রবীন্দ্রনাথের ভাব-ভাষা ও ছন্দের সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষিত হয়। ছন্দোরীতির বিচারে কম কিন্তু ছন্দোবন্ধের বিচারে এ-যুগের হিন্দী কাব্যশিল্প অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি লাভ করেছে।[৫০]

গীতাঞ্জলির কবি রবীন্দ্রনাথ বহু তরুণ কবির আদর্শ ও প্রেরণার উৎস হয়ে ওঠেন। গড়ে ওঠে এক অভিনব কবি সম্প্রদায়। কবি গিরিধর শর্মা 'নবরত্ন' গীতাঞ্জলির হিন্দী অনুবাদ প্রকাশ করেন।[৫১] মুকুটধর পাণ্ডের প্রমুখের রচনায় রবীন্দ্রনাথের ভাব-ভাষা ও ছন্দের প্রভাব পড়তে শুরু করে। পরেশনাথ সিংহ ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই রবীন্দ্রকবিতার হিন্দী অনুবাদ শুরু করেছিলেন। সরস্বতী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের অনুবাদ প্রকাশিত হতে থাকে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই। সে যাই হোক, বাংলা গীতিকবিতার আদর্শে হিন্দী লিরিক (Lyric) লেখা শুরু হয় ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই। বাংলা অমিত্রাক্ষর বা অমিল প্রবহমান পয়ারের অনুসরণে হিন্দীতে 'অতুকান্ত' রচনা প্রচলিত ছিল। অপ্রবহমান কবিতাতেও নানা কৌশলের সাহায্যে ছন্দোগত বৈচিত্র্য ও নতুনত্ব আনা যায়—সেকথাও সম্ভবতঃ বাংলা কবিতার 'ছন্দের নানা খেয়াল' প্রত্যক্ষ করে হিন্দী কবিদের মনে জাগে। রবীন্দ্র-প্রভাবেই হিন্দীতে 'ছায়াবাদী' বা রহস্যবাদী (Mystic) কবিতার সূচনা ঘটে। রবীন্দ্রনাথ এই রহস্যবাদের সন্ধান পেয়েছিলেন—মধ্যযুগের ভারতীয় সন্ত-সাধকদের রচনা ও সাধনা থেকে। তার উপযোগী সুন্দর ও সুস্পষ্ট প্রকাশের জন্য নতুন রচনাভঙ্গি দেখা দেয় রবীন্দ্রসাহিত্যে তেমনি হিন্দীতেও এই নব ভাবের প্রকাশের জন্য যে অভিনব প্রকাশভঙ্গির প্রয়োজন অনুভূত হল তার জন্যই হিন্দী ছন্দের ক্ষেত্রে বাংলা ছন্দের অনুপ্রবেশ ঘটল বলা যায়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে হিন্দী-কবি ও সাহিত্যিকদের অনেকে সুপরিচিত ছিলেন।[৫২] তাঁরা সাগ্রহে রবীন্দ্রকাব্য পড়তেন। ফলে অনেকের ভাব-ভাবনা-ভাবুকতা ও প্রকাশ-ভঙ্গির চিন্তায় রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্ব সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। এইভাবে রবীন্দ্রনাথের 'নীরবক্রান্তি' হিন্দীতে প্রবেশ করল। বাংলার 'কোমলকান্ত' পদাবলী, পর্ব পদ, পঙ্‌ক্তি স্তবক, প্রবহমান ও অসমমাত্রার পঙ্‌ক্তি রচনার প্রবণতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। হিন্দী ছন্দের এই অভিনব রূপবৈচিত্র্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগের স্বরূপ ও তার প্রতিক্রিয়া বোঝবার জন্য আমরা আধুনিক হিন্দী জগতের পাঁচজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি—মৈথিলীশরণ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৬৪) জয়শংকর প্রসাদ (১৮৮৯-১৯৩৭), সূর্যকান্ত ত্রিপাঠি নিরালা (১৮৯৬-১৯৬১), সুমিত্রানন্দন পন্ত

(১৯০০-১৯৭৮) এবং মহাদেবী বর্মা (১৯০৮-১৯৮৭) প্রমুখের কবিকৃতির ছন্দের আলোচনা করতে পারি।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল—হিন্দী কবিতার যোগ্য বাহন রূপে 'খড়ীবোলী'কে গড়ে তোলার চেষ্টা শুরু হয় উনবিংশ শতকের শেষপাদে। কিন্তু বিংশ শতকের প্রথম দশকের শুরুতে তার সাফল্য দেখা দেয়। উল্লিখিত কবিদের রচনাতে 'খড়ীবোলী' কবিতার যথার্থ বাহনরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। খড়ীবোলী-কবিতায় সাধারণভাবে বর্ণবৃত্তের প্রয়োগই বেশি। মিশ্রবৃত্তের প্রয়োগ বর্ণবৃত্তের চেয়ে বেশি কিন্তু কলাবৃত্তের চেয়ে কম। দুই-একজন কবির রচনায় লৌকিক ছন্দের আভাসও ফুটে উঠেছে। কলাবৃত্ত ও মিশ্রবৃত্ত রীতিতে সমিল-অমিল প্রবহমান মুক্তক এবং গদ্যকবিতা রচনাতেই যুগটির বিশিষ্টতা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে।

বর্ণবৃত্ত রীতি (Classic Syllabic Style)

কবি মৈথিলীশরণ গুপ্ত এবং জয়শংকর প্রসাদের রচনায় বর্ণবৃত্তের প্রয়োগ মেলে। মৈথিলিশরণের কবিতায় বর্ণবৃত্ত অপেক্ষাকৃত বেশি প্রযুক্ত। তাঁর বর্ণবৃত্ত বেশ সুগঠিত এবং খড়ীবোলীর সঙ্গে খানিকটা সঙ্গতিপন্নও। তিনি 'দ্রুতবিলম্বিত', 'বসন্ততিলকা', 'মালিনী', শিখরিণী', 'শার্দুল বিক্রীড়িত' এবং 'স্রগ্ধরা' প্রভৃতি বর্ণবৃত্তের প্রয়োগ করেছেন। সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রের নিয়ম মেনে রচিত হলেও তাঁর বর্ণবৃত্ত যে হিন্দী উচ্চারণের পুরোপুরি অনুকূল নয়, তা পড়লেই বোঝা যায়। যেমন—

সখি বিহগ উড়াদে, হোঁ সভী মুক্তি অভিমানী।
সুন শঠ শুক-বাণী-হায়! রূঠো ন রাণী॥
খগ-জনকপুরী কী ব্যাহ দূঁ সারিকা মৈঁ ?
তদপি রহ ওয়হীঁ কী ত্যক্ত হূঁ দারিকা মৈঁ ?

—সাকেত: নবম সর্গ।

পঞ্চদশাক্ষরা (৭ ল. ২ গু. ল. ২ গু. ল. ২ গু) 'মালিনী' ছন্দের এই নিদর্শনটিকে সে যুগের হিন্দী বর্ণবৃত্তের প্রতিনিধি স্থানীয় রচনা হিসাবে নেওয়া যেতে পারে। পরবর্তীকালে বর্ণবৃত্তের প্রয়োগ বহুলাংশে কমে এসেছে এবং সাম্প্রতিককালে হয়না বললেই হয়।[৫৩]

এই প্রসঙ্গে বাংলা, অসমীয়া এবং ওড়িয়া কবিতায় বর্ণবৃত্ত প্রয়োগের কথাও সংক্ষেপে স্মরণ করা যেতে পারে। বাংলা, অসমীয়া এবং ওড়িয়া কাব্যে আদি ও মধ্য যুগে বর্ণবৃত্তের প্রয়োগ ছিল না। বাংলায় অষ্টাদশ শতকে নরহরি চক্রবর্তী ভারতচন্দ্র রায় ও রামপ্রসাদ সেনের রচনায় এই রীতির কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। আধুনিক কালে ভুবনমোহন রায়চৌধুরী ও বলদেব পালিত বাংলায় বর্ণবৃত্ত প্রচলনে উৎসাহিত হয়েছিলেন। পরে বিজয়চন্দ্র মজুমদার ও হরগোবিন্দ লস্কর প্রমুখ আরও কেউ কেউ বাংলায় বর্ণবৃত্ত রচনায় কিছু কৃতিত্ব দেখান। কিন্তু সংস্কৃত উচ্চারণ-ধ্বনি বিন্যাস বাংলা ভাষার পক্ষে কৃত্রিম ও অনুপযোগী। ফলে বাংলায় বর্ণবৃত্ত প্রয়োগের রীতি বহু পূর্বেই পরিত্যক্ত হয়েছে বলা যায়। তবে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ কবিরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বর্ণবৃত্ত ব্যবহার করছেন দেখা যায়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল বর্ণবৃত্তের সাহায্য নিয়েছেন হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়োজনে।[৫৪] সত্যেন্দ্রনাথ কোনো কোনো সংস্কৃত বর্ণবৃত্তের বাংলা প্রতিরূপ রচনা করেছেন। তবে তাঁর বাংলা বর্ণবৃত্ত দীর্ঘস্বরের দীর্ঘত্ব হারিয়েছে। ফলে সংস্কৃত বর্ণবৃত্তের কাঠামো থাকলেও তার উদাত্ত ধ্বনি গাম্ভীর্য সত্যেন্দ্রনাথের বর্ণবৃত্তে নেই। তবু বাংলা কবিতায় যে তাতে একপ্রকার বৈচিত্র্য এসেছে তাতে সন্দেহ নেই।

বাংলার মতোই অসমীয়া এবং ওড়িয়া সাহিত্যের আদি ও মধ্যযুগে সংস্কৃত ছন্দ বিশেষভাবে বর্ণবৃত্তের ব্যবহার হয়নি বলা চলে। অসমীয়া কবিরা সংস্কৃত ছন্দ নিয়ে চর্চা করেছেন, তার প্রয়োগ করেছেন, এমন কি সংস্কৃত ভাষায় সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্র নিয়ে বইও লিখেছেন।[৫৫] যে সব অসমীয়া কবি সংস্কৃত ছন্দ চর্চা করেছেন তাঁদের মধ্যে শংকরদেবের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে ধীরেশ্বর আচার্যের 'বৃত্ত-মঞ্জরী' আর আনন্দরাম বোরার 'Prosody' সংস্কৃত ছন্দের গ্রন্থ দুটিও স্মরণীয়। আধুনিক যুগে অসমীয়ায় সংস্কৃত ছন্দ প্রযুক্ত হয়না। কচিৎ কারো রচনায় পাওয়া গেলেও তা উল্লেখযোগ্য মনে হয় না। ওড়িয়া কবিরা বর্ণবৃত্তের প্রতি কোনো আকর্ষণই অনুভব করেননি। কারণ—"ওড়িআকু সংস্কৃত রীতিরে উচ্চারণ কলে, তাহা কৃত্রিম ও হাস্যকর হোই পড়ে। তাই সংস্কৃতানুসারী ছন্দ ওড়িআরে যে পরি কৃত্রিম সেহি পরি অনাবশ্যক"।[৫৬] ষোড়শ শতকের কবি দেবদুর্লভ দাস প্রমুখ কয়েকজন ওড়িয়ায় সংস্কৃত ছন্দের প্রয়োগ নিয়ে পরীক্ষা করেছেন। কিন্তু অচিরে সে প্রয়াস

পরিত্যাগও করেছেন।[৫৭] আধুনিক যুগে মধুসূদন রাও এবং নীলকণ্ঠ দাস প্রমুখ কয়েকজন কবিও সংস্কৃত ছন্দে ওড়িয়া কবিতা রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। কবি মধুসূদন রাও তাঁর 'সঙ্গীতমালা' গ্রন্থটিতে অনুষ্টুপ, ভুজঙ্গপ্রয়াত এবং স্রগ্ধরা ছন্দে তিনটি (৮৬-৮৮ সংখ্যক) গান রচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় এই সঙ্গীত গ্রন্থে তিনটি গান সৌরাষ্ট্র অঞ্চলের 'বন্দনা' ছন্দ বা রাগের অনুসরণে রচিত। বাকিগুলি 'ওড়িআ ও বঙ্গলা রাগিণীরে' রচিত।[৫৮] সুতরাং বাংলার মতোই ওড়িয়াতেও সংস্কৃত (বর্ণবৃত্ত) ছন্দ পরিত্যক্ত। বাংলায় হাস্যরস সৃষ্টিতে বা দীর্ঘস্বরের বদলে রুদ্ধদলের ব্যবহার করে বর্ণবৃত্ত রচনার যে প্রয়াস দেখা যায়—তেমনটি হিন্দী, অসমীয়া এবং ওড়িয়া কোনো ভাষাতেই লক্ষিত হয় না। প্রাচীন ও মধ্যযুগে বর্ণবৃত্ত প্রয়োগের বিচারে বাংলা, অসমীয়া এবং ওড়িয়ার সঙ্গে হিন্দী ছন্দের পার্থক্য থাকলেও আধুনিক যুগে আর তা নেই। এখন কোনো ভাষাতেই বর্ণবৃত্তের প্রয়োগ হয় না।

কলাবৃত্ত রীতি (Moric Style)

হিন্দী ছন্দজগতে কলাবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্তেরই প্রাধান্য। আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের কবি পঞ্চক—মৈথিলীশরণ গুপ্ত, জয়শংকর প্রসাদ, সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী, সুমিত্রানন্দন পন্ত এবং মহাদেবী বর্মার রচনায় কলাবৃত্তের ব্যবহার সর্বাধিক। সুমিত্রানন্দন ও মহাদেবী তো কেবলমাত্র কলাবৃত্তই রচনা করেছেন। কলাবৃত্তের যে রূপ ও ঐশ্বর্য এ-যুগে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে—তেমনটি এর আগে কখনও দেখা যায়নি। প্রাচীন প্রাকৃত কলাবৃত্ত, প্রাচীন হিন্দী কলাবৃত্ত এবং আধুনিক কলাবৃত্তের বিবিধ ও বিচিত্র রূপ এবং প্রবহমান ও মুক্তকের সাজে সজ্জিত এ-যুগের হিন্দী কলাবৃত্ত। বিভিন্ন কবির রচনা থেকে নিদর্শন নিয়ে সংক্ষেপে তার পরিচয় দেওয়া গেল।

প্রাকৃত কলাবৃত্ত :—কবি মৈথিলীশরণের কবিতায় প্রাকৃত কলাবৃত্তের প্রয়োগ বেশি হয়েছে। কবি সাধারণভাবে প্রাচীন ছন্দশাস্ত্রের বিধান মেনে চলার চেষ্টা করলেও যুগোচিত অভিনবতা এসে গেছে মাঝে-মাঝে। তাঁর সাকেত (১৯৩১) কাব্যে সর্বপ্রাচীন প্রাকৃত ছন্দ আর্যাও তার উপবিভাগ গুলির—গীতি, উপগীতি, উদ্গীতি এবং আর্যাগীতি প্রভৃতির নিদর্শন মেলে। সৌরিন্ধ্রী (১৯২৭),

যশোধরা (১৯৩২) ও জয় ভারত (১৯৫২) প্রভৃতি কাব্যে ছপ্পয় বন্ধের ব্যবহার ঘটেছে। তাঁর রচনা থেকে একটি আর্যা এবং একটি ছপ্পয়ের উদাহরণ দিচ্ছি।—

আর্যা (১২+১৮ ।। ১২+১৫):—

পহলে আঁখোঁ মেঁথে, মানস মেঁ কূদ মগ্ন প্রিয় অব থে।
ছীঁটে ওয়হী উড়েথে, বড়ে বড়ে অশ্রু ওয়ে কব থে?

সাকেত: নবম সর্গ।

ছপ্পয়—চার পঙ্‌ক্তি রোলা (১১+১১) ও দুই পঙ্‌ক্তি উলালা (১৫+১৩):—

চেরী ভী ওয়হ আজ কহাঁ কল থী জো রাণী,
দানী প্রভুনে দিয়া উসে ক্যোঁ মন য়হ মানী?
অবলা-জীবন হায়! তুম্‌হারী য়হী কহানী—
আঁচল মেঁ হৈ দূধ ঔর আঁখোঁ মেঁ পানী ।।
মেরা শিশু সংসার য়হ, দূধ পিয়ে পরিতুষ্ট হো।
পানী কে হী পাত্র তুম, প্রভো, রুষ্ট য়া সন্তুষ্ট হো ।।

—যশোধরা, পৃ. ৪৭।

বিভিন্ন ছন্দোবন্ধের সমবায়ে স্তবক রচনার প্রথা প্রাকৃতে,[৫৯] প্রাচীন বাংলায় হিন্দীতে এবং অসমীয়া ও ওড়িয়াতেও ছিল। আধুনিক যুগে বাংলা অসমীয়া ও ওড়িয়াতে এই ছপ্পয় জাতীয় স্তবকের চল নেই কিন্তু হিন্দীতে আছে।

হিন্দী কলাবৃত্ত:—সাধারণভাবে হিন্দী কলাবৃত্ত সংস্কৃত প্রাকৃত অপভ্রংশ-মাত্রাবৃত্ত-জাত। তবে সময়ের প্রবাহ ও কবিসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এ ছন্দে নতুন-নতুন বন্ধের উদ্ভব ঘটেছে। এই ক্রম অব্যাহত দেখা যায় উনবিংশ শতক পর্যন্ত। পরবর্তীকালে নব নব ছন্দোবন্ধ সৃজনের প্রবণতা কমে আসে। তার পূর্ব পর্যন্ত যে-সব ছন্দোবন্ধের সৃষ্টি হয়েছে তাদের উল্লেখ সংস্কৃত-প্রাকৃত ছন্দ-শাস্ত্রে নেই। তবে হিন্দী ছন্দ-শাস্ত্রে আছে। এইসব বন্ধকে হিন্দী কলাবৃত্তবন্ধ বা হিন্দী কলাবৃত্ত নামে অভিহিত করা গেল। উনবিংশ শতক পর্যন্ত রচিত কলাবৃত্ত রীতির অন্তত ২৫০টি অভিনব বন্ধ পাওয়া গেছে।[৬০] প্রচলিত ছন্দোবন্ধের যতি-স্থান পরিবর্তন, মাত্রা সংখ্যার তারতম্য, দীর্ঘ-হ্রস্ব স্বরের স্থান বদল প্রভৃতি প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই বন্ধগুলি রচিত। সুতরাং

রূপ ও নামের সংখ্যাধিক্য ঘটলেও ছন্দধ্বনির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। এই সময় সাত-আট মাত্রা থেকে শুরু করে ছেচাল্লিশ মাত্রা পর্যন্ত দীর্ঘ ছন্দ পঙ্‌ক্তি রচিত হয়েছে। স্তবক রচনাতেও বৈচিত্র্য এসেছে। মৈথিলীশরণ, জয়শংকর প্রসাদ, সুমিত্রানন্দন এবং মহাদেবীর রচনায় যে-সব নব-নব বন্ধের নিদর্শন মেলে তাদের মধ্যে 'সখী', 'মানব', 'মধুমালতী', 'পীযূষবর্ষ', 'হংসগতি', 'ত্রিলোকী', 'রাস' 'রাধিকা', 'রূপমালা', 'গীতিকা', 'সরসী', 'তাটংক' (৩০ মাত্রা), এবং 'বীর' (আল্‌হা) প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কয়েকটির নিদর্শন দেওয়া গেল।—

(১) পীযূষবর্ষ (১০+৬ ল. ল. গু=১৯ মাত্রা) :—

নাক কা মোতী অধর কী কান্তি সে।
বীজ দাড়িম কা সমঝকর ভ্রান্তি সে॥
দেখ কর সহসা হুআ শুক মৌন হৈ।
সোচতা হৈ অন্য শুক—যহ কৌন হৈ॥

—মৈথিলীশরণ, সাকেত : প্রথম সর্গ।

(২) তাটঙ্ক (১৬+৮ গু. ল. গু.—৩০ মাত্রা) :—

নীল গগন মেঁ উড়্‌তী-উড়তী বিহগ বালিকা-সী কিরণেঁ।
স্বপ্নলোক কো চলী থকী-সী নদী সেজ পর জা গিরণে॥
কিন্তু বিরহিণী কে জীবন মেঁ এক ঘড়ী বিশ্রাম নহী।
বিজলী-সী স্মৃতি চমক উঠী তব, লগে জভী তমঘন ঘিরনে॥

—জয়শংকর প্রসাদ, কামায়নী 'স্বপ্ন'।

(৩) হংস গতি (১১+৯—২০ মাত্রা) :—

ভাব-কর্ম মেঁ জহাঁ সাম্য হো সন্তত।
জগজীবন মেঁ হো বিচার জন কে রত॥
জ্ঞানবৃদ্ধ, নিষ্ক্রিয় ন জহাঁ মানব মন।
মৃত আদর্শ ন বন্ধন সক্রিয় জীবন॥

—সুমিত্রানন্দন পন্ত, যুগবীণা : 'নব সংস্কৃতি'।

(৪) রূপমালা (১৪+৭ গু. ল =২৪ মাত্রা) —

অশ্রুকণ সে উর সজায়া, ত্যাগ হীরক হার।
ভীখ দুখ কী মাঁগনে জো, ফির গয়া প্রতি দ্বার॥

শূল জিসনে ফূল ছূ চন্দন কিয়া সন্তাপ।
সুন, জগতী হৈ উসী সিদ্ধার্থ কী পদচাপ॥

—মহাদেবী বর্মা, নীরজা-৫৩।

আধুনিক কলাবৃত্ত:—আলোচ্য যুগের হিন্দী কবিতায় হিন্দী কলাবৃত্ত বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে এমন বহু বন্ধের পরিচয় মেলে, যেগুলির শাস্ত্রীয় নাম নেই। এ-গুলি রবীন্দ্র-প্রবর্তিত বাংলা নব্যকলাবৃত্তের বিচিত্র বন্ধের আদর্শে রচিত। এগুলিকে আধুনিক হিন্দী কলাবৃত্ত নামে অভিহিত করা যায়। এখন মৈথিলীশরণ গুপ্ত, জয়শংকর প্রসাদ, সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী, সুমিত্রানন্দন পন্ত এবং মহাদেবী বর্মা প্রমুখের রচনা থেকে কলাবৃত্তের বিভিন্ন আয়তনের পর্ব, পদ, পঙ্‌ক্তি ও স্তবকের দৃষ্টান্ত এবং সুবিধামতো তার রাবীন্দ্রিক আদর্শ উদ্ধৃত করছি। তার থেকেই হিন্দী ছন্দে রবীন্দ্রনাথের ছন্দের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুসৃতি সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে আশা করি।—

(১) চতুষ্কল পর্বিক চৌপদী—

উনকো রাজ্য মিলা মথুরা কা,
যহ গোরস পর পান সুরাকা,
বৃন্দাবন হী ধনবিধুরা কা
কিসকা কিতনা মোলি ?

—মৈথিলী শরণ, বিষ্ণুপ্রিয়া।

প্রথম তিন ছত্র চার মাত্রার পর্বে বিভাজ্য আট মাত্রার দুইটি পদ নিয়ে গঠিত এবং চতুর্থ ছত্রটি আট মাত্রার একটি পূর্ণ পদ ও তিন মাত্রার একটি অপূর্ণ পদ নিয়ে গঠিত। এই ধরনের বন্ধকে অপূর্ণ মহা চৌপদী বলা যায়। রবীন্দ্ররচনা থেকে অনুরূপ মহা চৌপদীর দৃষ্টান্ত:—

গগন সঘন অব, তিমির মগন ভব,
তড়িত চকিত অতি, ঘোর মেঘ রব,
শাল তাল তরু সভয় তবধ সব,
পন্থ বিজন অতি ঘোর।

—ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী-১৯।

(২) পঞ্চকল পর্বিক ত্রিপদী:—

কিরণ কী মালিকা পড়ী তনুপালিকা
সমীরণ বহা সমধীত।

কণ্ঠরত পাঠ মেঁ হাট মেঁ বাট মেঁ
খুল গয়া গ্রীষ্ম য়া শীত ॥

—নিরালা, বেলা-১ ।

প্রথম দুই পদে দশমাত্রা এবং তৃতীয়টিতে তের মাত্রা আছে। রবীন্দ্ররচনা থেকে একটি অনুরূপ দৃষ্টান্ত, যার শেষ পদে বারোমাত্রা বিন্যস্ত।—

নিবিড় অমা-তিমির হতে বাহির হল জোয়ার-স্রোতে
শুক্লা রাতে চাঁদের তরণী।
ভরিল ধরা অরূপ ফুলে, সাজালো ডালা অমরাকূলে
আলোর মালা চামেলি বরণী ॥

—গীতিবিতান : প্রকৃতি-২৪২ ।

(৩) ষট্‌কল পর্বিক দ্বিপদী :—

উচ্চ শৈল-শিখরোঁ পর হঁসতী
প্রকৃতি চঞ্চলা বালা।
ধবল হঁসী বিখরাতী অপনী
ফৈলা মধুর উজালা ॥

—প্রসাদ, কামায়নী-'কর্ম' ।

১৬+১২=২৮ মাত্রার এই বন্ধটিকে মহাদ্বিপদী বলা যায়।

১৪+১৪=২৮ মাত্রার একটি রাবীন্দ্রিক মহাদ্বিপদী—

দ্বিধাভরে আজো প্রবেশ করনি ঘরে,
বাহির আঙনে করিলে সুরের খেলা।
জানিনা কী নিয়ে যাবে যে দেশান্তরে,
হে অতিথি, আজি শেষ বিদায়ের বেলা ॥

—মহুয়া : 'গুপ্তধন' ।

এই প্রসঙ্গে 'জন গণ মন অধিনায়ক'-গানের ১৬+১২=২৮ মাত্রার মহাদ্বিপদীর কথাও স্মরণীয়।

ষট্‌কল পর্বের প্রয়োগেই সর্বাধিক হওয়ায় আরও দুই-একটি উদাহরণ দেওয়া যাক্।—

(৪) চৌপদী :—

(ক) বিকসিত কর নব সুরভিত কর,
গুঞ্জিত কর কল কুঞ্জিত কর,

খিলা প্রেম কা নবজল জাত
বঢ়া কণক কর নিজ মৃদুতর।
—সুমিত্রানন্দন, বীণা-৬।

(খ) মেরা প্রতিপল নির্ভয় হো,
নিঃসংশয়, মঙ্গলময় হো,
য়হ নব-নব পলকা জীবন
প্রতিপল তন্ময়, তন্ময় হো।
—সুমিত্রানন্দন, গুঞ্জন-২৩।

চোদ্দ মাত্রার চার পদের উদ্ধৃতি দুইটিতে রবীন্দ্রনাথের নিম্নের ষট্‌কল পর্বিক দ্বিপদীর ভাব, ভাষা ও ছন্দের যথাসম্ভব অনুসৃতি লক্ষ করা যায়।—

অন্তর মম বিকশিত করো অন্তরতর হে।
নির্মল করো, উজ্জ্বল করো সুন্দর করো হে ॥…
জাগ্রত করো, উদ্যত করো নির্ভয় করো হে।
মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে ॥
গীতাঞ্জলি-৫।

(৫) সপ্তকল পর্বিক দ্বিপদী—

থা কলী কে রূপ শৈশব
মেঁ অহো সুখে সুমন।
হাস্য করতা থা, খিলাতী
অংক মেঁ তুঝকো পবন ॥
—মহাদেবী, নীহার : 'মুর্ঝায়া ফূল'।

১৪+১২=২৬ মাত্রার এই দ্বিপদী বন্ধের অনুরূপ ১৪+১০=২৪ মাত্রার দ্বিপদী—

বিরহে টানে মিড় মিলন-বীণাতারে,
সুখের বুকে বাজে বেদনা।
কপোত কাকলিতে করুণা সঞ্চারে,
কানন দেবী হল বিমনা ॥
—র. র. (প স),—২ সংযোজন, 'জীবন মরণ'।

বিভিন্ন পর্বের মাপের একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী, ও চৌপদী পঙ্‌ক্তির নানা

রূপের প্রয়োগ বাংলার মতোই হিন্দীতেও হয়েছে। তার মধ্যে ষট্‌কল পর্বিক দ্বিপদীর প্রয়োগই সর্বাধিক। সপ্তকল পর্বিক ত্রিপদী ও চৌপদীর নিদর্শন রবীন্দ্রসাহিত্যে বেশি নেই। হিন্দী সাহিত্যেও বন্ধ দুইটি প্রয়োগ হয় না বললেই হয়।

বাংলায় অতিপর্বের প্রয়োগ একটি সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু হিন্দীতে অতিপর্ব কমই চোখে পড়ে। আধুনিক কবিদের হিন্দী রচনায় অতিপর্ব প্রযুক্ত হলেও তার পরিচয়াত্মক কোনো নামকরণ করা হয়নি। এখানে মহাদেবী বর্মার রচনা থেকে একটি অতিপর্বের উদাহরণ দেওয়া গেল।—

সব দ্বিপদ চতুষ্পদ প্রাণিজগৎ হৈ চঞ্চল।
সবি তানে সব কো দিয়া কর্মকা সম্বল॥
—সপ্তবর্ণা : 'জ্যোতিষ্মতী'।

দুই পঙ্‌ক্তির শুরুতেই 'সব' এবং 'সবি' দুই মাত্রার অতিপর্ব। চতুষ্কল পর্বিক এই রচনাটিকে বলা চলে দীর্ঘ দ্বিপদী—(৪+৪ ॥ ৪+৪+৪); যেন বাংলা মহাপয়ারেরর (৮+১০) হিন্দী প্রতিরূপ। রবীন্দ্র-রচনা থেকে একটি অনুরূপ দৃষ্টান্ত।—

আজি নির্ভয় নিদ্রিত ভুবনে জাগে কে জাগে।
ঘন সৌরভ মন্থর পবনে জাগে কে জাগে।
—গীতালি : সংযোজন-৫।

লক্ষণীয়—'নে জাগে কে' অংশটুকুতে দীর্ঘস্বর কয়টি দ্বিমাত্রক হয়েছে—উভয় পঙ্‌ক্তিতেই।

প্রবহমান ও মুক্তক বন্ধ

বাংলার প্রবহমান ও মুক্তক বন্ধ হিন্দী কলাবৃত্তেও রচিত হয়েছে। কারণ হিন্দীর প্রধান ছন্দোরীতি কলাবৃত্তই। কলাবৃত্তে প্রবহমানতা আনেন সর্বপ্রথম হিন্দী কবি শ্রীধর পাঠক।[৬১] কবি জয়শংকর প্রসাদ তাঁর 'করুণালয়' (২য়, সং ১৯২৮) নাটকে কলাবৃত্ত অমিত্রাক্ষরের পুনঃ প্রয়োগ-পরীক্ষা করেন। তাঁর প্রয়াসের ফলে বহু তরুণ কবি আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তারই ফলে কবি

রূপনারায়ণ পাণ্ডের 'তারা' গীতিরূপক রচনা করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' নাটকটি এই অভিনব ছন্দে হিন্দীতে রূপান্তরিত করেন। সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী এবং সুমিত্রানন্দন পন্ত প্রমুখ কবিও কলাবৃত্তে প্রবহমান এবং মুক্তক বন্ধ রচনা করেন। তবে কবি মৈথিলীশরণ এবং মহাদেবী বর্মার রচনায় প্রবহমান ও মুক্তকের নিদর্শন নেই।

জয়শংকর প্রসাদের 'কানন কুসুম' (১৯১৩), 'মহারাণাকে মহত্ব' ও 'প্রেমপথিক'; নিরালার 'অনামিকা' (১৯৩৭), 'পরিমল' (৫ম, ১৯৫০) এবং সুমিত্রানন্দন পন্তের 'গ্রন্থি' (১৯২০), 'যুগান্তর' (১৯৩৪-৩৬) এবং 'গ্রাম্যা' কাব্যে কলাবৃত্ত রীতির সমিল ও অমিল প্রবহমান ও মুক্তকের বিচিত্র রূপের প্রয়োগ ঘটেছে। এখানে কয়েকটি নিদর্শন দেওয়া যাক্।—

(১) সমিল প্রবহমান :—

বানর-বাহিনী খিন্ন, লখ নিজপতি-চরণ-চিহ্ন
চলা রহী শিবির কী ওর স্থবির-দল জ্যোঁ বিভিন্ন;
প্রশমিত হৈ বাতাবরণ, নমিত-মুখ সান্ধ্য কমল
লক্ষ্মণ চিন্তা-পল পীছে বানর-বীর সকল;
রঘুনায়ক আগে অবনীপর নবনীত-চরণ,
শ্লথ-ধনু গুণ হৈ, কটি-বন্ধ স্রস্ত-তূণীর-ধরণ,
দৃঢ় জটা-মুকুট হো বিপর্যস্ত প্রতিলট সে খুল
ফৈলা পৃষ্ঠপর, বাহুওঁ পর, বক্ষ পর, বিপুল
উতরা জ্যোঁ দুর্গম পর্বত পর নৈশান্ধকার,
চমকতী দূর তারায়েঁ জ্যোঁ হো কহীঁ পার।
—নিরালা, অনামিকা : 'রাম কী শক্তি পূজা'।

চব্বিশ মাত্রার পঙ্‌ক্তিতে স্বতন্ত্র বিভক্তির যথাসম্ভব কম প্রয়োগ ও তৎসম শব্দের বহুলতায় বিশিষ্ট ধ্বনিগাম্ভীর্য সৃষ্টি হয়েছে। পাঠ্যভঙ্গিতে রচিত কবিতাটি নিরালার কাব্য শৈলীর স্বকীয়তার পরিচায়ক। প্রবহমানতা স্পষ্ট। মিলের দিকটিও লক্ষণীয়।

২। অমিল প্রবহমান :

শীশ রখ মেরা সুকোমল জাঁঘ পর,
শশিকলা-সী এক বালা ব্যগ্র হো
দেখতী থী ম্লান মুখ মেরা অচল,

সদয়, ভীরু, অধীর, চিন্তিত দৃষ্টি সে।
ওয়হ্ উপায় বিহীন, পর আশাময়ী—
স্নেহ দৃষ্টি অনন্য কোমল হৃদয় কী
করুণ মঙ্গল কামনা সে থী ভরী;
হায়; কেবলমাত্র সাধন দীন কী।

—পন্ত, গ্রন্থি : 'একবার'-স্তবক-৭।

উনিশ কলামাত্রার অমিল পংক্তির রচনায় প্রবহমানতা সুস্পষ্ট। চিত্রধর্মী এই রচনাটির ভাব এবং ভাষার উপযোগিতাও লক্ষণীয়।

৩। সমিল মুক্তক :—

পন ঘট পর
মোহিত নারী নর।
জব জল সে ভর
ভারী গাগর
খীঁচতী উবহনী ওয়হ্, বরবশ
চোলী সে উভর উভর কসমস
খিঁচতে সঙ্গ যুগ রস-ভরে কলস
জব ছলকাতী
রস বরসাতী
বল খাতী ওয়হ ঘর কো জাতী,
সির পর ঘট
উর পর ধর পট।

—পন্ত, গ্রাম্যা : 'গ্রাম্যযুবতী'।

ষট্‌কল পর্বিক কলাবৃত্ত রীতির সমিল মুক্তকের বলিষ্ঠ, সাবলীল ও পরিণত রূপ এবং গতিভঙ্গি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

৪। অমিল মুক্তক :—

যৌবন কে তীর পর প্রথম থা আয়া জব
স্রোত সৌন্দর্য কা,
বীচিয়োঁ মেঁ কলরব সুখ চুম্বিত প্রণয়কা
থা মধুর আকর্ষণময়,

মজ্জনা বেদনা মৃদু ফূটতা সাগর মেঁ ।
বাহিনী সংস্থতি কী
আতী অজ্ঞাত দূর চরণ-চিহ্ন রহিত
স্মৃতি রেখায়েঁ পার কর,
প্রীতি কী প্লাবন-পটু,
ক্ষণ মেঁ বহা লিয়া—
সাথী মৈঁ হো গয়া আকুল কা,
ভূল গয়া নিজ সীমা,
ক্ষণ মেঁ অজ্ঞানতা কো সৌঁপ দিয়ে-মৈঁনে প্রাণ
বিনা অর্থ-প্রার্থনা কে ।

—নিরালা, অনামিকা : 'রেখা'।

এই কলাবৃত্ত অমিল মুক্তকে ষট্‌কল পর্বের প্রয়োগ হলেও 'জোড়ে-জোড়' 'বিজোড়ে-বিজোড়' মাত্রাবিন্যাসের নিয়ম না মানায় পর্ব বা পদ-ভাগ সব সময় সুস্পষ্ট নয়। কবির অভিরুচি বা প্রয়োগ প্রবণতাই তার মূলে কাজ করছে।

সনেট রচনার ক্ষেত্রেও হিন্দী কবিরা মাত্রাবৃত্ত বা কলাবৃত্ত রীতিই প্রয়োগ করেছেন। অরিল্ল, রোলা, উলালা, বীর, সার ও ত্রিভঙ্গী প্রভৃতি বন্ধে হিন্দী সনেট রচিত রয়েছে। মিল, স্তবক-ভাগ ও প্রবহমানতা—প্রভৃতি সনেটের অপরিহার্য লক্ষণ বলে বিবেচিত হয়নি। অবশ্য সনেটের প্রকৃতি ও চোদ্দ-পংক্তির আয়তন সীমা অক্ষুণ্ণরাখার প্রয়াস সুস্পষ্ট। আমরা জানি রাবীন্দ্রিক সনেটের বিশিষ্টতাও তাই।[৩২] সুতরাং বলা যায় সনেট রচনায় হিন্দী কবিরা রবীন্দ্রানুসারী। জয়শংকর প্রসাদ, নিরালা এবং সুমিত্রানন্দনের কলামাত্রিক সনেটগুলি মান, পরিমাণ এবং বৈশিষ্ট্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মিশ্র কলাবৃত্ত রীতি (Mixed-moric Style)

হিন্দী সাহিত্যে 'কবিত্ত' বা মিশ্রবৃত্তের প্রয়োগ মধ্যযুগেই সূচিত হলেও কখনও তা ব্যাপকতা লাভ করতে পারেনি। বাংলা মিশ্রবৃত্তের বিপুল ও বিচিত্র ব্যবহারে আকৃষ্ট হয়ে আধুনিক যুগে কোনো-কোনো হিন্দী কবি তার প্রয়োগ-পরীক্ষা শুরু করেন নতুন করে। যাঁরা এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্রতী

হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে মৈথিলীশরণ গুপ্ত, জয়শংকর প্রসাদ এবং সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী 'নিরালা'র নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। মৈথিলীশরণ বাংলা অমিত্রাক্ষর বা প্রবহমান পয়ারের অনুসরণে পনের মাত্রার অমিত্রাক্ষর হিন্দীতে প্রবর্তন করেন। পনের মাত্রার সমিল ও অমিল দুই রূপই তিনি রচনা করেন। জয়শংকর প্রসাদ বাংলার অনুসরণে মিশ্রবৃত্ত রীতির পয়ার, ত্রিপদী ও মুক্তক রচনা করেন। নিরালা মিশ্রকলাবৃত্ত মুক্তকের প্রবর্তন এবং পরিণতি বিধান করেন। এই তিনজন কবি মিশ্রবৃত্তের আরও বিচিত্র নানা রকমের ব্যবহার করেছেন।

গুপ্তকবি সবৈয়া ও কবিত্তের সাধারণ ব্যবহারও করেছেন। তবে সবৈয়া খড়ীহিন্দীর পুরোপুরি অনুকূল না হওয়ায় আজকাল তার ব্যবহার হয় না। আর হলেও তা কবিত্তের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে।

হিন্দী মিশ্র কলাবৃত্ত রীতির প্রথম মুক্তক নিরালার 'জুহী কী কলী' (১৯১৬)। হিন্দীর যথার্থ মুক্তক এবং সুরহীন পাঠ্য-কবিতার সূচনা এখান থেকেই। মুক্তক বা স্বচ্ছন্দ ছন্দের স্বরূপ। নির্দেশ করেছেন নিরালাও, তাঁর পরিমল কাব্যটির ভূমিকায় বলেছেন—

> "দৃঢ় নিয়মোঁ সে বঁধী হুঈ কবিতা কদাপি মুক্ত ছন্দ নহী হো সকতী। মুক্ত ছন্দ তো ওয়হ হৈ, জো ছন্দ কী ভূমি মেঁ রহকর ভী মুক্ত হৈ।... মুক্ত ছন্দ কা সমর্থক উসকা প্রবাহ হী হৈ। ওয়হী উসে ছন্দসিদ্ধ করতা হৈ ঔর উসকা নিয়ম রাহিত্য উসকী মুক্তি।"
>
> —ভূমিকা, পরিমল, (১৯৫০), পৃ. ২১।

অর্থাৎ ছন্দের বহির্গঠন বা বন্ধ পরিহার সম্বন্ধে কবির পূর্ণ স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ্য থাকবে, কিন্তু তার অন্তর্গঠন বা প্রকৃতি ঠিক থাকবে—এটাই নিরালার অভিমত। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে বাংলা মুক্তক এবং হিন্দী 'স্বচ্ছন্দ ছন্দ' বা 'মুক্ত ছন্দ' একই বস্তু। বাংলা কবিতা বাক্‌ধর্মী হয়ে, মুক্তকে রূপান্তরিত। তারপর গদ্য কবিতায় পর্যবসিত। এই বিবর্তনের সুযোগ হিন্দীতে নেই। তাই নিরালার প্রয়াসে হিন্দীতেও উক্ত প্রকার বাক্‌ধর্মী প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। ফলে হিন্দী কবিতার গোত্রান্তর ঘটে গেছে—বলা যায়। প্রবণতা বাক্‌ধর্মী হলেও কাব্য শিল্পের মর্যাদা ও স্বরূপের প্রতি নিরালা পূর্ণমাত্রায় জাগরূক ছিলেন। বলেছেন—

> "মুক্ত ছন্দ কী রচনা মেঁ মৈঁনে ভাবকে সাথ রূপ সৌন্দর্য পর ভী ধ্যান

রখা হৈ, বল্কি কহনা চাহিয়ে, ঐসা স্বভাবতঃ হুআ, নহী তো মুক্তছন্দ ন লিখা জা সকতা, ওয়হাঁ কৃত্রিমতা নহী চল সকতী।"

—'মেঘে গীত ঔর কলা', প্রবন্ধপ্রতিমা (১৯৫০), পৃ. ২৭৫।

'জু হী কী কলী' লেখা হয় বাংলার মাটিতেই। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ বৎসরেই রবীন্দ্রনাথের মুক্তক-পুষ্ট কাব্য 'বলাকা' প্রকাশিত হয় (৭ মে, ১৯১৬)। ১৯১৪-১৬ পর্যন্ত বলাকার মুক্তক 'সবুজপত্রে' (১৯১৪) প্রকাশিত হয়েছিল। তখন নিরালা বঙ্গদেশেই বাস করতেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মুক্তক পড়ে নিরালা উদ্বুদ্ধ হন। এবং তারই ফল 'জুহী কী কলী'—একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না। পরিমল কাব্যে অনেকগুলি মিশ্রবৃত্ত মুক্তক সংকলিত। পরবর্তীকালে মুক্তক রচনার ব্যাপকতা দেখা দেয়। নিরালা মুক্তক বন্ধে নাট্যসংলাপও রচনা করেছেন। এই সন্দর্ভে তাঁর 'পঞ্চবটী' প্রসঙ্গ' রচনাটি স্মরণীয়। হিন্দীতে মিশ্রবৃত্ত রীতির বিবিধ ও বিচিত্র প্রয়োগে নিরালা যে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তা অবিস্মরণীয়। নিয়ে হিন্দী ঘনাক্ষরী বা মিশ্রবৃত্ত রীতির পয়ার, ত্রিপদী, প্রবহমান ও মুক্তকের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

১। পয়ার (৮ ॥ ৬ = ১৪ মাত্রা):—

কামিনী চিকুর ভার অতি ঘন নীল।
ভামেঁ মণি সম তারা সোহত সলীল ॥...
শান্তিনিশা মহিষী কো রাজচিহ্ন রূপ।
তুষহিঁ লখত সন্ধ্যা তারা শুভ রূপ ॥

—প্রসাদ, চিত্রাধার : 'সন্ধ্যা তারা'।

শব্দচয়ন, আট ও ছয় মাত্রার পদবিন্যাস—এই ব্রজভাষার দ্বিপদীকে স্পষ্ট ও পরিণত পয়ারের রূপ দান করেছে।

২। ত্রিপদী (৬ ॥ ৬ ॥ ৮ = ২০ মাত্রা)—

সঘন সুন্দর মেঘ মনোহর
গগন সোহত হেরি।
ধরা পুলকিত অতি অনন্দিত
রূপ ধর্যো চহুঁ ফেরি ॥

—পূর্ববৎ, 'বর্ষা মেঁ নদী কূল'।

এই ত্রিপদী বন্ধটির প্রাচীন নাম লঘু ত্রিপদী। হিন্দীতে এ-বন্ধের ভিন্ন নাম না থাকলেও অসমীয়াতে তা 'ছুলরি' এবং ওড়িয়াতে 'বঙ্গলাশ্রী' নামে পরিচিত।

৩। সমিল প্রবহমান হিন্দী পয়ার (৮ ।। ৭=১৫ মাত্রা) :—

ক্যা শক্রত্ব মেরা জো মিলী ন শচী ভামিনী
বাহর কী মেরী সাথী, ভীতর কী স্বামিনী।
আহ! কৈসী তেজস্বিনী, আভিজাত্য অমলা
নিকলী সুনীর সে যোঁ, ক্ষীর সে জ্যোঁ কমলা।

—মৈথিলীশরণ, 'নহুষ', পৃ. ২৬।

৪। অমিল প্রবহমান হিন্দী পয়ার (৮ ।। ৭=১৫ মাত্রা) :—

দাযেঁ ঔর বাঁয়ে ঘূম ঘূম ঝূম ঝূম কে
আতাল্‌ম লেতা হুআ পূর্ণ ঘট নীচে সে,
পাতী গাহরে কা রস, ওয়হ গুণ শালিনী।
রাগ রহ জাতা স্বেদ-ভাগ বহ জাতা থা
যোঁ ব্যায়াম ঔর কাম সঙ্গ সঙ্গ হোতে থে।

—মৈথিলীশরণ, 'সিদ্ধরাজ', পৃ. ৬১।

বলাই বাহুল্য দীর্ঘস্বরান্তিক পঙ্‌ক্তি হওয়ায় ভাবের প্রবাহ তেমন স্পষ্ট হতে পারেনি। প্রথমটিতে দীর্ঘস্বর ও মিল থাকায় ভাব যেন আড়ষ্ট হয়ে পড়েছে তবে পরেরটিতে কতকটা স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে—বলা যায়।

৫। অমিল মুক্তক :—

বিজন বন বল্লরী পর
সোতী থী সুহাগভরী-স্নেহ-স্বপ্ন-মগ্ন-
অমল-কোমল-তনু তরুণী-জুহী কী কলী,
দৃগবন্দ কিয়ে, শিথিল,—পত্রাংক মেঁ
বাসন্তী নিশা থী;
বিরহ-বিধুর-প্রিয়া-সঙ্গ ছোড়
কিসী দূর দেশ মেঁ থা পবন
জিসে কহতে হৈঁ মলয়ানিল।

—নিরালা, পরিমল : 'জুহী কী কলী'।

মিশ্র কলাবৃত্ত রীতির এই মুক্তকটি যেমন সহজ তেমনি স্বাভাবিক হয়েছে। মিশ্রবৃত্ত রীতির সমিল মুক্তকের হিন্দী নিদর্শন চোখে পড়েনি।

দলবৃত্ত রীতি (Syllabic Style)

বাংলা কবিতায় লোকগীতির ছন্দ অনুসরণ এবং লোকগীতির মতো সুরাশ্রিত গায়নের দৃষ্টান্ত বিরল নয়। হিন্দীতেও যে এ-রূপ প্রয়াস হয়নি তা নয়। তবে তা স্বীকৃতি লাভ করেনি। আধুনিক যুগে জয়শংকর প্রসাদ, সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী 'নিরালা' এবং মহাদেবী বর্মা প্রমুখের রচনায় লোকগীতি অনুসরণের নতুন উদ্যম দেখা যায়। লোকগীতি প্রভাবিত কবিতায় সাধারণভাবে কলাবৃত্ত রীতির চতুষ্কল পর্বের প্রয়োগ ঘটেছে। তবে বাক্‌ছন্দের প্রবণতায় বহু স্থলেই দীর্ঘস্বরের উচ্চারণ হ্রস্ব হয়ে পড়েছে। ফলে পঙ্‌ক্তি বা পদে দল-সংখ্যার সমতার প্রতি একটা ঝোঁক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এইভাবে কেবল হিন্দীতেই নয় অসমীয়া এবং ওড়িয়াতেও বাংলা দলবৃত্তের অনুরূপ একটি অভিনব ছন্দোরীতি সূচিত হয়েছে। অবশ্য অসমীয়াতে দলবৃত্ত একটি প্রাচীন এবং সমৃদ্ধ ছন্দোরীতি। আধুনিক যুগে তার সংস্কার এবং বিচিত্র প্রয়োগ ঘটেছে। দলসংখ্যাত এই ছন্দোরীতিটিকে যথাক্রমে 'হিন্দীদলবৃত্ত', 'অসমীয়া দলবৃত্ত' এবং 'ওড়িয়া দলবৃত্ত' বলা যেতে পারে। লোকগীতির শৈলী ও ছন্দের অনুসরণে রচিত এই পদগুলি গেয়। সুতরাং ছন্দের বিচারে মাত্রাগত ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও গাইবার সময় তা ঢাকা পড়ে যায়। তাই মাত্রাগত অসাম্য এই জাতীয় রচনায় দুর্লভ নয়।

জয়শংকর প্রসাদের 'ঝরণা' কাব্যের 'পী-কহাঁ', নিরালার 'গীতগুঞ্জ' কাব্যের 'শ্যাম গগন নব' এবং মহাদেবীর 'দীপশিখা' কাব্যের উনিশ নম্বর কবিতা—এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। গীতছন্দের ভঙ্গীতে পড়লে কলামাত্রার প্রবণতা এবং চরণগত মাত্রার অসাম্য দেখা দেয়, কিন্তু চলতি কথার ভঙ্গীতে পড়লে চরণে-চরণে দলসংখ্যার সমতায় প্রবণতা অনুভূত হয়। পর্বের কলামাত্রা পাঁচ-ছয়, সাত আবার কোথাও বা আট হলেও সাধারণভাবে ছয়ই মেলে। আবার উচ্চারণ-ভিত্তিক পর্বভাগ ও পর্বের মাত্রা লক্ষ করলে 'চতুর্দলমাত্রক' রূপও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন—

শ্যাম গগন নব ঘন মঁডরায়ে ৪।৪
কানন গিরি বন আগন ছায়ে। ৫।৪
লগে বাগ আমোঁ কে পরসে ৪।৪
ধানোঁ কে খেতোঁ পর সরসে, ৪।৪
যুবতী নিকলী অপনে ঘর সে, ৪।৪
পুরওয়াঈ কে ঝোঁকে খায়ে ।। ৪।৪

—নিরালা, 'গীতকুঞ্জ'।

বাকৃছন্দ অনুযায়ী পড়লে ছয়-চরণের বারোটি পর্বের মধ্যে মাত্র একটিতে কা. নন্. গি. রি. বন্ পাওয়া যায় পাঁচ দলমাত্রা, বাকি এগারোটি পর্বই চতুর্দলমাত্রক। সমসাময়িক অন্যান্য কবিদের রচনাতেও চতুর্দল ভিত্তিক পর্ব যোজনার প্রবণতা লক্ষিত হয়।

দল সমতার প্রবণতা ও চতুর্দল পর্বের প্রাধান্যই লৌকিক ছন্দের বিশিষ্ট ধর্ম বা লক্ষণ। উল্লিখিত দৃষ্টান্তে তা সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। বলতে কি বাংলা এবং অসমীয়া লৌকিক ছন্দেরও লক্ষ্য এবং লক্ষণ অনুরূপ। ওড়িয়াতে চারদলের সঙ্গে সঙ্গে পাঁচদলের পর্বের প্রবণতাও লক্ষিত হয়। লৌকিক ছন্দের ক্ষেত্রে বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া এবং হিন্দী ভাষায় এই সমতার কারণ নির্দেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। ভারতীয় ছান্দসিকদের বিষয়টির দৃষ্ট প্রতি আকৃষ্ট হলে রহস্যটি উদ্‌ঘাটিত হবে আশা করি।

গদ্য কবিতা

বাংলা অসমীয়া এবং ওড়িয়া ছন্দে মুক্তক বন্ধের পরবর্তী স্তর গদ্য কবিতা, হিন্দী কবিতার ক্ষেত্রেও তাই। রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে হিন্দীতেও গদ্য কবিতার ছন্দকে 'ভাবছন্দ' বলা হয়ে থাকে। হিন্দী ছান্দসিক পুত্তুলাল শুক্ল মনে করেন—

"ভাবছন্দ নিশ্চিত ছন্দ ঔর মুক্তক কো এক বিন্দু পর মিলাতা হৈ।"

—আধুনিক হিন্দী কাব্য মেঁ ছন্দ য়োজনা (১৯৫৮), পৃ. ২৪২।

অর্থাৎ ভাবছন্দের সুমিত-সুনিয়মিত ছন্দ ও মুক্তকের একবিন্দুতে মিলন

ঘটায়। আসলে 'ভাবের ছন্দ' বা গদ্যছন্দ নিশ্চিত গদ্য ও মুক্তকের মধ্যবর্তী বিন্দুতে অবস্থিত। তাই শুক্লজীর অভিমতে পুরোপুরি সায় দেওয়া সম্ভব নয়।

হিন্দী মুক্তক বন্ধের প্রবর্তক সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী নিরালাই সর্বপ্রথম হিন্দী গদ্য কবিতাও রচনা করেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'নয়েপত্তে' (১৯৪৬) কাব্যটি উল্লেখযোগ্য। কবি সুমিত্রানন্দন পন্তও গদ্যকবিতা রচনা করেছেন। তাঁর গদ্যছন্দের বিশিষ্টতা ফুটে উঠেছে 'বীণা' (১৯৫৭) এবং 'কলা ঔর বূঢ়া চাঁদ' (১৯৫৮) কাব্য দুইটিতে। এখানে নিরালার রচনা থেকে গদ্যকবিতার একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

আজ ঠণ্ডক অধিক হৈ।
বাহর ওলে পড় চুকে হৈঁ ;
এক হপ্তে পহলে পালা পড়া থা-
অরহর কুল কী কুল মর চুকী থী ;
হওয়া হাড়তক বেঁধ জাতী হৈ।
গেহুঁ কে পেড় অঁয়েঠে খড়ে হৈঁ,
খেতীহরোঁ মেঁ জান নহী,
মন মারে দরওয়াজে পর কৌড়ে তাপ রহে হৈঁ
এক দূসরে সে গিরে গলে বাতেঁ করতে হুয়ে
কুহরা ছায়া হুআ।

—নয়ে পত্তে : 'কুত্তা ভোঁকনে লগা'

রচনাটিতে যতি বিধান পুরোপুরি ভাব নির্ভর। ভাবের অনুস্যূতিই ছন্দের অনুভূতি আনে। অর্থাৎ ভাব ও ছন্দ পরস্পর অচ্ছেদ্য। রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ' (১৯৩২) কাব্যের গদ্যকবিতার সঙ্গে এই অংশটি তুলনীয়।

হিন্দী কবিদের অধিকাংশই বাংলা সাহিত্য, বিশেষ করে বাংলা কাব্যের সঙ্গে সুপরিচিত। কবি মৈথিলীশরণ বাংলা কাব্যের হিন্দী অনুবাদ করেছেন। রবীন্দ্র কবিতাও হিন্দীতে রূপান্তরিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্যের 'কাব্যের উপেক্ষিতা' প্রবন্ধটির প্রেরণায় তিনি 'সাকেত', 'যশোধরা' এবং 'বিষ্ণুপ্রিয়া' কাব্য রচনা করেন। বাংলা ছন্দও তাঁকে অনুপ্রাণিত করে। পর্ব, পদ, পঙ্‌ক্তি ও প্রবহমানতা রচনার ক্ষেত্রে তিনি হিন্দী ছন্দে অভিনবতা এনেছেন। তিনি সংস্কৃত, প্রাকৃত, উর্দু, বাংলা প্রভৃতি ছন্দের বিচিত্র প্রয়োগ করেছেন হিন্দী কবিতায়। তাঁর এই প্রয়াস বাংলা কাব্যে

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের বিভিন্ন ভাষার বিচিত্র ছন্দ প্রয়োগের কথা স্মরণ করায়।

কবি জয়শংকর প্রসাদ বাংলা মিশ্রবৃত্ত রীতির পয়ার, ত্রিপদী, প্রভৃতি বন্ধ রচনা করেছেন, মিশ্রবৃত্ত ও কলাবৃত্তে সমিল ও অমিল প্রবহমান এবং মুক্তক রচনারও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। বিচিত্র আয়তনের পর্ব ও পদ রচনা করে হিন্দী ছন্দের সমৃদ্ধি বিধানে নিজ গভীর ছন্দোজ্ঞান এবং উন্নত ছন্দ-শিল্প বোধের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কবিতায় ভাবে-ভাষায় ও ছন্দে বাংলার প্রভাব সুস্পষ্ট।

সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী নিরালা-হিন্দী সাহিত্যে 'বিদ্রোহী কবি' রূপে পরিচিত। তাঁর বিদ্রোহ প্রধানতঃ প্রাচীন হিন্দী ভাব-ভাষা ও ছন্দের বিরুদ্ধে। তিনি হিন্দী কবিতাকে প্রাচীন গেয়ধর্মী সংস্কার থেকে মুক্ত করে পাঠ্যধর্মী করতে চেয়েছেন। যুগের ধর্ম মান্য করে প্রবহমান, মুক্তক বন্ধ এবং গদ্যকবিতার প্রবর্তন করেছেন। বিভিন্ন আকৃতির পর্ব, পদ ও পঙ্‌ক্তির স্তবকের সাহায্যে হিন্দীকাব্যকাননকে সুসজ্জিত করেছেন। তাঁর এই সব কৃতিত্বের মূলে রয়েছে বাংলা ভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং ছন্দের অনুপ্রেরণা। হিন্দীকাব্যে ও ছন্দে নিরালা যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়েছেন তার জন্য পথনির্দেশ ও পাথেয় সংগ্রহ করেছিলেন বাংলা সাহিত্য, বিশেষ করে রবীন্দ্র-কাব্য ও ছন্দ থেকে—একথা বলা অনুচিত হবেনা।

সুমিত্রানন্দন পন্তও বাংলা, বিশেষ করে রবীন্দ্র কাব্যের সশ্রদ্ধ অনুরাগী পাঠক ছিলেন। সূক্ষ্ম ছন্দোবোধ-সম্পন্ন কবি ছিলেন তিনি। বিভিন্ন ও বিচিত্র রকমের পর্ব, পদ, পঙ্‌ক্তি ও স্তবক প্রভৃতির সমুচিত ব্যবহারে তিনি হিন্দীকাব্য সরস্বতীর অর্ঘ্য সাজিয়েছেন। রচনা করেছেন—প্রবহমান, মুক্তক এবং গদ্য কবিতা। তবে সর্বাধিক অনুরাগ ছিল তাঁর কলাবৃত্ত রীতির প্রতি। অন্য রীতি তিনি ব্যবহারই করেননি। বাংলা ছন্দোবন্ধের অনুরূপ বহু ছন্দোবন্ধের সাক্ষাৎ মেলে তাঁর কবিতায়। রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা-ভক্তি এবং অনুরাগ তাঁর ভাব-ভাষা ও ছন্দে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রস্ফুটিত। নানা ক্ষেত্রে কবিতায় এবং গদ্যেও তাঁর সে শ্রদ্ধা সহজ-সাবলিলভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে সুমধুর বাণীর সাহায্যে।

কবি মহাদেবী বর্মার কাব্যেও কেবলমাত্র কলাবৃত্ত রীতির প্রয়োগ ঘটেছে দেখা যায়। প্রবহমান ও মুক্তক বন্ধ এবং গদ্যকবিতা তিনি লেখেননি। তাঁর কাব্যবৈভব কলাবৃত্ত রীতির সহজ-স্বাভাবিক বিচিত্র প্রয়োগেই ভাস্বর হয়ে

উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের আত্ম নিবেদনের পর্যায়ের কলাবৃত্তের কবিতার সঙ্গে মহাদেবীর অনুরূপ রচনার ভাব-ভাষা ও ছন্দের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। তাঁর গ্রাম্য গীতের সুরের রচনায় যে মধুর সুর এবং ললিত ছন্দের ব্যবহারে উৎকর্ষ এসেছে তা রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-শিল্পের কথা স্মরণ করায় বৈকি।[৬৪]

দেখা গেল—বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া এবং হিন্দী—এই ভাষা চতুষ্টয় যেমন মূলে একই উৎসজাত এবং বাইরের আপাত ভিন্নতা সত্বেও তাদের সাম্য সাহিত্য এবং ছন্দের মধ্যেও তেমনি প্রতিফলিত হয়েছে মাঝে মাঝে। এই ক্রম চলে এসেছে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত। উনবিংশ শতকে তা আরও সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠ রূপে দেখা দিয়েছে। দেখা দিয়েছে ছন্দের ক্ষেত্রেও। এই ছন্দোগত সাম্য বা সংহতির মূল উৎস ও প্রেরণা রূপে আমরা পাই মধুসূদন দত্তের অভিনব কাব্য এবং ছন্দ-প্রবর্তনা। মধুসূদনের পর ভারতীয় ভাষার কাব্যে ছন্দ-সংহতির ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-শিল্প এবং ছন্দ-চিন্তাকে ভিত্তি করে। প্রথমে বাংলায় যে সব ছন্দোরীতি এবং ছন্দোবন্ধ রচনা করলেন রবীন্দ্রনাথ তা ক্রমে ক্রমে অসমীয়া ওড়িয়া এবং হিন্দী কাব্যে সঞ্চারিত হয়েছে। ছন্দ-শিল্পী কবির নবীন প্রয়োগ প্রতিবেশী ভাষার কাব্যেও সাদরে অভ্যর্থিত এবং ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে কেবল ভাব এবং ভাষার বিচারেই নয়, ছন্দ-শিল্পের বিচারেও পূর্বাঞ্চলীয় ভাষা চারটিতে ছন্দোরীতি এবং বিভিন্ন ও বিচিত্র ছন্দোবন্ধ-গত সাম্য ও সংহতি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্র-ছন্দ যেন চার ভাষারই কাব্য সাহিত্যকে এক সূত্রে বেঁধে কবি-শিল্পী-পাঠক এবং আবৃত্তিকারদের মধ্যে 'ভাব-সংহতি' সহজ ও সম্ভব করে তুলেছে। এই সংহতি সাধনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে রবীন্দ্র-মানসিকতার যথার্থ পরিচয়। রবীন্দ্রনাথের সত্য, শিব ও সুন্দরের সাধনা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সাধনার সঙ্গে সমন্বিত হয়ে সার্থক শিল্পরূপ লাভ করে অনবদ্য হয়ে উঠেছে তাঁর সাহিত্যের ছন্দ-শাখাতেও। এমনটি অন্যত্র এ কাণ্ডই দুর্লভ।

উল্লেখপঞ্জী

১। দ্রষ্টব্য—(ক) ড. সুধীন্দ্র : হিন্দী কবিতা মেঁ যুগান্তর (১৯৫৭), পৃ ৩২৭।
(খ) ডিম্বেশ্বর নেওগ : অসমীয়া সাহিত্যর বুরঞ্জী (১৯৫৭), পৃ. ৬৭৬-৮১।
(গ) সুরেন্দ্র মহান্তি : ওড়িআসাহিত্যর ক্রমবিকাশ (১৯৭৮), পৃ. ৩৪৫।

২। দ্রষ্টব্য—সন্ধ্যাসঙ্গীত : 'সূচনা' ও জীবনস্মৃতির 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' অধ্যায়।

৩। দ্রষ্টব্য—সন্ধ্যাসঙ্গীত কাব্যের 'সন্ধ্যা' ও 'তারকার আত্মহত্যা' কবিতা।

৪। এই প্রসঙ্গে 'ছবি ও গান' কাব্যের 'দোলা', 'একাকিনী', 'খেলা', 'বিদায়', 'মাতাল' ও অভিমানিনী' প্রভৃতি কবিতা স্মরণীয়।

৫। 'কে', 'আদরিণী' 'পাগল' ও 'বাদল' ('ছবি ও গান'); 'পত্র' 'বাঁশি' 'সারাবেলা' 'তুমি', 'বৃষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর', 'সাতভাই চম্পা' এবং 'পুরানো বট' ('কড়ি ও কোমল')।

৬। স্মরণীয়—জয়দেবের 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি' এবং শশিশেখরের 'তুঙ্গমণি মন্দিরে, ঘন বিজুরী সঞ্চরে' ইত্যাদি রচনা।

৭। এই ধরনের ছন্দে কবিতা লেখার প্রেরণা রবীন্দ্রনাথ বড়দা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা থেকে পেয়েছিলেন মনে হয়। দ্রষ্টব্য—'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যের দ্বিতীয়সর্গ।

৮। এই বিষয়টির আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—লেখকের প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রনাথের কবিতা,—চতুর্দশপদী'—'রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দী ছন্দ' (১৯৮৬), পৃ. ১০৯— ১২৫।

৯। "ক্ষণিকা যখন লিখলুম তখন লোকের ধাঁধা লেগে গেল"।
—রবীন্দ্রনাথ : 'আমার ছন্দের গতি', ছন্দ (১৯৭৮), পৃ. ১৭৭।

১০। দ্রষ্টব্য—গীতবিতান—'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি'—ইত্যাদি।

১১। প্রবোধচন্দ্র সেন : 'বাংলা ছন্দের রূপকার রবীন্দ্রনাথ' (১৯৮১), পৃ. ৩৭।

১২। দ্রষ্টব্য—রবীন্দ্রনাথ : ছন্দ (১৯৭৬), 'বাংলা ছন্দ-১', পৃ. ৩০।

১৩। দ্রষ্টব্য—পূর্ববৎ, 'বাংলা ভাষার স্বাভাবিক ছন্দ', পৃ. ৫।

১৪। দ্রষ্টব্য—পূর্ববৎ, 'আমার ছন্দের গতি', পৃ. ১৭৭।

১৫। দ্রষ্টব্য—(ক) পুনশ্চ (প্রথম সং ১৯৩২) 'ভূমিকা'।
(খ) লেখকের প্রবন্ধ—'বাংলা গদ্য কবিতা ও রবীন্দ্রনাথ', 'রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দী ছন্দ' (১৯৮৬), অনুষঙ্গ, পৃ. ১২৬-৩৭।

১৬। "প্রচ্ছন্ন আবেগের ব্যঞ্জনার মধ্যে ভাববিন্যাসের যে শিল্প তাকেই বলব ছন্দ"—রবীন্দ্রনাথ : ছন্দ (১৯৭৬), 'গদ্যছন্দ' পৃ. ২২২।

১৭। 'পুনশ্চ' (১ম সংস্করণ)—'কোমলগান্ধার', 'খালিখ', 'অস্থানে', 'ঘড়ছাড়া', 'ছুটি', 'গানের বাসা' ও 'পয়লা আশ্বিন'—এই সাতটি কবিতা।

১৮। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন নাটকে ও গীতবিতানে সংকলিত মৌলিক গানগুলি বাদে।

১৯। বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলীর ষড়্‌বিংশ খণ্ডের গ্রন্থ পরিচয় অংশে (পৃ. ৬৫৬-৬২) 'পালকি' (১৯৪০ এপ্রিল ২৪) ও 'বাল্যদশা' (১৯৪০ এপ্রিল ২৮) নামে দুইটি গদ্যকবিতা উদ্ধৃত রয়েছে। সম্ভবতঃ এ-দুইটি রবীন্দ্রনাথের শেষ গদ্য কবিতা। এ-দুইটি নিয়ে তাঁর গদ্যকবিতা সংখ্যা ১২৪। এই কবিতা দুইটি নিয়ে আলোচনা আছে, বর্তমান লেখকের 'রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দী ছন্দ, (১৯৮৬) গ্রন্থের অনুষঙ্গ অংশের 'রবীন্দ্রনাথের গদ্যের কবিতা' প্রবন্ধে।

২০। দ্রষ্টব্য—(ক) সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা : অসমীয়া সাহিত্যর সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত (১৯৮১) পৃ. ৩১৫।
(খ) লেখকের : আধুনিক ওড়িয়া ছন্দ (১৯৮০), পৃ. ৪০।
(গ) লেখকের : 'আধুনিক বাংলা ও হিন্দী ছন্দ' (১৯৭৭), পৃ. ১৬৯।

২১। সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা : অসমীয়া সাহিত্যর সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত (১৯৮১), পৃ. ৩২০।

২২। পূর্ববৎ, পৃ. ৩১০।

২৩। "The fact remains, this is the only age, in the whole course of Assamese metrical history, when all the three styles received equal attention and both end-stopped and enjambed verse-forms received equal favour. To be precise, it is the period when Assamese metre witnessed the emergence of an

altogether new style of metre, that is, the rigid moric style. And, it is the period when for the first time the syllabic style was recognised as a medium of serious and sophisticated poetry as well. Besides, new forms were created by the subtle mixing of metres in all the three levels of rhythm."
—M. Bora : Fundamentals of Assamese Metre (1977), P. 242.

২৪। "A Poem composed in regular Pentamoric metre, is a thing of rarity in the whole range of Assamese Poetry." Do. P. 64.

২৫। Do. P. 70.

২৬। (ক) Do. P. 247.

(খ) "চালিহার ভাব আরু প্রকাশভঙ্গীত রবীন্দ্রনাথর প্রভাব দুই করিব নোওয়ারি।"

—সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা : অসমীয়া সাহিত্যর সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত (১৯৮১), পৃ. ৩৫৯।

২৭। "Of all the styles of metre, it [Mixed moric Style] is the most favourite one of the Assamese poets, so much so that some seven-eights of Assamese Poetry is composed in the metres, belonging to this style.

—M. Bora : Fundamentals of Assamese Metre (1977), p. 81.

২৮। Do. Pp. 314-15.

২৯। Do. Pp. 132 and 148.

৩০। "It is Kamaleswar Chaliha (1904), who happens to be the first poet to introduce serious themes in the syllabic styles of metre. Besides he also gives us

verses of pure tetra syllabic character with far more consistent manifestations of them"

—M. Bora: Fundamentals of Assamese Metre, (1977), P. 268.

৩১। "It is Ratnakanta Barkakati, in whose hand, this [syllabic] style of metre not only received its perfection as the medium of written poetry, but also gained the flavour of sophistication which it had been wantingin miserably."—Do. P. 269.

৩২। (ক) "To Gohainbarua goes the creidit of introducing also that loose type of sonnet which we propose to call the Tagorean type, built on seven couplets".
—Do. P. 272.

(খ) "গোহাই বরুয়া" 'অকণি'র ক্ষুদ্রাবয়বী কবিতা সমূহ রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা' আরু 'কণিকার' কবিতাবলীর আদর্শত রচনা করিছে"।
—সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা: অসমীয়া সাহিত্যর সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত (১৯৮১), পৃ. ৩২৮।

৩৩। দ্রষ্টব্য—লেখকের: 'রবীন্দ্রনাথের কবিতা চতুর্দশপদী', 'রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দী ছন্দ' (১৯৮৬), অনুষঙ্গ, পৃ. ১০৭-২৫।

৩৪। একটি অসমীয়া পত্রিকা থেকে সংগৃহীত।

৩৫। "...rhythmic prose is thus becoming the second dominant metrical medium of poetry in the recentmost times."

—M. Bora: Fundamentals of Assamese Metre (1977), P. 307.

৩৬। দ্রষ্টব্য—যোগেন্দ্রনারায়ণ ভূঞা সম্পাদিত: রত্নকান্ত বরকাকতির গদ্যসম্ভার (১৯৭৭), পৃ. ৩৯৬।

৩৭। অসমীয়া সাহিত্যর বুরঞ্জী (১৯৫৭), পৃ. ৬৮১।

৩৮। "...সবুজ সাহিত্য ওভিমা কাব্যরাজ্যরে স্থায়ী ছাপ রখি যাইছি। মুক্ত মুক্তা ছন্দ ও বিচিত্র শব্দ যোজনারে কাব্যরাজ্যর বাতাবরণ,

পরিবেশ ও দিগ্বলয় সম্প্রসারিত হোইছি এবং ওড়িআ কবিতারে এক আন্তর্জাতীয় চেতনা আসিছি।

—বসন্ত কুমার শতপথী : 'ওড়িআ কাব্য সাহিত্যর ভূমিকা' সঞ্চয়ন (১৯৭৪), পৃ. ১।৶

৩৯। দ্রষ্টব্য—কৃষ্ণচন্দ্র পাণিগ্রাহীর প্রবন্ধ 'সবুজশৈলী', 'প্রবন্ধমানস' (১৯৭২)।

৪০। "মাত্রিক ছন্দ ওড়িআ সাহিত্যরে নূতন কহিলে চলে। ছন্দসাহিত্যরে এহার কৌণসি স্থান ন থিলা। অন্য কেতেক স্থলরে এহার পরিসর ও প্রচার থিলা অতীব সীমিত।"

—নটবর সামন্ত রায় : ওড়িআ সাহিত্যরে সমীক্ষা ও সংগ্রহ পৃ. ১১২।

৪১। "আধুনিক ওড়িআ কবিতার ইতিহাসরে মধুসূদন হেউচ্ছন্তি এ-ক্ষেত্ররে প্রথম কলাকার। তাংকর এই প্রাথমিক উত্তম হেতু সে ছন্দর নির্ভুল পরীক্ষা সর্বত্র তাংক সাহিত্যরে আশা করা যাই ন পারে।

—পূর্ববৎ, পৃ. ১১২।

৪২। পূর্ববৎ, 'আধুনিক ওড়িআ সাহিত্যর ভিত্তিভূমি (১৯৬৪), পৃ. ১৬৩-৮১।

৪৩। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় :—

(ক) ওড়িআ সবুজ সাহিত্য বঙ্গবাণীর বীণা নিক্কণরে ঝংকৃত হোই উঠি থিবা এক অবিসংবাদিত বিষয়।...একথা স্বীকার করিবাকু হেব যে সবুজদলর সাহিত্য সাধনা সাময়িক ও পরবর্তী লেখক গোষ্ঠীকু ব্যাপক প্রেরণা যোগাইথিলা। এমানংকু উত্তমরে ওড়িআ সাহিত্যর ক্ষীণ ধারা হোই উঠিলা বৈচিত্র্য-মণ্ডিত, সাহিত্যর প্রকাশভঙ্গি হেলা বহুমুখী; রচনার মূল প্রেরণা হেলা মানবিকতা। জাতীয় চিন্তা ও তীক্ষ্ণ অনুভূতির সরসতা হেতু এ-সাহিত্য হেলা বহু আদৃত।...মাত্রা ছন্দ এমানংকর কবিতার হেলা প্রধান আকর্ষণীয় বিন্দু। সবুজ হেলা নূতন সতেজ প্রাণস্পন্দনর এক তরল তরঙ্গিত প্রবাহ। যুব সুলভ গভীর অনুভূতির আবেগরে সবুজ ধারার সাহিত্য হেলা বলিষ্ঠ জীবনর দ্যোতক"

—বৃন্দাবনআচার্য : ওড়িআ সাহিত্যর সংক্ষিপ্ত পরিচয় (১৯৭৫) পৃ. ২৩৯।

(খ) 'সবুজ কবি মানে মধ্য সেমানংক সময়রে কবিতারে ছন্দগত বিপ্লব আনি থিলে, কিন্তু সেমানংকর কবিতার প্রতি ছত্রে ছত্রে ভরি উঠিথিলা হৃদয়র আবেগ। সে কবিতা ভিতরে ভরি উঠিথিলা উৎফুল্লতা আনন্দ ও বাঁচিবার অপরিসীম মোহ। তাহা পঢ় অন্তর ভিতরে আনন্দর ফল্গু সঞ্চারিত হেউথিলা কিংবা দুঃখর বন্যারে মনভিতর উৎপ্লুত হোইযাউথিলা।"

—দুর্গামাধব মিশ্র : 'মো দৃষ্টিরে সাম্প্রতিক সাহিত্য' (১৯৭৩), পৃ ২০২।

৪৪। দ্রষ্টব্য—পণ্ডিত বিনায়ক মিশ্র : আধুনিক ওড়িআ সাহিত্যর ইতিহাস' (১৯৬৮) পৃ. ৩৮৭।

৪৫। সংকলক ও সম্পাদক অধ্যাপক চিন্তামণি বেহেরা।

৪৬। দ্রষ্টব্য—নীলকণ্ঠ দাসের প্রবন্ধ 'ওড়িআ কবিতা তথা ছন্দর প্রগতি', ওড়িআ ভাষা ও সাহিত্য (১৯৫৮), পৃ. ৬৬ এবং পণ্ডিত বিনায়ক মিশ্র রচিত 'আধুনিক ওড়িআ সাহিত্যর ইতিহাস' (১৯৬৮), পৃ. ৩৪১।

৪৭। দ্রষ্টব্য—লেখকের 'আধুনিক ওড়িয়া ছন্দ' (১৯৮০), পৃ. ৬৩।

৪৮। তুলনীয়—"ছন্দকে মোটের উপর তিন জাতে ভাগ করা যায়। সমচলনের ছন্দ, অসমচলনের ছন্দ এবং বিষম চলনের ছন্দ। দুই মাত্রার চলনকে বলি সমমাত্রার চলন, তিন মাত্রার চলনকে বলি অসম মাত্রার চলন এবং দুই তিনের মিলিত মাত্রার চলনকে বলি বিষম মাত্রার ছন্দ।"

—রবীন্দ্রনাথ, ছন্দ (১৯৭৬), পৃ. ৫৫।

৪৯। "গড়নায়কংক সমস্ত মৌলিক কবিতা নির্দোষ যতিপাত ও ছান্দসিক অনবদ্যতা হেতু শ্রুতিসুখকর ও উপভোগ্য। ওড়িআ সাহিত্যরে ছন্দ ধুরন্ধর ভাবরে গড়নায়কংক শ্রেষ্ঠতা অপ্রতিদ্বন্দ্বী।"

—মায়াধর মানসিংহ, 'ওড়িআ সাহিত্যর ইতিহাস' (১৯৭৬) পৃ. ৩৭৮।

৫০। দ্রষ্টব্য লেখকের—রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দী ছন্দ (১৯৮৬), পৃ. ৬১।

৫১। দ্রষ্টব্য—লেখকের প্রবন্ধ : 'গীতাঞ্জলির অনুবাদ' 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকা, রবীন্দ্র সংখ্যা ১৩৯৬, পৃ. ১০২০-২৩।

৫২। ড. নগেন্দ্র : 'সুমিত্রানন্দন পন্ত (১৯৪২), পৃ. ১১।

৫৩। দ্রষ্টব্য—লেখকের 'আধুনিক বাংলা ও হিন্দী ছন্দ' (১৯৭৭), পৃ. ১৭০-৭১।

৫৪। দ্রষ্টব্য—সাহিত্যসাধক চরিতমালা—৬৬ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'আষাঢ়ে' কাব্যের 'কলিযজ্ঞ' কবিতা।

৫৫। M. Bora: Fundamentals of Assamese Metre (1977), preface. P. 10.

৫৬। জানকীবল্লভ মহান্তি : 'ওড়িআ ছন্দর বিকাশ' (১৯৬১), পৃ. ৩৪।

৫৭। লেখকের 'আধুনিক বাংলা ও হিন্দী ছন্দ' (১৯৭৭) পৃ. ৩৭।

৫৮। দ্রষ্টব্য—মধুসূদন গ্রন্থাবলী (১৯৬৪), পৃ. ২৬৪।

৫৯। দ্রষ্টব্য—প্রাকৃত পৈঙ্গলম্-১, প্রথম পরিচ্ছেদ—শ্লোক-১০৬।

৬০। ড. শিবনন্দন প্রসাদ : 'মাত্রিক ছন্দোঁ কা বিকাস' (১৯৬৪), গ্রন্থখানির চতুর্থ প্রকরণের (পৃ. ২২৩-২৫৯) অনুসরণে এই সংখ্যা অনুমিত।

৬১। দ্রষ্টব্য—লেখকের 'আধুনিক বাংলা ও হিন্দী ছন্দ' (১৯৭৭) পৃ. ৯৩-৯৫ এবং পৃ. ১৮৫-৮৬।

৬২। দ্রষ্টব্য—লেখকের 'রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দী ছন্দ' (১৯৮৬), অনুষঙ্গ 'রবীন্দ্রনাথের কবিতা-চতুর্দশপদী', পৃ. ১০৯-২৫।

৬৩। দ্রষ্টব্য—লেখকের 'আধুনিক বাংলা ও হিন্দী ছন্দ' (১৯৭৭), পৃ. ১৯১।

৬৪। এই প্রসঙ্গটির বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—লেখকের 'আধুনিক বাংলা ও হিন্দী ছন্দ' (১৯৭৭), পৃ. ২০৩-০৭।

চতুর্থ অধ্যায়

রবীন্দ্র-উত্তর যুগে বাংলা-অসমীয়া-ওড়িয়া ও হিন্দী ছন্দ

অবতারণা

রবীন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ ছন্দ প্রতিভা পরবর্তী বাংলা কবিসমাজের ছন্দ-শিল্প-বোধ নিয়ন্ত্রণ করবে এইটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বিংশ শতকের তৃতীয় দশকের শেষ দিকের বাংলা সাহিত্যে এমন একদল কবির আবির্ভাব হল, যাঁরা রবীন্দ্রনাথের ভাব-ভাষা ও ছন্দ পরিহার করে কবিতা রচনায় আত্মনিয়োগ করেন আত্ম-প্রতিষ্ঠা মানসে। তাঁরা অতিমাত্রায় পাশ্চাত্য প্রভাবিত এবং আধুনিক। এই কবিসম্প্রদায় কয়েকটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত। কবিতায় ছন্দ-প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই বিভিন্ন গোষ্ঠীতে ছিল মতের তারতম্য।

রবীন্দ্র উত্তর যুগে পদ্য ছন্দে, গদ্য ছন্দে এবং নিছক গদ্যে কবিতা লেখার তিনটি প্রবণতা সুস্পষ্ট। ভাবে স্বতন্ত্র কিন্তু ভাষা ও ছন্দে রবীন্দ্রানুসারী একদল কবি তাঁদের রচনায় সুস্পষ্ট ছন্দের ধারাটি অব্যাহত রেখেছেন। ফলে তাঁদের প্রয়োজন ও অভিরুচি অনুযায়ী ছন্দের বহিরঙ্গে এসেছে বৈচিত্র্য, ছন্দ রচনার ক্ষেত্র হয়েছে প্রসারিত। ভাষা ও ছন্দের ক্ষেত্রেও যাঁরা রবীন্দ্র পন্থা পরিহারে প্রয়াসী হয়েছেন তাঁদের রচনায় এসেছে কৌশল এবং চমকের অভিনবতা। তাঁরা বাংলা ছন্দে নতুন প্রবাহ এনেছেন। এইভাবে বাংলা ছন্দ যুগোপযোগী স্বক্ষেত্রে খুঁজে পেয়েছে। যদিও তার মূলটি সংযুক্ত হয়ে আছে রবীন্দ্র-ছন্দের সঙ্গেই।

আর নিছক গদ্যের কবিতা-প্রসাদ আলোচনার অপেক্ষা রাখে না।

আধুনিক কবিদের আবির্ভাবের ফলে বাংলা ছন্দের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ও বৈচিত্র্য নিয়ে আধুনিকতা ফুটে উঠেছে, বর্তমান শতকের পঞ্চম দশক থেকে অসমীয়া ওড়িয়া এবং হিন্দী, ছন্দ-জগতেও তার সূচনা ঘটেছে। অবশ্য ওড়িয়া এবং অসমীয়াতে তার পূর্বেই এই পরিবর্তনের আভাস ফুটে উঠেছিল। আধুনিক হিন্দী অসমীয়া এবং ওড়িয়া কবিরাও সুস্পষ্ট পদ্যছন্দ পরিহার করে গদ্য ছন্দ রচনায় মনোযোগী হয়েছিলেন। সব ভাষার কবিদের মধ্যেই বাংলার মতোই বেশ কয়েকটি গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। কারণ ছন্দ প্রয়োগ বিষয়ে স্ব-ছন্দ অভিমত

পোষণ করতেন কোনো কোনো কবি। এই স্বচ্ছন্দ্য বৈচিত্র্যের পথ খুলে দিয়েছে।

বাংলায় যেমন রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর ছন্দ-অনুবর্তীদের সুস্পষ্ট পদ্য ছন্দের ধারা[১] এবং রবীন্দ্রবিরোধী কবিগোষ্ঠীর গদ্যকবিতা ও গদ্যবৎ কবিতার ধারা পাশাপাশি প্রবাহিত, অসমীয়া ওড়িয়া এবং হিন্দী ছন্দের ক্ষেত্রেও অনুরূপ দুইটি ধারার প্রবাহ সুস্পষ্ট। হিন্দীতে রহস্যবাদী (ছায়াবাদী) যুগের পর প্রগতিশীল কাব্যযুগ, তারপর প্রয়োগবাদী কাব্যের যুগ। অসমীয়া এবং ওড়িয়াতে এই জাতীয় বিশেষ বিশেষ নামে চিহ্নিত না হলেও পরিবর্তনের স্বাক্ষর কিন্তু বিদ্যমান। হিন্দীতে শেষ যুগের কবিরাই ছন্দ প্রথাকে পুরোপুরি অস্বীকার করে স্বাধীনভাবে স্ব-স্ব রুচিতে কবিতা লিখতে শুরু করেন। অসমীয়া এবং ওড়িয়াতেও এই জাতীয় নবীন ঢেউ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে পঞ্চম-ষষ্ঠ দশকে। তার ফলস্বরূপ ছন্দের রূপ-বৈচিত্র্য এবং বিপুলতা দেখা দিল—দেখা দিল নব ঐশ্বর্য কিন্তু এলনা স্থৈর্য। অতি সম্প্রতি বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া এবং হিন্দী—চার ভাষার কবিতাতেই সুস্পষ্ট ছন্দ অর্থাৎ পদ্য ছন্দের উপযোগিতা আবার নতুন করে অনুভূত হচ্ছে। তাই বলে গদ্য-ছন্দ বা ছন্দোহীন নিছক গদ্যের কবিতার পরিমাণ যে কমেছে তা বলা যায় না। তবে তার ভাগ্যে যে স্থায়িত্ব ঘটছে না তা খুবই স্বাভাবিক। এ-অধ্যায়ে বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া এবং হিন্দী ছন্দ-ধারার পরিবর্তনের ক্রম এবং পারস্পরিক সাম্য বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাবে।

বাংলা ছন্দের সাম্প্রতিক প্রবণতা ও ভাবী সম্ভাবনা

রবীন্দ্র সমকালীন কবিদের মধ্যে করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৫), যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী (১৮৭৮-১৯৪৮); কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮২-১৯৭০) এবং কালিদাস রায় (১৮৮৯-১৯৭৫) প্রমুখ ভাবে, ভাষায় ও ছন্দে রবীন্দ্রানুসারী। অন্যদিকে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩); সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২); মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮২-১৯৫২); যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪) এবং কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) প্রমুখ রবীন্দ্রানুরাগী কবি ভাবে ও ভাষায় স্বচ্ছন্দবিহারী, কিন্তু ছন্দে রবীন্দ্রানুগামী। বাংলা ছন্দের কলাবৃত্ত,

মিশ্রবৃত্ত ও দলবৃত্ত—এই তিন রীতিরই প্রয়োগ দেখা যায় তাঁদের রচনায়। অবশ্য দ্বিজেন্দ্রলাল ও সত্যেন্দ্রনাথ ছন্দ প্রয়োগে বিচিত্র রকম পরীক্ষা চালিয়েছেন এবং নানা অভিনবত্ব আনতে প্রয়াসী হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্যকাব্য 'পুনশ্চ' (১৯৩২) প্রকাশিত হবার আগেই বাংলায় একদল তরুণ কবির আবির্ভাবের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। তাঁরা রবীন্দ্র-ছায়ায় মানুষ হলেও একমাত্র বিদেশী সাহিত্যের আদর্শ অনুসরণেই আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ দেখতে পান। কয়েকটি দলে বিভক্ত এই কবিদের মধ্যে ভাব ও ছন্দের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রবিরোধিতার মধ্যেও তারতম্য ছিল। এঁরা স্পষ্ট পদ্যছন্দের ব্যবহার করেননি এমন নয়। মুক্তক ও গদ্যছন্দে বৈচিত্র্য আনবার প্রয়াসে কোনো কোনো কবি বেশ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। বাংলা ছন্দের সুপ্রতিষ্ঠিত তিন রীতিতে এবং গদ্যছন্দে তাঁরা পাশ্চাত্য কবিতার নানা-প্রকার আকৃতি বা বন্ধ বাংলায় এনেছেন। এই সব দিক দিয়ে এ-যুগের বাংলা ছন্দে যাঁরা নূতনত্ব এনেছেন তাঁদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪); সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০); অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৬); প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮৮); বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৭); বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২) এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯২০) প্রমুখ কবির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখন এই সব কবিদের ছন্দ রচনার বিশেষ তাৎপর্যময় প্রয়াসের সাধারণ এবং সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হচ্ছে।

কলাবৃত্ত রীতি (Moric Style)

কলাবৃত্তে মুখের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা কতদূর সম্ভব হতে পারে তা নিয়ে নানাপ্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগ এ-টি। এই রীতিতে প্রবহমানতা সঞ্চার, মুক্তক রচনা, এমন কি সনেট রচনার প্রয়াসও লক্ষিত হয়। কলাবৃত্ত রীতি নিয়ে এরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা হিন্দী সাহিত্যে এর আগেই সূচিত হয়েছে। তবে অসমীয়া এবং ওড়িয়াতে এই প্রবণতা লক্ষিত হয় আরও পরে। বাংলা কলাবৃত্তে কথ্য ভাষার বৈশিষ্ট্য কেমন ফুটতে শুরু করেছে তার একটি দৃষ্টান্ত।—

এক বসন্তেই শূন্য তূণ !
তাহলে আজো কোনো শান্তি নেই !

কেন বিচক্ষণ যুধিষ্ঠির
পাঞ্চালীরে রাখে পাশায় পণ
স্বপ্নে ওঠে রোল—কোথায় কামরূপ
কাঁপছে চিত্রাঙ্গদার ঠোঁটে।
হে, বীর ভাঙো ভুল। ব্রহ্মচারী তুমি?
আবার 'বসন্তের' হুলুস্থুল।

—বু. ব. শ্রেষ্ঠ কবিতা: 'অসম্ভবের গান'।

এই স্তবকটি চারটি অমিল দ্বিপদী (৭+৫ I ৭+৫ I ৭+৫ I ৭+৫ I) নিয়ে গঠিত। 'বসন্তের'-'সন্' রুদ্ধ দলটির উচ্চারণ সংকুচিত ও একমাত্রার। সুতরাং 'বসন্তের' শব্দে চার কলামাত্রা গণ্য। কলাবৃত্তের অমিল প্রবহমান বন্ধের একটি উদাহরণ:—

শ্রীমতী আমার অরণ্য স্বাদ
মেটে এখানেই। লেকে সন্ধ্যায়
গোচারণ ঘাসে প্রার্থী যুবক।
কমণ্ডলুতে কারণ, তাইতে
ওঁ তৎসৎ;—প্রলাপ মানেই।
ফরাসী রাজ্য ভালো লাগে, তাই
সংসার ত্যাগ। লালত্রাসে কাঁপে
গ্রেসিয়ার দিন। পেশোয়ারীদের
করকমলেই ভবলীলা শেষ।

—সু. মু. কবিতা: 'পদাতিক'-৩।

ষট্‌কল পর্বিক কলাবৃত্তে প্রবহমানতা সঞ্চারের এই প্রয়াস অভিনব। তবে রচনাটি আয়াসজাত, কৃত্রিমতার ছাপ সুস্পষ্ট। পরীক্ষার স্তর উত্তীর্ণ হয়নি। কলাবৃত্ত রীতির একটি মুক্তক:—

নদীর স্রোতে স্বচ্ছতায়
চোখের পিছু আমিও যাই।
উপরে কালো চূড়ার চোখে অপাপনীল অশ্রুজল
আকাশ ধোয়া হ্রদ, স্বচ্ছ স্ফটিকে মেশে ইন্দ্রনীল।

পাহাড়ের পাশে দূর্বাদল মরকতের কোমলতায়
বাহার দেখি অহল্যায় তারল্যের বর্ণাভাস।
পেয়েছি চেনা মানুষে এই অনুপ্রাস, সমতলের অন্ত্যমিল।
মানসে তাই আশ্বিনের নীল আকাশ,
এখানে এক গ্রাম শহর সুস্থ ধীর নয়নারাম ॥

—বি. দে'র শ্রেষ্ঠ কবিতা : 'অনুপ্রাস অন্ত্যমিল'।

এই পঞ্চকল পর্বিক অমিল মুক্তকের দৃষ্টান্তে ছোট চরণ দশ এবং সবচেয়ে বড়ো চরণ পঁচিশ মাত্রার। সমিল কলাবৃত্ত মুক্তকও দুর্লভ এ-যুগের রচনায় নয়।

এ-যুগের কবিদের মধ্যে কলাবৃত্ত সনেট রচনার প্রয়াসও লক্ষিত হয়। এই প্রচেষ্টায় সফলতার চেয়ে রচনা-কৌশলের অভিনবত্বই মনকে সহজে আকৃষ্ট করে। একটি দৃষ্টান্ত :—

বরষা পুন এসেছে ঘন গৌরবে
কুহরি কেকী নাচিছে মেলি পুচ্ছটি,
মুক্ত মন সিক্ত ক্ষিতি সৌরভে,
দিকের সীমা মুছিয়া গেছে কুজ্ঝটি ॥
যুগান্তরের কদম পুলকাঞ্চিত
আসর যবে খুঁজিয়া পাবে ধন্যতা,
আমারই ভাগে সময় নেমিলাঞ্ছিত
পথের রজে ঘটিবে শুধু অন্যথা ?
জলদ যানে বৈতরণী উত্তরে
যক্ষ যথা বিহারে আজও অনঙ্গে,
তেমনি আমি ভ্রমিব, সখী, সত্বরে
নবোত্থিত মানস রস তরঙ্গে ;
আমারও বাণী বাজিবে তব অন্তরে
বায়ুর গানে, মেঘের মৃদু মৃদঙ্গে ॥

—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, তন্বী : 'অবিনশ্বর'

কলাবৃত্ত রীতির পঞ্চকল পর্বিক এই চতুর্দশপদী ভাব-ভাষা ও ছন্দের বিবেচনায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ চতুষ্কল পর্বিক ছন্দে সনেট লেখেন কলাবৃত্ত রীতিতে। আধুনিক কবিরা পাঁচ ছয় ও সাত মাত্রার পর্বে

কলাবৃত্ত সনেট লিখতে প্রয়াসী হয়েছেন। হিন্দী কবিরা কলাবৃত্ত রীতিতেই প্রথম থেকে সনেট রচনা করেছেন, সে কথা আমরা জানি।

সে যাই হোক, এ-যুগের অধিকাংশ কবির রচনায় কলাবৃত্তে নতুনত্ব আনবার প্রচেষ্টায় কৃত্রিমতার ছাপ সুস্পষ্ট। স্বাভাবিক শিল্প সৌন্দর্যের সাক্ষাৎ খুব কমই মেলে। অবশ্য এখানে স্মরণীয় হল—সাধারণভাবে শিল্পমাত্রেই কৃত্রিম। যখন সেই শিল্প সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে ওঠে তখন তা আর কৃত্রিম থাকে না। তাই কবিদের অভিনব প্রয়াস অনভ্যস্ততার জন্য কৃত্রিম মনে হয়।

মিশ্রকলাবৃত্ত রীতি (Mixed-moric Style)

আলোচ্য যুগের মিশ্রবৃত্ত রীতির একটি বিশিষ্টতা হল 'হস্ মধ্যপদের' রুদ্ধদলের সংকোচন বা সংশ্লেষণ। ভারতচন্দ্রের সময় থেকেই অক্ষর গুণে মাত্রা নিরূপণের অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি চলে আসছিল। ভারতচন্দ্র এবং তাঁর পরবর্তী কবিরা কেউই এ-বিষয়ে সচেতন ছিলেন বলে মনে হয় না। এমন কি রবীন্দ্রনাথও। এই বিষয়টি সর্বপ্রথম ছন্দ-অনুরাগীদের সামনে তুলে ধরেন ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন (১৮৯৭-১৯৮৬)[৩]। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের জানুআরি সংখ্যা 'প্রবাসী' পত্রিকায় বাংলা ছন্দ বিষয়ক প্রবন্ধে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করেন যে অক্ষর সংখ্যা দিয়ে মিশ্রবৃত্তের ধ্বনি বা মাত্রা পরিমাণ নির্ধারণ সম্ভব নয়। কারণ রুদ্ধদলের উচ্চারণ এ-রীতিতে কখনও সংকুচিত আবার কখনও প্রসারিত হয়।[৪] তবে হস্ মধ্যপদের রুদ্ধদলের একমাত্রকতা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেননি। কারণ হস্‌মধ্যপদ আসলে মেলে চলিত ভাষায়, বিশেষ করে ক্রিয়ায়। তাই এ-সব সাধুছন্দে (কলাবৃত্ত ও মিশ্রবৃত্ত) মানানসই নয়।[৫] পরে অবশ্য এই বিশিষ্টতাটি তাঁর স্বীকৃতি লাভ করে।[৬] পরিশেষ কাব্যে (১৯৩২) চলতি ক্রিয়াপদের ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথ পদমধ্যস্থিত হসন্ত বর্ণকে একমাত্রা রূপে গণ্য করেছেন। অর্থাৎ তার সংশ্লেষণ ধর্মিতা মেনে নেননি। যেমন—

> সে না হলে বিরাটের নিখিল মন্দিরে
> উঠত না শঙ্খধ্বনি,

মিলত না যাত্রী কোনো জন,
আলোকের সামমন্ত্র ভাষাহীন হয়ে
রইত নীরব।
—পরিশেষ : 'প্রাণ'

এখানে 'উঠত', 'মিলত' ও 'রইত' চলিত ক্রিয়াপদগুলি তিন-তিন মাত্রার। সুতরাং মিশ্রবৃত্তে 'হসন্ত' রুদ্ধ দলের সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ মেনে নিলেও সাহিত্যে তার প্রয়োগ করেননি রবীন্দ্রনাথ। তার জন্য প্রতীক্ষা ছিল আধুনিক কবিদের।

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক' কাব্যের (১৯৩৮-৪০) কয়েকটি কবিতায় তার বলিষ্ঠ প্রয়োগ চোখে পড়ে।—

১। বসন্ত সত্যই আসবে ? কি দরকার এসে
—পদাতিক : 'বার্ষিক'।

২। 'আমরা' কয়েকটি প্রাণী—দু চোখে ঘুমের হরতাল।
—পূর্ববৎ, 'পদাতিক-৪'।

৩। নখাগ্রে নক্ষত্র পল্লী, ট্যাঁকে 'টুকরো' অর্ধদগ্ধ বিড়ি।
মাংসের দুর্ভিক্ষ 'নইলে' ঋষি মনে হতো হাব-ভাবে।
—পূর্ববৎ, 'নির্বাচনিক'।

লক্ষ করলেই বোঝা যায় এখানে 'আসবে', 'আমরা' 'কয়েকটি', 'টুকরো' ও 'নইলে'র রুদ্ধ দলগুলি সংশ্লেষিত উচ্চারণের। আধুনিক কবিদের মধ্যে সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে এই স্বাভাবিক কিন্তু দুঃসাহসিক প্রয়োগের জন্য ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।[৭]

অতঃপর বাংলা উচ্চারণের এই বৈশিষ্ট্য অন্য কবিদের রচনাতেও দেখা দিতে শুরু করে। আধুনিক কবিদের প্রত্যেকেই মিশ্রবৃত্ত রীতিতে কবিতা লিখেছেন। কারও কারও রচনায় মুক্তকের রূপ বিশিষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। যেমন—

কাছে এলো যোলো কলা চাঁদ শূন্যে দুলে
পূর্ণিমায়,
প্রতিবেশী জ্বলন্ত আকাশী ;
নিঃসঙ্গের সঙ্গতার সোনার অলিন্দে রেখে যায়,

পাতা-খোলা বই ভুলে
দেখো চেয়ে মৃত্তিকার অধিবাসী।
—অ. চক্রবর্তী, ঘরে ফেরার দিন : 'সান্নিধ্য'

মিলের ধারাবাহিকতা নেই। এই জাতীয় মুক্তকে বুদ্ধদেব বসুও কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

এ-যুগের সনেটের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ হল চোদ্দ মাত্রার পঙ্‌ক্তি আয়তনের অভিরুচি মতো হ্রাস-বৃদ্ধি। অভিপ্রায় মত কবিরা যেমন একদিকে দশমাত্রার পঙ্‌ক্তি ব্যবহার করেছেন, অপর দিকে তেমনি ছাব্বিশ মাত্রা পর্যন্ত দীর্ঘ পঙ্‌ক্তিও রচনা করেছেন। দশমাত্রার পঙ্‌ক্তির একটি সনেট :—

আমাদের পরিবর্তনের
অর্থ ; এই দেহ ম্রিয়মাণ ;
দ্যুতিময় অন্তর উত্থান
তাও শুধু পিতৃহননের
নান্দী পাঠে ফাল্‌গুন ফুরায়।
কৈশোরের মঞ্জু মুখোশ
ঢেকে রাখে জরার আক্রোশ
প্রগতির দৃপ্ত পাহারায়
অবিরাম চলে অধঃপাত
বাঁচে শুধু, যা তোমার হাত
চিরকাল মূর্ছার কন্দরে
রেখে দিয়ে, করে উন্মোচন—
রূপান্তর থেকে রূপান্তর—
পৃথিবীর প্রথম যৌবন।
—বু. বসু, আ. বা. কবিতা : 'স্মৃতির প্রতি'

প্রবহমানতার আভাস ক্ষীণ হলেও মিলের ক্রম অক্ষুণ্ণ আছে। এই জাতীয় সনেট বাংলায় সম্ভবতঃ এইটি প্রথম।

মিশ্রবৃত্ত রীতির ছন্দে সনেট রচনায় বিশিষ্টতা এনেছেন—জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কবিগণ। মুক্তক বন্ধে এমন কি গদ্য ছন্দেও সনেট লিখেছেন পরবর্তী যুগে কোনো কোনো

কবি।[৮] রবীন্দ্রনাথের আদর্শে সনেট 'আগে কবিতা পরে শিল্প'-এ ধারাটির অনুসরণে কবিরা সনেট রচনায় যে স্বাচ্ছন্দ্য দেখিয়েছেন তাতে একদিকে সনেটের অহেতুক অনড় বন্ধন যেমন খসে পড়েছে, অন্যদিকে রচনার ভাষা হয়ে উঠেছে গদ্যধর্মী।

দলবৃত্ত রীতি (Syllabie Style)

দলবৃত্ত নিয়ে বিচিত্র পরীক্ষার-নিরীক্ষার কাজ রবীন্দ্রনাথই সুসম্পন্ন করে দিয়েছেন—বলা যায়। এ-যুগের কবিরা কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে নানাভাবে তাঁকে অনুসরণের চেষ্টা করেছেন। তাঁরা প্রবহমান দলবৃত্তকে গভীরভাবের ছড়ার বাহন রূপে ব্যবহারে বিশিষ্টতা দেখিয়েছেন। কেউ কেউ আবার প্রবহমান দলবৃত্তে সনেটও লিখেছেন :—

পাঞ্জাবীতে ইস্ত্রি রেখো কড়া
ছাঁটা চুলে যত্নে এঁকো টেরি ;
লোকে দেখে ভাবুক 'আমাদেরই'।
নয়তো ঝড়ে ছিঁড়বে দড়িদড়া।
　　সামনে তোমার অনেক আছে ফাঁড়া
　　আক্রমণ, কাফের করতালি,
অবসাদের মলিন জোড়াতালি।—
　　চতুর মন, ছদ্মবেশ ছাড়া।
ঢাল তলোয়ার আর কি তোমার আছে,
যত্নে যার বানের জলেও বাঁচে
ভ্রূণের মতো, অকথ্য সে আগুন,
　　আর তাছাড়া সত্যি যদি উনুন
　　রাঙিয়ে তোলে নিঃশ্বাসের হাওয়া—
　　আর কেন বা বিজ্ঞাপনের ধোঁয়া।

—বু. বসু. শ্রেষ্ঠকবিতা : 'এক তরুণ কবিকে'

দশমাত্রার আয়তনের পঙক্তিতে লেখা এই দলবৃত্ত সনেটটির মিল বিন্যাস

এবং পর্ব গঠনে অভিনবত্ব আছে। বুদ্ধদেব বসুর পূর্বে উদ্ধৃত মিশ্রবৃত্ত সনেটটির সঙ্গে এর পঙ্ক্তি আয়তন এবং প্রথম দশ পঙ্ক্তির মিলের ক্রম একই। এই সনেটটির সঙ্গে হিন্দী কবি সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী 'নিরালা'র দশমাত্রার পঙ্ক্তির দলবৃত্ত সনেট—'বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতকে প্রতি'—তুলনীয় (দ্রষ্টব্য বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া ও হিন্দী কবিতার যোগাযোগ, পৃ. ১১৭)।

মিশ্রবৃত্তের মতোই দলবৃত্ত কবিতাও প্রায় গদ্যধর্মী হয়ে উঠেছে দেখা যায়। কারণ এই গদ্যধর্মিতা-আলোচ্য যুগের কবিতার একটি বিশেষ লক্ষণ। উদাহরণ—

চিনি তো জল, আকাশ মাটি
মরণ-ভীরু রৌদ্রপায়ী জানী প্রাণের লীলা ;
হঠাৎ যেন এসব চেনার অতীত
গিরির গহন হৃদয় থেকে
উৎসারিত নিকশ কালো কোমল বিকিরণে
পেলাম আরেক দিশা।

—প্রেমেন্দ্র মিত্র, ফেরারী ফৌজ : 'সুড়ঙ্গ'

গদ্যধর্মী অসম পঙ্ক্তিক কবিতাটি দলবৃত্ত রীতির অমিল মুক্তকরূপে গণ্য হতে পারে।

বঙ্গ ভাষাভূমির স্বাভাবিক ফসল হল ছড়া। ছড়া এতদিন লঘু-ভাবের বাহন রূপে শিশুমনকে এবং প্রাসঙ্গিকভাবে সকলের মনকে আনন্দ দিয়ে এসেছে। এই ছড়ার ছন্দটি বা দলবৃত্ত সাধু-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা পায় রবীন্দ্রনাথের হাতে। কিন্তু ছড়া রইল অবহেলিত। রবীন্দ্রনাথ 'ছড়া', 'ছড়ার ছবি' প্রভৃতি বই লিখলেও তার শক্তি ও সৌন্দর্যের বিশেষ দিকটি থেকে গেল অনাবিষ্কৃত। এই প্রত্যাশিত কাজটি করলেন অন্নদাশংকর রায় (১৯০৪)। তিনি ছড়ার যথার্থ রূপায়ণ ঘটিয়ে তাকে সাধুসাহিত্যে প্রতিষ্ঠা দিলেন। কলাবৃত্ত ও দলবৃত্ত উভয় রীতিতে ছড়া লেখা হলেও দলবৃত্তের ছড়াই অধিকতর স্বাভাবিক সার্থক মনে হয়।—

তেলের শিশি ভাঙলো বলে
খুকুর পরে রাগ করো

তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করো।
তার বেলা !
—অা. বা. কবিতা : 'খুকু ও খোকা'।

অন্নদাশংকরের ছড়ার কবিতা রচনার এই অভিনব প্রথা অচিরেই জনপ্রিয়তা লাভ করে। অন্য কবিও এইভাবে ছড়ায় কবিতা লিখেছেন। যেমন—

আমরা যেন বাংলা দেশের
চোখের দুটি তারা।
মাঝখানে নাক উঁচিয়ে আছে,
থাকুক গে পাহারা।
দুয়োরে খিল। টানদিয়ে তাই
খুলে দিলাম জান্‌লা।
ও পারে যে বাংলা দেশ
এ পারেও সেই বাংলা।
—সু. মু. কবিতা : 'পারাপার'

এ-রচনায় কয়েক স্থলে ছন্দোগত শৈথিল্য থাকলেও তাতে সৌন্দর্যহানি ঘটেনি। বরং তা আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। কারণ এই শৈথিল্য বাংলা ছড়ার স্বভাবজাত সঙ্গী।

আধুনিক কবিগোষ্ঠীর উত্তরসূরীদের কেউ কেউ দলবৃত্তের প্রবহমান মহাপয়ারবন্ধও রচনা করেছেন। এ-জাতীয় রচনার একটিমাত্র নিদর্শন মেলে সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যে। সেটি হল—"যারা আমার সাঁঝসকালের গানের দীপে জ্বালিয়ে দিলে আলো…" ইত্যাদি। সুতরাং নবীনতম কবিদের প্রয়াসে বাংলা ছন্দের অভাবের ক্রমে ক্রমে পূর্তি ঘটবে—এটা খুবই আনন্দ এবং প্রত্যাশার কথা।

একই কবিতায় একাধিক ছন্দোরীতি প্রয়োগের প্রবণতা দেখা গিয়েছিল একসময় রবীন্দ্রনাথের মধ্যে।* সত্যেন্দ্রনাথ দত্তর 'দূরের পাল্লা' এই জাতীয় কবিতা। অমিয় চক্রবর্তীর 'অভিজ্ঞান বসন্ত কাব্যের' 'অভিজ্ঞান' এবং বিষ্ণু দে'র 'চোরাবালি কাব্যের' 'ওফেলিয়া' কবিতাও এই জাতীয় রচনা। একই কবিতায় বিভিন্ন রীতি, একই রীতির বিভিন্ন পর্ব, সমিল প্রবহমান ও অমিল প্রবহমান

প্রভৃতি রূপের সমাবেশে ছন্দের উপভোগ্যতা বাড়ে। বিভিন্ন রীতির মিশ্রণ এমন কি বিভিন্ন কবির ভিন্ন ভিন্ন রীতির কবিতা পঙ্‌ক্তির সহযোগে কবিতা রচনার প্রবণতাও দেখা যায় এই যুগে। অনুরূপ একটি নিদর্শন—

> পাঁচ মিনিট, পাঁচ মিনিট মোটে
> 'কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও ?'
> 'উদ্দাম উধাও'
> ট্রেন এলো বলে হাওড়ায়।
> ওপরে স্টক এক্সচেঞ্জের এপারে রেলওয়ের হাওড়া
> 'তারি মধ্যে বসে আছেন শিবসদাগর।'
> ট্যাক্সির হৃদস্পন্দনের ট্রাফিকের এটাফসিয়ায়…
> 'হায় রে আশার ছলনে ভুলি',
> কোথায় তুমি। ট্রেন তো এলো।'
>
> —বিষ্ণু দে, আ. বা. কবিতা : 'টপ্পাঠুংরি'।

বিষ্ণু দে দলবৃত্ত ছন্দের রচনায় মাঝে মাঝে অন্য কবির মিশ্রকলাবৃত্ত ও দলবৃত্তের পঙ্‌ক্তি সন্নিবিষ্ট করে অভিনবতা এনেছেন। এই প্রবণতা আরো কোনো কোনো কবির মধ্যেও লক্ষিত হয়।

এই হল অতি সংক্ষেপে রবীন্দ্রপরবর্তী সুপরিচিত ও সুনিয়মিত বাংলা ছন্দের পরিচয়।

গদ্যকবিতা

আধুনিক কবিদের রচনার একটি বিশিষ্ট বাহন হল গদ্যছন্দ। রবীন্দ্রপ্রবর্তিত গদ্য-কবিতার ধারায় নানাপ্রকার বৈচিত্র্য সংযোজিত হয়েছে এ-যুগে। জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু ও বিষ্ণু দে প্রমুখের গদ্যকবিতা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। তাঁদের রচনায় ছোট বড়ো বাক্‌-পর্ব, পদ্যছন্দের পঙ্‌ক্তি এবং বিদেশী শব্দগুচ্ছ প্রভৃতির সমবায়ে অভিনবতা সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ করা যায়। একটি উদাহরণ—

একটা অদ্ভুত শব্দ।
নদীর জল, মচকা ফুলের পাপড়ির মতো লাল।
আগুন জ্বললো আবার—উষ্ণ লাল হরিণের মাংস তৈরি হয়ে এলো।
নক্ষত্রের নীচে ঘাসের বিছানায় বসে অনেক পুরানো শিশির ভেজা গল্প;
সিগারেটের ধোঁয়া;
টেরিকাটা কয়েকটা মাথা;
এলোমেলো কয়েকটা বন্দুক—হিম নিস্পন্দ অপরাধ ঘুম।
—জী. প্রে. কবিতা: 'শিকার'।

সহজ মুখের ভাষা সুলভ ভঙ্গিতে চিত্রধর্মী ভাবানুসারী বাক্‌পর্ব রচনাটিকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। এক-এক জন কবির গদ্য কবিতায় এক-এক প্রকার বিশিষ্টতা সত্যই লক্ষ করার মতো।

আলোচ্য যুগে ইংরাজি ফরাসি প্রভৃতি য়ুরোপীয় ভাষার কবিতা বাংলায় অনূদিত হয়েছে। এই অনুবাদের মাধ্যমে বিদেশী কবিতার নানা রূপ-আকৃতি বাংলায় দেখা দিতে শুরু করেছে। ধীরে ধীরে কবিরা সহজ সাবলীল ভাবে সেগুলির বাংলায় ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছেন। এইভাবে অমিয় চক্রবর্তীর রচনায় ছন্দের আলপনা, বিষ্ণু দের কবিতায় 'ভিলানেল' 'ব্যালাড', 'সেসটিনা', 'ট্রিয়োলেট' এবং অন্নদাশংকরের ছড়ায় 'লিমেরিক' প্রভৃতি বিদেশী কবিতার রূপ সুস্পষ্ট হয়ে যেন বাংলা হয়ে উঠেছে।

অগ্রজদের অনুসরণে তরুণ কবিসম্প্রদায়ও বাংলা কবিতা এবং ছন্দে বৈচিত্র্য আনতে গিয়ে সুষমা ও মাধুরীর বদলে কবিতায় বলিষ্ঠতা, ঋজুতা এবং অপেক্ষাকৃত নীরসতাকে গুরুত্ব দিতে শুরু করেছেন। তাই গদ্যকবিতা ক্রমে ক্রমে যেন নিছক গদ্যে পর্যবসিত হয়ে পড়েছে। ফলে এই জাতীয় কোনো বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে কবিতা-পংক্তি রূপে চেনা যায় না। সুতরাং কবিতা ও ছন্দ কবিতার অংশবিশেষকে দুইই কতদূর স্বধর্মভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে তা সহজেই অনুমেয়। আমাদের আলোচ্য পদ্যের ছন্দ অর্থাৎ সুমিত-নিয়ন্ত্রিত ও শিল্পিত ছন্দ। কাজেই গদ্য কবিতা সম্পর্কে বেশি কিছু না বলাই শ্রেয়। তরুণ কবিদের রচনায় আরও কয়েকটি লক্ষণীয় প্রবণতা পাওয়া যায়। যেমন—

(১) বক্তব্যকে জোরাল করার উদ্দেশ্যে একই ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছের পুনরুক্তি। তাতে চমক এলেও একঘেয়েমিতে কবিতার উদ্দেশ্য মার খায়।

(২) গদ্য কবিতাতেও মিল-রচনা। তাতে অভিনবত্ব চোখে পড়লেও গুরুত্ব কিছুমাত্র বাড়ে না।

(৩) চোদ্দো পঙ্‌ক্তির কাঠামোতেই সনেটের অন্যান্য বিধিকে অগ্রাহ্য করে চতুর্দশপদী রচনার স্বাধীনতা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সনেটের প্রকৃতি অক্ষুণ্ণ থাকায় বৈচিত্র্য এসেছে।

(৪) গদ্যছন্দ, ভাঙা-ছন্দ ও ছন্দোহীনতার অসারতা উপলব্ধি করে সুস্পষ্ট পদ্যছন্দের দিকে পুনঃ আকর্ষণ-বোধ। তবে ছন্দের পুরনো রূপকে যথাসম্ভব পাশ কাটিয়ে নতুন রূপ-ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস। রবীন্দ্রনাথ গদ্যছন্দ রচনাকালে বা পরবর্তীকালে পদ্য-ছন্দের প্রয়োগ ত্যাগ করেন নি। কিন্তু তার রূপ আর পূর্বের মতো থাকেনি। তরুণ কবিগোষ্ঠীর এই নবীন প্রবণতা উল্লেখযোগ্য হলেও তাতে তেমন বৈচিত্র্য এবং আকর্ষণের সংযোগ ঘটেনি, অবশ্য তার ব্যতিক্রমও আছে।

লক্ষ করলে দেখা যায়—পাশ্চাত্য কবিতা ও ছন্দের আদর্শে আধুনিক কবিরা বাংলা ছন্দে বাক্‌ধর্মী উচ্চারণকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। কিংন্তু বাংলা ভাষায় যেমন সংস্কৃত-উচ্চারণ খাপ খায়না তেমনি পাশ্চাত্যধর্মিতাও 'বিদেশী—বিদেশী ঠেকে। তাই বাংলা ভাষার স্বাভাবিক শক্তি, সৌন্দর্য ও অন্তঃপ্রকৃতির উপর ভিত্তি করে বাংলা ছন্দের নূতন শক্তি সুষমা আবিষ্কারের প্রয়াসী তাঁরা হন নি। তাঁদের অনুজ কবিসম্প্রদায়ও আজ পর্যন্ত এমন কিছু নতুনত্ব আনতে পারেননি যা স্থায়ী মর্যাদা পেতে পারে। তবে পদ্য-ছন্দের আকর্ষণ যেন আবার ফিরে আসছে এটা আশার কথা। কবিতায় ছন্দ-শিল্পের সার্থকতা আবার তার উপযোগিতা স্পষ্ট করে তুলছে। আশা করা যায়, বাংলা ছন্দ নিয়ে আবার নানাপ্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হবে এবং যথার্থ প্রতিভার স্পর্শে তার ভিতরের শক্তি ও সৌন্দর্য নতুনভাবে ফুটে উঠবে। তাতেই প্রমাণিত হবে বাংলা ছন্দের স্বাভাবিক বিশিষ্টতা অভিনব বিচিত্রতা এবং ছন্দশিল্পীর চারিত্রিক মৌলিকত্ব।

অসমীয়া ছন্দের সাম্প্রতিক প্রবণতা ও ভাবী সম্ভাবনা

আমরা লক্ষ করেছি চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা, অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরী, রত্নকান্ত বরকাকতি, নলিনীবালা দেবী প্রমুখের কবিতায় অসমীয়া ভাষার

প্রকৃতিসুলভ সুস্পষ্টপদ্যছন্দেরই প্রাধান্য। প্রবহমান-মুক্তক প্রভৃতি বদ্ধ এবং গদ্য-ছন্দের প্রবর্তন ঘটলেও তার পরিমাণ তুলনায় কম। আপাতভাবে গদ্য কবিতারই প্রাধান্য চোখে পড়লেও, যথার্থ গদ্য কবিতার সংখ্যা কমই। ছন্দোরীতি অক্ষুণ্ণ রেখে বদ্ধ এবং অন্যবিধ প্রয়োগের দিক থেকে বাংলা ছন্দে যে পরিবর্তন দেখা দেয় বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে, পাশ্চাত্য ও বাংলার আদর্শে অনুরূপ অভিনবতা দেখা গেল অসমীয়া তথা ওড়িয়া কবিতার ছন্দে চতুর্থ-পঞ্চম দশকে। অসমীয়া সাহিত্যে যে সব নবীন কবির আবির্ভাব ঘটে তার পরিচয় ফুটে উঠল 'জয়ন্তী' পত্রিকায়। কমল নারায়ণ দে ও চক্রেশ্বর ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'জয়ন্তী' (১৯৩৬) পত্রিকায় ভবানন্দ দত্ত ও অমূল্য বরুয়া প্রমুখ প্রগতিবাদী যুবক কবির পরিচালনায় রোমাণ্টিক, বাস্তববিমুখ, কল্পনাশ্রিত কাব্যের বিরুদ্ধে ক্রান্তিকারী চেতনা ও সমাজবাদী-বাস্তব ধারণার বাহক রূপে নতুন ভাব, ভাষা, ছন্দ ও প্রকাশভঙ্গি নিয়ে দেখা দেয় প্রগতিধর্মী কবিতা। স্বল্পায়ু কবি অমূল্য বরুয়ার[১০] 'বেশ্যা', 'কুকুর' ও 'কয়লা' প্রভৃতি রচনায় নব অসমীয়া কবিতার বীজ অঙ্কুরিত হয় নীরবে অনেকটা অলক্ষে।

'জয়ন্তী গোষ্ঠী' (১৯৩৬-৪৬) অসমীয়া কাব্যে যে অভিনবতা আনে তাতে কবিতার ভাষা মুখের ভাষার দিকে মোড় নেয়। গদ্যছন্দ হয় কবিতার বাহন। মুক্তকের রচনাও অব্যাহত থাকে। অতঃপর 'রামধনু' পত্রিকার পৃষ্ঠায় প্রগতি-বাদের পর প্রয়োগবাদী নব্য 'নবন্যাস' মূলক কবিতার আবির্ভাব ও প্রচার শুরু হয়। 'রামধনুর' পৃষ্ঠাতেই পঞ্চম-ষষ্ঠ দশক ধরে প্রয়োগবাদী কবিতার বিচিত্র রূপ ও সুর সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আসামে কবিদের মধ্যেও একাধিক দল বা গোষ্ঠী গড়ে ওঠে—কবিতার শৈলী, ছন্দ-মিল এবং বিষয় নিয়ে আলোচ্য যুগের মতের ভিন্নতার জন্য। ১৯৩৬ সালের পরবর্তী সম্ভাবনার আভাস নিরূপণই আমাদের বর্তমান লক্ষ্য। অসমীয়া কবিতা যে প্রকৃতির বিচারে সমসাময়িক বাংলা ও হিন্দী কবিতার সমধর্মী তাতে সন্দেহ নেই।

এই প্রসঙ্গে সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথ শর্মার অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন—

> "নতুন কবি সকলে যেনকৈ ন ন উপমা, চিত্রকল্প সৃষ্টি করিছে তেনেকৈ শব্দসম্ভারো আমদানি করিছে। আগর চাম কবিয়ে ব্যবহার ন করা বহুতো সংস্কৃত শব্দই অসমীয়া কবিতাত প্রবেশর অধিকার পাইছে। ও চর-চুবুরিয়া বঙলা কবিতার প্রভাবো অস্বীকার কবি নোওয়রি।

> পুরণি নির্দিষ্ট অক্ষর, পর্ব, যতিস্থাপন আরু মিলযুক্ত ছন্দর ঠাইত মুক্তক ছন্দ আরু স্পন্দিত গদ্যের (Rhythmic Prose) প্রয়োগ আধুনিক কবিতার বিশেষত্ব।
>
> —অসমীয়া সাহিত্যর সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত (১৯৮১), পৃ. ৪৩২।

বলাই বাহুল্য আধুনিক অসম-কবিতার ভাষা যতদূর সম্ভব বাক্‌নির্ভর। তাতে গ্রাম্য ও অব্যবহৃত তৎসম শব্দ, দেশজ ও অন্য ভাষার শব্দে বহুল ব্যবহার হয়েছে। গদ্য ছন্দ ও মুক্তকের সঙ্গে সঙ্গে কলাবৃত্ত, মিশ্রবৃত্ত ও দলবৃত্তের সাধারণ রূপের রচনাও চোখে পড়ে। সনেট, ব্যালাড, মনোলগ প্রভৃতি বিদেশী কবিতা-রূপের সাক্ষাৎও পাওয়া যায়। গদ্য কবিতার পাশা-পাশি নিছক গদ্যে লেখা কবিতারূপও মেলে।[১১] তবে এইসব অত্যাধুনিক ছন্দোরূপের সাহায্যে কবিমনের সব রকমের ভাব প্রকাশ কঠিন, তাই সুস্পষ্ট পদ্যছন্দের দিকে নতুন করে ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। অসমীয়া কবিতার নবীন কবিদের মধ্যে হেম বড়ুয়া (১৯১৪-১৯৭৭), নবকান্ত বড়ুয়া (১৯২৬), হরি বরকাকতি (১৯২৯), হোমেন বর গোহাঞি (১৯৩১), মহিম বরা (১৯২৬), কেশব মহন্ত (১৯২৬), হীরেন ভট্টাচার্য (১৯৩২-) মহেন্দ্র বরা (১৯২৯-), বীরেশ্বর বরুয়া (১৯৩১-) এবং নীলমণি ফুকন (নবীন, ১৯৩৩)—প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রবীণ কবি দেবকান্ত বড়ুয়াও নব্যকবিতা রচনায় আগ্রহ দেখিয়েছেন। এবার আলোচ্য যুগের অসমীয়া কবিতার ছন্দের বিশেষ প্রবণতার বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

কলাবৃত্ত (Moric Style)

অন্যান্য ভারতীয় ভাষার মতোই অসমীয়াতেও কলাবৃত্ত রীতির ষট্‌কলপর্বের রচনাই সর্বাধিক হয়। পঞ্চকল ও সপ্তকল পর্বের রচনা কম, তার বৈচিত্র্য এবং আকর্ষণও কম। তবে বাংলার মতোই ছন্দোবৈচিত্র্য অসমীয়াতেও যে সম্ভব তা মানতেই হবে। এখানে আমরা কবি মহেন্দ্র বরার রচনা থেকে দুইটি উদাহরণ উদ্ধৃত করছি।—

পঞ্চকল পর্ব—

দিনতে আজি আহিব খুজি
নাহিলা কিয় নেপালো বুজি
খবর দিলা সন্ধ্যাবেলা
তোমার অহা বন্ধ বুলি।
ফুলিব খুবি হাস্নাহানা
এনেয়া কিঅ সরীল জানা
উরি কি হব নাহিলে তুমি
বতাহ ভরি গন্ধধূলি ॥

—অসম ছন্দর মূল ভিত্তি (১৯৭৭), পৃ. ৬৬।

এটি পঞ্চকল পর্বিক চল্লিশ মাত্রার চৌপদী পঙ্‌ক্তির রচনা।

সপ্তকল পর্ব—

বাজিছে মৃদঙ্গ বাজিছে ডম্বরু
নাচে মহানন্দে নাচে রঙ্গনাথ,
লুপ্ত ধীরে ধীরে লাস্য তরলিত
প্রলয় তাণ্ডবে আনে উল্‌কাপাত।

—পূর্ববৎ, পৃ. ৭২।

কবিতাটিতে রুদ্ধদলের আধিক্যজনিত ধ্বনি ঝংকার বেশ অনুভূত হয়। কিন্তু কবিতা খণ্ড রূপে এই জাতীয় রচনার সার্থকতা কম, সপ্রয়াস রচনা। অতিপর্বের সাহায্যে ধ্বনি বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রবণতা এ-যুগেও লক্ষিত হয়। একটি উদাহরণ :—

কালি রাতি মেঘে গাজি ছিল
মোর সিরাই সিরাই বিজুলী বেগরে
নামি আহি ছিল শেষ বরিষার মেঘ।
কালি রাতি মেঘে গাজিছিল
কার কুমারী কেশর অগাধ এন্ধারে
ঢাকি রাখিছিল গোলাপ রঙের তেজ।
কালি গোটেই রাতি মেঘে গাজিছিল,
মোর সিরাই সিরাই শেষ বরিষার মেঘ ॥

—হীরেন ভট্টাচার্য, সুগন্ধি পখিলা : 'সিরাই সিরাই'।

এই রচনায় কবি ৬ মাত্রার পর্বের সঙ্গে ৪ ও ২ মাত্রার অপূর্ণ পর্ব এবং দুই মাত্রার অতিপর্ব সন্নিবিষ্ট করে নতুনত্ব এনেছেন। তিন-তিন পঙ্‌ক্তির ত্রিক (Triplet) রচনার প্রয়াসও লক্ষণীয়। ত্রিকের পঙ্‌ক্তি তিনটিতে যথাক্রমে ১০, ১২ ও ১৪ মাত্রার বিন্যাস, স্তবক জোড়ায় যথানুক্রমিক মিল এবং ত্রিকের দ্বিতীয় ও শেষ দুই পঙ্‌ক্তির প্রারম্ভে অতিপর্ব—সব কিছুতেই অভিনবতার ছাপ বিদ্যমান।

এ-যুগেরও কবিদের কবিতায় কলাবৃত্ত রীতির প্রবহমান বন্ধ রচনার প্রয়াস নেই। তবে মুক্তকের অমিল ও সমিল রূপ ফুটে উঠেছে কোনো-কোনো কবির রচনায়। যেমন—

ষট্‌কল পর্বিক অমিল মুক্তক :—

জীবন সাঁকোতে করেনো নাবিকে মুকুতা বিচারি পাই
চমকি দমকি রল কোনো নাই নাই সারে আছে মাখো
হেজার প্রিয়ার চকুর লোতক গোট মারী হোওয়া
আকাশর চেঁচা জোন কত বাট রুওয়া এই বাটে গল
কতবার আসি পঁজা সাজি রল তোমার মরমী ছাঁত
সীমা জানো আছে তার
চাকির শিখাত জানো চগার হিসাপ লিখা থাকে।
—হরি বরকাকতি : 'প্রিয়ার চিঠি'।

এখানে চরণে ৮ থেকে ২০ পর্যন্ত মাত্রা আছে। যুক্তবর্ণাশ্রিত রুদ্ধদলের অভাব লক্ষণীয়। তাই ষট্‌কল পর্বিক মিশ্রবৃত্ত মুক্তক রূপে ভুল করার সম্ভাবনাও থেকে যায়।

ষট্‌কল পর্বিক সমিল মুক্তক :—

আকাশ তোমার নীলা রঙ মোর ব্যথারে
আরু নীলা করি করুণ করার কামনা
ক্ষমা করা আজি দুখার দুখর কথারে
আত্মরতির বিলাসর দিন গণা
কালপুরুষর তরোওয়ালে ললে কেঁচা সূর্যর কক্ষপথত শাণ
ধঁউসী নিশার উল্‌কার জুই আবেলির কবিতাত

বন্ধ্যা আনর গুহাত বিচারি প্রাণ ওষধির অনুপান
বিকল বেজালি তোমার নীলিম নিয়রর কণা দিয়া তাত।
—নবকান্ত বড়ুয়া, প্রার্থনা : 'আকাশর প্রতি'।

এই মুক্তকে ১৪ থেকে ২৬ মাত্রা পর্যন্ত দীর্ঘ চরণ আছে।

একই কবিতায় ৪, ৫, ৬ ও ৭ মাত্রার পর্ববিন্যাসে মুক্তক রচনা এ-যুগের অসমীয়া কবিতার আর একটি লক্ষণীয় বিশেষত্ব। একটি দৃষ্টান্ত :—

মোর বুকুত
এ জোপা গোলাপ
কোন্ রুলে?
তেজত এটোপা আঁতর ঢালি
হৃদয় কোনে চুলে?
তোমার কথা ভাবিলে
অকালে অঞ্চলে,
তরাই তরাই কথাপাতে
গোলাপের পাহে পাহে।
জোনাকীর জাক জলে
মোর তেজর কোঁহে কোঁহে।
মোর বুকুত
এ জোপা গোলাপ কোনে রুলে?
—হীরেন ভট্টাচার্য, সুগন্ধি পখিলা : 'এ জোপা গোলাপ'।

কেবল বিভিন্ন মাপের পর্ব ই নয়, মিল রচনার কৌশলও বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

মিশ্রবৃত্ত রীতি (Mixed Moric Style)

আলোচ্য-পর্বের তরুণ কবিমহলে মিশ্রবৃত্ত রীতির ছন্দে বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রবণতা লক্ষিত হয়। সনেট, মহাসনেট ও মুক্তক রচনা করেছেন কবিরা। ভাষা হয়ে উঠেছে বাক্‌ছন্দাভিমুখী। যে প্রবণতা সমসাময়িক অন্য ভাষার কবিতাতেও

লক্ষিত হয়।

সাধারণ ছন্দোবন্ধেও বৈচিত্র্য আনতে প্রয়াসী হয়েছেন কেউ কেউ। তবে সে প্রয়াস সব সময় যে প্রশংসনীয় হয়েছে তা বলা যাবে না। যেমন—

একপদী—৪+৪=৮ মাত্রা।

পথত পথিক চলে—
বাছ চলে ট্রাম চলে
রেল চলে প্লেন চলে—
বাতরি কাকত চলে
পথে পথে কথা চলে
অধীর জনতা চলে
নেতা চলে মুখ চলে
বাতরি কাকত চলে
কথা চলে মুখ চলে
চরৈবেতি ! চরৈবেতি !

—ভবেন বরুয়া : সোনালী জাহাজ : 'চরৈবেতি'

বাক্‌ছন্দাশ্রিত সমমিলের এই একপদী রচনা সহজেই অভিনবতার আস্বাদ দেয়। তবে 'চলে'-র আতিশয্যে একঘেয়েমি অনুভূত হওয়া বিচিত্র নয়।

মহাসনেট একটি (১৮ মাত্রার) :—

সন্ধ্যা যেন গোপনে মৌনত নামে ধোঁওয়ার রেখাত :
আকুল মনর মুদ্রা কঁপি যায় গহন-জলর
গভীরত, লাহে লাহে, আরু যেন নীরব মনর
ছায়াবোর নামি যায় ঘন হৈ নিজরে মৌনত।
একো নাই ; একো নহে ; মনে যেন নিজর মৌনকে
শুনিরয়। একো নাই : নামি না হে গহন জলত
যতাহর ভার। আকাশেদি ধোঁওয়া লৈ ডেউকাত
কোনো নাহে। ভয় করে মনে যেন নিজর মুদ্রাকে।
কিমান দীঘল রাতি, কিমান নীরব হাত তার—
ছায়াবোরে না পায় উমান : মুদ্রার কঁপনি বোরে

নিদিয়ে সন্ধান, কোনো-কিমান গধূর জলভার।
মনে যেন শুনি রয় ভয়ে ভয়ে নিজরে মৌনক ;
না বাহে পাখির ধ্বনি : কোনো নাহে জলর পথেরে :
গোপন মুদ্রাই মাথো মাতি আনে মৌন ধুমুহাক।
—ভবেন বরুয়া : সোনালী জাহাজ : 'ধুমুহার প্রান্তত'।

চার-চার ও তিন-তিনের অর্থাৎ দুইটি চতুষ্ক ও দুইটি একের স্তবক ভাগ এবং ক খ খ ক ; গ ঘ ঘ গ ; চ ছ চ, জ ছ জ—ক্রমে মিল এবং মৌন, মুদ্রা প্রভৃতি শব্দের বার বার ব্যবহার লক্ষণীয়।

অমিল মুক্তক :—

কিন্নর বিষণ্ণ আলাপ যেন—
সন্ধ্যা আকাশত শুনা গল
বেতারর গুঞ্জনত উরি অহা দূর শব্দ রেখা !
অয়ি, 'শব্দময়ী অপ্সরী রমণী' ?
গোমা পোহরত
উরে সেয়া কার যেন সংকুচিত কপালর রেখা ?
'সন্ধ্যা রাগে জিল-মিল' চকু।
—পূর্ববৎ : 'বলাকা'।

ছয় থেকে আঠার মাত্রার চরণের এই মুক্তকের নাম এবং রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যের অনুরূপ রচনার পঙ্ক্তি ও শব্দ ব্যবহার লক্ষ্য করার মতো। এ-যুগের অসমীয়া কবিদের মধ্যে ও বাংলার সমসাময়িক কবিদের মতো বিভিন্ন কবির (এমন কি বাংলারও) কবিতা পঙ্ক্তি সন্নিবেশের সাহায্যে বৈচিত্র্য-সৃষ্টির প্রয়াস বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

সমিল মুক্তক :—

জীবনত কোনো দিন মোর আইতাই
পদ্মাশালী দেখা নাই,
পার হোওয়া নাই কোনো দিন নিজর গঁওয়ার থেক সীমা।
কিন্তু কতদূর সমুদ্রর অগাধ নীলিমা,

অনন্ত শুভ্রতা চির-তুষারর,
আসমুদ্র হিমাচল ভারত বর্ষর,
আইতার পরিচিতা। যত সিবোরর স্থান
ভূগোলত, আইতার নাই সেই জ্ঞান।
—হোমেন বরগোহাঞি : 'মোর আইতা'।

এখানেও আট থেকে বিশ মাত্রার পঙ্‌ক্তিবন্ধ রয়েছে। আলোচ্য যুগের তরুণ অসম-কবিগণ বহুল প্রচলিত প্রাচীন মিশ্রবৃত্তে ভাষাকে মৌখিক আদলে রূপায়িত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। তাতে অনেকে সফলকামও হয়েছেন। রূপের বিচারেও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। এ-যুগের মিশ্র কলাবৃত্তে এটাই লক্ষ করার মতো।

দলবৃত্ত রীতি (Syllabic Style)

দলবৃত্ত বা লৌকিক রীতির প্রয়োগ অসম-কবিতায় প্রাচীন এবং জনপ্রিয় হলেও আধুনিক যুগে এই রীতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রয়াস খুব একটা দেখা যায় না। তবে সাধারণভাবে রীতিটি ব্যবহার করছেন কোনো কোনো কবি। অসম-ভাষাতে দলবৃত্ত রীতিতে প্রবহমানতা আনা বা মুক্তক রচনার প্রয়াস দেখা যায় নি।[১২] সম্ভবতঃ অন্য দুই রীতি, বিশেষ করে মিশ্র-বৃত্তের প্রয়োগ প্রাধান্য এবং গদ্যকবিতার বাহন গদ্যছন্দের সহজতা দলবৃত্তের আকর্ষণ এবং উপযোগিতাকে ম্লান করে তুলেছে। যাইহোক আলোচ্য যুগের কবিদের রচনা থেকে দলবৃত্তের দুই-একটা উদাহরণ দেখা যাক্।—

দলবৃত্ত দ্বিপদী :—

আছে এজনী ডাইনী তাই
ঠিক সন্ধ্যাবেলা
বুকুত মোর মন্ত্র শুনাই
নদীত করে খেলা
নাওয়ে করে টুলুং ভুটুং
বঠাই করে বাঁও :

আধা বুজো মন্ত্র তোমার
হে ডাইনী মাও।
সন্ধ্যামণি ! সন্ধ্যামণি !
হাত্তত বঠার খেলা,
নদীর পানীত নাও চলে—
বুকুত সন্ধ্যাবেলা।

—ভবেন বরুয়া : সোনালী জাহাজ : 'ঠিক সন্ধ্যাবেলা'।

কবি ভাব অনুসারী ছন্দ বেছে নিয়েছেন। লৌকিক ছন্দে মাত্রার কম বেশি হলে তাতে বৈচিত্র্যই আসে। এই অংশটিও তার ব্যতিক্রম নয়। সেই সহজ-সরল মিষ্টি মধুর সুরধ্বনিই-এর বৈশিষ্ট্য। কবি ভবেন বরুয়ার রচনা থেকে আরও কয়েক টিপংক্তি—

মোর বুকুত হীরার আঘাত
মোর বুকুত সুরর আঘাত,
মোর বুকুত হীরার সুর।

—পূর্ববৎ, অমিত বাক্,

কবি ভবেন বরুয়া যুগোচিত ছন্দের রচয়িতা হলেও সুস্পষ্ট পদ্য ছন্দের প্রতিই তাঁর আস্থা বেশি। তাই তিনি যেমন পদ্যছন্দের প্রয়োগ করেছেন, তেমনি তার কৈফিয়তও দিয়েছেন। বলেছেন—

> "গদ্যছন্দ আরু মুক্ত ছন্দর (-যি-এক হিচাবে একপ্রকার মিশ্র ছন্দও) যোগেদি সকলো ধরণর আবেগ অনুভূতির প্রয়োজন পূরণ ন হয় দেখিয়েই হয় তো মোর মনোটা ওয়ে মাজে মাজে মুক্তক আরু সমিল পদ্যগত ছন্দয়ো (অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, আরু স্বরবৃত্তরে—এই তিনিওটা রূপরে) আশ্রয় লৈছে।"

—পূর্ববৎ, অমিত বাক্,

এই অভিমত থেকে কবির ছন্দবিষয়ক মনোভঙ্গি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'মুক্ত ছন্দ' বলতে কবি বিশেষ ছন্দোরীতিও বন্ধের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ বিভিন্ন ছন্দোরীতিও ছন্দোবন্ধের মিশ্রণের কথা বলেছেন। এরকম প্রয়োগ যে এ-যুগে হয়েছে তা আমরা উল্লেখ করেছি যথাস্থানে।

গদ্য ছন্দ

বাংলা ও হিন্দী গদ্য ছন্দের মতো অসম কাব্যেও গদ্য ছন্দের সূচনা পূর্বেই ঘটেছে—সে কথা আমরা জানি। আলোচ্য যুগে গদ্যছন্দ অভিব্যক্তি, রূপ ও শৈলীর বিচারে কিছুটা নবীনতা লাভ করেছে। এই প্রসঙ্গে কবি দেবকান্ত বড়ুআর 'সাগর দেখিছা' রচনাটি স্মরণীয়। তবে বাংলার অগ্রজ কবিদের রচনায় অনুপ্রাণিত হয়ে অসম-কবিরা গদ্য কবিতায় অনুরাগী হন। এই অনুরাগের সাক্ষ্যবাহী হেম বরুআ ও অমূল্য বরুআর রচনা থেকে উদাহরণ :—

আমি ঘোপ মরা ব্ল্যাক-আউট নিশার
হতভাগা ল্যাম্পপোষ্ট।
সিহতে পিন্ধিছে চাহাবী সাজ
খুব পরিপাটি, মজবুত ইস্ত্রি
নায়তো খমখমীয়া পায়জামা
আরু সিল্ক পাঞ্জাবী।
আমার ফটা-ছিটা কাপরর জাজ।
আমি দাড়িয়ে গোঁফে অর্ধনগ্ন জানোয়ার।

—হেম বরুয়া, 'পূজা'।

অসমীয়া গদ্য কবিতার এই প্রাথমিক রূপ আরও স্পষ্ট হয়েছে—পরের উদাহরণে :—

আরু এই সংগ্রাম লিপ্ত কামনার আগত উছর্গিত
থাকী জীবনবিলাকর উন্মত্ত কাম-বুভুক্ষার পথত
তাই এক সামাজিক শৃঙ্খলার শাসক।
কিন্তু সমাজর ধরণীধর দলেই তৈক ভয় করে
আটাইতকই বেচি।
দেশদ্রোহী, জাতিদ্রোহী, সমাজদ্রোহী তাই
অগ্নিক সাক্ষী করি লোওয়া কত পতিব্রতা স্ত্রীর
মদ্যপায়ী জন্তু স্বামীর তায়ে সর্বনাশর হেতু।

—অমূল্য বরুআ : 'বেশ্যা'।

গদ্য যে শিল্পিত হয়ে কাব্যরসের সার্থক বাহন হয়ে উঠতে পারে নিম্নের রচনাটি তার নিদর্শন।—

গোটেই আঘোণ মহীয়া রাতিটো
ইন্দ্রমালতী ফুল বোরে কান্দি আছিল;
উঠি গাই দখিলো গে
গাঁওয়র এটা গধূলির দরে
তোমার হাঁহিটো
তমাল জোপাত ওলমি আছে।
—নীলমণি ফুকন (নবীন): 'ছ'টা বিভিন্ন কবিতা'।

আরও একটি সুন্দর ও সার্থক গদ্যকবিতা—

কান্ধর পরা নমাই থ'লা সপোন। গালে মুখে বিষাদের ছাঁপ
সিতামত সহজ সঁচারকাঠি। শেঁতা মুখত উবুরি খাই পরে
আষাঢ়র অমল পূর্ণিমা। প্রেমর দাবি যে বহুত!
দুখে মোর ঘর হেরুওয়াই কান্দে কবিতার আখরে আখরে।
—হীরেন ভট্টাচার্য 'কবিতার রদ' (১৯৮১), পৃ. ২৮।

সাতের-আটের দশক পর্যন্ত গদ্য ছন্দই অসম-কবিতার প্রধান বাহন রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে বলা চলে। কিন্তু তার পাশা-পাশি পদ্য কবিতাও রচিত হয়েছে বিভিন্ন ছন্দে ও রূপে। সাম্প্রতিক কালে গদ্য কবিতা নানা কারণে তার আকর্ষণ হারাচ্ছে। আর পদ্য কবিতা নতুন করে স্বীকৃতি লাভ করছে। সুতরাং ক্রমে ক্রমে রীতিবদ্ধ ছন্দের প্রয়োগেই অভিনবতা ও যুগোচিত বৈচিত্র্য আনতে প্রয়াসী হবেন নবীন কবিরা তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। দলবৃত্ত রীতিটি তার যথোচিত শক্তি ও সুষমা নিয়ে ফুটে উঠবে এবং অসমীয়া কবিতাকুঞ্জকে ছন্দমাধুরী ও সৌন্দর্যের বিচারে পরিপূর্ণতা দান করবে। এটাই প্রত্যাশিত। তা না হলে অসম কবিতারও ছন্দের উৎকর্ষের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। আলোচনা প্রসঙ্গে ভবেশ বরুয়া যথার্থই বলেছেন—

"অসমীয়া সমাজ বর্তমান কবি বুলিব পরা লোকর সংখ্যাটোও যথেষ্ট সর-মাত্র। কেই জনমানহে কবি আছে। বেছি ভাগরে কবিসুলভ ছন্দজ্ঞান—আধুনিক ছন্দজ্ঞান নাই। আরু এটা ঠরঙ্গা জখলা ভাষা লৈয়েই বহুতে কাম চলাব লাগিছে।"

—গোলাপী-জামুরলগ্ন (১৯৭৭), পৃ. ২৬-২৭।

ওড়িয়া ছন্দের সাম্প্রতিক প্রবণতা ও ভাবী সম্ভাবনা

ওড়িয়াতে মোটামুটি ১৯২১-৩৫ অবধি সময় 'সবুজ যুগ' রূপে চিহ্নিত। তারপর শুরু হল বাস্তববাদিতার আশ্রয়ে সাহিত্যমহলে নতুন-চিন্তাভাবনাও শৈলীর খোঁজ। ফলে কাব্যেও ধ্বনিত হল ক্রান্তিক বিদ্রোহের সুর, আর কাব্যশিল্পে সূচিত হল অভিনবতা। এই অভিনবতাবাদীদের পুরোধা হলেন ভগবতীচরণ পাণিগ্রাহী (১৯০৭-৪৩)। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ স্থাপিত হল 'নবযুগ সাহিত্য সংসদ'। তার মুখপত্র 'আধুনিক'। ১৯৩৬ সনে দেখা দিল 'প্রগতিশীল লেখকসংঘ'। এই সব প্রয়াসের ফলেই নবযুগের সংকল্প ও সঞ্জীবনী মন্ত্র রূপ নিল। স্পষ্ট হয়ে উঠল যুগের তথাকথিত দৃষ্টিভঙ্গি। যার বলিষ্ঠ প্রতিফলন ঘটে ওড়িয়া কাব্যে ও ছন্দে। এই যুগের উল্লেখযোগ্য কবি হলেন —অনন্ত পট্টনায়ক, মনোমোহন মিশ্র এবং শচি রাউতরায়। এঁদের ছন্দ চিন্তার নবায়নের প্রকাশ 'সবুজ-যুগেই। তাই সবুজপন্থী কবি রূপেও তাঁরা পরিগণিত হয়ে থাকেন। মনে রাখতে হবে—এই মানবধর্মী ও বাস্তবতাবাদী কাব্যস্বর ১৯৩৫-৩৬ থেকে স্পষ্ট রূপ লাভ করলেও তার আগেও তার ক্ষীণ ধারা বহমান ছিল।[১৩] ১৯৩৬ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত এই যুগের স্থায়িত্বকাল। যার একটি উল্লেখযোগ্য প্রবণতা প্রচার ধর্মিতা। ১৯৪৭ সালের পরবর্তী যুগের কাব্যসাহিত্য প্রধানতঃ ভারতের স্বাধীনতা-লাভ স্বপ্ন-চেতনা বিশ্ব ও সমাজের অসহ্য রূপ প্রভৃতির উপর স্থাপিত। তাই এ-যুগের অধিকাংশ কবির রচনায় জীবনের ভাষা ও জীবননিষ্ঠার অভাব, সৌন্দর্যবোধ-শূন্যতা ও প্রচারধর্মিতা প্রভৃতি বড়ো হয়ে উঠেছে। তা সত্ত্বেও অনন্ত পট্টনায়ক (১৯১০), কৃষ্ণচন্দ্র ত্রিপাঠী (১৯১১), কুঞ্জবিহারী দাস (১৯১৪), শচি রাউতরায় (১৯১৫), জ্ঞানীন্দ্র বর্মা (১৯১৬), বিনোদচন্দ্র নায়ক (১৯১৯), চিন্তামণি বেহেরা (১৯২৮), প্রমুখ অগ্রজদের সঙ্গে জানকীবল্লভ মহান্তি (১৯২৪), বেহুধর রাউত (১৯২৬), দুর্গা মাধব মিশ্র (১৯২৯), যদুনাথ দাস মহাপাত্র (১৯২৯), রমাকান্ত রথ (১৯৩৪), মনোজ দাস (১৯৩৪) ও হরিহর মিশ্র প্রমুখের নাম স্মরণীয়—যাঁরা কাব্যে ও ছন্দে নতুনত্বের ধারাকে ধরে রাখতে চেয়েছেন। তবে এইসব কবির মধ্যে বিভিন্ন মতাদর্শ ছিল। এ-যুগের বাংলা, হিন্দী ও অসমীয়া কবিদের মতো ওড়িয়া কবিদের

বিভিন্ন মত দেখা যায়—কবিতায় ছন্দ-প্রয়োগ এবং অন্যান্য বিষয়ে। কেউ কেউ মনে করেন—কবিতায় আত্মিক পরিবর্তনের সঙ্গে তার আঙ্গিকেরও বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। আবার ১৯৫৫ থেকে অত্যাধুনিক ওড়িয়া কবিতার ভাষা ও শৈলী নতুন রূপ নিয়েছে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক নীলাদ্রিভূষণ হরিচন্দনের অভিমত লক্ষণীয়—

> "পুরাতন ভাবাংশর মৃত্যু সঙ্গে সঙ্গে কাব্যিক ছন্দ, প্রবহমান গীতিময় ধারা অবলুপ্ত হোইছি। ছন্দ ও যতিপাত আধুনিক জটিল মনর বক্তব্যকু প্রকাশ করি লাগি অক্ষম হোইছি। সাম্প্রতিক যুগচেতনার বিক্ষিপ্ততা ও জটিলতাকু প্রকাশ করিবা লাগি বর্তমান গদ্যহিঁ প্রধান মাধ্যম।···এহি গদ্যছন্দ ভিতরে মধ্য এক নতুন ধরণর মাধুর্য রহিছি। তাহা হেউছি অন্তচ্ছন্দ বা মধ্যমিলন। রুক্ষ গদ্যছন্দ ভিতরে এহি মধ্য মিলনর ধ্বনি মাধুর্যহিঁ পাঠক কু কেতেক পরিমাণরে আনন্দ দান করি থাএ, নচেৎ গদ্যকবিতা সম্পূর্ণ নীরস ও বাহ্য কাব্যধর্ম বিবর্জিত হোই পড়ি থান্তি।"
>
> —মো দৃষ্টিরে সাম্প্রতিক সাহিত্য (১৯৭৩), পৃ. ৩১১-১২।

বলাই বাহুল্য এখানে ছন্দের স্পন্দনের চেয়ে মিলের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সুতরাং অভিমতটি যথার্থভিত্তিক বলে মনে করা যায় না কারণ ছন্দে মিলের ভূমিকার স্থান নেই। মিলের ভূমিকা অলংকারে—অনুপ্রাসে। আবার আর একদলের প্রতিনিধি দুর্গামাধব মিশ্র মনে করেন—

> "বর্তমান কবিতারে কেতেটি অপরিহার্য অঙ্গ এহার জনপ্রিয়তা হানি নিমন্তে দায়ী। প্রথমতঃ ছন্দর অভাব। যদ্যপি গদ্য কবিতারে কবির ভাবরাজিকু সাজড় বা নিমন্তে অনেক স্বাধীনতা মিলে, তথাপি তাহা মধ্যরে এক অন্তর্নিহিত উচ্ছ্বাস রহিবা দরকার। তাহা ন হেলে, তাহা কবিতা পদবাচ্য হেব নাহিঁ। হুএত পদ বা উপধা মিল ন পারে; পঢ়িলা বেলে তাহা গদ্যঠারু ভিন্ন হেবা বাঞ্ছনীয়; কিন্তু অধুনা অনেক কবিতারে (গদ্য কবিতা না আরে প্রকাশ পাই) এহি মৌলিক বিচার প্রতি দৃষ্টি দিয়া যাউ নাহিঁ।"—
>
> —মো দৃষ্টিরে সাম্প্রতিক সাহিত্য' (১৯৭৩), পৃ ২০৩।

আজকের ওড়িয়া কবিতা অধিকাংশই ছন্দহীন বা স্পন্দন হীন নিছক গদ্য

রচনা বা খবর বাহী। সুতরাং তা কবিতা পদবাচ্য নয়। এই সব দেখে গদ্য-কবিতার নামের আড়ালে নিছক গদ্য-রচনার অবাঞ্ছিত আধিক্য লক্ষ করে আর একদলের হয়ে জ্ঞানীন্দ্র বর্মা বলেছেন—

> "যেউঁঠি আহ্বান আসিছি সেঠি ধ্বনি উঠিছিBack to past অর্থাৎ অতীতর কাব্য-সম্ভার পাখকু চলি।...মুঁ মোর রেনেসাঁ ও ডকাডেন্সর এপিকরে লেখিথিলে ফুলবন ভিতরে মুষীর প্রজাপতি হজি থিবা কবিতা।"
>
> —মো দৃষ্টিরে সাম্প্রতিক সাহিত্য (১৯৭৩), পৃ. ২৯৫।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ওড়িয়াতে নিকট অতীতের কাব্য ও ছন্দের দিকে মোড় ফেরার ব্যাকুলতা স্পষ্ট। এখন আমরা আলোচ্য যুগের ওড়িয়া ছন্দের সাম্প্রতিক প্রবণতা ও ভাবী সম্ভাবনার দিকটি দেখার চেষ্টা করব।

কলাবৃত্ত রীতি (Morie Style)

কলাবৃত্ত রীতির রচনায় অভিনবতার তেমন পরিচয় না পেলেও মুক্তক এবং সনেট রচনায় বৈচিত্র্য আনতে প্রয়াসী হয়েছেন আলোচ্য যুগের একদল কবি। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল সেই বৈশিষ্ট্যের। এ-যুগেও ষট্‌কল পর্বেরই প্রাধান্য।

ষট্‌কল পর্বিক একপদী :—

> প্রাণ মন্দিরে প্রীতির পুলক—
> নরদেবতার বন্দনা গীত গাইবি...
> নিরাশার স্রোতে আশার তরণী বাহিবি।...
>
> —রবীন্দ্রনাথ সিংহ, 'আজি এই নবপ্রভাত বেলরে'।

কবিতার ভাষার বাক্‌ছন্দানুগত্য লক্ষণীয়। গদ্যধর্মিতা যেন আরও স্পষ্ট হয়েছে নিম্নের দৃষ্টান্তে :—

> পাঞ্চটি নোট্ ঝিঅটি হাতরে উপরকু টেকি দেখাইলা
> স্বামীপাদ ধীরে ধীরে আউন্ আউন দয়ন লোতকে ভিজাইলা।

দেখুচ? বন্ধু, দেখুচ কি?
এহি মহীয়সী সতী পত্নী কি?
—কৃষ্ণচরণ বেহেরা, 'ধরিত্রী' : এই ঝিয়টিকি জাণ কি?

কলাবৃত্ত সমিল মুক্তক :—

শবর শীতল মশাণি ছাতিরে একা মুহিঁ, খালি একা
চারিপাশে মোর শিলা লিপি শিলা-লেখা।
ব্যর্থজনম যৌবন এঠি হায়!
ভঙ্গা হড়রু চারু সঙ্গীত খোজি খোজি নিরুপায়!
—বিনোদ রাউতরায়, ধরিত্রী : 'আবর্তন'।

এইসব উদাহরণ ষট্কল পর্বিক। এবার অরবিন্দ পট্টনায়কের সপ্তকল পর্বে রচিত একটি সনেট :—

মইলা কাচতলু আলোক জ্যোতি কেবে ঝটকে?
দবিলা মন তলে দীপ্তি দাউ দাউ জলে কি?
হজিলা অতীতর সাউঠা শপথে মুঁ চমকে,
তোলিলা বেলে ফল চঢ়িলা ডাল যাএ নহকি।
ভবিষ জীবনকু কেতে যে শপথ মুঁ নেই নি!
শেফালি ফুল সরি সবুত ঝরি অছি ভূঁইরে,
সাধনা তরু তুলে সিদ্ধিফল তোলি পারিনি,
অসার আশা মোর ফসর ফাটি পড়ে পছ রে।
ধইলা ধৈর্য মো ধক্কা খাই খাই ধরার
টলি চি পথে তার মো চলা বাটে সে গো পাচেরী
মনর হরণী মো তুনিয়াঁ নিয়াঁ দেখি আতুর
সাহস পিতুলা মো হতাশা জলে যাএ বতুরি।
সাধনা যেঁউ ঠারে যাএনা উৎসাহ, নিষ্ঠা হুএ তহিঁ নিউন
সিদ্ধি সেইঠারে সমাধি তলে শুএ, তেজিলা আশা হুএ মণ্টন॥
—অরবিন্দ পট্টনায়ক, সারথীর শপথ : 'লণ্ঠন'।

সপ্তকল পর্বিক এই চতুর্দশপদী রচনাটির প্রথম বারো পংক্তি ৭+৭+৩=১৭ মাত্রার এবং শেষ দুই পংক্তি ৭+৭+৭+৩=২৪ মাত্রার। এই ধরনের সনেট বা চতুর্দশপদী যার শেষ দুই পংক্তি অপেক্ষাকৃত বড়ো, রচনার ঐতিহ্য রয়েছে

হিন্দী কবিতায়। ওড়িয়ায় কলাবৃত্ত রীতির এই প্রয়োগ তারঅনুস্মৃতির কথা মনে করিয়ে দেয়। এ-যুগের কবিরা কলাবৃত্তের ধারাকে সজীব রেখেছেন—একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদী বন্ধে চতুষ্কল, পঞ্চকল, ষট্‌কল এবং সপ্তকল পর্বের সার্থক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে আবার মাঝে মাঝে অভিনব প্রয়োগেও প্রয়াসী হয়েছেন কেউ কেউ।

মিশ্রবৃত্ত রীতি (Mixed Moric style)

ওড়িয়াতেও মিশ্র কলাবৃত্ত রীতির প্রয়োগই অধিক সেকথা বলাই বাহুল্য। দীর্ঘ দিনের বহু প্রচলিত এই রীতিতে নতুনত্ববিধানের অবকাশ কম। তবে প্রবহমান ও মুক্তক রচনায় বিচিত্রতা আনার প্রয়াস লক্ষিত হয়। কবিতার ভাষা বাক্‌ছন্দাভিমুখী এ-টাই এ-যুগের বিশেষ প্রবণতা।

অমিল পয়ার ও মহাপয়ার বন্ধে বক্তব্যকে জোরালো করার মানসে একই শব্দ বা শব্দগুচ্ছের বার বার ব্যবহার দেখা যায়। অনুরূপ প্রয়োগের উদাহরণ—

মণিষ এ পৃথিবীরে সমস্ত ক্ষমতা !
মণিষ এ পৃথিবীরে একমাত্র ধন !
মণিষ এ পৃথিবীরে একান্ত গৌরব !
মনিষরে দূরে দূরে বহু দূরে
ফিঙ্গি দেলে তুমে
এ জীবন কেড়ে নিঃস্ব, কেড়ে প্রাণহীন।

—কৃষ্ণচন্দ্র ত্রিপাঠি : 'অগ্নিশংখ'।

তিনটি সাধারণ পয়ার পঙক্তির সঙ্গে একটি মহাপয়ার ও একটি সাধারণ পঙ্‌ক্তির সমাবেশে স্তবকটি গঠিত। আবার প্রবহমান মহাপয়ারেও কবিরা স্বাধীনতা দেখিয়েছেন। সমিল প্রবহমান মহাপয়ার :—

হঠাৎ মুঁ অন্ধহেলি ইএ কেউ আলোক জ্বালারে
অনেক রঙ্গর বর্ণে ! মেঞ্চা মেঞ্চা বিচিত্র পীড়ারে
(যে পূর্ব অনুভূতি) সচকিতে নিজেই বিহ্বলি
অদ্ভুত বেদনানন্দে, নগ্নভাবে নিজভাবে নিজে জোড়ি জিলি।[২২]

বোধহুএ হজিগলি আলোকর নিবস্ত ব্যাপ্তিরে
নিজকু হরিলি নিজে ইএ যেউ অভিভূত নির্বাক দ্যুতিরে।[২২]
—বেণুধর রাউত : 'দুইটি আখির সূর্যাবর্ত'।

তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে বন্ধনীর অংশ-মধুসূদনের অনুরূপ প্রয়োগের কথা মনে করায়। চতুর্থ ও ষষ্ঠ পঙ্‌ক্তিতে ১৮ মাত্রার বদলে ২২ মাত্রা করে আছে। আর আছে পঙ্‌ক্তিতে-পঙ্‌ক্তিতে মিল। এবার মুক্তকের উদাহরণ :—

সমিল মুক্তক—

পুরুণা পৃথিবী আজি বঞ্চিবার অগ্নিশিখা তলে
সূর্যর জঙ্গল পরি অন্তঃসারশূন্য হোই জলে
জলি যাএ অকালে মণিষ
শতাব্দীর মেরুদণ্ড ভাঙ্গি যাএ আজি অহর্নিশ।
—যদুনাথ দাস মহাপাত্র : 'বহিছি বলঙ্গ নদী'।

মুক্তকের দীর্ঘতম চরণ ১৮ এবং হ্রস্বতম চরণ ১০ মাত্রার।

অমিল মুক্তক :—

আমে সবে বচন-বাগীশ
সভামঞ্চে উচ্চকণ্ঠে করু কেবে
উচ্ছ্বসিত জ্ঞান আউ কর্মর ঘোষণা;
'ডালডা' যুগর আমে পলাতক ত্রিশংকুর দল,
স্থিতিহারা স্থিতির সন্ধানী।
এই আম জীবন আদর্শ
বঞ্চিবার এ অনুশাসন।
—জানকী মহান্তি : ধরিত্রী : দুই অধ্যায়।

এখানেও সবচেয়ে বড়ো ১৮ এবং সবচেয়ে ছোট ১০ মাত্রার চরণ বিন্যস্ত।

ভাষা ও ছন্দ কবিতাকে যেন মুখের ভাষার আদল দান করেছে। যুগোচিত পরিবর্তনে ছন্দ বাক্‌পর্ব প্রধান কবিতার রূপ স্পষ্ট করে তুলেছে। মিশ্রকলাবৃত্ত বা দাণ্ডিবৃত্ত ছন্দের এই রূপ বাংলা, হিন্দী ও অসমীয়ার অনুরূপ আধুনিক কবিতার ভাষা ও ছন্দের স্মৃতি জাগায়।

দলবৃত্ত রীতি (Syllabic Style)

লৌকিক অর্থে দলবৃত্ত রীতির ছন্দ আধুনিক ওড়িয়াতে অ-প্রযুক্ত বলা চলে। ওড়িয়া লোকগীতির ছন্দ প্রকারান্তরে 'দাণ্ডিবৃত্ত'ই। কারণ ওড়িয়ার স্বরান্ত উচ্চারণ সাধুসাহিত্য ও লোকসাহিত্যে প্রায় একই প্রকার। কেবল আঞ্চলিক রচনায় আঞ্চলিক উচ্চারণ এবং আধুনিক বাংলা, হিন্দী ও ইংরেজির প্রভাবে ব্যঞ্জনান্ত উচ্চারণও মাঝে মাঝে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এই প্রসঙ্গে জানকীবল্লভ মহান্তির অভিমত স্মরণীয়—

> "ওড়িআরে প্রত্যেক অক্ষর গোটিএ গোটিএ Syllable তেণু প্রত্যেকে এক এক মাত্রা। ওড়িশার প্রাচীনতম রচনা ঢগ, গাউলী গীত, ডাক-বচন, কান্দণা, চষাগীত, খেলগীত, জণান প্রভৃতিরে মধ্য হসন্তর ব্যবহার দেখা যাএ নাহিঁ।...(বঙ্গলা ও হিন্দীরে) হসন্তর ব্যবহার এবং হ্রস্ব দীর্ঘ স্বরর উত্থান পতন রহিছি; মাত্র ওড়িআ উচ্চারণ এপরি ন হেলে হেঁ ওড়িআ পদ্যরে এতাদৃশ প্রবর্তন যাথার্থ্য তাহা নিরূপণ একান্ত কর্তব্য।"
>
> —ওড়িয়া সাহিত্য পরিক্রমা (১৯৭৬), পৃ. ১০৮-১০৯

সাধুসাহিত্যে দলবৃত্ত ছন্দের প্রয়োগ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা দেখা দিলেও তা গভীর চিন্তন-মনন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরে পৌঁছয়নি। তাই তার প্রয়োগও সম্ভব হয়নি। ওড়িয়া ছন্দের সচেতন বৈজ্ঞানিক সমালোচনার প্রবর্তক নীলকণ্ঠ দাসও বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে আধুনিক ওড়িয়া ছন্দের আলোচনা প্রসঙ্গে 'ওড়িয়া কবিতা তথা ছন্দরে প্রগতি' প্রবন্ধে বলেছিলেন—

> "এহা ছাড়া স্বরছন্দ [স্বরবৃত্ত বা দলবৃত্ত] বিষয়রে মধ্য কহিবার অছি, পরে কুহাযিব।"
>
> —ওড়িআ ভাষা ও সাহিত্য (১৯৫৮), পৃ. ৬৯।

কিন্তু পরে আর স্বরছন্দ বা দলবৃত্ত সম্পর্কে তিনি কিছু বলেননি। বললে, ওড়িয়া দলবৃত্তের স্বরূপ বোঝা সহজ হত। সুতরাং দলবৃত্তের স্বরূপ ওড়িআ কবিদের কাছেও সুস্পষ্ট বলে মনে হয় না। আর তা হলে প্রাচীন উচ্চারণ-কাঠামোয় তা বসানো যায় না। 'ঢগ ঢমালি' প্রভৃতি হল লোকগীতির নাম,

যা মিশ্রবৃত্তে রচিত। এগুলিকে ছন্দ নামে গ্রহণ করা সমীচীন নয়। যেমন সমীচীন নয়, মধ্য বাংলার লোচনদাসের 'ধামালি' রচনার ছন্দকে 'ধামা লি' নামে অভিহিত করা। তবে কচিৎ-কদাচিৎ দলবৃত্তের দুর্লভ নিদর্শন রচনা করেছেন কেউ কেউ। বিনায়ক মিশ্র-সংগৃহীত বৈষ্ণব পাণির (১৮৯৮-১৯৬৩) একটি ছড়া—

জাপান্, জাপান্ কহ না।
জাপান্ তোফান্ জার্মান্ বেমান্
সমান্ অটই তুই না ॥
—আধুনিক ওড়িআ সাহিত্যর ইতিহাস' (১৯৫৮), পৃ. ৩৯৯।

৪+৪+৩ ॥ ৪+৪ ॥ ৪+৩ দলমাত্রাক্রমের এই ছড়াটি বিষয় ও ছন্দের বিচারে নিম্নোদ্ধৃত অনুরূপ বাংলা ও হিন্দী ছড়ার সঙ্গে তুলনীয়—

বাংলা— এতদিন তো নাচতেছিলেম
তাক ধিনা ধিন ধিন্না
বাড়া ভাতে ছাই দিল রে
কায়দে আজম জিন্না।...
শোনরে ভাই রাশিয়ানরে
শোনরে ও ভাই চীন্না
পাকাধানে মই দিল রে
কায়দে আজম জিন্না।
—অন্নদাশংকর : 'রামরাজ্যবাদীর বিলাপ'

হিন্দী— হাথী ঘোড়া পালকী
জৈ কহৈয়া লালকী।
হিন্দু হিন্দুস্তান কী
জৈ হিটলর ভগবান কী
জিন্না পাকিস্তান কী
টোজো ঔর জাপান কী
বোলো বন্দেমাতরম্
সত্যং শিবং সুন্দরম্ ॥
—রামবিলাস শর্মা : 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্'

পল্লীকবি প্রাণকৃষ্ণ সামল (১৯১২-৫৯) রচিত দুই একটি রচনায় লৌকিক ছন্দের আভাস লক্ষ করা যেতে পারে।—

জলাশয় প্রাণ আজি পূর্ণ হেলা এ সন্নিধ্য পাই
আগ্রহ, আনন্দ যহিঁ সেহি তীর্থ তহুঁ আনন্দ নাহিঁ ।
—রজপর্ব : 'পহিলেরজ' ।

সাধারণভাবে এ-টি মিশ্রকলাবৃত্তের মহাপয়ারের দৃষ্টান্ত। কিন্তু দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে ৮+১০=১৮ না হয়ে ৮+১১=১৯ মাত্রা থাকা সত্ত্বেও পাঠ কর্ণপীড়ক না হওয়ায় মনে হয় অতিরিক্ত একমাত্রা উচ্চারণে লুপ্ত হয়ে ১৮ মাত্রার রূপ নিয়েছে। লক্ষ করলে-'তহুঁ আনন্দ' পর্বটি পাঁচ মাত্রার হলেও উচ্চারণে 'তঁউ্ আনন্দ' বা 'তহানন্দ' রূপ নেয় ফলে সহজেই চারমাত্রা পাওয়া যায়। এইভাবে তহুঁ 7তউ্ হওয়া লৌকিক ছন্দ বা দলবৃত্তেই সম্ভব। সুতরাং রচনাটি মিশ্রবৃত্ত না হয়ে দলবৃত্ত মহাপয়ার হওয়াই সম্ভব। আর একটি দৃষ্টান্ত দেখুন—

টপ টপ পড়ে বরষা অমা অন্ধার ঘন
এ অন্ধারে হজিযিবাকু খালি হেউছি মন ।
—প্রাণকৃষ্ণ : 'ভুই নঅন'

এখানে প্রতি পঙ্‌ক্তিতে আপাতভাবে ১৬টি করে অক্ষর থাকলেও উচ্চারণ তা ঠিক থাকছে না। অবশ্য ৪+৫+৫+২ হিসাবে পড়া যেতে পারে। কিন্তু একটু সজাগ হলে—

ট-প্ ট-প্ । পড়ে বর্‌ষা । তমা অন্ধার । ঘন I
এ অন্ধারে । হজ্জিবাকু । খালি হেউ্‌ছি । মন

উচ্চারণ বৈগুণ্যে ১৬ মাত্রার পঙ্‌ক্তি দুটি ৪+৪+৪+২=১৪ দলমাত্রার রূপ নিয়েছে। এ ভাবের উচ্চারণ সম্ভব হলেও তা অঞ্চল বিশেষে সীমিত। কিন্তু যদি এই উচ্চারণ-প্রকৃতি স্বীকৃতি পায় তবেই ওড়িয়াতে কবিতা রচনার এক অতিরিক্ত ক্ষেত্র প্রশস্ত হয়ে উঠবে। তবে তার জন্য তরুণ ওড়িয়া কবিদের এগিয়ে আসতে হবে। পরীক্ষা নিরীক্ষায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। আশা করা যায়—তা যথাসময়ে সম্ভব হবে। ওড়িয়া দলবৃত্তের আরও একটি উদাহরণ :—

কারখানা । খলা বাড়ি । খাদাম বা । গান রে ;
একহুঅতু । ভারত জনতা । সংগ্রামর । মাইদানরে ।
—মনোমোহন মিশ্র : 'জনতার জয়গান' ।

দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির পর্বকয়টি চতুর্দল মাত্রিক। 'এক্', 'রত্', 'জন্' ও 'মাই' রুদ্ধদল রূপে উচ্চার্য।

গদ্য-ছন্দ

সাম্প্রতিক ওড়িয়া কবিতার ভাষা অনেকটা মুখের ভাষার আদল লাভ করলেও তার প্রতিফলন প্রধানতঃ পদ্য ছন্দেই ঘটেছে। গদ্য-ছন্দে এবং বিনা ছন্দের গদ্যেও কবিতা লেখা হচ্ছে—ঠিকই, তবে সাধারণ পাঠকের কাছে তার সাগ্রহ-স্বীকৃতি কম। তা হলেও গদ্যকবিতা নিয়ে আধুনিক কবিগণ বিচিত্র রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চালিয়ে যাচ্ছেন। অবশ্য তার ফল যে ভালো হচ্ছে না সে কথা বলাই বাহুল্য। এই প্রসঙ্গে কবি ও আলোচক চিন্তামণি বেহেরার একটি উক্তি স্মরণীয়। তিনি বলেছেন—

> "…গদ্যছন্দ বা মুক্ত ছন্দের প্রয়োগ ক্ষেত্ররে বলিষ্ঠ শিল্প-ক্ষমতার আবশ্যকতা সর্বদা স্বীকার্য। নিম্ন দরর শিল্পী-হাতরে এহি ছন্দগুড়িকর প্রয়োগ অসার্থক হেবা সঙ্গে সঙ্গে শিল্পর অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ উভয় রূপ ক্ষুন্ন হোই থাত্র।"
>
> —কাব্য ও কলাকার (১৯৭৬), পৃ. ২৬৯।

এই অভিমতটি কেবল ওড়িয়াই নয়, অন্যান্য ভারতীয় ভাষার গদ্য কবিতা প্রসঙ্গেও প্রযোজ্য। তবে গদ্য ছন্দও 'মুক্তক-এক' বস্তু নয়—এটাও মনে রাখা দরকার।

আধুনিক কবিদের অন্যতম রমাকান্ত রথের গদ্য কবিতার উদাহরণ :—

আমর অগণা সারা মুখাংকর সিল্‌হট ও সেমানংক ছাইর ফাঁকরে
ফুস্‌লা পিঠিয়ে খরা পোউ থাস্তি অন্যান্য যুবতী
আমে দেখি নাহঁ বাঘ, দেখি নাহঁ কৌণসি স্ত্রী লোক
তথাপি বিশ্বাস করু, শব্দ দ্বারা এ বাঘ ও স্ত্রীলোক নির্মিত ।।
আমে বি শব্দর অংশ, আমে তেণু বাঘ ও স্ত্রীলোক।
আমে সে লম্পরে ক্ষুধা, সে মৃত্যুর অসহায় হাত
রাত্রির অন্ধার আমে, জঙ্গলরে যোষরা প্রভাব।

—অনেক কোঠরী : 'বাঘশিকার'।

এটি কবিতা হলেও গদ্যাশ্রিত। এবার যথার্থ গদ্যকবিতার কিছু অংশ :—

বিদ্যুতর তরবারিরে
নিগ্রোদেহী মেঘর বক্ষকু হানি
তৃষিত পৃথিবীর পিপাসু প্রাণ রে
পুলকর পলক পকাই,
বজ্রর বিস্ফোরণরে ঝরি ঝরি পড়ে
নূতন আষাঢ়র প্রথম বৃষ্টি।
—ব্রজনাথ রথ, 'ধরিত্রী' : 'মেঘ সঞ্চার'

কবি এ-যুগের কোনো কোনো কবিতায় গদ্য মিল দেওয়ার প্রয়াসও করেছেন। কেউ বা গদ্য-ছন্দে সনেট লিখেছেন। গদ্য-ছন্দে একটি ওড়িয়া সনেট—

মোর সমস্ত কামনাকু অঞ্জুলাএ লিঅা করি—
পাণি ভিতরকু ফোপাড়ি দেলি,
সেগুড়িক মাছ হোই গলে ॥

মো জীবনর সমগ্র খসড়াকু
এক বিরক্তিকর পত্রপরি চিরি ফোপাড়ি দেলি
সেমানে প্রজাপতি হোই
পাখ ফুল গছ মানংকরে বসিলে ॥

অবয়বর সমস্ত পরিচ্ছদকু কাঢ়ি ফোপাড়ি দেলি
এক থুণ্টা বরগছ আড়কু
সে মানে সেঠি দিব্যবস্ত্র পলিটি মুনিনে ॥
পলাই যিবাকু ভাবুথিলি, কেউঁ দূর বনস্ত কু
গলি—
গাঁ শেষর শিব মন্দির কু
প্রণাম কলি, এবং ফেরি আসিলি।
—অরবিন্দ পট্টনায়ক, সারথির শপথ : 'ইচ্ছা'।

দেখা যাচ্ছে কবি গদ্য-ছন্দে সনেট রচনায় বেশ কৌশলে স্তবক ভাগ এবং মিল রক্ষা করেছেন। গদ্যকবিতার আরও নানারূপ ফুটে উঠছে ক্রমে ক্রমে ওড়িয়া কবিদের হাতে। তবে তা তুলনামূলকভাবে কম। আর স্থায়িত্ব আরও কম।

হিন্দী ছন্দের সাম্প্রতিক প্রবণতা ও ভাবী সম্ভাবনা

আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে দেখেছি মৈথিলীশরণ গুপ্ত প্রমুখ হিন্দী কবিদের রচনায় সাধারণ পদ্যছন্দেরই প্রাধান্য। প্রবহমান মুক্তক, প্রভৃতি বন্ধ এবং গদ্য-ছন্দের পরিমাণ কম। পাশ্চাত্য ছন্দের প্রভাবে বাংলা ছন্দে যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল, পাশ্চাত্য এবং বাংলা ছন্দের আদর্শে হিন্দী ছন্দে অনুরূপ পরিবর্তন সূচিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। পঞ্চম দশকের প্রারম্ভে নবীন হিন্দী কবিসম্প্রদায়ের আবির্ভাব এবং 'নয়ীকবিতা'র অর্থাৎ অতি আধুনিক কবিতার সূচনা ঘটে। এই কবিরা 'নবপন্থান্বেষী'। ১৯৪৩ সালে 'তারসপ্তকে'র পৃষ্ঠায় যে নব কাব্যধারার সূত্রপাত, ১৯৫১ সালে 'দ্বিতীয় সপ্তক' ও ১৯৫৩-৫৪ সালে 'নয়েপত্তে' এবং 'নয়ী-কবিতা'র পৃষ্ঠায় তার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি। কাব্যবস্তু, শৈলী, ছন্দ ও মিল প্রভৃতি বিষয়ে মতানৈক্যের জন্য আধুনিক হিন্দী কবিরাও নানা দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। সপ্তম দশকে হিন্দী কবিতা ও তার আঙ্গিকের আরও প্রসার ঘটে। প্রসার ঘটে ছন্দেরও। এত সব সত্ত্বেও বাংলারই মতো হিন্দী ছন্দেও নানাপ্রকার বৈচিত্র্য আসে, কিন্তু স্থৈর্য আসেনি। আমরা ১৯৩৩ সালের পর হিন্দী ছন্দেও যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে তার গতি-প্রগতির ধারা ও ভাবী সম্ভাবনার স্বরূপ নির্দেশের চেষ্টা করছি।

মানুষের মনোভাব, ভাষা এবং বাক্‌ছন্দ প্রভৃতির পরিবর্তন ঘটে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। তাই ঐতিহ্যপূর্ণ হলেও 'বেদের গায়ত্রী' সংস্কৃত রামায়ণের 'অনুষ্টুপ্' বাংলার 'পয়ার' এমন কি রামচরিত মানসের 'দোহা-চৌপাঈ' প্রভৃতি ছন্দের সাহায্যেও আজকের কবিতার সহজ ও স্বাভাবিক স্ফুরণ সম্ভব নয়। তাই আধুনিক হিন্দী কবিদের ছন্দ-সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়—

> "আমাদের অভিনব প্রয়োগের আশ্রয় নিতে হবে। অন্য ভাষার ছন্দও আমরা গ্রহণ করব। নিরালা প্রবর্তিত হিন্দী কাব্যে মুক্তক, বিষম-চরণবর্তিনী, অমিল ঘনাক্ষরী [মিশ্রকলাবৃত্ত] ছন্দে আশ্রিত তালযুক্ত পদ্যরচনা পদ্ধতিও শ্রেয়স্কর। তাতে ভাবের ওঠা-নামার অনুকূলে গতিকে দ্রুত ও মন্থর-করা সম্ভব হলে আরও ভালো।"
>
> —প্রভাকর মাচওয়ে, তারসপ্তক-১, 'বক্তব্য' পৃ. ৫২।

লক্ষণীয় আধুনিক হিন্দী কবিতার ছন্দের সম্ভাবিত নবীন রূপটি বেশ স্পষ্ট হয়ে

উঠেছে।

আধুনিক হিন্দী কবিতার ভাষাকে যতদূর সম্ভব বাক্‌ছন্দ নির্ভর করার প্রয়াস অব্যাহত। তাতে গ্রাম্য শব্দ ও প্রবাদ বচন প্রভৃতির ব্যবহারও চলে, ক্রমে ক্রমে দীর্ঘ-স্বরের হ্রস্ব উচ্চারণও স্বীকৃতি পেয়েছে। কলাবৃত্ত ও মিশ্রবৃত্ত রীতির মুক্তক, উর্দু ছন্দ এবং অন্যান্য ছন্দের প্রয়োগ আলোচ্য যুগের বিশিষ্ট লক্ষণ। 'সনেট', 'ব্যালাড', 'মনোলগ', প্রভৃতি বিদেশী কবিতার আকৃতি এবং লোকগীতির বিচিত্র-রূপেরও পরিচয় মেলে আধুনিক হিন্দী কবিতায়। প্রচুর গদ্যকবিতা লেখা হয়েছে। এমন কি নিছক গদ্যেও কম কবিতা লেখা হয় নি। তারই সঙ্গে সুস্পষ্ট পদ্যছন্দে নতুন করে কবিতা লেখার প্রবণতাও লক্ষিত হচ্ছে। আধুনিক হিন্দী কবিতায় প্রযুক্ত ছন্দ-বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাচ্ছে।

কলাবৃত্ত রীতি (Moric Style)

কলাবৃত্ত (হিন্দী মাত্রাবৃত্ত) রীতির প্রবহমান ও মুক্তক বন্ধের প্রয়োগই সাম্প্রতিক হিন্দী কবিতায় বেশি। এই দুই বন্ধের ক্রমবর্ধমান প্রয়োগ এ-যুগের একটি বিশেষ ধর্ম। মিশ্রকলাবৃত্ত বা ঘনাক্ষরীর প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত কম। বালকৃষ্ণ রাও (১৯১৩), নেমিচন্দ্র জৈন (১৯১৪) প্রভাকর মাচওয়ে (১৯১৭-৯১) গজানন মুক্তিবোধ (১৯১৭-১৯৬৪), ভারত ভূষণ অগ্রওয়াল (১৯১৯-১৯৭৫), লক্ষ্মীকান্ত বর্মা, নরেশ কুমার মেহতা (১৯২৪), জগদীশ গুপ্ত (১৯২৪), ধর্মবীর ভারতী (১৯২৬), অজিত কুমার (১৯৩৩), দুষ্যন্ত কুমার (১৯৩৩-১৯৭৫) প্রভৃতি কবিরা কলাবৃত্ত রীতিতে অভিনবতা আনতে চেষ্টা করেছেন। হিন্দী কলাবৃত্তের সমিল ও অমিল মুক্তকের উদাহরণ :—

সমিল মুক্তক :—

মধুরিতু রাণী মহান
মানিনী বসন্তীরঙ্গ চোলী ঝলকৈ জিসকী,
ঢলকে আঁচল ধানী লহর-সা
আঁখোঁ মেঁ আকর্ষণ ভী খাসা
যুগ যুগ কা প্যাসা সা ছলকে দিলাসা জহাঁ,

উতরী উন সরসোঁ কে খেতোঁ পর মায়াবিনি
হলকে—হলকে—হলকে।
ফূল মেঁ ছিপে নিশান হৈঁ ফলকে।
—প্র. মাচওয়ে, 'বসন্তাগম', পহলা তারসপ্তক, পৃ. ৫২।

ষটকল পর্বের মুক্তক। চরণে বারো থেকে চব্বিশ মাত্রা।

অমিল মুক্তক :—

যৌবন ভী ভিক্ষুক হৈ
তিথি-সা জো আতা হৈ, বরণে কো—
আপনে কো দোগে ?
দেনা হৈ কঠিন ॥
—নরেশ মেহতা, 'পুনঃ ভিক্ষুক', নয়ী কবিতা-৩, পৃ. ৫৬।

এটিও ষটকল পর্বিক। বাংলার মতোই হিন্দীতেও ষট্‌কল পর্বের ব্যবহার বেশি হলেও ৪, ৫, ৭ ও ৮ মাত্রার পর্বেও মুক্তক লেখা হয়েছে।

আমরা জানি হিন্দী সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতার বাহন কলাবৃত্ত রীতির ছন্দ। আলোচ্য যুগেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। কলাবৃত্ত রচয়িতা অধিকাংশ কবিই সনেট লিখেছেন। চোদ্দ পঙ্‌ক্তির আয়তন ও যুগ্মক-মিল ছাড়া সনেটের অন্যান্য ধর্ম হিন্দী সনেট থেকে কবেই খসে পড়েছিল। এ-যুগের কোনো কোনো কবি এ-দুইটিকেও মানতে চান না। সনেট রচনায় তাঁরা পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়েছেন। এই শ্রেণীর প্রতিনিধিস্থানীয় কবি বালকৃষ্ণ রাও তাঁর 'রাতবীতী' (১৯৫৪) কাব্যের ভূমিকায় লিখেছেন—

"সনেটের জন্য চোদ্দো পংক্তি এবং মিলের বন্ধন আমার মনঃপূত হয়নি।·· আমি চোদ্দো পঙ্‌ক্তির বন্ধন স্বীকার করিনি, কোনো প্রকার মিলও রাখিনি, তবুও এগুলিকে···সনেট বলেই মনে করি, কারণ সনেটের অন্যান্য গুণগুলি আছে।"

—রাতবীতী (১৯৫৫), 'ভূমিকা'।

এই প্রসঙ্গে বাঙালি কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের দলবৃত্ত 'দশপদী'র কথা স্মরণীয়।[১৪]

মিশ্র কলাবৃত্ত (Mixed Moric Style)

আলোচ্য যুগের পূর্ব উল্লিখিত কবিরা প্রায় সবাই মিশ্রবৃত্তে কবিতা লিখতেন। তাছাড়া সচ্চিদানন্দ হীরানন্দ বাৎস্যায়ন 'অজ্ঞেয়' (১৯১১-১৯৮৭), রাম বিলাস শর্মা (১৯১২), ভবানীপ্রসাদ মিশ্র (১৯১৪) এবং গিরিজা কুমার মাথুর (১৯১৮) প্রমুখ কবিরা মিশ্রবৃত্ত ব্যবহার করেছেন। এই কবিদের নেতৃস্থানীয় ছিলেন 'অজ্ঞেয়'। মিশ্রবৃত্ত মুক্তক রচনায় প্রবণতা দেখিয়েছেন—তাঁরা। যেমন—

রাত রহস্যময় স্পন্দিত তিমির কো
ভেদতী কটার-সী
কোঁধগঈ বৌখলায়ে মোরকী পুকার—
বায়ুকো কঁপাতী হুঈ,
ছোটে ছোটে বিন-জমে ওস বিন্দুওঁ কো ঝকঝোরতী,
দুঃসহ ব্যথা সী।
নভপর।

—অজ্ঞেয় 'চেহরা উদাস', তারসপ্তক-১, পৃ ৮২।

অমিল মুক্তকটি ভাবে-ভাষায় ও ছন্দে কেমন মৌখিক ভাষার আদল ফুটিয়ে তুলেছে তা লক্ষ করার মতো। এই রীতির সমিল মুক্তকও বিরল নয়। রাম-বিলাস শর্মা প্রমুখ কয়েকজন কবি মিশ্রবৃত্তে ষোলো-মাত্রা পঙ্‌ক্তির প্রবহমান বন্ধে সনেট লিখেছেন। কারো কারো রচনায় পয়ার ও ত্রিপদী প্রভৃতি বন্ধের নিদর্শনও পাওয়া যায়। সব মিলিয়ে বলা চলে হিন্দীতে এ-যুগেও ঘনাক্ষরী বা মিশ্র কলাবৃত্তের প্রয়োগ উল্লেখ করার মতো।

দলবৃত্ত (Syllabic Style)

লৌকিক ভাব, ভাষা এবং ছন্দের স্বীকৃতি আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের একটি উল্লেখনীয় প্রবৃত্তি। 'অজ্ঞেয়র' মতে :—

আধুনিক যুগের "একটি বিশিষ্টতা হল, লোক সঙ্গীত ও লোকপ্রচলিত লয়ের প্রতি অনুরক্তি। এ-টি একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ প্রবৃত্তি।…যেখানে

এই প্রয়োগ সফল হতে পেরেছে সেখানে রচনা সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠেছে। বহু কবিই এই দুর্লভ সফলতার অধিকারী হয়েছেন।"

—'নয়ী কবিতা', পত্রেপত্রে (১৯৫৩ জানু-ফেব্রুআরি)

সুতরাং বলা চলে লৌকিক ছন্দের রচনায় এ-যুগের কবিদের মধ্যে আশাব্যঞ্জক উৎসাহ দেখা দিলেও দলবৃত্তের স্বরূপ উপলব্ধি এবং নিপুণ প্রয়োগ সকলের পক্ষে সম্ভব হয় নি। এখানে সফল কবিদের মধ্যে একজন কেদারনাথ সিংহ দের (১৯৩২): রচনার নিদর্শন দিচ্ছি।—

ঝীলোঁকে পানী খজুর হিলেঁ গে
খেতোঁ কে পাতী ববূল
পছুওয়াকে হাথোঁ মেঁ শাখেঁ হিলেগীঁ
পুরওয়া কে হাথোঁ মে ফূল
আনাজী বাদল জরুর।

—তীসরাসপ্তক (১৯৫৯)।

মাত্রাবৃত্তের মতো পড়ার অবকাশ থাকলেও এই উদ্ধৃতিতে দলভিত্তিক ১২টি পর্ব আছে। ৮টি চতুর্দল এবং ৪টি ত্রিদল। স্বাভাবিক উচ্চারণের শ্রুতি মাধুরীটুকুও লক্ষণীয়। রচনাটি বাংলা ছড়ার সমগোত্রীয়, পর্বে, মাত্রা-সমতা নেই। এই স্বাভাবিক ছন্দই রবীন্দ্রনাথের হাতে সংস্কার লাভ করে ক্ষণিকা (১৯০০) কাব্যে সাহিত্যিক মর্যাদা পেয়েছে। হিন্দী ছড়ার ছন্দ আজও সে সম্মান ও স্বীকৃতির প্রতীক্ষায় আছে।

এই ছড়ার ছন্দের আলোচনা প্রসঙ্গে হরিবংশ রায় বচ্চন (১৯০৭), রামবিলাস শর্মা (১৯১৪), ভবানীপ্রসাদ মিশ্র (১৯১৪) এবং কুঁওর নারায়ণ সিংহ (১৯২৭) প্রভৃতি কবির দলবৃত্তের রচনার কথা স্মরণীয়।[১৫]

দেখা যাচ্ছে হিন্দী দলবৃত্ত ছন্দও ধীরে ধীরে কবিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। মুখের ভাষা ও ছন্দে কবিতা যে কতখানি স্বাভাবিক ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে রবীন্দ্রনাথের দলবৃত্তের কবিতাগুলিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আশা করা যায় হিন্দী কবিতাতেও এই লৌকিক ছন্দটির পরিমার্জিত এবং উপযোগী রূপের ব্যাপক প্রয়োগের ফলে হিন্দী ছন্দজগৎ সমৃদ্ধির দিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে। পূর্ণ বিকশিত রূপ-লাবণ্য সুষমা-সৌন্দর্য এবং শক্তি নিয়ে হিন্দী ছন্দ আত্মপ্রকাশ করবে—সেদিনের হয়তো আর বেশি দেরি নেই।

গদ্যছন্দ

হিন্দী কবিতার পাঠের সঙ্গে 'লয়' বা 'সুরের' একটা অচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে—মনে করা হয়। কেবল শব্দ বা ধ্বনিরই নয়, অর্থেরও সুর থাকা সম্ভব।[১৬] আর এই অর্থ লয়ের নামান্তরই গদ্যছন্দ। তাকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'ভাবের ছন্দ' (Sense Rhythm)। এ-যুগের অধিকাংশ হিন্দী কবিই গদ্যকবিতা লিখেছেন। 'অজ্ঞেয়' তাঁদের পথপ্রদর্শক।[১৭] তবে নিছক গদ্য রূপে পরিগণিত হবার মতো কবিতারও অভাব নেই—সে কথা আমরা বার বার উল্লেখ করেছি। কবিযশ-লাভের স্পৃহা থাকলেও তার জন্য যে প্রতিভা, ছন্দের অনুশীলন এবং যোগ্যতার প্রয়োজন তা অনেকের নেই। তাই 'ছন্দোহীন' কবিতায় ছেয়ে গেছে হিন্দী-কাব্য জগৎ।[১৮] তবে গদ্যছন্দে যথার্থ কবিতা বা গদ্যকবিতারও অভাব নেই। অজ্ঞেয়ের রচনা থেকে একটি দৃষ্টান্ত :—

দস বর্ষ।
দস বর্ষ ঔর। ওয়হ্ বহুত হৈ।
হমেঁ কিসী কল্পিত অমরতা কা মোহ নহীঁ,
আজকে বিবিক্ত অদ্বিতীয় ইস ক্ষণ কো
পূরা হম জীলেঁ, পীলেঁ আত্মসাৎ করলেঁ
উসকী বিবিক্ত অদ্বিতীয়তা
আপকো, কিম্‌পি কো, ক খ গ কো
অপনী সী পহচনওয়া সকেঁ—
রসময় করকে দিখা সকেঁ—
শাশ্বত হমারে লিয়ে ওয়হী হৈ।
—'নয়ী কবিতা'-২ নয়ী কবিতা : এক সম্ভাব্য ভূমিকা।

ভাবের স্পন্দন, ও অর্থ বা ভাব যতিপাত রচনাটিকে যথার্থ হিন্দী গদ্য কবিতা রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বলাইবাহুল্য হিন্দীতে এমন কবি এবং এইরূপ সার্থক কবিতার সংখ্যা কম।

গদ্য কবিতা নামে ছন্দোহীন রচনা বা নিছক গদ্যকে যাঁরা চালাতে তৎপর তাঁদের প্রতি সাবধান বাণী উচ্চারিত হয়েছে—নানা মহল থেকে। এখানে

ডঃ দেবরাজ উপাধ্যায়ের (১৯০৮-৮১) একটি উক্তি উদ্ধার করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন—

> "কিছু সংখ্যক কবির বিষয়ে এমন সন্দেহ হয় যে, সম্ভবত অক্ষমতার জন্যই তাঁরা ছন্দোবদ্ধ রচনার 'ডিসিপ্লিন' আয়ত্ত না করেই ছন্দোহীন রচনায় হাত দিয়েছেন। এ-বিষয়ে আমি হিন্দী লেখক ও সমীক্ষকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। মানব সংস্কৃতির প্রখ্যাত 'অধ্যেতা', নৃ-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ক্রোয়েবার বলেছেন—ছন্দোহীন কাব্য এবং আখ্যানহীন উপন্যাস সাংস্কৃতিক অধঃপাতের (ডিকেডেন্স) দ্যোতক।"
>
> —নয়ী কবিতা-২ প্রয়োগবাদী কবি : এক চেতাওয়নী',।

বলাই বাহুল্য এই মন্তব্যের প্রারম্ভিক অংশে রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা ও তার ছন্দ বিষয়ক বহু মন্তব্যের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। কবি নীরজ তো অকপটে স্বীকারই করেছেন—'ছন্দে লেখার ক্ষমতার অভাবেই আমরা ছন্দোহীন ছন্দে লিখতে শুরু করেছি।[১৯]

আলোচ্য যুগের হিন্দী ছন্দ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে বাংলা ছন্দের দ্বারা অনুপ্রাণিত। ইংরেজি ও বাংলা ছন্দ বিষয়ে আধুনিক হিন্দী কবিরা উদাসীন ছিলেন না। প্রভাকর মাচওয়ে তো তরুণ কবিদের বাংলা ভাষা, শব্দ, ছন্দ ও কবিতা পাঠ প্রভৃতি বিষয়ে ওয়াকিবহাল হয়ে হিন্দী কাব্যসাহিত্যের উন্নতিবিধানের প্রতি সংকেত করেছেন।[২০] এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন উনিশ শতকে ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রও। আধুনিক হিন্দী কবিদের মধ্যে ভবানীপ্রসাদ মিশ্র প্রমুখ কেউ কেউ রবীন্দ্রানুরাগী রূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। তাঁর 'অনুগামিনী' কাব্যের ভাব, ভাষা, ছন্দ, গতিভঙ্গি সব রবীন্দ্রনাথের—একথা তিনি সানন্দে ঘোষণা করেছেন।[২১]

বাংলার মতোই উর্দু ছন্দের প্রয়োগও হিন্দী কবিতায় পাওয়া যায়। সর্বপ্রথম ভারতেন্দুর রচনাতে উর্দু ছন্দের নিদর্শন মেলে। পরবর্তীকালে মৈথিলীশরণ গুপ্ত, সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী নিরালা এবং আধুনিক যুগে 'নীরজ', শমশের সিংহ, রামবাহাদুর, শ্রীহরি, সত্যেন্দ্রনাথ শ্রীবাস্তব, জানকী বল্লভ শাস্ত্রী (১৯১৬) প্রমুখের কবিতাতে উর্দু ছন্দের বিচিত্র রূপ পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে 'নীরজ' ও শমশের সিংহের (১৯১১) নামেই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। উর্দু কবিতাও

সুর করে পড়তে হয়। তাই কোনো কোনো উর্দু ছন্দ হিন্দীতে খুব স্বাভাবিকভাবে খাপ খেয়ে যায়। সে যাই হোক, হিন্দী কবিতায় কথ্য ভাষার স্বরূপ স্বাভাবিকভাবে ফুটে উঠতে পারছে না। তাই হিন্দী ছন্দের বিকাশও স্বাভাবিক হচ্ছে না। কারণ হিন্দী কবিতা আজও সুর করে পড়া হয়। মধ্যযুগীন গেয়ধর্মিতা থেকে হিন্দী কবিতা ও তার ছন্দকে পুরোপুরি মুক্তি দেওয়ার জন্য প্রয়াস দরকার। এ-বিষয়ে হিন্দী কবিতার আদর্শ হতে পারে বাংলা কবিতা। মধ্যযুগে বাংলা কবিতাও গেয় ছিল। তবে আজ তা পুরোপুরি পাঠ্য। তাই কবি-সমালোচক প্রভাকর মাচওয়ে সহজ কণ্ঠে বলেছেন—

> 'হিন্দী কবিদের পক্ষে "সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেটি বাঙালি কবিদের কাছ থেকে জেনে নেওয়ার মতো, তাহল কাব্যপাঠের গুরুত্ব এবং উপযোগিতা।' 'কাব্যপাঠ' আর 'কাব্য-গান' এক জিনিস নয়।"
>
> —নয়ীকবিতা-৩ ভারতীয় ভাষা, মেঁ নয়ী কবিতা : 'কুছ নোট্স'

নবীন ছন্দ-প্রয়োগের উত্তেজনায় এবং অনায়াস যশোলাভের আকর্ষণে অনেকের কবিজীবনের সূচনা ঘটলেও গদ্য ছন্দে বা ছন্দোহীন গদ্যে কবিতা পাঠকের তৃপ্তিবিধান লিখে সকলের ভাগ্যে ঘটে না যে তা ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তাই কেউ কেউ ভাবের সুষ্ঠু এবং সংবেদনশীল প্রকাশের জন্য সুস্পষ্ট পদ্যছন্দের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করছেন। তরুণ কবিদের মধ্যে সুস্পষ্ট ছন্দ রচনার প্রবৃত্তি ক্রমবর্ধমান। তাই বাংলা অসমীয়া এবং ওড়িয়ার মতোই হিন্দী কবিতার ক্ষেত্রেও পদ্যছন্দের গুরুত্বও মহত্ত্ব আবার স্বীকৃতি পাবে আশা করা যায়।

দেখা গেল—বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া এবং হিন্দীর আধুনিক কবি সম্প্রদায়ের মধ্যে অভিনব ছন্দ-প্রয়োগের উত্তেজনায় এবং অনায়াস যশোলাভের আকর্ষণে অনেকের কবি জীবনের সূচনা ঘটলেও গদ্যছন্দে বা ছন্দোহীন গদ্যে সর্বজন গ্রাহ্য ও সংবেদনশীল কাব্যরচনা যে সকলের পক্ষে সম্ভব হয়নি, সে কথা আজ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তাই কেউ কেউ ভাবের সুষ্ঠু এবং সংবেদনশীল প্রকাশের জন্য সুস্পষ্ট পদ্যছন্দের প্রতি আবার আকর্ষণ অনুভব করছেন। তরুণ কবিদের মধ্যে এই প্রবণতা ক্রমশ স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। বর্তমানে কবিতাকে ভাবে-ভাষায় ও ছন্দে 'সহজ' অর্থাৎ স্বাভাবিক করার দিকে ঝোঁক বেশ প্রবল। আধুনিক ভারতের বিভিন্ন ভাষায় বিশেষ করে পূর্বাঞ্চলীয় ভাষা কয়টিতে

কবিতার যে আদর্শ এবং পরিণতি দেখা যায়,—তা অষ্টাদশ শতকের শেষে ইংরেজি সাহিত্যে ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোল্‌রিজ্ প্রবর্তিত কবিতার স্বাভাবিক লক্ষণ ও আদর্শের অনুপন্থী বলা যায়।

—W. L. Renwick, এরমতে ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'Lyrical Ballads-এর ভূমিকায় ওয়ার্ডসওয়ার্থ লিখেছিলেন :—

> "The principal object, then proposed in these poems was to make incidents of common life interesting by tracing in them, truly though not ostentatiously, the primary Laws of our nature ; chiefly as far regards the manner in which we associate ideas in a state of excitement."
>
> —English Literature : 1789-1815 (1463) P. 149.

আধুনিক বাংলা কবিতা সম্পর্কে সমালোচক প্রবোধচন্দ্র সেনের একটি অভিমতও প্রায় সমধর্মী বলা যায়।—

> "আধুনিক কবিতার গতি-প্রকৃতি ও প্রবণতার প্রতি নজর রেখে… আমি আশান্বিত হয়েছি, নিরাশ হইনি। তবে আধুনিক কবিদের সব প্রচেষ্টাই পরীক্ষা-নিরীক্ষার পালা শেষ করে সফলতার দৃঢ়ভূমির উপরে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে, এমন কথাও বলতে পারি না।…আশা করি পরবর্তী ছন্দোনিষ্ঠ কবিদের সমবেত প্রচেষ্টায় বাংলা ছন্দের নবতর প্রকাশ আমাদের অনাগত কাব্য সাহিত্যের উদয় দিগন্তকে অরুণ-আভায় উদ্‌ভাসিত করবে।"
>
> —বাংলা ছন্দ সমীক্ষা, (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) পৃ. ৮১।

এই সন্দর্ভে হিন্দীর 'সহজ কবিতাগোষ্ঠী' (১৯৬৮)-র কাব্যদর্শ ও অনুধাবনীয় :—

> "সমকালীন জীবন এবং সৃজনধর্মী দায়িত্ববোধের উপর কবিতা নির্ভরশীল। তার মূলে রয়েছে সহজ পরিপূর্ণ জীবনের প্রতীতি এবং সহজ সুগঠিত শিল্প মাধ্যমের আন্তরিক অনুসন্ধান-প্রয়াস।"
>
> —সহজ কবিতা[২২] (১৯৬৮), পৃ. ৮।

সাম্প্রতিক অসমীয়া কবিতাতেও নতুনের প্রত্যাশা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত। অসম-সাহিত্য-বিহারী সত্যেন্দ্রনাথ শর্মার মতে :—

> "সাম্প্রতিক কবিতা এতিয়াও আত্মমহিমারে মহিমামণ্ডিত হৈ আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিছে বুলি কব নোৱাৰি। ই বহুত কবিৰ ক্ষেত্ৰত শব্দৰ কুচকাওয়াজ মাত্র। প্রকাশভঙ্গীর নতুনত্ব আরু জীবনক গতানুগতিভাবে নাচাই নিজস্ব দৃষ্টিরে চোওয়ার প্রয়াস আধুনিক এচাম কবির রচনাত লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান সমাজব্যবস্থা, জীবনপ্রবাহর প্রতি অসন্তুষ্টির ভাব প্রায়েবোর কবির রচনাত পরিস্ফুট, নতুন জীবনর কারণে তেওঁলোক অপেক্ষারত।"
>
> —অসমীয়া সাহিত্যর সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত (১৯৮১) পৃ. ৪৩৬।

ওড়িয়ার সাম্প্রতিক কবিতার আদর্শ এবং ভাবী সম্ভাবনাও অনুরূপ বলা যায়। অধ্যাপক চিন্তামণি বেহেরার মতে :—

> "আধুনিক মনুষ্যর মানসিক সংকট ও চিত্তবৃত্তির রূপায়ণরে শিল্পোচিত রসদৃষ্টি যদি আত্মপ্রকাশ ন করে, তাহা বাস্তবতার নগ্ন লিপি হোই-পারে; কিন্তু তাহা যে কবিলিপির সম্মান লাভ করিবাকু অযোগ্য, এহা সুনিশ্চিত। তেণু কবির বাস্তব চেতনা সমাজর বহিরঙ্গ ও কাল্পনিক রূপকু সম্বল ন করি জীবনর গভীর চেতনা ও দেশ-কাল-পাত্রর প্রকৃতি উপরে প্রতিষ্ঠিত হেলে তাহা বাস্তব, জীবনধর্মী ও সামাজিক হেবা স্বাভাবিক।"
>
> —কাব্য ও কলাকার (১৯৭৬), পৃ. ২৪৫।

দেখা যাচ্ছে বাংলা, হিন্দী, অসমীয়া এবং ওড়িয়া চার ভাষারই সাম্প্রতিক কবিতার সংকট, তার সমাধান এবং শিল্পসম্মত পরিণত প্রকাশ-প্রত্যাশার গর্ভে নিহিত। তার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া গেলেও, সমুচিত অভিব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ এখনো সম্ভব হয়নি। তাই প্রতিষ্ঠা পায়নি তথাকথিত আধুনিক ছন্দও।[২৩]

আধুনিক ভারতীয় কবিতা ও তার ছন্দের দিকে একটু গভীরভাবে তাকালে আমরা সবিস্ময়ে এই কথাটা উপলব্ধি করি যে, ঐক্যের মধ্যেও যেমন বৈপরীত্যের স্থান আছে তেমনি আছে বিরোধের মধ্যে মূলীভূত সাধর্ম্য ও সংহতির বীজ। আর দিন দিন তার অভিব্যক্তি এবং পত্রে-পুষ্পে-ফলে সার্থকতার সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠছে তাতে সন্দেহ নেই।

বৈদিক, সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ-প্রভৃতি বিভিন্ন যুগে ভারতীয় সাহিত্য ও ছন্দে বৈচিত্র্য কম ছিল না। ছন্দের আপাত ভিন্নতার কথাও জানা যায়, আঞ্চলিকতার কারণে। তা সত্ত্বেও 'বৈদিক ছন্দ', 'সংস্কৃত ছন্দ', 'প্রাকৃত ছন্দ' ও 'অপভ্রংশ ছন্দ'—নামেই সে-সব যুগের ছন্দের পরিচয়। অনুরূপভাবে আধুনিক যুগে—বিশেষ করে রবীন্দ্র সমসাময়িক এবং পরবর্তী যুগে ভারতীয় সাহিত্য ও ছন্দে নানা বৈচিত্র্য ও আপাত ভিন্নতা থাকলেও মূলগত বিশেষ ঐক্যের কারণে তা রবীন্দ্র-অনুপ্রাণিত আধুনিক ভারতীয় ছন্দ-নামে অভিহিত হতে পারে। বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া এবং হিন্দী ছন্দের আলোচনা আমাদের সেই নিষ্কর্ষে পৌঁছে দেয়।

উল্লেখপঞ্জী

১। রবীন্দ্রনাথ গদ্যকবিতা লিখলেও পদ্যকবিতার তুলনায় তার সংখ্যা অতি নগণ্য। তাঁর তিন হাজারের মতো সুমিত ও সুনিয়ন্ত্রিত ছন্দের কবিতার পাশে গদ্যকবিতা মাত্র ১২৪টি।

২। ওড়িয়া সাহিত্যের আধুনিক যুগ পাঁচ ভাগে বিভক্ত বলে অনেকে মনে করেন। যেমন—রাধানাথ যুগ, সত্যবাদী যুগ, সবুজবাদী যুগ, প্রগতি যুগ এবং অত্যাধুনিক যুগ। ঊনবিংশ শতকে সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্য-আশ্রিত যে জাতীয় উন্মেষ উড়িষ্যাতে সংঘটিত হয়েছিল তাই রাধানাথ যুগ রূপে চিহ্নিত। এ-যুগের অবস্থান ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। সত্যবাদী যুগ ১৯১০-২১; সবুজবাদী যুগ ১৯২১-৩৫; প্রগতি যুগ ১৯৩৬-৪৬ পর্যন্ত এবং ১৯৪৭ থেকে অত্যাধুনিক যুগ। অসমীয়া সাহিত্যেও প্রগতিবাদী, প্রয়োগবাদী (১৯৩৬-৪৬) এবং অত্যাধুনিক যুগের ভাগের কথা কেউ কেউ স্বীকার করেন।

৩। লেখকের 'আধুনিক বাংলা ও হিন্দী ছন্দ' (১৯৭৭), পৃ. ২১২-২১৪।

৪। দ্রষ্টব্য ছন্দ (১৯৭৬) 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত-২' পৃ. ১০২।

৫। —পূর্ববৎ 'বাংলার প্রাকৃত ছন্দ-২', পৃ. ১৮২।

৬। —পূর্ববৎ, 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত-২' পৃ. ১০১ এবং ১১৫।

৭। 'বাংলা ছন্দে নূতন সম্ভাবনা', 'পরিচয়' (পত্রিকা) ১৩৪৮ ফাল্গুন।

৮। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'তামার তিমিরে' ('বারো বছরের বাংলা কবিতা') এবং বিশ্বজিৎ গুপ্তের 'জনৈক বিশ্ব নেতার প্রতি', (শারদীয়া 'দেশ' ১৯৬৫) কবিতা দুইটি যথাক্রমে মুক্তকে এবং গদ্য ছন্দে সনেটের নিদর্শন।

৯। দ্রষ্টব্য—লেখকের 'আধুনিক বাংলা ও হিন্দী ছন্দ' (১৯৭৭), পৃ. ১৫৮।

১০। কলকাতার ১৯৪৬ সালের দাঙ্গায় জীবনাবসান ঘটে আকস্মিকভাবে।

১১। "Both of them [Hem Barua (1915-77) and Amulya

Barooah (1922-46)] threw off not only the strait-jacket of metre, but metre itself."

—M. Bora : Fundamentals of Assamese Metre (1977) P. 297.

১২। "We feel, verse libre in full sense of the term exists only in the variable Moric [Misra vritta] style. As for the compositions in the other two styles built only on anisometrical lines, they are but on the outer-fringe of the form."

১৩। দ্রষ্টব্য—চিন্তামণি বেহেরাকৃত 'কাব্য ও কলাকার' (১৯৭৬) পৃ. ২৪১।

১৪। দ্রষ্টব্য—দ্বিজেন্দ্রলাল গ্রন্থাবলী (ব. সা. প. ১৯৭৬)-২য় খণ্ড, পৃ. ৪৯১।

১৫। দ্রষ্টব্য—লেখকের 'আধুনিক বাংলা ও হিন্দী ছন্দ' (১৯৭৭), পৃ. ২২৬-২৯।

১৬। দ্রষ্টব্য—জগদীশ গুপ্ত : 'নয়ী কবিতা : নয়া সঙ্কলন', নয়ী কবিতা-২ (১৯৫৫), পৃ. ৩১।

১৭। দ্রষ্টব্য—লেখকের 'আধুনিক বাংলা ও হিন্দী ছন্দ' (১৯৭৭), পৃ. ২৩০, পা. দ টীকা-২।

১৮। দ্রষ্টব্য—নয়ীকবিতা-২ (১৯৫৫), পৃ. ১৯।

১৯। "ছন্দো মেঁ লিখ সকনা বস কী বাত নহীঁ হৈ,
ইসী লিয়ে বে-ছন্দ ছন্দ মেঁ হম লিখতে হৈঁ।"

—নীরজ কী পাতী, পৃ. ৯৩।

২০। দ্রষ্টব্য—'নয়ী কবিতা-৩, (১৯৫৬), পৃ. ২১।

২১। 'বক্তব্য' দূসরা তারসপ্তক (১৯৫১), পৃ. ৬-৭

২২। দ্রষ্টব্য—লেখকের 'হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস' (১৯৮৯), পৃ. ৫২৫।

২৩। বিশ্বভারতী থেকে ১৯৬৮ সালে ডঃ অশোক রথ, অধ্যাপক খগেশ্বর মহাপাত্র এবং অধ্যাপক রামবহাল তেওয়ারীর যুগ্ম-পরিচালনায় 'ওড়িয়া ছন্দ' বিষয়ে গবেষণাকার্য সম্পন্ন করেছেন। তবে গবেষণা-পত্রটি আজও অ-প্রকাশিত। তা-ছাড়া ওড়িয়া ছন্দ নিয়ে কয়েকটি পুস্তকও রচিত প্রকাশিত হয়েছে। পত্র-পত্রিকায় এবং অন্যত্র ওড়িয়া ছন্দ নিয়ে আলোচনার মাত্রা ক্রমে ক্রমে বাড়ছে। সুতরাং ওড়িয়াতেও

ছন্দ আর পূর্বের মতো অবহেলিত বিষয় নয়। এই প্রসঙ্গে লেখকের 'আধুনিক ওড়িয়া ছন্দ' (১৯৮০) এবং তার 'ওড়িয়া ভাষায় অনুবাদের' (১৯৮৩) কথাও উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থেই ওড়িয়া ছন্দের বৈজ্ঞানিক আলোচনা এবং বিশ্লেষণের প্রথম প্রয়াস লক্ষিত হয়। এই প্রসঙ্গে ওড়িশার লব্ধ প্রতিষ্ঠ সাহিত্য পত্রিকা 'ঝংকার'-এ প্রকাশিত একটি অভিমতের অংশ বিশেষ স্মরণীয়।—

"ওড়িয়ায় সমালোচনা সাহিত্যে ছন্দ নিয়ে বিশেষ কোনো কাজ হয়নি।…এ-অবস্থায় বাংলা ভাষায় ও ওড়িয়া কবিতার ছন্দ নিয়ে রচিত এই পুস্তকটি একটি অভিনন্দনীয় পদক্ষেপ। এটি আধুনিক ওড়িয়া সমালোচকদের উদ্বুদ্ধ করবে ও ছন্দের ক্ষেত্রে অধিক কাজ করতে উৎসাহ যোগাবে—বলে আমাদের বিশ্বাস।"

—ঝংকার (পত্রিকা), জুন, ১৯৮৮, পৃঃ ৩১৪।

উপসংহার

আধুনিক বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া এবং হিন্দী ছন্দের প্রবাহ প্রায় অভিন্নমুখী। বাংলা ও অসমীয়া ছন্দ স্ব স্ব স্বভাবসুলভ গতিপথ পেয়েছে, কিন্তু হিন্দী ও ওড়িয়া ছন্দের পক্ষে তা আজও সম্ভব হয়নি। কারণ-স্বরূপ বলা যায়—বাংলা কাব্যের বাহনরূপে চর্যাপদের যুগ থেকেই ব্যবহৃত হওয়ায় বাংলা ভাষা তার প্রকৃতি অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট ও সুস্থির পরিণত রূপ লাভ করেছে। অসমীয়া ভাষার পরিস্থিতিও বহুলাংশে অনুরূপ। চতুর্দশ শতক থেকে তার স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট। কিন্তু হিন্দী কাব্যের বাহন রূপে খড়ীবোলীর প্রয়োগ শুরু হয়েছে উনবিংশ শতকের শেষের দিকে। ওড়িয়া ভাষা সারলা দাসের সময় থেকে স্বতন্ত্র হয়ে উঠলেও প্রতিবেশী অনার্য ভাষার প্রভাবে তাতে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা দেয় যার ফলে বিবর্তন প্রক্রিয়া প্রতিবেশী আর্যভাষার ধারা থেকে পৃথক হয়ে বিচ্ছিন্ন ও ব্যাহত হয়। হিন্দী কাব্যের বাহন প্রথমাবধি অনিশ্চিত এবং অনির্দিষ্ট,—কোথাও ভোজপুরী, কোথাও অবধী, আবার কোথাও বা ব্রজভাষা। পূর্ব সংস্কার ত্যাগের অক্ষমতা এবং রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভার অভাব লক্ষিত হয় হিন্দী এবং ওড়িয়া উভয় সাহিত্যে। অসমীয়ার ক্ষেত্রে সে অসুবিধা ঘটেনি সংস্কার মুক্ততা এবং বাংলা সাহিত্যের বিশেষ করে রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ এবং তা থেকে সামূহিক প্রেরণা লাভের ফলে। তাই বাংলার মতোই অসমীয়াতেও লৌকিক বা দলবৃত্ত ছন্দ সংস্কৃত ও মার্জিত হয়ে সাধুসাহিত্যের বাহন রূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। হিন্দী এবং ওড়িয়াতে আজও তা পুরোপুরি সম্ভব হয়নি। সম্প্রতি অতি ধীর গতিতে স্বাভাবিকতা আসতে শুরু করেছে—তাই দলবৃত্তের প্রতি হিন্দী ও ওড়িয়া কবিদের চিত্ত আকৃষ্ট হয়েছে বলা যায়। দলবৃত্তে কবিতা লেখাও শুরু হয়েছে। বাংলায় চর্যাপদের সময় থেকেই (সংস্কৃত) বর্ণবৃত্ত ছিল না। ভারতচন্দ্রের সময় বাংলায় বর্ণবৃত্তের চল শুরু হয়। পরে বর্ণবৃত্ত বা সংস্কৃত ছন্দ চালাবার আরও প্রয়াস দেখা দেয়। তবে বর্তমানে বাংলায় আর বর্ণবৃত্ত রচিত হয় না। হিন্দীতেও প্রারম্ভিক যুগে বর্ণবৃত্ত ছিল না। মধ্যযুগ থেকে তার প্রচলন দেখা যায়। আধুনিক যুগে বর্ণবৃত্ত আর লেখা হয় না। অসমীয়াতে শংকরদেব প্রমুখ কোনো কোনো কবির রচনায় সংস্কৃত ছন্দের আভাস মাত্র পাওয়া যায়। তারপর অসমীয়া ছন্দ আপন স্বাতন্ত্র্য নিয়ে অগ্রসর হয়েছে। বর্ণবৃত্তের প্রয়োগ

অসমীয়াতে হয় না। প্রাচীন ও মধ্য যুগের ওড়িয়া কাব্যে বর্ণবৃত্তের ব্যবহার ছিল। অবশ্য মধ্যযুগে তা খুবই কমে আসে। বর্তমানে বর্ণবৃত্তের রচনা হয় না। তবে বাংলা, অসমীয়া ওড়িয়া এবং হিন্দী চার ভাষাতেই কখনও বা গানে কখনো বা কবিতায় সংস্কৃত মাত্রাবৃত্তের ব্যবহার ঘটে থাকে। অবশ্য তা পরিমাণে অনুল্লেখ্য মনে হয়। বাংলার কলাবৃত্ত, মিশ্রবৃত্ত ও দলবৃত্ত রীতির মতোই হিন্দী, অসমীয়া এবং ওড়িয়াতে যথাক্রমে কলাবৃত্ত (মাত্রাবৃত্ত), মিশ্রবৃত্ত (ঘনাক্ষরী, যৌগিক এবং দাণ্ডিবৃত্ত বা অক্ষরবৃত্ত) এবং দলবৃত্ত, (স্বরবৃত্ত, লৌকিক) —এই তিন রীতির ছন্দ আছে। তিন রীতিতেই বাংলা ও অসমীয়া ছন্দের শক্তি ও সৌন্দর্যের বিচিত্র অভিব্যক্তি ঘটেছে। হিন্দীর সম্ভাবনাও ক্রমশঃ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। কিন্তু ওড়িয়া ছন্দের সুষমা-সামর্থ্য সীমিত হয়ে আছে কলাবৃত্ত ও মিশ্রবৃত্ত রীতিকে কেন্দ্র করেই। লৌকিক বা দলবৃত্ত রীতির সাধুসাহিত্যে প্রয়োগের উল্লেখযোগ্য প্রয়াস এখনো দেখা দেয়নি। তবে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে— এ-টি খুবই আশার কথা। বিংশ শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশকে বাংলায় ; চতুর্থ দশকে অসমীয়া এবং ওড়িয়াতে তথা পঞ্চম দশকে হিন্দীতে ছন্দের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য ছন্দের আদর্শে যে অভিনবতার সূচনা এবং পরবর্তী কয়েক দশকে ক্রম-অভিব্যক্তি ঘটেছে তার কোনো স্থায়ী গুরুত্ব না থাকাই সম্ভব। কারণ এগুলি এখনো পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরেই থেকে গেছে। তবে এগুলি ছন্দের পরবর্তী উৎকর্ষের প্রেরণার উৎসরূপে প্রমাণিত হবে সে কথা বলাই বাহুল্য। সাম্প্রতিক কালে চার ভাষাতেই গদ্য ছন্দ থেকে পদ্যছন্দের দিকে তরুণ কবিদের আগ্রহ ক্রমেই বাড়ছে। কাজেই আশা করা যায় ভবিষ্যতে বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া এবং হিন্দী—পূর্বাঞ্চলীয় এই চার ভাষারই ছন্দের শক্তি ও সৌন্দর্যের সুন্দর ও সাবলীল সামগ্রিক প্রকাশ সম্ভব হবে।

আধুনিক বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া এবং হিন্দী ছন্দ পরস্পরের খুব নিকট এসে গেছে। উনবিংশ শতক পর্যন্ত এই চার ভাষার ছন্দের মধ্যে যোগাযোগের যে পরিমাণ ছিল বিংশ শতকে তা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তার অন্যতম প্রধান কারণ বাংলা ছন্দ বিশেষ করে রবীন্দ্র-ছন্দের আদর্শ থেকে অসমীয়া, ওড়িয়া এবং হিন্দী কবিদের প্রেরণা লাভ। আবার তার ফলস্বরূপ পরস্পরের মধ্যেও প্রেরণা এবং উৎসাহ লাভের উৎস ও উৎকর্ষ অনুসন্ধান। হিন্দী ছান্দসিকদের ছন্দ আলোচনাতেও এই যোগাযোগের যথেষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে। চার ভাষাতেই ছন্দ সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলস্বরূপ প্রত্যেক ভাষাতেই অন্য তিন

ভাষার ছন্দ বিষয়ে কৌতূহল ও আগ্রহ উত্তরোত্তর বাড়ছে। বাড়ছে ছন্দ শাস্ত্র নিয়ে আলোচনাও। বাংলা ছন্দ নিয়ে প্রচুর আলোচনা ও গবেষণা হয়েছে এবং হচ্ছে। ছন্দগ্রন্থও প্রচুর প্রকাশিত হয়েছে। ছন্দ পরিভাষা ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি নিয়ে যে মতভেদ ছিল এখন তাও মিটে গেছে—বলা যায়। ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন কৃত ছন্দ পরিভাষা ও বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে সকলের শ্রদ্ধা এবং আস্থা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বাংলা ছন্দের বৈজ্ঞানিক আলোচনার পথিকৃৎ রূপে আজ প্রবোধচন্দ্র সর্বজন মান্য। হিন্দীতে ছন্দ-শাস্ত্র নিয়ে রচিত গ্রন্থের সংখ্যা কম নয়, গবেষণাও হয়েছে প্রচুর। তাতে সংস্কৃত প্রাকৃত ছন্দ-শাস্ত্রই অনুসৃত। তাই ছন্দ-শাস্ত্রের আলোচনায় পরিভাষা-আদিজনিত মতভেদ দেখা দেয়নি। অতি সম্প্রতি অনুরূপ মতভেদের কিছু কিছু আভাস পাওয়া যাচ্ছে। অসমীয়াতে ছন্দগ্রন্থের অভাব নেই। ছন্দ নিয়ে গবেষণাও হয়েছে এবং হচ্ছে। ছন্দ-পরিভাষা ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি নিয়ে ইদানীং কিছু কিছু মতপার্থক্য দানা বেঁধে উঠছে। ওড়িয়াতে ছন্দ-আলোচনা হয়েছে খুবই কম। ছন্দ-শাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থের নিতান্তই অভাব। তাই ছন্দের আলোচনায় এক এক সময় এক-এক রকম পরিভাষার ব্যবহার চোখে পড়ে। এখন পর্যন্ত ওড়িয়া ছন্দ নিয়ে মাত্র একটি গবেষণা হয়েছে। গ্রন্থটি অপ্রকাশিত। বাংলা ছন্দ নিয়ে হিন্দী, অসমীয়া এবং ওড়িয়াতে আলোচনা বেশি, বাংলায় ওই তিন ভাষার ছন্দ নিয়ে আলোচনা তুলনায় কম। কিন্তু পারস্পরিক আত্মীয়তা এবং পরস্পরের প্রতি কৌতূহল ও আগ্রহের ফলে এই আলোচনা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। একের নির্মিতি ও অভিব্যক্তিতে অবশিষ্টের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও প্রত্যক্ষ করা যায়। এই প্রয়াস ও প্রবণতা উদারতা এবং জ্ঞানস্পৃহার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও স্বীকৃতি পেলে, বিবিধ বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে—বাংলা, অসমীয়া ওড়িয়া এবং হিন্দী ছন্দ—এমন প্রত্যাশা অমূলক নয়। ভবিষ্যতের ভারতীয় ছন্দ, শক্তি, সৌন্দর্য এবং সার্থকতায় আরও ঘনিষ্ঠ, সংহত এবং প্রত্যাশিত রূপ পরিগ্রহ করবে এমন আভাসও পরিসূচিত।

এই ভাবে রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-প্রতিভা পূর্বাঞ্চলীয় চার ভাষার ছন্দে যে সংহতি ও সংস্থিতি সম্ভব করেছে অচিরে তা অপরাপর ভারতীয় ভাষার ছন্দের ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষ করে তুলবে—এমন সুন্দর, সার্থক এবং মঙ্গলময় সম্ভাবনাবতই রবীন্দ্র ছন্দে প্রতিভার বৈশিষ্ট্য নিহিত।

নির্দেশিকা

১. ব্যক্তিনাম

২. গ্রন্থনাম

৩. ছন্দনাম

৪. বিবিধ—'ক'

৪. বিবিধ—'খ'

শুদ্ধিপত্র

ছন্দ বিষয়টি প্রাকরণিক। তার পঠন-পাঠনে বিশুদ্ধতা প্রত্যাশিত। তা প্রত্যাশিত উপস্থাপনেও। কিন্তু সহজে তা হয় না। হয়নি প্রস্তুত ক্ষেত্রেও। তাই বিষয় ও বক্তব্যের দিকে লক্ষ রেখে অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ অশুদ্ধির শুদ্ধরূপ দেওয়া গেল।—

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	আছে	হবে
২৪	২৬	পদ্যছন্দ	পদ্যস্পন্দ
২৬	১৭	মিশ্রবৃত্তে	মিশ্রবৃত্তে (Mixed Moric Style)
৩২	১৪	সিং. হা. স. ন	সিং. হাঃ স. ন
৪৩	১	পয়ারবদ্ধ	পয়ারবন্ধ
৪৪	১৬	স্বাভাবিক নয়	স্বাভাবিকতায়
৭২	৩	শুরক	শূকর
৭৯	১১	সৃজন নয়	সৃজন অবাস্তব নয়
৯০	২	পঙ্গীতি	পঙ্গতি
৯১	২১	মাধবরাজ	কবিরাজ
১০৩	১৭	চউতিশ	চউতিশা
১০৭	১০	রচনায় দ্বারা	রচনায় তার দ্বারা
১০৮	১৭	কহেকা	কহেগা
১০৯	২১	দুঃখব	দুঃখর
১১২	২৪	বণে	রণে
১১৫	১৭	একপদী ওই যে	একটি একপদী
১১৬	১৫	প্রস্তাব	প্রভাব
১২০	১৭	মহাবীর কেন-লেখা	জাহ্নবীর ফেন-লেখা
১২৩	১৪	পরিচিত	পরিচিতি
১২৪	৪	সম্প্‌ত্ত	সম্পৃক্ত

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	আছে	হবে
১২৭	১০	মালচ	মালঞ্চ
১৩০	২৮	ক'টি বাকি	বাকি ক'টি
১৩৪	১	বঙ্কিমচন্দ্রের	বংকিমচন্দ্রের
১৩৮	২	নবীমচন্দ্র	নবীনচন্দ্র
১৫৩	১৩	বাই হোক	যাই হোক
১৫৭	৯	গধাধর মোহর	গঙ্গাধর মেহের
১৫৮	শীর্ষক	Syllabic Tiyle	Syllabic Style
১৫৯	৭	শব্দটি রূপে	শব্দটি অতি সংকুচিত রূপে
১৭৩	৩	সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী	হিন্দীতে সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী
১৭৮	২-৩	পরিণত দেখা যেতে পারে বয়সের	দেখা যেতে পারে পরিণত বয়সের
১৯৭	১৬	দলবৃত্ত সুস্পষ্ট	দলবৃত্ত প্রকৃতি সুস্পষ্ট
২১১	১০	বর হোইন	বর গোহাইন
২১৬	১৬	মৃতু	মৃত্যু
২১৭	৬	=২	=২০
	২৬	গোস্বারী	গোস্বামী
২২০	২৩	ইতিবৃত্ত	অ, সা, সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত
২২৩	৫	ছায়াপদী	ছায়াবাদী
২২৫	১	সচ্চিদানন্দ	শচ্চিদানন্দ
	৯	নিদর্শদন	নিদর্শন
২৩৩	২৮	অত্তহান	অন্তহীন
২৩৪	১২	ভুল্‌নী	ভুলুনী
২৩৬	৩০	উদ্ধৃতি	উদ্‌ধৃত
২৩৭	১৩	সাতমাত্রার	সাত মাত্রার পর্বের
২৩৯	১২	বৈ. প. পট্টনায়ক	বৈ. না. পট্টনায়ক
২৪৫	১৬	রা, সো. গ. গ্রহাবলী	রা. মো. গ. গ্রন্থাবলী
২৫১	৫	প্রান্তিত	প্রান্তিক
২৫৫	১৫	ধাত্র	থাএ
২৫৯	২৭	কাব্যকুঞ্চ	কাব্যকুঞ্জ

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	আছে	হবে
২৬৮	৫	আঁখো যেঁথে	আঁখো মেঁথে
	২৪	ছন্দোবদ্ধের	ছন্দোবন্ধের
২৭৩	১৪	৬+১০	৮+১০=১৮
২৭৪	১৩	চলা রহী	চল রহী
২৮১	৭	গীতকুঞ্জ	গীতগুঞ্জ
	১৭	দৃষ্টপ্রতি	প্রতি দৃষ্টি
২৮৪	২৪	একান্তই	একাস্তই
২৯০	৫	পঢ়	পঢ়ি
২৯২	১৬	প্রসাদ	প্রসঙ্গ
৩০০	৫ শীর্ষক	Syllabie	Syllabic
৩০৫	৫	জক্ষুণ্ণ	অক্ষুণ্ণ
৩১৯	১৬	প্রাধায্য	প্রাধান্য
৩২৪	২	ধামানি	ধামালি
	১০	৪+৪+৩ ॥	৪+৩ ॥
৩২৭	১১	ক্ষুণ্ন	ক্ষুণ্ণ
৩৩২	৬	সিংহদের	সিংহের
৩৩৫	শেষ	নামেই	নামই
৩৪০	২৫	১৯৬৮	১৯৮৬
৩৪৪	২৮	সম্ভাবনা তই	সম্ভাবনাতেই
৩৪৪	২৯	ছন্দে প্রতিভার	ছন্দ-প্রতিভার

গ্রন্থটিতে বৈদিক সংস্কৃত-প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ছন্দের সঙ্গে আধুনিক ভারতীয় ছন্দের সম্পর্ক নির্দেশের প্রয়াস করা হয়েছে। বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া এবং হিন্দী ছন্দের প্রাচীন ও মধ্য যুগের স্বরূপ তুলনাত্মক দৃষ্টিতে বোঝার ও বোঝাবার চেষ্টা লক্ষিত হয়। উচ্চারণভেদের জন্য এই চার ভাষার ছন্দে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তবু তাদের মধ্যে ঐক্যের সুরও শোনা যায়। আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথের ছন্দ প্রতিভার স্পর্শে কেবল বাংলা ছন্দই নয়, প্রতিবেশী অসমীয়া, ওড়িয়া ও হিন্দী ছন্দও আধুনিক হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই আধুনিকতার স্বরূপ কি, তা কিভাবে সম্ভব হয়েছে, বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া ও হিন্দী কাব্যকানন কিভাবে নবনব ছন্দকুসুমে আমোদিত হয়ে উঠেছে—এ সবই তুলনাত্মক দৃষ্টিতে তুলে ধরা হয়েছে। স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—জাতীয় সংহতির—একটি অনুপম অধ্যায়।

পঁচাশি টাকা ISBN—81-247-0012-5